স্বস্তিকা

দাম : ৭০ টাকা

পূজা সংখ্যা - ১৪৩০

৯ অক্টোবর - ২০২৩

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

পূজা সংখ্যা

৭৬ বর্ষ ৫ সংখ্যা, ২১ আশ্বিন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

৯ অক্টোবর - ২০২৩, যুগাব্দ - ৫১২৫,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ৭০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

দেবী প্রসঙ্গ

দুর্গা ভাবনা : বেদ থেকে বর্তমান
ড. জয়ন্ত কুশারী ১৯

উপন্যাস

পথে চলে যেতে যেতে
এষা দে ৪৫

ভোজবাজি
শেখর সেনগুপ্ত ৭১

অথ ত্রিলিঙ্গ কথা
প্রবাল ১৪৩

প্রবন্ধ

হিন্দুত্বের প্রতি যুবকদের আকর্ষণ ক্রমবর্ধমান
রবীন্দ্র জোশী ২৫

হিন্দুত্ব : চন্দ্রনাথ বসু এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ
বিজয় আঢ্য ৩১

আমাদেরই বাংলা রে..
কুণাল চট্টোপাধ্যায় ৫৫

প্রবন্ধ

ওপারের হিন্দুরা কেমন আছেন
তথাগত রায় ৬৭

ইতিহাসের উপেক্ষিত নায়ক
ড. নারায়ণ চক্রবর্তী ৮৭

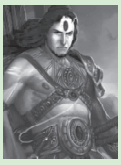

অভিশপ্ত নিঃসঙ্গ মহাবীর অশ্বত্থামা
নন্দলাল ভট্টাচার্য ১০১

বঙ্গগৌরব মহারাজা শশাঙ্ক
গোপাল চক্রবর্তী ১২৩

নাথুরামের বিচার এক অন্তহীন কোর্টরুম ড্রামা
সুজিত রায় ১৩১

পরাধীন ভারতবর্ষে জাতীয়তাবোধ ও চরমপন্থী রাজনীতির উত্থান এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৫

ব্যোমকেশের অন্তরালে
সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ২০৩

শিব, শিবলিঙ্গ ও শ্রীরুদ্র একটি পর্যালোচনা সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
ড. পঙ্কজ কুমার রায় ২১১

প্রবন্ধ

রূপান্তর নয়, সংযোজনের আর এক নাম দুর্গাপুজো
ড. রাজলক্ষ্মী বসু ২২১

বিশ্বকাপ ফুটবলের সঙ্গে আমরা
নিলয় সামন্ত ২৩৫

গল্প

পঞ্চম ব্রহ্মাণ্ড
সন্দীপ চক্রবর্তী ১১৫

লড়াই
জয়ন্ত পাল ১৮৭

নাগরিক
দেবদাস কুণ্ডু ১৯৯

চোর
অনির্বাণ দে ২১৩

সুজাতার পায়েস
সমাজ বসু ২৩১

নবাঙ্কুর

মুংরু
গার্গী দেব ২৪৫

চিরসাথী
মৌমিতা দেবনাথ ২৪৭

দুর্গাভাবনা : বেদ থেকে বর্তমান

ড: জয়ন্ত কুশারী

নিজের নাম প্রসঙ্গে স্বয়ং দেবী দুর্গা (শ্রীশ্রীচণ্ডীতে) বলছেন—

''সেই সময় (শাকম্ভরী রূপে)

আমি যখন 'দুর্গম নামের মহাসুর-কে বধ করব তখনই আমি 'দুর্গাদেবী নামে খ্যাত হব।''''তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যং মহাসুরম্। / দুর্গাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি।।১১/৫০।।

দ্ + উ + র্ + গ্ + আ এই বর্ণগুলিকে পাওয়া যায় দুর্গা শব্দটি বিশ্লেষণ করলে। তাঁর স্বরূপের ব্যাখ্যা রয়েছে প্রতিটি বর্ণের মধ্যেই। অর্থাৎ দ-কার দৈত্য বিনাশের, উ-কার বিঘ্ননাশের, র-কার সর্বরোগের বিনাশের, গ-কার পাপনাশের এবং আ-কার শোক দুঃখাদি জগৎ ও সর্বশত্রু বিনাশের সূচনা করে।

''দৈত্যনাশার্থ বচনো দকারঃ পরিকীর্ত্তিতঃ/উকারো বিঘ্ননাশস্য বাচকো বেদ-সম্মতঃ। / রেফো রোগঘ্ন বচনোগশ্চপাপঘ্নবাচকঃ / ভবশত্রুঘ্নবচনশ্চকারঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।। আবার ব্যাকরণগত ব্যাখ্যায় তিনি—দুঃখেন গম্যতে যা, সা দুর উপসর্গাৎ গম্ ধতোরচ্ স্ত্রিয়াম্ আপ্ বা ঈপ্ ইতি দুর্গা বা দুর্গি শব্দ ব্যুৎপত্তিঃ। যাঁকে দুঃখের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া বা জানা যায়, তিনিই দুর্গা। এই হলো দুর্গা শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। এখন দুর্গা শব্দ সচরাচর শোনা যায়, কিন্তু দুর্গি শব্দের প্রয়োগ কোথায়? কিন্তু না, তাও পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের যাজ্ঞিকা উপনিষদে দুর্গার গায়ত্রীতে—

'কাত্যায়নায় বিদ্মহে কন্যাকুমারীং ধীমহি, তন্নো দুর্গি প্রচোদয়াৎ।' বেদের ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্যের মতে দুর্গা ও দুর্গি অভেদ। এখন প্রশ্ন হলো, এই দুর্গা কে? আদ্যা প্রকৃতির

নামই দুর্গা। শক্তি নিরাকার; কর্ম দ্বারা শক্তি অভিব্যক্ত হয়। আমাদের জ্ঞানে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই কর্ম। অতএব দুর্গা বিশ্বরূপা। জড় ও শক্তি একই পদার্থ; এটা আধুনিক ভূতবিদ্যাবেত্তাগণ পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করেছেন। কল্পনার দ্বারা অগ্নি ও এর দাহিকাশক্তি পৃথক ভাবতে পারি। কিন্তু বস্তুত পৃথক করতে পারি না। আধ্যাত্মিক অর্থে দুর্গা বিশ্বরূপা মহাশক্তি। আধিভৌতিক অর্থে পঞ্চভূতের মধ্যে দুর্গা অগ্নিরূপা। আধিদৈবিক অর্থে দুর্গা রুদ্রদেবের শক্তি রুদ্রযজ্ঞীয়াগ্নি। যে অগ্নি নানারূপে খ্রিস্টপূর্ব ৪৫০০ অব্দ হতে পূজিত হয়ে আসছে। যে প্রত্যহ প্রভাতে 'দুর্গা-দুর্গা' অক্ষরদ্বয় বিশিষ্ট দুর্গানাম স্মরণ করে, সূর্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় তার সকল বিপদ নষ্ট হয়।

''প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গা দুর্গাক্ষরদ্বয়ম্।/আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমঃ সূর্যোদয়ে যথা।।"

চঞ্চলচিত্তে অধিকক্ষণ সমাধি (সবিকল্প) স্থায়ী হয় না। ছাদ হতে যেমন নিম্ন সোপানে অবতরণ হয় ঠিক তেমন ব্রহ্ম ভাবনা হতে সংসারে অবতরণ হয়। তখন প্রথমত বিপদআপদের কথা মনে আসে। বিপদআপদ ঘটলে তো ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ কিছুই সিদ্ধ হয় না, সেজন্য দুর্গার স্মরণ। দুর্গা ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তি সেই ভগবতী সংসারে অর্থাৎ সৃষ্টির আদি কর্ত্রী ও অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সুতরাং প্রথমেই তাঁর স্মরণ। শাস্ত্রে দুর্গানাম স্মরণের কথা বলা হয়েছে। তাঁর রূপ তো দেখবার বা ভাববার শক্তি নাই, তাই নাম করতে করতে এই একান্ত ভক্তির উদয় হলে তিনিই তাঁর রূপ দেখান।

বৈদিক যুগেও দেবীর এই রূপ সম্বন্ধে ইঙ্গিত পাওয়া যায়—

'কেনোপনিষদ'-এর ঋষির চোখে বহু পূর্বে সুরলোকে দেবাসুর সংগ্রামে গর্বিত দেবতাদের সম্মুখে উমা, হৈমবতী রূপে তাঁর প্রথম প্রকাশ। শক্তি সচেতন বায়ু, অগ্নি প্রমুখ দেবগণ ব্রহ্মপুরুষের সামনে শক্তি প্রদানে যখন ব্যর্থ, তখনই হঠাৎ নীল আকাশের বুকে বিদ্যুৎ বর্ণা উমার আবির্ভাব—

''স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম / বহু শোভমানাম্ উমাম্ হৈমবতীম্।।

এই দেবী (বাক্ নাম্নী দেবী) ব্রহ্মকে স্বীয় আত্মারূপে অনুভব করে ঋক্ মন্ত্রে আত্ম পরিচয় ঘোষণা করেন—''অহং রুদ্রেভির্বসুভি শ্চরাম্যহম্...।"

দুর্গাসপ্তশতী বা দেবীমাহাত্ম্য মূলত বেদভিত্তিক। এর তিনটি চরিত্রের প্রথম চরিত্রটি ঋগ্বেদস্বরূপা। মধ্যম চরিত্রটি যজুর্বেদস্বরূপা। উত্তর চরিত্রটি সামবেদস্বরূপা।

বাল্মীকি রামায়ণে শারদীয়া দুর্গাপূজার কথা উল্লেখ না থাকলেও কৃত্তিবাস তাঁর বাংলা রামায়ণে দেবী দুর্গার আবাহণের ঘটনাটি কারণ সহ তুলে ধরেছেন। কিন্তু না, রামচন্দ্র রাবণ বধের জন্য দেবীর অকাল বোধন করেন, তা কৃত্তিবাসের কপোলকল্পিত নয়। কারণ এই ঘটনাটির পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন দেবীর বোধন পূজায় এই মন্ত্রটি—''ওঁ ঐঁ রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ...।"

বৃহন্নারদীয় পুরাণে সেই দেবী, উমা, শক্তি, লক্ষ্মী ইত্যাদি নামে উক্ত হয়েছেন—'উমেতি কেচিদাহুস্তাম্, শক্তি লক্ষ্মীংতথাপরে...।'

ইতিহাসও দুর্গা সম্বন্ধে বাঙ্ময় ছিল। মহাভারতে একাধিকবার দুর্গা স্মরণের কথা উল্লেখ আছে। অজ্ঞাতবাসের সাফল্যের জন্য বিরাটপর্বের ষষ্ঠ অধ্যায়ে দেবী দুর্গার স্বরচিত স্তব পাঠ করেন যুধিষ্ঠির। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রারম্ভে যুদ্ধজয়ের জন্য শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে অর্জুন স্বরচিত দুর্গাস্তোত্র পাঠ করেন। বৌদ্ধধর্মের মারীচি দেবীও দশভুজা।

শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে ব্রজবালারা ব্রজের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কাত্যায়নী দুর্গার কাছে তাঁদের কাতর প্রার্থনা জানিয়েছেন নন্দগোপসুত শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাওয়ার জন্য।' ...নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ।।' শ্রীশ্রীচণ্ডীতে মেধা ঋষির স্তুতিতে ইনি— 'দেবী, আপনি সর্ব কার্য ও কারণ স্বরূপিণী, সর্বেশ্বরী, সর্বশক্তিময়ী (She is omnipotent) দুর্জ্ঞেয়া। 'সর্বস্বরূপে সর্বেশে সর্বশক্তি সমন্বিত...।' ইনি (দেবী) সর্বজ্ঞা ও সর্বস্থিতা (She is omniscient and omnipresent)। দেবতাদের স্তুতিতে এই চিচ্ছক্তি, চেতনা, বুদ্ধি, নিদ্রা, ক্ষুধা, ছায়া, শক্তি, তৃষ্ণা, ক্ষান্তি, জাতি, লজ্জা, শান্তি, শ্রদ্ধা, কান্তি, লক্ষ্মী, বৃত্তি, স্মৃতি, দয়া, মাতা, তুষ্টি ও ভ্রান্তি রূপে সর্বজীবে বিরাজমানা। 'যা দেবী সর্বভূতেষু...।'

বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণের মতে প্রাকৃতিক নয়টি ভেষজে ব্রহ্মাণী প্রমুখ নয়টি দেবীর অবস্থান। সম্মিলিতরূপে যিনি নবপত্রিকা (কলা বউ) বাসিনী নবদুর্গারূপে খ্যাতা। আবার দেবীর ধ্যানে (জটাজুট সমাযুক্তাং...)-র একেবারে শেষভাগে বলা হয়েছে—উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা প্রমুখ অষ্টশক্তিগণে যিনি সর্বদা পরিবেষ্টিতা সেই ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষদাত্রী জগতের ধাত্রী সর্বদা চিন্তনীয়া। এই অষ্ট শক্তি পরিবৃতা ভগবতী নবদুর্গা রূপে প্রকাশমানা। প্রসঙ্গত বলা যায়, বিজ্ঞানের পরিভাষায় যাকে শক্তির বিকেন্দ্রীকরণ (Decentralisation of power) বলে সেটিই এখানে ঘটেছে। অর্থাৎ দেবী দুর্গার শক্তি এই অষ্টশক্তির মধ্যে বিকেন্দ্রীকৃত।

এখন দেখা যাক তন্ত্রের দৃষ্টিতে ইনি কেমন। বিশ্বসারোদ্ধার তন্ত্রে দেবী প্রকৃত অর্থেৎ ত্রাণকর্ত্রী। এখানে বলছে—'তুমি (দেবী) নিরাশ্রয়, দীন, তুষ্ণার্ত, ক্ষুধার্ত, ভীত ও বদ্ধজীবের একমাত্র গতি ও নিস্তারকারিণী। মুণ্ডমালাতন্ত্রে দেবীর পরস্পর বিরোধী (Paradox nature) চরিত্র তথা রূপগুলি দেখা যায়। এখানে তিনি সাকারা আবার নিরাকারা আর অব্যক্তা আবার ব্যক্তরূপাও।

ভগবান শঙ্করই (শিবই) যাঁর একমাত্র আরাধ্যদেবতা সেই শিবগত প্রাণ আচার্য শঙ্কর (আদি শঙ্করাচার্য) তাঁর 'দেব্যাপরাধ ক্ষমাপণ স্তোত্র'-এ দেবীর উদ্দেশে বলছেন—'...এখনও যদি আমার প্রতি দয়া না কর হে লম্বোদর জননী। নিরাশ্রয় আমি আর কার শরণ নেব?

'...নিরালম্বো লম্বোদর জননি কং যামি শরণম্।'

নির্বিঘ্নে গ্রন্থ সমাপ্তির জন্য মহাকবি কালিদাস এই দেবীর (তিনি

অবশ্য শিব ও শিবানীর) শরণাগত—'জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতী পরমেশ্বরৌ।।" রঘুবংশ ১/১।

সাধক কবি রামপ্রসাদ সেন দেবীকে দেখেছিলেন বাঙ্গালি ঘরের একেবারে আটপৌরে কন্যার চোখে। তাঁর আগমনী গানে লিখলেন— 'এবার আমার উমা এলে আর উমাকে পাঠাব না...।'

একইভাবে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামও গাইলেন— ''এবার নবীন মন্ত্রে হবে, জননী তোর উদ্বোধন। নিত্যা হয়ে রইবি ঘরে, হবে না বিসর্জন...।"

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দেশমাতৃকাতে বিশ্বমাতৃকার (দশপ্রহরণধারিণী দুর্গার) রূপ আরোপ করেছেন—''বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি। তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে। ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী।" ঋষি অরবিন্দ ঘোষ দেশের ঘোর সঙ্কটকালে দেবীকে প্রার্থনা জানালেন কাতরভাবে—''মাতঃ দুর্গে। স্বার্থে, ভয়ে, ক্ষুদ্রাশয়তায় ম্রিয়মাণ ভারত। আমাদের মহৎ কর, মহৎ প্রয়াসী কর, উদারচেতা কর, সত্যসঙ্কল্প কর। আর অল্পায়াশী, নিশ্চেষ্ট, অলস, ভয় ভীত যেন না হই।"

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ভাবনায়ও জগন্মাতা ও দেশমাতা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। তাই তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হলো—''ও আমার দেশের মাটি তোমার তোমার পরে ঠেকাই মাথা। তোমাতে বিশ্বময়ী, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা...।"

আবার পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চিন্তা চেতনায় জগদম্বা, গর্ভধারিণী তথা সমগ্র মাতৃজাতির (তাঁর জাগতিক নারী কল্যাণমূলক কাজই নিদর্শনস্বরূপ) মধ্যেই অন্তর্লীনা।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে বিদ্যাসাগর মহাশয়ই হলেন এই চিন্ময়ী শক্তির প্রকৃত সাধক। বিদ্যাসাগর, ঋষি বঙ্কিম, সাধক রামপ্রসাদ ও রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের মাতৃবন্দনাকে বিজ্ঞানের কথায় Transformation of power বা শক্তির রূপান্তর অথবা রূপান্তরিত শক্তির সাধনা বলা যায়।

সংস্কৃত কবি মাঘ তাঁর 'শিশুপাল বধম্' কাব্যে নারদের স্বর্গ থেকে অবতরণের দৃশ্যটি একটি শ্লোকের মাধ্যমে অবতারণা করেন—'চয়স্তিষামিত্যবধারিতং পুরা...।' সমগ্র শ্লোকটির অর্থ হলো, শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে 'তেজঃপুঞ্জ' বলে নিশ্চয় করলেন পরে, আকৃতি দেখে 'শরীরধারী' বলে মনে করলেন, তারপরে পৃথক পৃথক ভাবে মুখ-হাত-পা প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শ্মশ্রু-গুম্ফ (দাড়ি-গোঁফ) দেখে পুরুষ বলে স্থির করলেন, ক্রমে ওই ব্যক্তিকে দেবর্ষি 'নারদ' বলে জানতে পারলেন।

ঠিক একইভাবে বলা যেতে পারে 'দুর্গাভাবনা' । বেদ থেকে বর্তমান প্রসঙ্গে, যে দেবী প্রথমে নীলবর্ণ আকাশের বুকে বিদ্যুৎ বর্ণা তেজঃপুঞ্জে নিজেকে প্রকট করেছিলেন মাত্র। ক্রমে ক্রমে পুরাণ, তন্ত্রে যাঁর মুখ-হাত-পা (ক্রিয়াকলাপ) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল প্রকাশ পেল বর্তমান ঋষি-কবি-সাহিত্যিক- সমাজসংস্কারক-সাধকগণের ভাবনা (লেখনি)-তে, তিনিই আমাদের একান্ত আপন উমারূপী কন্যা। ক্রমে তাঁর পূর্ণতা পেল বঙ্কিমকলমে দেশমাতৃকারূপিনী সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারিণী 'দেবী দুর্গা'।

হে ব্রহ্মস্বরূপা পরমা জ্যোতিরূপা সনাতনি দেবি। পরমা প্রকিতি!! হে মা দুর্গে!!! তোমার শ্রীচরণযুগলে অখিল বিশ্বজনগণের সমবেত প্রার্থনা হোক গুরুদেবের (রবীন্দ্রনাথের) ভাষায়—''বরিষো ধরার মাঝে শান্তির বাণী কেন এ হিংসা-দ্বেষ? কেন এ ছদ্মবেশ?

কেন এ মান-অভিমান?

বরিষো ধরার মাঝে শান্তির বাণী....।"

এখন জেনে নেওয়া যাক্, কলিযুগের অশ্বমেধ যজ্ঞ শারদীয়া দুর্গোৎসবের মহতী পূজার বিধি-বিধান এবং পূজা প্রকরণ প্রসঙ্গে শাস্ত্রকারগণ কী বলছেন—

ভবিষ্যপুরাণে বলা হয়েছে, দুর্গাদেবীর দর্শন মাত্রই পুণ্য। দর্শনের থেকে বন্দনা, প্রণাম শ্রেষ্ঠ। বন্দনা-প্রণাম হতে স্পর্শ শ্রেষ্ঠ। আর স্পর্শ থেকেও শ্রেষ্ঠ হলো পূজন।

যদিও দেবী নিত্যা, তবু তাঁর পূজো শরৎকালে হয় বলে একটু সংশয় থেকেই যায়। কারণ এই সময় তো দক্ষিণায়ন। দক্ষিণায়ন দেবতাদের রাত্রিকাল। এই সময় দেবতারা নিদ্রিত থাকেন। তখন দেবী দুর্গাও নিদ্রিতা। এই সংশয় নিরসন করে বলা হয়েছে, এজন্যই শারদীয়া দুগাপূজায় দেবীর জাগরণের জন্য বোধন করতে হয়। এই বোধন করলে, তখনই ভগবতী আবির্ভূত হন দশভুজা দুর্গাপ্রতিমাতে। অন্যদিকে বসন্তকাল উত্তরায়ণ। তখন দেবতাদের দিবাকাল অর্থাৎ দিনেরবেলা।

তাই বাসন্তী দুর্গাপূজায় বোধন করতে হয় না। এ বিষয়ে বামন পুরাণে, দেবী ভাগবতে এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণে বলা হয়েছে, মহিষাসুর বধের জন্য ভগবতী শরৎকালে হিমালয়ে কাত্যায়ন ঋষির আশ্রমে দশভুজা দুর্গারূপে আবির্ভূতা হয়েছিলেন। কিন্তু দুর্গার আবির্ভাবের সময় এবং দেবীর পাদলগ্ন হয়ে মহিষাসুরের পূজা পাওয়ার বিবরণী এক কালিকাপুরাণ ভিন্ন আর কোথাও নেই।

স্মার্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন তাঁর দুর্গোৎসবতত্ত্বে উল্লেখ করেছেন, শারদীয়া দুর্গাপূজার সাতটি কল্পের কথা। পিতৃপক্ষেই আরম্ভ হয় দেবীপক্ষের মহাপূজার প্রথম কল্প অর্থাৎ কৃষ্ণনবম্যাদি কল্প। ভাদ্রী পূর্ণিমার পর কৃষ্ণপক্ষের নবমী থেকে মহানবমী পর্যন্ত যে পূজা, সেটাই প্রথম কল্প। ''আর্দ্রায়াং বোধয়েদ্ দেবীম্...।" অর্থাৎ আর্দ্রানক্ষত্রযুক্ত কৃষ্ণনবমী তিথিতে দেবীর বোধন। প্রসঙ্গত বলা যায়, এই মহাপূজাতে সাতটি কল্প। (১) কৃষ্ণনবম্যাদি, (২) প্রতিপদাদি (শুক্ল প্রতিপদ থেকে মহানবমী পর্যন্ত), (৩) ষষ্ঠ্যাদি (শুক্ল ষষ্ঠী থেকে মহানবমী পর্যন্ত), (৪) সপ্তম্যাদি (সপ্তমী থেকে মহানবমী পর্যন্ত), (৫) মহাষ্টম্যাদি (মহাষ্টমী থেকে মহানবমী পর্যন্ত), (৬) কেবল মহাষ্টমী, (৭) কেবল মহানবমী।

দেবী পুরাণে পূজা প্রকরণে উল্লেখ রয়েছে—

''অশ্বমেধমবাপ্নোতি ভক্তিনা সুরসত্তম। মহানবম্যাং পূজেয়ং

সর্বকামপ্রদায়িকা।”

ভক্তিপূর্বক পূজা করলে অশ্বমেধ যজ্ঞের সমান ফলপ্রাপ্তি হয়। এই কারণেই শারদীয়া দুর্গাপূজার বিধি-নিষেধ সংবলিত সংবিধান রচনার তাগিদ অনুভব করেছিলেন সংবিধানকারগণ। অখণ্ড বঙ্গপ্রদেশ (পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ) রঘুনন্দনের অনুশাসনকে স্বীকার করে। রঘুনন্দন কোনও একটি পুরাণ অবলম্বন করে তাঁর প্রয়োগ প্রণয়ন করেননি। নানা পুরাণ ও নিবন্ধ থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন তাঁর ‘দুর্গোৎসব তত্ত্ব’ ও ‘‘দুর্গাপূজা তত্ত্ব’। এখন সংক্ষেপে সেগুলিই আলোচনা করা যাক।

আশ্বিন শুক্ল প্রতিপদ থেকে শুক্ল পঞ্চমী পর্যন্ত দেবীকে নিম্নরূপ অঙ্গরাগ ও অলংকার দিতে বলেছে ভবিষ্যপুরাণ। প্রতিপদে কেশ সংস্কারের দ্রব্য। দ্বিতীয়ার কেশবন্ধনের পট্টডোর। তৃতীয়ায় পদরঞ্জনের আলতা, ললাটের জন্য সিন্দুর, মুখদর্শনের জন্য দর্পণ। চতুর্থীতে মধুপর্ক ও চোখের জন্য কাজল। পঞ্চমীতে অগুরু ও চন্দন প্রভৃতি। একমাত্র শারদীয়া দুর্গাপূজাকে মহাপূজা বা মহোৎসব বলার কারণ স্বরূপ লিঙ্গ পুরাণ বলছে—

‘‘শারদীয়া মহাপূজা চতুঃকর্মময়ী শুভা। তাং তিথিত্রয়মাসাদ্য কুর্য্যাদ্ ভক্ত্যা বিধানত।।”

এই চতুঃকর্ম হলো, স্নপন (মহাস্নান)-পূজন-বলিদান-হোম। এই চারটি কর্মই একমাত্র এই পূজায় রয়েছে। এই পূজাতেই আবার একই সঙ্গে তিথি ও নক্ষত্রের প্রাধান্য দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে দেবী পুরাণ বলছে—

‘‘আর্দ্রায়াং বোধয়েৎ দেবী মূলেনৈব প্রবেশয়েৎ।
পূর্বোত্তরাভ্যাং সম্পূজয় শ্রবণেন বিসর্জয়েৎ।।”

অর্থাৎ আর্দ্রা নক্ষত্রযুক্ত কৃষ্ণ নবমীতে দেবীর বোধন। মূলা নক্ষত্রযুক্ত সপ্তমীতে নবপত্রিকা (কলাবউ) প্রবেশ। পূর্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া নক্ষতর যুক্ত মহাষ্টমী ও মহানবমীতে সম্যকরূপে পূজা করে, শ্রবণা নক্ষত্রযুক্ত দশমীতে দেবীর বিসর্জন। সর্বজন কল্যাণে দেবীর আগমন ও প্রত্যাগমন আর ফলাফল বিষয়ে দুর্গোৎসবতত্ত্ব বলছে—

‘‘রবৌ চন্দ্রে গজারূঢ়া, ঘোটকে শনিভৌময়োঃ।
গুরৌ শুক্রে চ দোলায়াৎ, নৌকায়াং বুধবাসরে।”
‘‘গজে চ জলদা দেবী, শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা, ছত্রভঙ্গস্তুরঙ্গমে।
দোলায়াং মড়কং ভবেৎ, নৌকায়াং শস্যবৃদ্ধিস্তথা জলবৃদ্ধি।।”

অর্থাৎ যদি সপ্তমী তিথি আর দশমী তিথি রবি বা সোমবার হয় তবে দেবীর আগমন গজে (হাতিতে) আর প্রত্যাগমনও গজে হবে। একইভাবে মঙ্গলবার বা শনিবার সপ্তমী তিথি আর দশমী তিথি হলে দেবী ঘোটকে (ঘোড়ায়) আসেন বা যান। বৃহস্পতিবার বা শুক্রবার এলে বা গেলে দেবী দোলায় বিরাজমান। আর বুধবারে আসা বা যাওয়ায় দেবী নৌকায় আরোহী হন। দেবী গজারূঢ়া হলে

LUXMI TEA CO. PRIVATE LIMITED

17, R. N. Mukherjee Road, Kishore Bhawan, Kolkata-700 001
Phone No. 2248 4437/4227, Fax No. 2243 0177
E-mail : mail@luxmitea.com, Web.: www.luxmigroup.in

GROUP GARDENS

NARAYANPUR T.E.
SHYAMGURI T.E.
MONMOHINIPUR T.E.
MANOBAG T.E.
BHUYANKHAT T.E.
MANU VALLEY T.E.
GOLOKPUR T.E.
PEARACHERRA T.E.
JAGANNATHPUR T.E.
SAROJINI T.E.
FULBARI T.E.
URRUNABUND T.E.
MAKAIBARI T.E.
KENDUGURI T.E.
MORAN T.E.
SEPON T.E.
ATTABARIE T.E.
LEPTKATTA T.E.
ADDABARI T.E.
DIRAI T.E.
MAHAKALI T.E.

শস্যপূর্ণা হবে পৃথিবী। ঘোড়ায় এলে অথবা গেলে ছত্রভঙ্গ হবে। দোলায় সওয়ার হলে মড়ক। নৌকায় আরোহণ করলে শস্যবৃদ্ধি জলবৃদ্ধি। রঘুনন্দন নবপত্রিকা বিষয়ে দুর্গোৎসবতত্ত্বে বলেছেন—

"কদলী দাড়িমী ধ্যান্যাঃ হরিদ্রা মানকুং কচুঃ।
বিল্বাশোকৌ জয়ন্তী চ বিজ্ঞেয়া নবপত্রিকাঃ।।"

অর্থাৎ কলা-ডালিম-ধান-কচু-বেল-অশোক-জয়ন্তীর সমন্বয়ে নবপত্রকা বা কলাবউ।

তন্ত্রসার গ্রন্থে বলা হয়েছে কুমারীপূজা প্রসঙ্গে—

"কুমারীং ভোজিতা যেন ত্রৈলোক্যং তেন ভোজিতম্।"

অর্থাৎ কুমারীকে ভোজন করালে ত্রিলোকবাসীকে ভোজন করানোর ফল লাভ হয়। কুমারীর মধ্যেই জননীর দর্শন। এক প্রকৃতির মধ্যে বিশ্বপ্রকৃতির পূজন।

বস্তুত আমরা ভাবের পূজা করি। মূর্তির পূজা করি না। দুর্গার মূর্তি থাকতে পারে না। তিনি বিশ্বাত্মা, শক্তিরূপিণী, চিন্ময়ী। অথবা বিশ্বই তাঁর অবয়ব। তিনি প্রত্যেক অবয়বে বর্তমান। সে অবয়ব তাঁর প্রতীক। আমরা দুর্গার মূর্তি বলি না। বলি দুর্গার প্রতিমা। গুণ আর কর্মের প্রতিমা। প্রতিমা শব্দটি রয়েছে শুক্ল যজুর্বেদে। ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোম এই পঞ্চভূতের সমাহার ঘটেছে ঘট ও অনুষঙ্গিক উপকরণগুলির মধ্যে। যার জন্য পূজার ক্ষেত্রে ঘট স্থাপনার প্রয়োজন আবশ্যিক। এখন প্রশ্ন হলো, পূজাতে প্রতিমা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা কোথায়?

এ সম্বন্ধে শাস্ত্রে বলা হয়েছে, গোরুর সর্বাঙ্গে দুধ থাকলেও স্তনমুখ দিয়েই তা ক্ষরিত হয়। ঠিক একইভাবে প্রতিমাতে সর্বাঙ্গে সর্বময় হয়ে দেবতা বিরাজ করেন। তবে একই কাঠামোতে পরিবারসহ দুর্গা প্রতিমা স্থাপন বিষয়ে কালীবিলাস তন্ত্রে উল্লেখ রয়েছে—

"জয়া বামে স্থিতা বিদ্যা বিজয়া চাপি দক্ষিণে
বামে চ কার্ত্তিকদেবং দক্ষিণে গণপতিস্তথা।
যা নিত্যা প্রকৃতিনিত্যাং দুর্গায়া দক্ষিণেস্থিতা,
শরাদা ভারতী নিত্যাংবামভাগে সদাস্থিতা।।"

আর কালিকাপুরাণে বলা হয়েছে, দুর্গা দশভুজা ও সিংহস্থিতা হবে। দেবীর মহাস্নানের দ্রব্যগুলি একবার দেখে নেওয়া যাক্। তৈল-হরিদ্রা, অষ্টকলস-সহস্রধারা, পঞ্চামৃত-পঞ্চগব্য-পঞ্চকষায়, শিশির জল,সর্বতীর্থের জল,সাগরের জল,সপ্ত সমুদ্রের জল,বৃষ্টির জল, সরস্বতী নদীর জল, ঝরনার জল, পদ্মরেণুর জল,ডাবের জল, অগুরু-চন্দন-কুঙ্কুম-সর্বৌষধি-মহৌষধি-বিষ্ণু তৈল-তিল তৈল-ইক্ষু রস, গজদন্ত মৃত্তিকা—বরাহ মৃত্তিকা-চতুষ্পথ মৃত্রিকা ও বেশ্যাদ্বার মৃত্তিকা আর দাঁত মাজার উপকরণ হিসাবে এক ঘটি গঙ্গাজল ও আট আঙুল পরিমিত বিল্বদন্তকাষ্ঠ।

সবশেষে আসছে প্রতিমার বিসর্জনপর্ব। বিসর্জন সম্বন্ধে দুর্গাপূজাতত্ত্বে বলা হয়েছে, নৌকা বা মনুষ্যবাহিত যানে ভগবতীকে বহন করে ক্রীড়া, কৌতুক ও মঙ্গলাচারপূর্বক স্রোতের জলে প্রক্ষেপ (অর্থাৎ শোভন সুন্দরভাবে ধীরে ধীরে নিরঞ্জন) করতে হবে। সংস্কৃত শ্লোকের আকারে তা এইভাবে বলা হয়েছে দুর্গাপূজাতত্ত্বে—

"নৌযানৈর্নরযানৈর্বা নীত্বা ভগবতী শিবাম্।
স্রোতোজলে প্রক্ষিপেয়ুঃ ক্রীড়াকৌতুক মঙ্গলৈঃ।।"

তথ্যসূত্র ঃ স্মার্ত ভট্টাচার্য রঘুনন্দনকৃত 'দুর্গোৎসবতত্ত্ব' এবং 'দুর্গাপূজাতত্ত্ব' গ্রন্থ।

(লেখক ঃ সর্বভারতীয় প্রাচ্যবিদ্যা আকাদেমির অধ্যক্ষ)

Phone : 2573 0416
2572 4419

BIKANERVALA

10181-82, Chowk Gurdwara Road
Karolbagh
NEW DELHI-110005

Our Speciality

PISTA LAUJ & BADAM KATLI,
BENGALI SWEETS & NAMKEENS

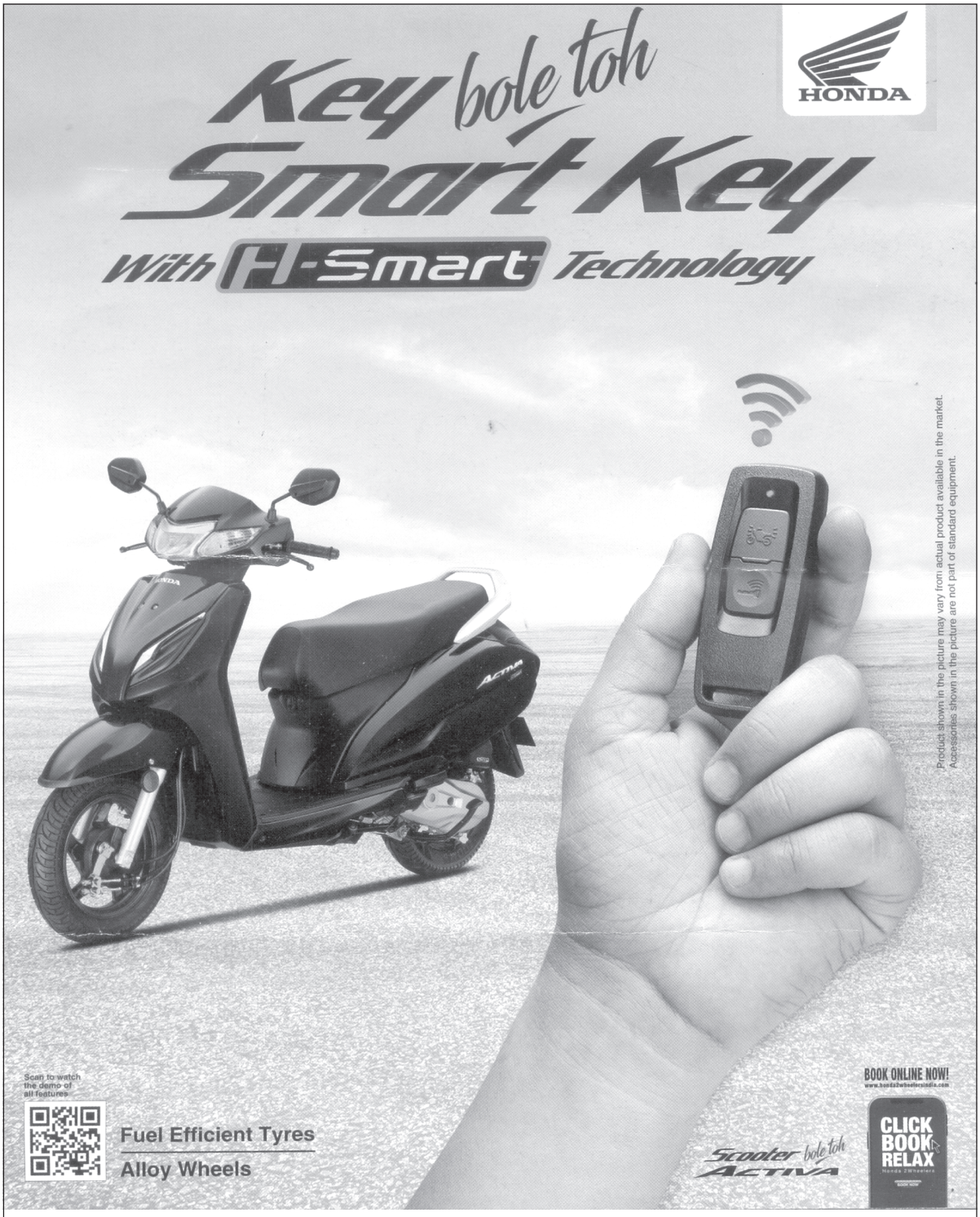

Showroom : Todi Honda - 225C, A. J. C. Bose Road, Kolkata-700 020
Backbagan - Minto Park, Ph. 9007035184, (O) : 033-22809028

Service Centre : Todi Honda - 8/2C, Abinash Chowdhury Lane, Kolkata-700 046
Customer Care : 9007035186, **Service Booking :** 9831447711
Spare Parts : 9007035188

হিন্দুত্বের প্রতি যুবকদের আকর্ষণ ক্রমবর্ধমান

রবীন্দ্র জোশী

স্বামী বিবেকানন্দ ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ শিকাগোতে বিশ্বসভায় অভ্যর্থনার উত্তরে বলার সময় শিবমহিম্ন স্তোত্রম্ থেকে শ্লোক আবৃত্তি করলেন ঃ

'রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল নানাপথজুষাং।
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।।'

এবং ব্যাখ্যা করলেন যে, সমস্ত সোজা এবং বাঁকা নদ-নদীর চূড়ান্ত গন্তব্য যেমন সমুদ্র, ঠিক তেমনিই কোনও মানুষ তার ইচ্ছা অনুযায়ী যে উপাসনার পথই বেছে নিক না কেন, শেষ পর্যন্ত একটি চূড়ান্ত সত্যেই সে পৌঁছায়। তাই ধর্মান্তরের কোনো প্রয়োজন নেই। ধর্মীয় গোঁড়ামির অবসান হওয়া উচিত।

ওই ঘটনার পর বহু বছর পেরিয়ে গেছে। আজকের যুবকরা হিন্দুত্ব নিয়ে কী ভাবেন? কেউ কি তাঁর জীবনে হিন্দুত্ব অনুভব করতে পারেন? হিন্দুত্ব বিরোধী আলোচনা নিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া

ও চিন্তাভাবনা কী? এই বিষয়গুলো বোঝার জন্য আমি গুজরাট ও মহারাষ্ট্র জুড়ে শতাধিক যুবকের সঙ্গে আলোচনা করে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি তা আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ জুগিয়েছে।

ইন্টারনেটে আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী আমার এক তরুণ বন্ধুর সঙ্গে কথাবার্তা বলেছি; এ বিষয়ে তিনি কী বলছেন, প্রথমে তা একটু দেখে নেওয়া যাক।

''ভারতে পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুত হারে ক্রমবর্ধমান ২৫ অনূর্ধ্ব যুবক জনগোষ্ঠী রয়েছে। এরা ভারতীয় জনসংখ্যার ৪০ শতাংশের বেশি। স্বাভাবিকভাবেই, এরাই যে ভারতের ভবিষ্যৎ চালনা করবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। ভারত ক্রমশ পুঁজিবাদী নীতিকে আলিঙ্গন করার সঙ্গে সঙ্গে ভোগভিত্তিক সংস্কৃতির আরও গভীরে শিকড় প্রোথিত করবে, যা হবে হিন্দুত্ববাদী মতাদর্শ বিস্তারের সবচেয়ে বড়ো প্রতিবন্ধ। হিন্দু-বিরোধী মিডিয়া এবং খ্রিস্টান মিশনারি সমর্থিত জাতীয় দলগুলির কথা ভুলে যান। নতুন সেলফোন, বাইক ও ফ্যাশনদুরস্ত পোশাকআশাক কেনার আগ্রহে অধীর যুবকদের মনে হিন্দুত্বের উপর ভিত্তি করে জাতীয়তাবাদী ধারণার উন্মেষ ঘটানো কঠিন হতে পারে।''

''একই সঙ্গে যে সমস্ত ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে বাস্তবে হিন্দুত্বের কোনও সম্পর্ক নেই, সেগুলোর জন্য হিন্দুত্ব দর্শন সম্পর্কে বোঝার রাস্তা ক্রমশ কণ্টকাকীর্ণ হচ্ছে। আমার মনে হয়, ভারতর সুপ্রিম কোর্টের মন্তব্য থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত। কোর্ট বলেছেন, 'আদালত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে 'হিন্দুইজম' বা 'হিন্দুত্ব' শব্দগুলিকে এমন অর্থে বোঝানোর প্রয়োজন নেই যা কঠোর হিন্দুধর্মীয় রীতিগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং ভারতের জনগণের জীবনযাত্রার সংস্কৃতি ও নীতির সঙ্গে সম্পর্কহীন।' বর্তমান যুব জনগোষ্ঠীর অগ্রাধিকারগুলি ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে এবং তাদের হিন্দুত্ব বোঝাতে হবে এমন একটি ভাষায় যা তারা বোঝে।''

''দুঃখের বিষয়, 'হিন্দুত্ব' শব্দটি গুন্ডামির সঙ্গে সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, শিবসেনা যখন ভ্যালেন্টাইন'স ডে-তে লোকেদের মারধোর করে, তখন শেষমেশ তার অর্থ দাঁড়ায় হিন্দুত্ববাদীদের গুন্ডামি, অর্থাৎ 'হিন্দুত্ব' হলো ভালোবাসা দিবস উদ্‌যাপন না করা। আমি নিজেও ভ্যালেন্টাইন'স্ ডে ব্যাপারটাকে বেশ বোকা বোকা মনে করি, কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমি এই নিয়ে অন্যদের মারধোর করব। মত প্রকাশের স্বাধীনতা সর্বাগ্রে এবং যে কোনো মূল্যে সুরক্ষিত হওয়া উচিত। সঙ্গে সঙ্গে এও বলতেই হবে যে, এম এফ হুসেনের চিত্রকর্মকে আক্রমণ করা অবশ্যই সঠিক, কারণ তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে হিন্দুদের অনুভূতিতে আঘাত করেছেন এবং আইন সংস্থা বা সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।

''এই ধরনের জাগতিক বিষয়ের সঙ্গে হিন্দুত্বের কোনো সম্পর্ক নেই। হিন্দুত্ব হলো একটি দর্শন যার বিস্তৃত বর্ণালী রয়েছে। তাই, প্রথমে আমাদের এই ধরনের বাহুবলী হিন্দুত্বের থেকে প্রকৃত হিন্দুত্বকে পৃথক করতে হবে।

''পুঁজিবাদের উত্থান থামানো অসম্ভব। গত কয়েক দশকের মধ্যে এই প্রথম ভারতীয়রা দারিদ্র্য থেকে নিজেদের বের করে আনার সুযোগ খুঁজে পাচ্ছে। কোনো শক্তিই তাদের আর থামাতে পারবে না। হিন্দুত্ব কি পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে? হিন্দুত্ব'র কোনও সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক মডেল আছে কিনা আমার জানা নেই। বর্তমান পরিস্থিতিতে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক মডেল ভারতের জন্য আশীর্বাদ প্রমাণিত হয়েছে (ভবিষ্যতে পরিস্থিতির পরিবর্তন হতে পারে, সেক্ষেত্রে এর মোকাবিলা ভবিষ্যতেই করা উচিত)।''

তাঁর চিন্তাভাবনা আমাকে বুঝিয়েছিল যে ভারতের বাইরেও যুবক-যুবতীরা হিন্দুত্ব সম্পর্কে সচেতন এবং তাঁদের আরও তথ্য দেওয়া দরকার। উদাহরণস্বরূপ, অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর পণ্ডিত দীনদয়ালজীর চিন্তাধারা (একাত্ম মানবদর্শন) এমন একটি ভাষায় ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন যা আজকের যুবক-যুবতীরা বুঝতে পারে। ভারতীয় বিচার মঞ্চের মতো সংগঠনগুলিকে বিশ্বব্যাপী এদের মধ্যে কার্যকরভাবে এই দর্শন প্রচারের জন্য এগিয়ে আসা উচিত।

হিন্দু জীবনধারার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো বেদান্ত । এই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয় এমন কয়েকটি কেন্দ্র আমি ঘুরে দেখেছি। মালয়েশিয়া, জাপান, রাশিয়া ইত্যাদি দেশের যুবকরা চিন্ময় মিশন, মুম্বাই এবং আরশা গুরুকুলম, ডোরালি (নাগপুর থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার)-তে বেদান্ত শিখতে আসেন। তারা আশ্রমে ২-৩ বছর থেকে বেদান্ত শেখেন। বেদান্তের প্রতি তাদের আকর্ষণ এমন যে জাপানের কোনও ছাত্রের জন্য ইংরেজি ভাষায় দুর্বলতা কোনো বাধাই নয়। তারা ইংরেজি-জাপানি অভিধানের সাহায্য নিয়ে বেদান্ত শেখেন। একটি মেয়ে, যে আগে টাইমস অফ ইন্ডিয়ায় কাজ করতেন, চিন্ময় মিশনে বেদান্ত পড়েছিলেন। পড়ার সময় তাঁর জীবন বদলে যায় এবং তিনি তাঁর চাকরি থেকে ইস্তফা দেন।

এই উদাহরণগুলি তুলে ধরে এই বস্তুবাদী জগতে হিন্দুত্বের চিরন্তন মূল্যবোধকে।

২০০৯ সালের ১৪-১৫ জানুয়ারি পুণের রামকৃষ্ণ মঠ একটি যুব সম্মেলনের আয়োজন করেছিল। তাতে অংশ নিয়েছিলেন ১২০০ যুবক-যুবতী। তাঁদের সঙ্গে আলাপকালে রাষ্ট্রপতি ডঃ এ. পি.জে. আবদুল কালাম তাদের জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আপনাদের যদি কেউ রাজনৈতিক নেতা হন তাহলে আপনার কাজ কী হবে?'

'আমরা সকলকে শিক্ষা, খাদ্য ও পানীয় দেব এবং দুর্নীতি দূর করার চেষ্টা করব'—এই ছিল ওই যুবক-যুবতীদের উত্তর।

কন্যাকুমারীর বিবেকানন্দ কেন্দ্র আয়োজিত 'বিজয়! সম্পূর্ণ বিজয়!' শীর্ষক এক কনভেনশনে হাজার হাজার ছাত্রযুবা অংশ নিয়েছিল! সত্যি, স্বাধীন ভারতে হিন্দুত্বের প্রতি যুবকদের আকর্ষণ যে যথেষ্ট রয়েছে, এতে সন্দেহ নেই।

আমি গুজরাট ও মহারাষ্ট্র জুড়ে শতাধিক যুবকের সঙ্গে আলোচনা করেছি, একথা আগেই বলেছি। এতে আমার কী উপলব্ধি হয়েছে এবার সে প্রসঙ্গে আসা যাক।

১। সারা দেশে মিডিয়া চ্যানেলগুলির আক্রমণাত্মক গোয়েবলসীয় প্রোপাগান্ডা যন্ত্রের কারণে দেশের যুব সমাজের রুচি, মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। আজকের বেশিরভাগ যুবকের ধারণা হলো হিন্দুত্ব মূলত একটি রাজনৈতিক মতাদর্শ, যা বিজেপি, শিবসেনা, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং দল, শ্রী রাম সেনা প্রভৃতি সংগঠনের সমর্থনপুষ্ট। হিন্দুত্বের বিভিন্নরূপী প্রকাশের মধ্যে পার্থক্য করার কথা তাঁরা ভাবেনই না! তাঁদের কাছে এই সমস্ত সংগঠনগুলি একই হিন্দুত্ব মতাদর্শগত পরিবারের অংশ এবং হিন্দু পরিচয় দিয়ে রাজনৈতিক/মতাদর্শগত সুবিধা অর্জন করার প্রয়াস করে।

২। সাধারণভাবে, যুবকদের মনে হিন্দুত্বের সঙ্গে জড়িত ধারণাগুলো হলো—রাম জন্মভূমি-বাবরি মসজিদ ইস্যু, সংখ্যালঘু, গুজরাট দাঙ্গা, ওড়িশার কান্ধমাল দাঙ্গা, খ্রিস্টান ধর্মান্তর ইত্যাদি। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হলো এই যে, সর্বসমাবেশক হিন্দুত্বের বিশালতাকে না জেনে তাঁরা রাজনৈতিক ও দিগ্‌ভ্রান্ত হিংসাত্মক দিকগুলোকেই বোঝেন এবং 'রাজনৈতিক হিন্দুত্ব' নামে জানেন।

৩। যুবক-যুবতীদের মনে এই রাজনৈতিক হিন্দুত্ব কী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তা নির্ভর করে তাঁদের মনস্তাত্ত্বিক পটভূমির উপর। যুবকদের দুটি শ্রেণী রয়েছে—(ক) অভিজাত শ্রেণী যারা বেশিরভাগই শহুরে পটভূমি থেকে আসা এবং (খ) শহর/মফস্‌সলের মধ্যবিত্ত শ্রেণী। অভিজাত শ্রেণীর যুবকদের বাস্তবতার অভিজ্ঞতা নেই এবং ইংরেজি মিডিয়ার উদাসীন উপভোক্তা হওয়ার ফলে রাজনৈতিক হিন্দুত্ব মতাদর্শের বিষয়ে তাঁদের মধ্যে একটি ভয় ও ঘৃণা রয়েছে। অন্যদিকে, মধ্যবিত্ত যুবকরা সমাজের বাস্তবতার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কারণে কিছু কঠিন সত্য উপলব্ধি করেছেন, যেমন—(অ) অহিন্দু সম্প্রদায়গুলি অসহিষ্ণু, তারা বহুত্বকে স্বীকার করে না এবং (আ) দেশে সন্ত্রাসবাদের জন্য ইসলাম প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দায়ী। ফলে তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এখন রাজনৈতিক হিন্দুত্বের নিষ্ক্রিয় বা সক্রিয় সমর্থক। নিষ্ক্রিয় সমর্থন হোয়াটস অ্যাপ বা অর্কুট গ্রুপে অংশগ্রহণ, ই-মেইল ফরোয়ার্ড করা, বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা ইত্যাদির রূপ নেয়।

৪। বিভিন্ন পটভূমির ওইসব যুবকদের মধ্যে একটা বিষয় লক্ষ্য করেছি, আমাদের সমাজ সম্পর্কিত অনেক বিষয়েই ওই যুবকরা হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। যেমন ধরুন, পরিবার ও মূল্যবোধ, পরিবেশ সংরক্ষণ, জৈব চাষের প্রাসঙ্গিকতা, বিকেন্দ্রীকৃত উন্নয়ন, জীবনের মূল ভিত্তিতে আধ্যাত্মিকতা, শিক্ষাব্যবস্থার প্রকৃত উদ্দেশ্য ইত্যাদি। এই বিষয়গুলোতে যুবকরা হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করেন, কিন্তু তাঁরা আদৌ জানেন না যে, ওই বিষয়গুলো হিন্দুত্বের দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রয়োগ এবং হিন্দুত্ব আধুনিক জীবনযাত্রার অনেক সমস্যারই সমাধানের রাস্তা বলে দিতে পারে।

৫। এই ব্যাপারে যা করণীয় তা হলো হিন্দুত্ব মতাদর্শের বিস্তৃত এবং সর্বসমাবেশক প্রকৃতিকে তার একাধিক রূপ এবং দিকগুলিতে উপস্থাপন করা। আরও ভালো হয় যদি আমরা হিন্দু আদর্শের অরাজনৈতিক, ইতিবাচক ও উন্নয়নমুখী বিষয়গুলিকে তুলে ধরতে পারি।

গুজরাত ও মহারাষ্ট্রের যুবসমাজের সঙ্গে আলোচনার ফলে আশু করণীয় কিছু বিষয় আমার মনে উঠে এসেছে—

Saraogi Udyog Private Limited

Merchants & Importer for Coal and Coke

Corporate Office :

Marlin Infinite, 9th Floor, Suite No. 910

Salt Lake City, Sector-V, DN-51, Kolkata- 700 091

Regd. Office :

21, Hemanta Basu Sarani, "Centre Point" Suite No - 212

2nd Floor, Kolkata - 700 001

Fax : +91-33-2243-5334, +91-33-22138782

Phone : +91-33-2248-1333 / 0674, +91-33-2213-8779 / 80 / 81

E-mail : info@saraogiudyog.com, ops@saraogiudyog.com

Web : www.saraogiudyog.com

১। কনভেন্ট স্কুলে সেন্ট জেভিয়ার সম্পর্কে তথ্য দেওয়া হয় কিন্তু সমর্থ স্বামী রামদাস সম্পর্কে নয়। আমাদের পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে ধারণা খুব কম বয়সে দেওয়া উচিত।

২। আজকের যুবকরা তাদের সময় ব্যয় করে ভ্যালেন্টাইন ডে, কিটি পার্টি, পাব সংস্কৃতি ইত্যাদির মতো কার্যকলাপে। এই ব্যর্থতার দায়ভার বহুলাংশে আমাদের তো নিতেই হবে।

৩। ছাত্র ও শিক্ষকদের হিন্দুত্ব সম্পর্কে সঠিকভাবে জানানো প্রয়োজন।

৪। শিক্ষায় সবাইকে সমান সুযোগ দিতে হবে।

৫। আমরা অতীতে যা করেছি তা ঠিকই করেছি—এই আত্মতৃপ্তি থেকে সরে আসতে হবে। আমাদের সমাজের ঐতিহাসিক ভুলগুলি, যেমন—বর্ণ বৈষম্য, লিঙ্গ বৈষম্য ইত্যাদি সংশোধন করার জন্য সমাজের মানসিকতা পরিবর্তন করা দরকার এবং এই কাজে যুবকদের জরুরি ভূমিকার কথা মাথায় রেখে এগোতে হবে আমাদের।

৬। আজকের রাজনীতির কারণে হিন্দুত্বের প্রসার ধীরগতি হয়ে গেছে।

৭। মুসলমান ও খ্রিস্টান যুবকরা বেশি উগ্র প্রকৃতির।

৮। হিন্দুত্বের ভিত্তিতে হিন্দু সমাজের নেতৃত্ব নির্বাচন প্রয়োজন।

৯। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি সকলের জন্য বাধ্যতামূলক করতে হবে, নচেৎ জনসংখ্যার ভারসাম্যহীনতার সমস্যা ভয়াবহ আকার নেবে।

১০। আজ প্রত্যেককে আরও স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক এবং ক্যারিয়ার ভিত্তিক হতে শেখানো হয়। কিন্তু হিন্দুদর্শন আমাদের অনুপ্রাণিত করে শুধু মানবতা রক্ষা করতে নয়, পশুপাখি, গাছগাছালি, জল, ভূমি ও বন-সহ সমগ্র প্রকৃতিতে সংরক্ষণ করতে। শুধুমাত্র হিন্দুত্বই আমাদের প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ রচনা করে দেয়।

১১। হিন্দুত্বের সামান্য অভিজ্ঞতাও কাউকে সমগ্র মানবতার জন্য কাজ করতে অনুপ্রাণিত করার পক্ষে যথেষ্ট।

১২। মিডিয়া ও রাজনীতি হিন্দুত্বকে রক্ষণশীল ও সংকীর্ণ মনের বলে উপহাস করে।

১৩। হিন্দুত্ব হলো ভারতের ঐক্য ও অখণ্ডতার স্তম্ভ। জাতপাতের ভিত্তিতে সমাজকে বিভক্ত করার জন্য দায়ী রাজনীতি।

১৪। আজকের যুবকদের সামর্থ্য আছে কিন্তু তারা ঐক্যবদ্ধ নয়; হিন্দুত্ব তাদের একত্রিত করতে পারে।

১৪। সমাজে খুব কম লোকই আছেন যাঁরা হিন্দুত্ব সম্পর্কে সঠিক তথ্য দিতে পারেন। এই অবস্থার পরিবর্তন হওয়া উচিত।

১৫। হিন্দুত্বের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আধুনিক প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা করা উচিত।

১৬। দক্ষতা ও ক্ষমতার ভিত্তিতে ভারতেরই বিশ্বকে নেতৃত্ব

দেওয়ার কথা।

১৭। হিন্দু সমাজ ঐক্যবদ্ধ হলে ২০৩০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ভারত গৌরবের শিখরে পৌঁছে যাবে।

হিন্দু সমাজকে কীভাবে জাগানো যায়?

প্রতি বছর, হিন্দু যুব জাগরণ কর্মসূচি ১১ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর পালন হওয়া উচিত।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি মাসে হিন্দুত্বের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হওয়া উচিত।

স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাভাবনা এবং হিন্দুত্বের বার্তা কৌতুক, কার্টুন, গ্রাফিক্স ইত্যাদির পরিবর্তে এসএমএস হিসাবে পাঠানো উচিত।

চার পুরুষার্থ ধর্ম অর্থ, কাম, মোক্ষ , চতুরাশ্রমের বিভিন্ন দিক (ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস) আজকের প্রেক্ষাপট এবং সমকালীন উদাহরণে উপস্থাপন করা উচিত।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে ঐতিহ্যের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করার সময় স্বামী বিকোনন্দ বলেছিলেন—''বছরে আমাদের কমপক্ষে চল্লিশটি উৎসব রয়েছে, তবে আজকের জীবনযাত্রাকে মাথায় রেখে তাদের মধ্যে দশটি উদ্‌যাপন করলেও যথেষ্ট। সেগুলো হলো দীপাবলি, গীতা জয়ন্তী, বসন্তপঞ্চমী, মহাশিবরাত্রি, হোলি, গঙ্গা দশেহরা, ব্যাস পূর্ণিমা, রক্ষাবন্ধন, পিতৃতর্পণ ও বিজয়াদশমী।'' রক্ষাবন্ধন সম্পর্কে স্বামীজী বলেছেন, ''এই অনুষ্ঠানের তাৎপর্য হলো ভ্রাতৃত্ববোধ, নারীর সুরক্ষা ও তপস্যা।'' বিজয়া দশমী সম্পর্কে তিনি বলেন, ''এ হচ্ছে স্বাস্থ্য, অস্ত্র ও সংগঠনের শক্তির কথা স্মরণ করে মন্দ ও ভালোর যুদ্ধে ভালোর বিজয়ের উৎসব।'' ভারত জুড়ে শ্রী রামনবমী, শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী, হনুমান জয়ন্তী, গণেশ চতুর্থী, বুদ্ধ পূর্ণিমা, ডঃ আম্বেদকর জয়ন্তী ইত্যাদি উদ্‌যাপনের সময় আজকাল লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে ওই উৎসবগুলিতে বিভিন্ন পদ্ধতি ও শৈলীর মাধ্যমে সমাজের প্রতি যুবকদের সংবেদনশীলতাই প্রতিফলিত হচ্ছে। প্রাক-স্বাধীনতা যুগে লোকমান্য তিলক গণেশ উৎসব উদ্‌যাপন শুরু করেছিলেন। আজ দেখা যাচ্ছে যুবকরা ওই অনুষ্ঠানটিকে নানা রকমের সাজে সাজিয়ে কন্যাভ্রূণ হত্যা, পণপ্রথা, জলাভাব, এইডস ইত্যাদি নানান সামাজিক সমস্যার ওপর খোলামেলা আলোকপাত করছেন।

এমনটাই অভিজ্ঞতা হয়েছে যে যুবকরা হিন্দুত্ব নিয়ে কথা বলতে যথেষ্ট আগ্রহী।

ইন্টারনেট ও মিডিয়াতে হিন্দুত্বের নেতিবাচক উপস্থাপনার মোকাবেলা করার জন্য ওই সমস্ত মিডিয়াতে আরও বেশি সময় বেশি সংখ্যক অভিজ্ঞ লোক দেওয়া উচিত।

সৃজনশীল কাজে নিয়োজিত যুবকদের রাজ্যভিত্তিক তালিকা তৈরি করতে হবে।

ভারতের বৌদ্ধিক মানবসম্পদ বিকাশের জন্য আগামী ১০-১২ বছরের জন্য ব্যক্তিত্ব বিকাশের কর্মসূচি নেওয়া উচিত। (মহাভারতের শান্তি পর্বের গালভ-নারদ সংলাপ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

অন্যের সমালোচনা করে নিজেকে প্রচার করার চেষ্টা করার চেয়ে খারাপ আর কিছু নেই। এটা শুধু আমাদের নিজেদের ঘাটতিই দেখায়, তাই আমাদের এটা এড়ানো উচিত।

সবসময় মনে রাখা উচিত যে, নিজের শক্তি ও সামর্থ্যের ভিত্তিতে এগিয়ে যাওয়াই সঠিক পথ। যাঁরা ভালো ও যোগ্য, তাঁরা অন্যের দিকে আঙুল তোলেন না বা নিজের প্রশংসা করেন না। ফুলের সুবাস কোনো শব্দ ছাড়াই তার উপস্থিতির অনুভব দেয়। একইভাবে সূর্যও নিঃশব্দেই তার মহিমা ও আলো ছড়ায়।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, ''জনগণকে অবহেলা করা সবচেয়ে বড়ো পাপ।'' এই পাপ ধুয়ে ফেলা প্রতিটি যুবকের দায়িত্ব।

পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় বলেছিলেন, ভারতকে অতীতের চেয়ে আরও মহিমান্বিত করা আমাদের কর্তব্য। আমাদের কাজ হলো তাঁর এই উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা।

(শ্রী রবীন্দ্র যোশী নাগপুরের ধর্মপীঠ কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক। তিনি শৈশব থেকেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দায়িত্বশীল কার্যকর্তা। এই লেখার সময়ে তিনি সঙ্ঘের পশ্চিম ক্ষেত্রের সহক্ষেত্র কার্যবাহ ছিলেন। ইংরেজি থেকে অনুবাদ করেছেন অধ্যাপক ডাঃ উচ্ছল কুমার ভদ্র।)

SAHARA®
Air Coolers, Storage Water Heaters, Exhaust Fans, Ceilling Fans, Fresh Air Fans, Cooler Kit, Washing Machines, Heat Convectors
JAS-ANZ
VIKAS ENGINEERS
Manufacturers of :
SAHARA Electrical Appliances
D-377/378, Sector-10, NOIDA-201301
Ph.:0120-2520297, 2558594
Telefax : 0120-2526961
Website : www.saharaappliancesindia.com

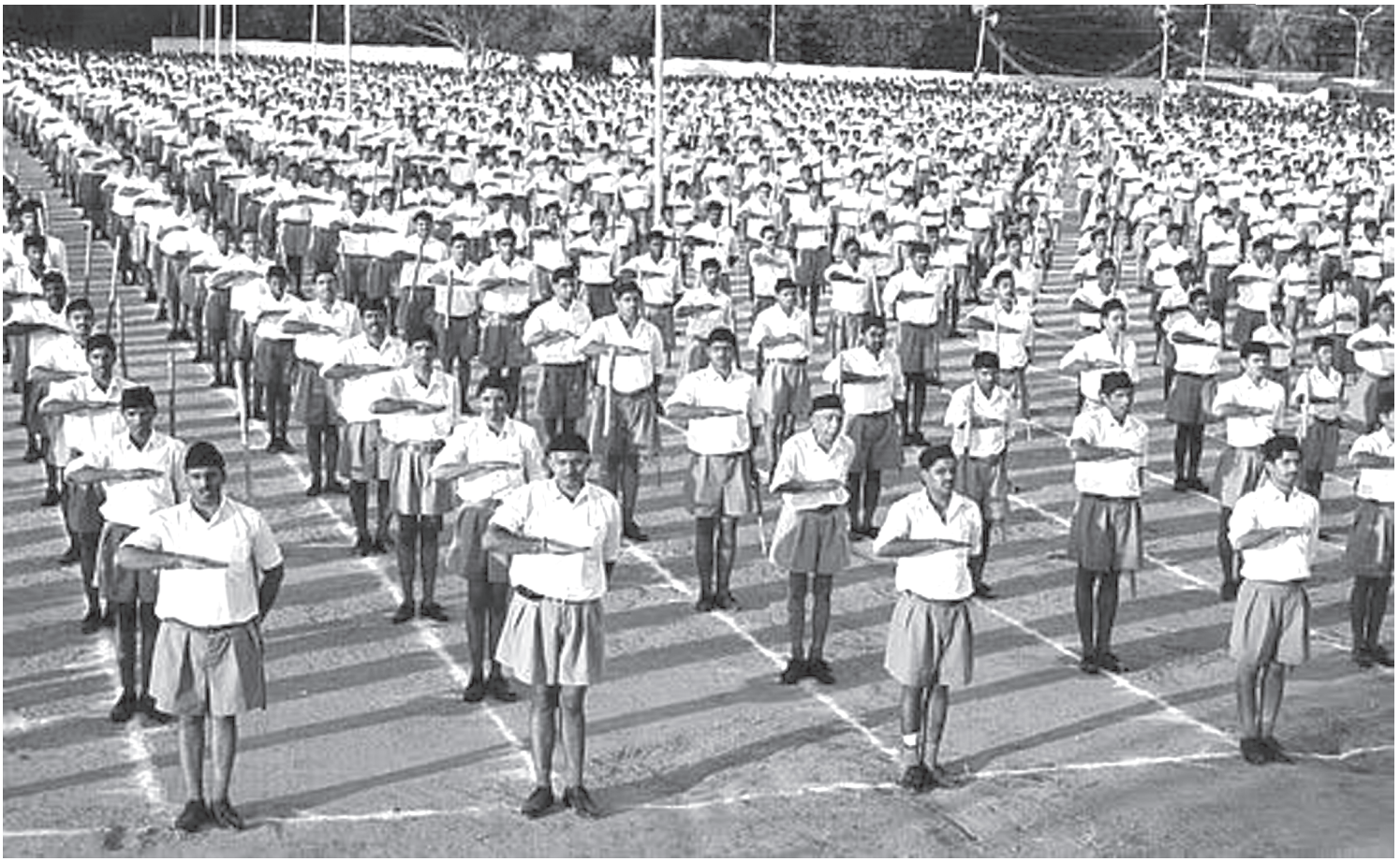

হিন্দুত্ব : চন্দ্রনাথ বসু এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ

বিজয় আঢ্য

হিন্দুত্ব শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন চন্দ্রনাথ বসু। তাঁর সমাজ চিন্তামূলক প্রবন্ধের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি 'হিন্দুত্ব' (১৮৯২)। এই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন—"প্রকৃত হিন্দু হওয়ার ন্যায় কঠিন কাজ আর নাই—মহৎ কাজ আর নাই।" এই মহৎ কাজ করার জন্য তিনি হিন্দুজাতির প্রকৃত ইতিহাস সন্ধানের প্রেরণায় 'হিন্দুত্ব' গ্রন্থটি লিখেছিলেন। তাই গ্রন্থের নামপত্রে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে 'হিন্দুর প্রকৃত ইতিহাস' কথাগুলি উল্লেখ করেছিলেন। গ্রন্থে সংকলিত প্রবন্ধগুলির মূল সুর হলো হিন্দুর প্রাচীন গৌরবে গৌরববোধ। কিন্তু চন্দ্রনাথ জানেন, প্রাচীন বৈভবের গর্ব করা মনুষ্যত্ব নয়, প্রাচীন বৈভব পুনর্লাভ করাই মনুষ্যত্ব।" সম্পূর্ণ গ্রন্থটিই লেখকের এই মনোভাবের দ্বারা সমৃদ্ধ।

উনিশ শতকের প্রধানত শেষ তিনটি দশককে নিয়ে যে কালপর্ব, চন্দ্রনাথ বসু (১৮৪৪–১৯১০) সেই বিশেষ সময়ের অন্যতম প্রতিনিধি। তত্ত্ববোধিনী (১৮৪৩) পত্রিকার যুগে তাঁর জন্ম। হিন্দু পুনরভ্যুত্থান কালের শেষ দিকে তাঁর মৃত্যু। মধুসূদন, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্রের মতো মনীষীদের আবির্ভাব, ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা, ইংরাজি শিক্ষার ক্রমপ্রসার—এই সময়ের স্মরণীয় ঘটনা। কাজেই উনিশ শতকের বিভিন্ন ভাব-আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া তাঁর জীবনের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

চন্দ্রনাথ বসুর কোনো প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ নেই। চন্দ্রনাথ নিজে বৃদ্ধবয়সে আত্মকথা লিখেছিলেন। হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'বঙ্গভাষার লেখক' (১৩১১ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থের প্রথম ভাগে তা সংকলিত হয়েছে। 'পৃথিবীর সুখদুঃখ' চন্দ্রনাথের আত্মস্মৃতিমূলক অন্য একটি রচনা। এছাড়া ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা'-য় (৮ম খণ্ড) এবং মন্মথনাথ ঘোষ রচিত 'ভারতবর্ষ' (আষাঢ়, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ) পত্রিকায় 'চন্দ্রনাথ বসু' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে চন্দ্রনাথের জীবনী বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। 'ত্রিধারা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'বউ কথা কও' রচনায় চন্দ্রনাথ নিজ গ্রামের অন্তরঙ্গ বর্ণনা দিয়েছেন।

হুগলী জেলার কৈকালা গ্রামে ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দের ৩১ আগস্ট চন্দ্রনাথ বসুর জন্ম। যদিও চন্দ্রনাথের 'সার্ভিস রেকর্ডস'-এ রয়েছে সেপ্টেম্বর, ১৮৪৫। সম্ভবত এন্ট্রাস সারটিফিকেটে বয়স এক বছর কম দেখানো হয়েছিল। পিতা সীতানাথ বসু ধর্মনিষ্ঠ হিন্দু ছিলেন। পাঁচ বছর বয়সে হাতেখড়ি এবং গ্রামের পাঠশালায় শিক্ষাগ্রহণ। আট বছর বয়সে কলকাতায় এসে জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনে ভর্তি হন। কিন্তু খ্রিস্টধর্ম ভীতির জন্য ছয় মাস পরেই তাঁর পিতা তাঁকে ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে ভর্তি করেন। আর্থিক অনটন ছিল, কিন্তু একটি সরকারি বৃত্তি লাভের ফলে তাঁর পড়াশোনা চলে। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে ইতিহাসে অনার্স সহ এমএ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার পর তিনিই প্রথম এই বিরল সম্মান লাভ করেন। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে বি এল পরীক্ষাতেও চন্দ্রনাথ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

শিক্ষাজীবন শেষ হওয়ার পর কম-বেশি এক বছর সময় ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতেই চন্দ্রনাথ শিক্ষকতা করেন। পরে শিক্ষকতা ছেড়ে কলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করেন। বছরখানেক পরেই পেশা পরিবর্তন করে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি নিয়ে ঢাকায় যান। কিন্তু চাকুরির অবস্থা অসম্মানজনক হওয়ায় দুই মাস পরেই চাকরি ছেড়ে রাজস্থানের জয়পুর কলেজের অধ্যক্ষ পদে যোগ দেন (১৮৭৮-৭৯)। জয়পুরের আবহাওয়া ভালো না লাগায় অধ্যক্ষ পদে ইস্তফা দিয়ে বেঙ্গল লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান পদে যোগ দেন। এই চাকরি তাঁর মনোমত হয়েছিল। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে ৭ অক্টোবর থেকে ১৮৮৬-র ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত তিনি এই পদে কাজ করেছেন। এই সময় তিনি 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় নিয়মিত বাংলা বইয়ের সমালোচনা করতেন। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি বেঙ্গল গভর্নমন্টের অনুবাদকের পদ লাভ করেন এবং ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের ১জানুয়ারি সরকারি কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

দেশের জনজীবন অপেক্ষা সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গেই চন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতা বেশি ছিল। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে 'সারস্বত সমাজ' নামে একটি সাহিত্যসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। চন্দ্রনাথ প্রথমাবধি 'সারস্বত সমাজ'-এর উৎসাহী সদস্য ছিলেন। ১২৮৯ বঙ্গাব্দে সারস্বত সমাজের উদ্যোগে ভূগোলের পরিভাষা স্থির করার উদ্দেশ্যে যে সমিতি গঠিত হয়েছিল, চন্দ্রনাথ বসু এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও সেই সমিতির সভ্য নির্বাচিত হন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শৈশবকাল থেকেই চন্দ্রনাথ এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রমেশচন্দ্র দত্তের সভাপতিত্বে পরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশনে (১৭ জুন, ১৮৯৪) যে দশজন বিশিষ্ট সদস্য নির্বাচিত হন চন্দ্রনাথ বসু তাঁদের অন্যতম।

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষা প্রচলনের চেষ্টারও সমর্থক ছিলেন চন্দ্রনাথ। প্রস্তাবটি অবশ্য গৃহীত হয়নি।

বেঙ্গল সোশ্যাল সায়েন্স আসোসিয়েশন, বেথুন সোসাইটি, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আসোসিয়েশন এবং ইন্ডিয়ান আসোসিয়েশনের সঙ্গে চন্দ্রনাথ কম-বেশি যুক্ত ছিলেন এবং সেখানে কখনো প্রবন্ধ পাঠ করেছেন বা বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছেন।

প্রথম জীবনে ইংরাজি ভাষা সাহিত্যের চর্চায় তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে কলেজ রিইউনিয়নে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয় এবং বেঙ্গল লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান হিসেবে বাংলা বইয়ের সমালোচনা (যদিও ইংরাজিতে) চন্দ্রনাথের সাহিত্য জীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। চন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় তাঁর লেখা 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর সমালোচনা পড়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে 'বঙ্গদর্শন'-এ লেখার জন্য আহ্বান জানান। 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত চন্দ্রনাথের 'নভেল বা কথাগ্রন্থের উদ্দেশ্য' (বৈশাখ, ১২৮৭) এবং 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' (জ্যৈষ্ঠ–পৌষ ১২৮৭) তাঁর সাহিত্য জীবনে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। তিনি নিজে লিখেছেন ঃ ''শকুন্তলা-তত্ত্ব লিখিবার পর সরকারি কার্যের জন্য ভিন্ন আর ইংরেজি লিখি নাই—লিখিতে আর ইচ্ছাও হয় নাই—এখন সম্পূর্ণ অনিচ্ছা হইয়াছে। লিখিতে হইলে মাতৃভাষায় লেখার ন্যায় অন্য কোন ভাষায় লেখা স্বাভাবিক ও সুখকর নয়।''

'শকুন্তলা তত্ত্ব' যখন লেখেন তখনই চন্দ্রনাথের মনোজগতে একটা বড়ো পরিবর্তন ঘটে গেছে। চন্দ্রনাথ নিজেই এ প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ ''যখন কলেজে পড়ি, তখন আমার দেবদেবীতে বিশ্বাস

ছিল না, আমি সত্যধর্ম খুঁজিতাম। তখন কেশববাবুর (কেশবচন্দ্র সেন) ধর্মান্দোলনের ধুম পড়িয়াছিল; অনেক যুবক তাঁহার চেনা হইয়াছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার সঙ্গে তাহার কয়েকজন উদ্যমশীল চেনা পড়িতেন। আমি মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মসমাজে যাইতাম--- কেশববাবুর বক্তৃতা শুনিতাম। কিন্তু তাহাতে Reed, Hamilton, Kant, Victor, Cousin প্রভৃতি ইউরোপীয় দার্শনিকদিগের কথাই অধিক থাকিত, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতাম না। তাহার পর অগস্ত কোমতের দুই একখানা গ্রন্থ পড়ি এবং স্বর্গীয় মহাপুরুষ দ্বারকানাথ মিত্রের সহিত বন্ধুত্ব হয়। দেখিলাম কোমতের প্রণালীতে আমাদের সমাজ প্রণালীর অনেক সমর্থন আছে। বড় আহ্লাদ হইল, কিন্তু কোমতের (মতে) ঈশ্বর নাই দেখিয়া তাহাতে আমার তৃপ্তি হইল না। দ্বারকানাথকে বলিলাম। মহামান্য মহাপুরুষ বলিলেন—তবে জোরে ঈশ্বরকে ধরিয়া থাক। আবার সত্য ধর্ম খুঁজিতে লাগিলাম। ইংরাজীতে দেখিতাম, ইংরাজের মুখে শুনিতাম Religion কেবল ঈশ্বর লইয়া, আর কিছু লইয়া নয়। ভাবিতাম—তবে ঈশ্বর ছাড়া এই যে এত বস্তু ব্যাপার রহিয়াছে ইহাদের সহিত তবে কি মানুষের ধর্মমূলক সম্বন্ধ নাই? বঙ্কিমবাবুর বাসায় প্রতি রবিবার আমরা এই সকল আলোচনা করিতাম। সেইসময় (১৮৮৪) পূজনীয় শ্রীশশধর তর্কচূড়ামণির নাম শুনা গেল। ইন্দ্রনাথকে বলিয়া বঙ্কিমবাবু চূড়ামণি মহাশয়কে একদিন আপন বাসায় আনাইলেন। চূড়ামণি মহাশয় ধর্মকথা কহিলেন। তিনি যেমন বলিলেন—ধৃ ধাতু ইহতে ধর্ম অর্থাৎ যাহা ধারণ করে তাহাই ধর্ম—অমনি আমার সকল সংশয় দূর হইল, বিশ্বে যাহা কিছু আছে বিশ্বনাথ হইতে তাহা স্বতন্ত্র রাখিয়া দিলে বিশ্বনাথকে পাওয়া যায় না বুঝিলাম। কারণ বিশ্বনাথ তাহা হইলে আমাদিগকে রক্ষা না করিয়া বিনাশই করে; যাহা এত অন্বেষণে পাই নাই তাহা পাইলাম। আমার আনন্দের সীমা রহিল না।"

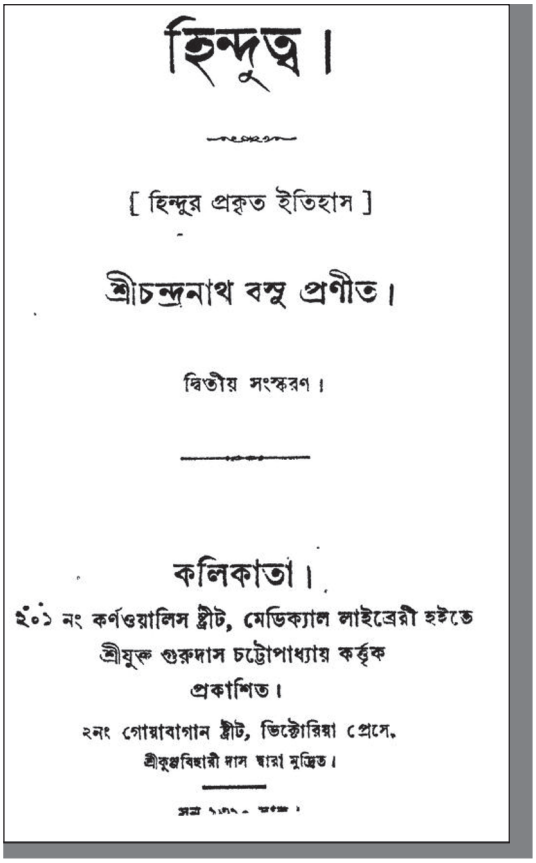
হিন্দুত্ব।

[হিন্দুর প্রকৃত ইতিহাস]

শ্রীচন্দ্রনাথ বসু প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

২নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে,
শ্রীকুঞ্জবিহারী দাস দ্বারা মুদ্রিত।

শশধর তর্কচূড়ামণির বক্তৃতা শুনে তাঁর সংশয় দূর হলেও তিনি তাঁর অনুগামী হননি। কেননা তা ছিল অসম্ভব। আসলে চন্দ্রনাথের একটি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল। ব্রাহ্মসমাজ ও খ্রিস্টান মিশনারিদের হাত থেকে শিক্ষিত হিন্দু যুবকদের উদ্ধার করার জন্য শশধর তর্কচূড়ামণি প্রমুখ উদ্ভট যুক্তিজালকে সর্বস্ব করেছিলেন। অন্যদিকে চন্দ্রনাথ বসুর মতো কয়েকজন মনীষী গ্রহণ করেছিলেন যুক্তির আশ্রয়। যুক্তির অস্ত্র দিয়েই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করেছিলেন। ইংরাজের অনুকরণে সভাসমিতি, বিতর্কসভা, নারী উদ্ধার প্রচেষ্টা, বিধবাবিবাহ প্রভৃতির অন্তঃসার শূন্যতা প্রমাণ করার জন্য ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারত উদ্ধার' (১৮৭৭)-এর অনুকরণে 'পশুপতি সম্বাদ' (১৮৮৩) রচনা করেছিলেন। চন্দ্রনাথের কাল ছিল ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেনের (১৮৩৮-৮৪) কর্মযুগ। কেশবচন্দ্র সেনের নতুন ধর্মোন্মাদ ও সর্বধর্মসমন্বয় প্রয়াস হিন্দু সমাজে আতঙ্ক সঞ্চার করে। ব্রাহ্মদের একইসঙ্গে পরিবারজীবনে দায়িত্বহীনতা ও সমাজসেবার অতি আগ্রহ, মৌখিক প্রগতিবাদ ও তার প্রয়োগে ভণ্ডামি, নারীর স্বাধীনতা ও নারী শিক্ষা প্রচারের নামে চরিত্র শৈথিল্যের প্রশ্রয় প্রভৃতি আচরণকে চন্দ্রনাথ বিদ্রূপের শাণিতবাণে বিদ্ধ করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরোধে চন্দ্রনাথ 'বঙ্গদর্শন'-এর লেখকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হলেও প্রথম থেকেই তাঁর মননে স্বাতন্ত্র্য ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থের সঙ্গে চন্দ্রনাথের 'হিন্দুত্ব' গ্রন্থের তুলনা করলে তা স্পষ্ট বোঝা যাবে।

উনিশ শতকের সত্তর দশকের আগে বাঙ্গালি চিন্তানায়কদের উপর জন স্টুয়ার্ট মিলের প্রভাব ছিল গভীর। কিন্তু হিন্দুধর্মের নবব্যাখ্যাতাদের চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করেছিল মনুর শাস্ত্রনির্দেশ। বঙ্কিমচন্দ্রও উত্তরজীবনে তাঁর উপর মিলের প্রভাব অস্বীকার করেছিলেন। চন্দ্রনাথের মনু প্রশস্তিতে ও মননে যুগচিন্তার প্রভাব লক্ষণীয়। "The combination of Mill and Manu, the latter largely expurgated of its priestly and patriarchel excesses, did not reveal any absurdity to the majority of Bengal Victorians."

মন্মথনাথ ঘোষ লিখেছেন, "চন্দ্রনাথ প্রেমময় স্বামী ও স্নেহময় পিতা ছিলেন। তাঁহার বন্ধুবাৎসল্যও ছিল আদর্শস্থানীয়। তিনি অমায়িক, বিনয়ী, কর্তব্যপরায়ণ, স্বাধীনচিত্ত ও ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন।" এই উক্তির মধ্যে চন্দ্রনাথের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের

With Best Compliments from :

Durga Trading Co.

40, Strand Road, Fourth Floor (Room No.4)

Kolkata - 700 001

Phone : 2243-1722

E-mail : aksadt_saboo@yahoo.co.in

Deals In:

Bamboo, Hardwood, Bamboo Chips & Other Raw Materials for paper mills

An ISO 9001 : 2008 Certified Company

Alloy Group

UTSAV INDUSTRIES PVT. LTD.

AIM TECHNOLOGIES PVT. LTD.

RAJ ALUMINIUM PVT. LTD.

Aluminium & Hardware People

HINDALCO INDUSTRIES LIMITED

AN ISO 9002 COMPANY HINDAL ALUMINIUM LIMITED

NALCO Aluminium Sheet Coil

ALOM Aluminium Extruded Section

503, **Kamalalaya Centre,** 156/A, Lenin Sarani, Kolkata-700 013. INDIA

Phone : 4050 3400

E-mail : info@alloyindia.com **Website :** www.alloyindia.com

একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র ফুটে উঠেছে।

১৯১০ খ্রিস্টাব্দের ২০ জুন ছেষট্টি বছর বয়সে চন্দ্রনাথ বসু পরলোকগমন করেন। তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী-সহ মৃত্যুসংবাদ সমসাময়িক পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ আয়োজিত শোকসভায় (৫ ভাদ্র, ১৩১৭) স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতাকালে একটি অর্থপূর্ণ মন্তব্য করেন—''তাঁহার জীবনী আলোচনা কেবল তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য নহে, আমাদের শিক্ষার জন্যও দরকার।''

চন্দ্রনাথের রচনাগুলি প্রকাশিত হয় প্রধানত 'ক্যালকাটা রিভিউ', 'প্রচার', 'নবজীবন', 'সাহিত্য', 'নব্যভারত', 'বঙ্গবাসী' প্রভৃতি পত্র পত্রিকায়। তাঁর মুষ্টিমেয় কয়েকটি প্রবন্ধমাত্র 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত হয়েছিল।

চন্দ্রনাথ বসুর রচিত ইংরেজি গ্রন্থের সংখ্যা ১৮টি। তাঁর প্রণীত বাংলা গ্রন্থের সংখ্যা ২১টি। তাঁর জীবৎকালে (১৮৪৪–১৯১০) তাঁর লেখা প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা অবশ্য ১৪টি। যথা, (১) শকুন্তলাতত্ত্ব (১৮৮১), (২) পশুপতি সম্বাদ (১৮৮৪), (৩) ফুল ও ফল (১৮৮৫), (৪) গার্হস্থ্য পাঠ (১৮৮৬), (৫) গার্হস্থ্য স্বাস্থ্যবিধি (১৮৮৭), (৬) হিন্দু বিবাহ (১৮৮৭), (৭) ত্রিধারা (১৮৯১), (৮) হিন্দুত্ব (১৮৯২), (৯) কঃ পন্থাঃ (১৮৯৮), (১০) বর্তমানে বাংলা সাহিত্যের প্রকৃতি (১৮৯৯), (১১) সাবিত্রীতত্ত্ব (১৯০০), (১২) বেতালে বহু রহস্য (১৯০৩), (১৩) সংযম শিক্ষা বা নিম্নতম সোপান (১৯০৪), (১৪) পৃথিবীর সুখদুঃখ (১৯০৯)।

পরবর্তীকালে প্রকাশিত তাঁর রচিত অন্যান্য বাংলা গ্রন্থগুলি হল—(১) চন্দ্রকণা , (২) সাহিত্য পুস্তক (১২৯৯), (৩) পার্টিশন প্রহেলিকা, (৪) সাহিত্য পুস্তক (৪র্থ ভাগ-সচিত্র)।

(খ) হিন্দুত্ব

চন্দ্রনাথ সাহিত্যতত্ত্ব বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ভারতীয় সমাজের পুনর্জাগরণে সহায়তা করেছিলেন। তাঁর সমাজ চিন্তামূলক প্রবন্ধের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি 'হিন্দুত্ব' (১৮৯২)। এই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন—''প্রকৃত হিন্দু হওয়ার ন্যায় কঠিন কাজ আর নাই—মহৎ কাজ আর নাই।'' এই মহৎ কাজ করার জন্য তিনি হিন্দুজাতির প্রকৃত ইতিহাস সন্ধানের প্রেরণায় 'হিন্দুত্ব' গ্রন্থটি লিখেছিলেন। তাই গ্রন্থের সংকলিত প্রবন্ধগুলির মূল সুর হলো হিন্দুর প্রাচীন গৌরবে গৌরববোধ। কিন্তু চন্দ্রনাথ জানেন, প্রাচীন বৈভবের গর্ব করা মনুষ্যত্ব নয়; প্রাচীন বৈভব পুনর্লাভ করাই মনুষ্যত্ব। সম্পূর্ণ গ্রন্থটিই লেখকের এই মনোভাবের দ্বারা সমৃদ্ধ। এযুগে এমন ঘটনা অবশ্য নতুন নয়। এই প্রসঙ্গে রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। 'শকুন্তলা তত্ত্ব (১৮৮১) থেকে 'কঃ পন্থাঃ' (১৮৯৮) পর্যন্ত বিভিন্ন গ্রন্থে চন্দ্রনাথের এই প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

চন্দ্রনাথের কাছে হিন্দুত্ব ও মনুষ্যত্ব সমার্থক। হিন্দুর লক্ষণ নির্ণয় করতে গিয়ে তিনি হিন্দুর একটি অসাধারণ মৌলিকতার সন্ধান পেয়েছেন। তাঁর বক্তব্য— ''এই অসাধারণ মৌলিকতার একটি অর্থ এই যে ধর্মশাস্ত্র, দেবতত্ত্ব, দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজ প্রণালী কিছুরই নিমিত্ত হিন্দু কাহারো নিকট কিছুমাত্র ঋণী নয়। হিন্দুর যাহা আছে সবই তাহার নিজের, এতই নিজের যে অপরে আপন আপন প্রণালী আমূল পরিবর্তন না করিলে হিন্দুর কিছুমাত্র গ্রহণ করিতে পারে না। ...হিন্দুধর্মে খ্রিস্টধর্মের ভাঁজ আছে বা মুসলমান ধর্মের ভাঁজ আছে, এইরূপ যে সকল কথা শুনিতে পাওয়া যায় তাহা নিতান্ত অমূলক, একেবারেই অবিশ্বাস্য।''

সমগ্র সৃষ্টি সম্পর্কে হিন্দুর নিজস্ব একটি দর্শন বা বিশ্বাস আছে। চন্দ্রনাথ বসুর ভাষায়—''সোহহং—সেই-ই আমি—একথা ভারতের হিন্দু বই আর কেহ কখন কহে নাই। এই কথা কহে বলিয়া হিন্দু হিন্দু—এই কথাতে হিন্দুর হিন্দুত্ব, হিন্দুর হিন্দুধর্ম। সোহহং–হিন্দুর লক্ষণ, হিন্দুত্বের লক্ষণ, হিন্দুধর্মের লক্ষণ।'' যে 'Fraternity, Equality and liberty' আধুনিক ইউরোপীয় জীবনদর্শন, ভারতবর্ষে তা বহু প্রাচীনকাল থেকেই বর্তমান। হিন্দু সমাজে অতিথিকে নারায়ণ জ্ঞানেই সেবা করা হয়। ভিক্ষুকের কখনও জাতপাত বিচার করা হয় না। আত্মীয়-কুটুম্ব না হলেও হিন্দুর ঘরে অনেক মানুষকেই দেখতে পাওয়া যায়। বাংলায় 'ঘরের ছেলের মতো' একটা কথা এরই উদাহরণ। শুধু মানুষ নয়, ইতর প্রাণীর প্রতিও হিন্দুর মমত্ববোধ।''

'হিন্দুত্ব'-র ধারণা সম্বন্ধে চন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতানৈক্য ছিল। রবীন্দ্রনাথ একবার বিপিনবিহারী গুপ্ত (১৮৭৪-১৯৩৫)-কে বলেছিলেন—''তোমাকে একদিন তিনি (চন্দ্রনাথ বসু) বলিয়াছিলেন—তুমি হিন্দুর ছেলে, ওরকম লেখো কেন? তদুত্তরে আমি লিখিলাম—'হিন্দুত্ব সম্বন্ধে আপনার মত লইতে প্রস্তুত নাহি।''

''মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কৃষি, কীট বৃক্ষ, লতা, পাহাড়, পর্বত, জল, স্থান, জগতে যাহা কিছু আছে, হিন্দুর কাছে সকলই সমান, প্রীতির পাত্র। ....হিন্দুর মৈত্রী হিন্দুকে জগদ্ব্যাপী এবং জগৎরূপী করিয়াছে।'' হিন্দুধর্মে সর্বব্যাপী প্রীতিচিন্তার আবিষ্কারক বঙ্কিমচন্দ্র। ''মনুষ্য প্রীতি ভিন্ন ঈশ্বরে ভক্তি নাই।'' বঙ্কিমচন্দ্রের প্রীতিচিন্তা চন্দ্রনাথের মৈত্রীচিন্তায় রূপান্তরিত।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা দরকার, যদিও শশধর তর্কচূড়ামণির বক্তৃতা শোনার (জুন, ১৮৮৪) পর থেকেই তিনি হিন্দুত্বের গৌরব ঘোষণায় আগ্রহী হন তবুও তিনি শশধর-পন্থী ছিলেন না। কেননা তা ছিল অসম্ভব। চন্দ্রনাথের একটি দার্শনিক দৃষ্টি ছিল যা শশধর প্রমুখের ছিল অনুপোযুক্ত।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি 'সাহিত্য' (বৈশাখ, ১৩০০) পত্রিকায় 'রবীন্দ্রবাবুর পত্র' নামে একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। ওই পত্রে রবীন্দ্রনাথ অসংকোচে স্বীকার করেছেন, ''চন্দ্রনাথবাবুর সহিত

মতভেদ হওয়ায় আমি আমার দুর্ভাগ্য জ্ঞান করি। কারণ আমি তাঁহার উদারতা ও অমায়িকতার অনেক পরিচয় পাইয়াছি। তাঁহার অধিকাংশ মত যদি বর্তমান কালের বৃহৎ একটি সম্প্রদায়ের মত না হইত তাহা হইলে, তাঁহার সহিত প্রকাশ্যে বাদ-প্রতিবাদে আমার কখনই রুচি হইত না।" এই পত্র প্রকাশিত হবার পর চন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের সাত বৎসর ব্যাপী যুদ্ধের ('সেভেন ইয়ার্স ওয়ার') অবসান হয়েছিল।

'হিন্দুত্ব' গ্রন্থটি সম্বন্ধে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বেঙ্গল লাইব্রেরির রিপোর্টে (আর বি এন) যে মন্তব্য করেছেন এখানে প্রসঙ্গত তা উল্লেখ করা যেতে পারে। হরপ্রসাদের মন্তব্য—"Hindutva, by Babu Chandranath Basu, is one of the most remarkable books of the year. The object of the work is to differentiate Hinduism from all other religions of the world. He has pointed out with some force that Hinduism is a singular system of religion and that it differs from all others in the very first articles of faith..." [RBL, 1893, Page 6.] (দ্রষ্টব্য ঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ ঃ২য় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ প্রকাশিত)

'হিন্দুত্ব' শীর্ষক গ্রন্থ শুধু চন্দ্রনাথই রচনা করেননি। তাঁর এই গ্রন্থ রচনার উনত্রিশ বছর পর বিনায়ক দামোদর সাভারকর (১৮৮৩-১৯৬৬) 'হিন্দুত্ব' (১৯২১) নামে একটি গ্রন্থ লেখেন। সাভারকর মহারাষ্ট্রের রত্নগিরি জেলে বন্দি থাকাকালীন গ্রন্থটি লেখেন এবং পরে 'জনৈক মারাঠা' এই ছদ্মনামে গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। এই পুস্তকটি তৎকালীন বুদ্ধিজীবী মহলে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে। হিন্দুয়ানী এবং হিন্দুত্ব যে এক বস্তু নয়, হিন্দুত্ব যে ধর্মবাচক বিশেষণ নয়, গুণবাচক বিশেষ্য এবং এটা যে দেশ, জাতি, ধর্ম, সমাজ, ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সভ্যতার সার্বিক সমন্বয়ের অভিধা—এই গ্রন্থে সাভারকর তা প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী হয়েছেন।

গ্রন্থটির মর্মবাণী একটি সংস্কৃত শ্লোকের মাধ্যমে তিনি ব্যক্ত করেছেন—

"আসিন্ধু সিন্ধু পর্য্যন্তা যস্য ভারত ভূমিকা।
পিতৃভুঃ পুণ্যভূশ্চৈব স বৈ হিন্দুরিতি স্মৃত।।" (হিন্দুত্ব)

অর্থাৎ হিন্দুকুশ থেকে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ভারতভূমিকে যারা পিতৃভূমি ও পুণ্যভূমি বলে মনে করেন, তারাই হিন্দু।

সাভারকরের অভিমতে হিন্দুত্ব হলো একটি সাংস্কৃতিক সত্তা—কোনো ধর্মীয় বিশ্বাস নয়। সুনির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার ও স্বদেশপ্রেম—হিন্দুত্বের দুই স্তম্ভ। হিন্দুধর্ম হিন্দুত্বের ক্ষুদ্র একটা ভগ্নাংশ মাত্র। সাভারকরের কাছে হিন্দুত্ব ছিল জাতীয়ত্ব। 'The Hindus a nation rest is community'। অর্থাৎ হিন্দুস্থানে হিন্দুরাই জাতি, অন্যরা সম্প্রদায়মাত্র। অন্যদিকে চন্দ্রনাথ 'হিন্দুত্ব' গ্রন্থে হিন্দুর প্রকৃত ইতিহাস সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে হিন্দুত্বের লক্ষণগুলি আবিষ্কার করেছেন। চন্দ্রনাথের ব্যাখ্যায় 'হিন্দুত্ব' গ্রন্থ তার অন্যতম নিদর্শন। তাঁর গ্রন্থ প্রকাশের উনত্রিশ বছর পরে সাভারকরের মতো স্বদেশপ্রেমিক মনীষীরাও 'হিন্দুত্ব' নিয়ে ভাবনাচিন্তা করছেন।

উনিশ শতকের শেষ তিনটি দশকে নব্য হিন্দু আন্দোলনের কালে ভারতের ত্যাগ ও সেবার আদর্শময় জীবন অধিক মূল্য পেয়েছিল; ধিকৃত হয়েছিল ভোগবাদ-সর্বস্ব পাশ্চাত্য জীবন। চন্দ্রনাথের বক্তব্য এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা প্রয়োজন। অনেকের অভিযোগ, ভারত যে আজ পার্থিব সুখ-সম্পদ থেকে বঞ্চিত, তার জন্য দায়ী হিন্দুশাস্ত্র— চন্দ্রনাথ এই ধরনের বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করে বলেছেন ঃ "হিন্দু শাস্ত্রে রাজ্যপালন, রাজ্যরক্ষা, বাণিজ্যাদির দ্বারা ধনবৃদ্ধি, জীবিকা উপার্জন প্রভৃতি ঐহিক শৃঙ্খলাবৃদ্ধির উপায় সম্বন্ধে ভুরি ভুরি উপদেশ ও ব্যবস্থাদি আছে।" তাঁর আরও বক্তব্য, খ্রিস্টীয় ধর্মশাস্ত্রেরও অন্তর্গূঢ় নির্দেশ ইহলোককে পরলোকের অনুবর্তী করা এবং জাগতিক ভোগস্পৃহাকে প্রশয় না দেওয়া। কিন্তু ইউরোপ শাস্ত্রীয় নির্দেশ না মানায় আজ অধঃপতিত। পার্থিব আকাঙ্ক্ষা তাদের মনুষ্যত্বকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে। এই বিষয়ে চন্দ্রনাথ কয়েকটি প্রমাণও উল্লেখ করেছেন—এক, ইউরোপীয় জাতিগুলির 'ভূমিতৃষ্ণা'। এশিয়া ও আফ্রিকার দুর্বল দেশগুলি তাদের ভূমিক্ষুধা মেটাবার উপকরণ। দুই, 'অর্থলালসা'। এবং তা থেকে এসেছে বাণিজ্যমোহ। এবং তিন, 'ভোগলালসা'।

ইউরোপ তার পার্থিব সম্পদ নিয়ে ভারতে এসেছে। ইউরোপে বাণিজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রসভ্যতাও বিকাশলাভ করেছে। চন্দ্রনাথ ইউরোপীয় কলকারখানায় প্রস্তুত অসার বিলাস দ্রব্য ও তার বিজ্ঞাপন প্রণালীকে ভারতবাসীর নৈতিক অধঃপতনের জন্য দায়ী করে বলেছেন, "বিলাসের ন্যায় মনোহর শত্রু আর নাই।"

যাঁদের বক্তব্য ইউরোপের পথের অনুসরণ না করলে এদেশের অভাব মিটবে না, তাঁদের জন্য চন্দ্রনাথের প্রত্যুত্তর—"প্রকৃত অভাবের বৃদ্ধিবশত পার্থিব বিষয়ে অধিকতর মনোযোগী হওয়াকে ইউরোপের পথে যাওয়া বলে না। অর্থলালসা ও ভোগলালসায় পার্থিব বিষয়ে মুগ্ধ হওয়াকেই ইউরোপের পথে যাওয়া বলে।" ভোগের ইচ্ছাকে প্রশ্রয় দিলেই স্বধর্মচ্যুতি ঘটবে। চন্দ্রনাথের বক্তব্য, "পরলোকের পথ ধরিলে পার্থিব পথের সীমা বা দৈর্ঘ্য আপনা আপনিই নির্দিষ্ট হইয়া পড়ে।" চন্দ্রনাথের সিদ্ধান্ত, ভারতের ত্যাগ ও সেবার আদর্শই অনুসরণীয়।

ভূদেবের মতো চন্দ্রনাথও মনে করতেন, ভারত-সমাজের উন্নতি ভারতীয় আদর্শের দ্বারাই হবে এবং এদেশে একজন জাতীয় কর্ণধার জন্মাবেন যিনি দেশের ভবিষ্যৎ গড়ে দেবেন। কিন্তু তা পাশ্চাত্য অনুকরণে হবে না, হিন্দুর প্রাচীন গৌরবময় ইতিহাস হবে তার ভিত্তিভূমি। চন্দ্রনাথ 'পশুপতি সম্বাদ'-এর আখ্যাপত্রে 'হিতোপদেশ' থেকে যে দুটি চরণ উদ্ধৃত করেছেন তা থেকে তাঁর এই মনোভাব বোঝা যায়। আখ্যাপত্রে উদ্ধৃত শ্লোকটি নিম্নরূপ ঃ

"যদি ন স্যাং নরপতিঃ সম্যক্ নেতা ততঃ প্রজা।
অকর্ণধারা জলধৌ বিপ্লবেতেহ, নৌরিব।।"

শ্রীগুরুজী ও বীর সাভারকর

—অর্থাৎ, যদি এই নরসমাজের সম্যক নেতা না থাকে, তবে প্রজাকূল সমুদ্রে কর্ণধারহীন তরণীর ন্যায় নিমগ্ন হয়।

চন্দ্রনাথ বসু আজ বিস্মৃতপ্রায় হলেও তাঁর সমাজ সম্বন্ধে ভাবনাচিন্তার উত্তরাধিকার পরবর্তী চিন্তানায়কদের মধ্যেও লক্ষ্য করি। স্থান-কাল-পাত্রের পরিপ্রেক্ষিতে হয়তো তা কিছু পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু মূল চিন্তাসূত্রটি আজও অব্যাহত রয়েছে। আজ একুশ শতকের ভারতে হিন্দুত্বের জাগরণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। হিন্দুত্বে আস্থাশীল ব্যক্তিদের সোচ্চার হওয়া ও হিন্দুত্বনিষ্ঠ সংগঠনগুলির সক্রিয়তা লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে শতাব্দী-প্রাচীন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। কেননা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ আজ বিশ্বের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। তাই সঙ্ঘ সম্পর্কে সবাই কম-বেশি জানতে উৎসুক। সঙ্ঘ হিন্দুত্বের দর্শনে বিশ্বাসী যা অধ্যাত্মভিত্তিক এবং জীবনের একাত্ম ও সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির অভিব্যক্তিকে প্রকাশ করে। কিন্তু কথায় আছে—'শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি'। দেশে ও বিদেশে এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী সঙ্ঘের ভাবমূর্তি বিকৃত করার জন্য কল্পিত ও মিথ্যা প্রচার নিরন্তর চালিয়ে যাচ্ছে। এত সব সত্ত্বেও সঙ্ঘের বিস্তার, শক্তি ও তার ইতিবাচক প্রভাব বেড়েই চলেছে।

সঙ্ঘের কাজ অভিনব। এই কাজের সঙ্গে তুলনা করার জন্য দ্বিতীয় কোনও তুলনীয় (Comparable) কাজ কোথাও দেখা যায় না। এমনকী সঙ্ঘের কার্যকর্তারাও 'অপরিচিত' (Faceless)। শতবর্ষ ধরে শতসহস্র কার্যকর্তা দেশজুড়ে মাতৃভূমির সেবায় কর্মরত থাকলেও কতজনই-বা তাঁদের চেনে? মূলত তাঁরা আত্মলোপী। 'তেরা বৈভব অমর রহে মা হম দিন চার রহে না রহে।'—এই মন্ত্রে বিশ্বাসী। তাই সঙ্ঘকে দেখা অনেকের কাছেই 'অন্ধের হস্তিদর্শন'-এর মতো হয়ে থাকে। বস্তুত সঙ্ঘকে জানতে হলে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশবরাও বলিরামরাও হেডগেওয়ার (১৮৮৯– ১৯৪০)-কে প্রথমে জানতে হবে। ডাঃ হেডগেওয়ার নিজেকে বীজ রূপে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে সঙ্ঘ বৃক্ষটিকে বড়ো করেছেন। এজন্য সঙ্ঘকে বুঝতে চাইলে সেখান থেকে শুরু করতে হবে।

বর্ষপ্রতিপদ তিথির পুণ্য প্রভাতে ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে ১ এপ্রিল নাগপুরের এক গরিব ব্রাহ্মণ পরিবারে ডাঃ হেডগেওয়ারের (ডাক্তারজী) জন্ম। মাত্র বারো বছর বয়সে ডাক্তারজী একই দিনে প্লেগ রোগে আক্রান্ত বাবা বলিরাম পন্থ ও মা-কে হারিয়ে ছিলেন। কিন্তু এই দুঃখ ও দৈন্যের জ্বালায় তাঁর মনুষ্যত্ব কখনও ম্লান হয়ে যায়নি। অল্প বয়সে সংবেদনশীল মন নিয়ে পড়া ছত্রপতি শিবাজীর জীবনচরিত ডাক্তারজী কখনও ভোলেননি। সাত সমুদ্র পেরিয়ে বিদেশি ইংরাজরা আমাদের দেশে বাণিজ্য করতে এসে শাসক হয়ে উঠল। ডাক্তারজী কিশোর বয়সেও এই ঘটনাকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে পারেননি। 'বন্দে মাতরম্' বলার অপরাধে তৎকালীন 'রিস্‌লে সার্কুলার' অনুযায়ী স্কুল থেকে বহিষ্কৃত হন। পরে পুণার রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয় থেকে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে ম্যাট্রিক পাশ করেন।

তাঁর সক্রিয়তা ও তেজোদীপ্ত ভাব লক্ষ্য করে নাগপুরের তৎকালীন নেতৃবৃন্দ তাঁকে কম-বেশি আর্থিক সাহায্য করে কলকাতার ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে পড়ার জন্য পাঠিয়ে দেন। পড়া তো উপলক্ষ্য মাত্র। মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল কলকাতায় সারা দেশের বিপ্লবীদের সংগঠন অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত হওয়া যাতে

With Best Compliments from -

Kaka Ram Babu Ram Aggarwal

Office : B-XXIII / 2891, Link Road, Near Samrala Chowk, Ludhiana

Ph. : 2604287, 5031390

Fax : 0161-5021390, Mob. :98763-20448

E-mail : dhruv@krbr.in

With Best Compliments From :

ALL INDIA ROAD TRANSPORT AGENCY
AIRTA LOGISTICS PRIVATE LIMITED
ALL INDIA PACKERS & MOVERS

ADMINISTRATION OFFICE :

1A, Raja Subodh Mullick Square, (5th Floor) Kolkata-700013
Phone : 2237 5919 / 2090 / 2822
Mobile : 9830020245 / 9831010261 / 9051060808 / 9163311779
E-mail : Kolkata@allindiatpt.com/airtalogistics@gmail.com
Web-site : www.allindiatpt.com
(H.O- 28, Black Burn Lane, Kolkata-700 012)

TIME GURANTEED DELIVERY TRANSPORTERS FOR ALL OVER INDIA MARINE TYPE ISO CONTAINER TRUCKS AVAILABLE.
SPECIALIST IN ODC CARGOES BY HEAVYDUTY TRUCKS & TRAILERS.
SPECIALISTS IN PACKING OF HOUSEHOLD GOODS & TRANSPORTATION BANK APPROVED (IBA)

BRANCHES & ASSOCIATES ALLOVER INDIA

তার মাধ্যমে ছুটিতে নাগপুরে এসে তিনি কেন্দ্রীয় প্রদেশ ও বেরারে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড শুরু করতে পারেন। এই দুটো কাজ তিনি ভালো মতোই করেন। মেডিক্যাল কলেজের অন্তিম পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন এবং এই চার বছর ধরে অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষা দিয়ে এই বিপ্লবী সমিতির কোর কমিটির অন্তর্ভুক্ত হন। সেই সময় তাঁর ছদ্মনাম ছিল কোকেন। ১৯১৬-র প্রথম দিকে তিনি নাগপুরে ফিরে যান।

ডাঃ হেডগেওয়ার কখনও ডাক্তারি করেননি। আজীবন অবিবাহিত ছিলেন। শৈশবকাল থেকেই দেশের স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রের উন্নতিই ছিল তাঁর সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা। এই আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। আহুতি দিয়েছেন নিজের জীবন। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের আগে চরমপন্থীদের রাজনীতিতে এবং ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। সেই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে ভাষণ দেওয়ার জন্য তিনি গ্রেপ্তার হন। তাঁর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা চলে। তখন কেউ আত্মপক্ষ সমর্থন করতেন না। শাস্তি হলে মেনে নিতেন। কিন্তু তিনি বললেন যে শাস্তি স্বীকার করবেন কিন্তু আত্মপক্ষ সমর্থনে বক্তব্যও রাখবেন। এরপর আদালতে তিনি যে বক্তব্য রাখলেন তা শুনে বিচারপতি বললেন, যে ভাষণের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ উঠেছে সেটার থেকেও এই ভাষণ আরও ভয়ংকর। তাঁর হৃদয়ে রাষ্ট্রভক্তির এই ভাব বাহ্য পরিস্থিতির কারণে উৎপন্ন হয়নি, বস্তুত এটাই ছিল তাঁর সহজাত স্থায়ী স্বভাব। ১৯১৫ থেকে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই দশ বছরে তিনি দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও তাদের আন্দোলন ইত্যাদির নিরীক্ষণ, অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ করেছেন এবং দেশের প্রকৃত রোগের নিদান খুঁজতে সচেষ্ট হয়েছেন।

ডাঃ হেডগেওয়ার সম্পূর্ণভাবে দেশের সর্বজনীন জীবনে এতটাই মগ্ন ছিলেন যে তাঁর বন্ধুরা ঠিক করলেন যে তাঁকে দিয়ে এমন ভাষণ দেওয়াবেন, যার মধ্যে দেশ বিষয়টাই আসবে না। এজন্য তাঁকে একটি ঘরোয়া আলোচনাচক্রে ডেকে নিদ্রা বা ঘুম সম্বন্ধে ভাষণ দিতে বলা হলো। ডাঃ হেডগেওয়ার ভাষণ দিলেন—আপনারা সবাই ডাক্তার, আপনারা জানেন যে 'নিদ্রা' খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটা ছাড়া স্বাস্থ্য ঠিক থাকে না। তাই ভালো ঘুম হওয়া প্রয়োজন; তারপর দেশের পরিস্থিতি, যুবকদের কর্তব্য সম্বন্ধে বললেন। এরকম অবিরাম দেশের চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। আসলে তিনি ছিলেন সহজাত দেশভক্ত। তাই সবার সঙ্গে তার চর্চা হতো।

গান্ধীজীকে যখন পুণার ইয়ারবেড়া জেলে বন্দি করে রাখা হয়, তখন নাগপুরের কংগ্রেস কমিটি স্থির করে যে প্রতি মাসের ২৮ তারিখে গান্ধীজীকে শ্রদ্ধা জানানো হবে। সেইমতো ১৯২২ সালের ২৮ এপ্রিল প্রথম সম্মেলন ছিল এবং সেখানে তাঁরা বক্তারূপে ডাঃ হেডগেওয়ারকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সেখানে তিনি বললেন যে শুধু গান্ধীজীকে স্মরণ করলে চলবে না, তাঁর জীবনে যে ত্যাগ-তিতিক্ষা আছে, তা অনুসরণ করতে হবে। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু, স্বাতন্ত্র্যবীর সাভারকর, মদনমোহন মালব্য প্রমুখ বিশিষ্টজনের সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। বিপ্লবীদের সঙ্গে তো তাঁর সম্পর্ক ছিলই। বিপ্লবী রাজগুরু যখন আত্মগোপন করেন তখন বিদর্ভে তাঁর থাকার ব্যবস্থা তিনি করে দেন। কলকাতার প্রসিদ্ধ বিপ্লবী ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী লিখেছেন—''১৯১১ তে একবার ডাঃ হেডগেওয়ার তাঁর বাড়িতে এসেছিলেন। তখন তিনি এই কথা বলেছিলেন—দাদা, মনে হয় এই সমাজকে কিছু প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রয়োজন আছে। কিন্তু এজন্য কারও সময় নেই। আমার মনে হচ্ছে এই কাজ আমাকেই করতে হবে।''

১৯১৫ থেকে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই দশ বছরে তিনি দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও তাদের আন্দোলন ইত্যাদির নিরীক্ষণ, অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ করেছেন এবং দেশের প্রকৃত রোগের নিদান খুঁজতে সচেষ্ট হয়েছেন। তিনি অনুভব করলেন যে ভারতবর্ষ হিন্দুর আবাসভূমি হওয়া সত্ত্বেও বারবার এই দেশের হিন্দুরা হয়েছে বিদেশি আক্রমণকারীদের দ্বারা আক্রান্ত ও অপমানিত, লুণ্ঠিত হয়েছে জাতির স্বকীয়তা। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন হিন্দুর বিদ্যাবুদ্ধি, শৌর্যবীর্য, ধনসম্পদ, বেদ-উপনিষদ-গীতা সবই আছে, নেই কেবল জাতীয় চেতনা (Nationl concousness) ও সংগঠন (organisation)। তাই হিন্দুকে রক্ষা করতে হলে প্রথমেই তাদের বাঁধতে হবে ঐক্যের বন্ধনে। চাই হিন্দু সংগঠন।

কিন্তু হিন্দু শব্দ কেন? একথা ঠিক যে হিন্দু নাম বাইরে থেকে এসেছে। ভারতের প্রাচীন গ্রন্থাদিতে এই হিন্দু শব্দ পাওয়া যায় না। আজও বহু বিদ্বান, সন্ত হিন্দু বলেন না। তারা নিজেদের সনাতনী বলেন। ধর্মকে সনাতন বলেন। বৌদ্ধরা ধর্মকে 'ধম্ম' বলে থাকে। কোনও বিশেষ পরিস্থিতিতে হিন্দু নাম পরে এসেছে। পারস্য বা বর্তমান ইরানের সঙ্গে আমাদের পূর্বপুরুষদের ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল। ফারসি ভাষায় 'স'-এর উচ্চারণ 'হ' হয়। এবং তখন থেকেই ধীরে ধীরে ব্যবসায়ীদের তথ্য অনুসারে হিন্দু নাম প্রচলিত হয়। যেরকম আমার-আপনার নাম আমরা নিজেরা কেউ দিইনি, তেমনই এই হিন্দু নাম আমাদের পরিচয়ের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। শোনা গিয়াছে যে এদেশ থেকে কোনও মুসলমান হজ করতে গেলে নথিবদ্ধকরণের সময় তাদেরকে হিন্দু হিসেবে অর্থাৎ হিন্দুস্থানেরই মুসলমান রূপে গণ্য করা হয়। যখন আমরা ভারতীয় বলি তখন শুধু ভৌগোলিক ভারতকে বোঝায় না। কারণ ভৌগোলিক ভারতের সীমানা কম-বেশি পরিবর্তিত হয়। আসলে ভারত একটি স্বভাব বা সংস্কৃতির নাম। এইসব শব্দ সমার্থক। কিন্তু হিন্দু শব্দটির মাধ্যমে এর সারমর্ম স্পষ্ঠভাবে বর্ণনা করা যায়। এজন্য সঙ্ঘ হিন্দু শব্দকে গুরুত্বের সঙ্গে ব্যবহার করে। যারা ভারতীয়, ইন্ডিক বা আর্য শব্দ ব্যবহার করেন, তাদের সঙ্গে কোনও বিরোধ নেই। আমরা হিন্দু শব্দকে গুরুত্ব দিই, তারা ওগুলিকে দেয়, এই যা। এজন্যই হিন্দু সংগঠন।

কিন্তু চাইলেই তো হবে না। যে সময়ে সঙ্ঘ শুরু হয়েছে, সেই

M.T. GROUP

Estd. 1954

M.T. MECHANICAL WORKS

M.T. INTERNATIONAL

EN. EN. ENGG. WORKS

D-75, Phase - V, Focal Point,
Ludhiana - 141010 (Punjab) India
Ph: 91-161-2670128, 2672128
Fax : 91-161-2673048, 5014188
E-mail : mtgroup54@sify.com
Visit us at : www.mtexports.com

Manufacturers :
Domestic Sewing Machine & Parts, Overlock Machines, Industrial Machine, TA-1, Embroidery, Bag closer and Aari Machines

Phones : Fac : 2222224, 2222225, 2222226
Resi : 2426562, 5050350

Rai KNITWEARS

842/2, Industrial Area - A,
Backside R.K. Machine Tools Ldt.
LUDHIANA - 141003

HOSIERY MANUFACTURERS
& EXPORTERS OF:

EXCLUSIVE SCHOOL
UNIFORMS & T-SHIRTS
ALL FASHION WEARS

S.T. No. 55615216 Dt. 4-9-68
C. S. T. No. 55615216 Dt. 10-9-68

Ph. :-0161- 2510766, 2512138, 2510572
Fax No. 0161-2510968/ 2609668,
Gram : **TYRES**

HINDUSTAN TYRE CO.

Prop. : HINDUSTAN CYCLES & TUBES (P) LIMITED

Regd. Office :
G-3, TEXTILE COLONY
INDUSTRIAL AREA - A,
LUDHIANA - 141 003

Works :
KANGANWAL
G. T. ROAD
LUDHIANA - 141 120

সময়ে কারও বিশ্বাসই ছিল না যে এরকম হওয়া সম্ভব। তখন মনে করা হতো যতক্ষণ পঞ্চম ব্যক্তি কাঁধে না থাকে (অন্তিম যাত্রার সময়) ততক্ষণ হিন্দু সমাজের চারজন লোক এক দিশায় চলতে পারে না। সেই সময় বিদেশি ইংরেজদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য চেষ্টা চলছিল। ১৮৫৭ তে দেশকে স্বাধীন করার জন্য একটা চেষ্টা হলেও তা ব্যর্থ হয়। লোকবল, বিদ্যাবুদ্ধি, শৌর্যবীর্য, ধনসম্পদ সব থাকা সত্ত্বেও মুষ্টিমেয় ইংরেজদের কাছে আমরা কেন হারলাম। সেসময় এই প্রশ্নের সমাধানে অর্থাৎ স্বাধীনতা লাভের জন্য যে প্রচেষ্টা শুরু হয় মুখ্যত তার চারটি ধারা দেখা যায়। একদল সশস্ত্র সংগ্রামের পথে এগোতে থাকেন। যেমন বিপ্লবীদের বিভিন্ন প্রচেষ্টা। ১৯৪১-এ সুভাষচন্দ্র বসুর অন্তর্ধান পর্যন্ত এই ধারা বজায় ছিল। দ্বিতীয় ধারা ছিল রাজনৈতিক আন্দোলন। কংগ্রেসের মতো একটি সংগঠন এই ধারার নেতৃত্ব দেয়। বহু সর্বস্বত্যাগী মানুষ এইসব আন্দোলনে যোগ দেন। তৃতীয় ধারা সমাজ সংস্কারের পথ অবলম্বন করেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলে, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, ঠক্কর বাপ্পা প্রমুখের নাম এই ধারার উল্লেখযোগ্য নাম। চতুর্থ ধারা হলো যাঁরা মনে করতেন নিজেদের মূল ভিত্তিতে ফিরতে হবে। অর্থাৎ ভারতের পরম্পরাগত শাশ্বত সমুচ্চ মূল্যবোধের ভিত্তিতেই সমাজ জাগরণ হওয়া দরকার। আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতী, লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ মনীষী নিজেদের মূল ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে সমাজ জাগরণে ব্রতী হন। ডাঃ হেডগেওয়ার এই শাশ্বত মূল্যবোধের ভিত্তি অর্থাৎ হিন্দুত্বের ভিত্তিতেই সমাজ পুনর্জাগরণের জন্য রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করলেন।

এখন আমাদের এই সমাজকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে একটি প্রধান বাধা হচ্ছে এই সমাজ এক ভাষাভাষী নয়। শুধু তাই নয়, খাদ্য, পানীয়, পোশাক, রীতিনীতি ভিন্ন ভিন্ন। কোনও বিষয়ে একরূপতা (Uniformity) ভারতের কোথাও নেই। এবং আরও দুর্ভাগ্য যে এর মধ্যে কিছু ভিন্নতাকে নিয়ে প্রথমে আমরাই নিজেদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করেছি। তাহলে কীভাবে জোড়া যাবে? সংহতির কোনও সূত্র আছে কি? আছে। সৌভাগ্যক্রমে এটা আমাদের দেশের পরম্পরাগত চিন্তাধারা বা মূল্যবোধ। আমাদের দেশে যত মত রয়েছে যা এই দেশের মাটিতে উৎপন্ন হয়েছে, সেইসবগুলির মধ্যে কিছু ভিন্নতা, এমনকী বিরোধিতা থাকলেও প্রত্যেকটির উৎসমূল কিন্তু এক। সমগ্র সৃষ্টির মূলে রয়েছে একই সত্তা। বিদ্বান ব্যক্তিরা তাকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেন, তাই ভিন্নভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যাও করেন। 'একম সদ্ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি' (ঋক বেদ)। এই পরাম্পরাগত চিন্তাধারা বা মূল্যবোধ আমাদের একাত্ম করে। তাই হিন্দুর ঘরে শুধু জন্মেছি বলেই আমরা হিন্দু নয়। এই সনাতন মূল্যবোধের কারণেই আমরা হিন্দু। এজন্যই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'আমি নিজেকে হিন্দু বলিতে গর্ববোধ করি।' হিন্দু চিন্তাধারাই হলো সৃষ্টির সংহতির সূত্র। এই প্রসঙ্গে সঙ্ঘের পঞ্চম সরসঙ্ঘচালক মাননীয় কে এস সুদর্শনজীর বক্তব্য উল্লেখ করার মতো। তিনি বলেছেন, ''হিন্দুরা এই বিশ্বকে একটি সামগ্রিক দৃষ্টিতে দেখেন—খণ্ড খণ্ড রূপে নয়। অন্যদিকে পাশ্চাত্যের লোকেরা বিশ্বকে খণ্ড খণ্ড রূপে দেখতে অভ্যস্ত। তারা মানুষকে, প্রকৃতিকে আলাদা করে দেখেছেন এবং মানুষ প্রকৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করবে, প্রকৃতিকে উপভোগ করবে—এই ছিল পাশ্চাত্যের চিন্তাদর্শ। আজ পাশ্চাত্যের চিন্তাবিদরা তাদের ভুল বুঝতে পেরেছেন। তাদের বিজ্ঞানীরা বলতে শুরু করেছেন—'Every particle contains every other particle' প্রতেকটি কণাই অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। একথা হিন্দুদের আগেই জানা ছিল। হিন্দুরা সেই সত্য বা সত্তাকে নমস্কার জানিয়ে বলেছে—'যা দেবী সর্বভূতেষু'। আমাদের পূর্বপুরুষেরা বিষয়টি উপলব্ধি করেছিলেন, মানুষ সৃষ্টি থেকে আলাদা নয়, বরং সৃষ্টিচক্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য করেই মানুষের জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে হবে। আমাদের এখানে বৃক্ষের মধ্যেও ঈশ্বরের অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয়েছে। এই যে একাত্মতার দৃষ্টিভঙ্গী এটাই হলো হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গী। ডাঃ হেডগেওয়ার এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারেই বলেছেন—'বয়ম্ হিন্দুরাষ্ট্রাঙ্গভূতা' (সঙ্ঘের প্রার্থনা)। হাত-পা যেমন শরীরের অঙ্গ, ঠিক সেইরকম ব্যক্তি-আমি পরিবারের অঙ্গ, পরিবার রাষ্ট্রের অঙ্গ, রাষ্ট্র মানবসমাজের অঙ্গ এবং মানবসমাজ প্রকৃতির অঙ্গ এবং প্রকৃতি পরমাত্মার অঙ্গ। ব্যক্তি থেকে পরমাত্মা পর্যন্ত সব কিছুই এভাবে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। আর শরীরের সব কাজ যদি ঠিকভাবে চালাতে হয় তবে হাত-পা-চোখ-নাকের মধ্যে পরস্পর সামঞ্জস্য ও সহযোগিতার ফলেই সমগ্র বিশ্ব সঠিকভাবে পরিচালিত হতে পারবে। এই বোধই হলো হিন্দুত্ব। এটা কোনও ইজম নয়, এটা একটা প্রক্রিয়া। গান্ধীজী বলেছেন যে সত্যের নিরন্তর অনুসন্ধানই হিন্দুত্ব। তাই ডাক্তারজী স্পষ্ট ঘোষণা করেন যে হিন্দুস্থান হিন্দুরাষ্ট্র। হিন্দুত্বই রাষ্ট্রীয়ত্ব। এই বোধের কারণেই হিন্দুরাষ্ট্র আজ জীবিত ও বর্তমানে তার প্রয়োজনীয়তা। তাই নতুন করে 'হিন্দুরাষ্ট্র' ঘোষণা করার প্রয়োজন নেই। সমগ্র বিশ্বের কাছে এটাই হলো হিন্দুরাষ্ট্রের চিরন্তন বাণী। এই বোধ প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে জাগ্রত করাই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কাজ। ১৯২৫ সালের বিজয়াদশমী তিথিতে (২৭ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার) নাগপুরে ডাঃ হেডগেওয়ার ঘোষণা করেছিলেন যে এই কাজ আজ থেকে শুরু হলো।

এই কাজের জন্য যে যোগ্য ব্যক্তির প্রয়োজন তা ডাক্তারজী আগেই বুঝেছিলেন। ১৯১১-তে বিপ্লবী ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় ডাক্তারজীর মনে এই ভাবনা ছিল যে স্বাধীন দেশ বলার জন্য আমাদের সমাজ যোগ্য নয়, তাকে যোগ্য তৈরি করতে হবে। কিন্তু চাইলেই তো যোগ্য ব্যক্তি পাওয়া যাবে না। আমাদের দেশে আদর্শ আছে, মহাপুরুষেরও কোনও ঘাটতি নেই।

আমাদের সমাজে সেইসব আদর্শের মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করা হয়, মহাপুরুষদের জন্মজয়ন্তীও উৎসাহের সঙ্গে পালন করা হয়। কিন্তু কেউ ভুলেও তাঁদের মতো হতে চাই না। স্বামী বিবেকানন্দের মতো হওয়া চাই, কিন্তু আমার ঘরে নয়, অন্যের ঘরের ছেলে হোক। তা হলে? আসলে সমাজের আচরণ উদাহরণের মাধ্যমেই পালটায়। আমাদের কাছাকাছি যারা আছেন, তাদের আচরণের প্রভাব সমাজের উপর পড়ে। যদি দেশের প্রতিটি গ্রামে, নগরে পাড়ায় পাড়ায় স্বাধীন ভারতের বর্তমান নাগরিকের যেরকম কর্তব্যপরায়ণ হওয়া উচিত, সেরকম কর্তব্যে অটল, চরিত্রসম্পন্ন, সম্পূর্ণ সমাজের সঙ্গে আত্মীয়ভাব যুক্ত ব্যক্তি থাকেন, তাহলে সেই পরিবেশ পরিস্থিতিতে সমাজের আচরণ পালটাবে। সমাজ পরিবর্তন হবে। তাই সঙ্ঘ প্রতিটি গ্রামে শহরে ব্যক্তিনির্মাণ অর্থাৎ ভালো স্বয়ংসেবক তৈরির কাজ করে চলেছে। ভালো স্বয়ংসেবকের অর্থ যাঁর নিজের চরিত্র বিশ্বাসযোগ্য, শুদ্ধ। যিনি সম্পূর্ণ সমাজ দেশকে নিজের মনে করে কাজ করেন। কাউকেই ভেদভাব বা শত্রুতার দৃষ্টিতে দেখেন না এবং এজন্য সমাজের থেকে স্নেহ ও বিশ্বাস অর্জন করেছেন। ১৯২৫ থেকে সঙ্ঘ এই কাজটি শুধু করে আসছে, এর থেকে বেশি কিছু নয়। ডাঃ হেডগেওয়ারের বক্তব্য সম্পূর্ণ হিন্দু সমাজকে সংগঠিত করতে হবে। সমাজের মধ্যে পৃথক কোনও নিজস্ব সংগঠন তৈরি করা নয়। সবাইকে সংগঠিত করতে হবে। সঙ্ঘ হিন্দু সমাজের অংশবিশেষ নয়, সঙ্ঘ মানে সম্পূর্ণ হিন্দুসমাজ। মনসতাত্ত্বিক দিক থেকে সঙ্ঘ সমগ্র হিন্দুসমাজের সঙ্গে একাত্ম। 'Psychologically RSS is identified with entire Hindu Society'। সঙ্ঘের শাখাতে যাঁরা আসছেন তাঁরা আমাদের 'পেটেন্ট' স্বয়ংসেবক এবং যাঁরা আসেননি, এমনকী বিরোধিতাও করছেন, তাঁরা 'লেটেন্ট' স্বয়ংসেবক। একবার এক স্বয়ংসেবক পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়জীকে উত্তরপ্রদেশের এক নির্বাচনের ফলাফল কী হবে জানতে চাইলে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন—তুমি এই প্রশ্ন একজন স্বয়ংসেবক হিসাবে করছো না একজন জনসঙ্ঘের কার্যকর্তা হিসাবে? প্রশ্নকর্তা যখন বলে, সেটা তো একই হলো, তখন দীনদয়ালজী বললেন, না এক নয়। স্বয়ংসেবক হিসাবে ভাবলে সব আসনেই আমরা জিতবো। আমাদের কেউ পর নয়। আর জনসঙ্ঘের কর্মী হিসাবে প্রশ্ন করলে বলব, তিরিশ-পঁয়ত্রিশটি আসলে জিতব। আর এজন্যই ব্যক্তি নির্মাণ ছাড়া সঙ্ঘ অন্য কোনও কাজ করবে না। দুধকে দই করার জন্য যেমন দম্বল (সাজা)-এর দরকার হয়, তেমনই সঙ্ঘ শুধু যোগ্য ব্যক্তি নির্মাণের জন্য কাজ করবে। অন্যদিকে স্বয়ংসেবকরা সমাজের সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য নিরন্তর সক্রিয় থাকবে। সমাজের কোনও ক্ষেত্রকেই বাদ দেবে না। এটা এক প্রকার শ্রমবিভাজন (Division of labour)। ভারতবর্ষকে পরমভৈবশালী অর্থাৎ সশক্ত ও সমৃদ্ধ করার জন্য 'বসুধৈব কটুম্বকম্' অর্থাৎ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে আত্মীয়তা স্থাপনের জন্য সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা নিরন্তর কাজ করে চলবে।

আমাদের রাষ্ট্র খুবই প্রাচীন। রাষ্ট্রের কল্পনা যদি পশ্চিমি ব্যাখ্যা অনুসারে করি তবে সেখানে 'স্টেট ইজ নেশন'। স্টেট নষ্ট হয়ে গেলে নেশনও ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের ধারণা এটা নয়। আমাদের রাষ্ট্র সাংস্কৃতিক যা শাশ্বত মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। সকলের মঙ্গলের জন্য এক পরিমিত সমন্বয় বা আত্মীয়তা। ভারতে উদ্ভূত সব সম্প্রদায়ের এটাই সার্বিক মূল্যবোধ এবং এর নামই হিন্দুত্ব। এটা কোনও নির্দিষ্ট উপাসনাপন্থীদের স্পষ্ট করে বোঝায় না। অখণ্ড ভারতের সাংস্কৃতিক পরিচয় হলো হিন্দুত্ব। গাজিয়াবাদে মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চ আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে বর্তমান সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবতজী বলেন যে, 'ধর্ম বা রিলিজিয়ন (উপাসনা পদ্ধতি) যাই হোক না কেন, হিন্দু-মুসলমান আলাদা নয়। সব ভারতীয়র ডিএনএ এক। অনুষ্ঠানের মূল বিষয় ছিল—'হিন্দুস্থানি ফার্স্ট, হিন্দুস্থান ফার্স্ট।' এই বক্তব্যের সূত্র ধরেই তিনি আরও বলেন, 'হিন্দু-মুসলমান ঐক্য আসলে ভুল কথা। কারণ হিন্দু-মুসলমান অভিন্ন। ধর্ম আলদা হলেও এদেশে সকলের ডিএনএ এক। আমরা সবাই ভারতবাসী।'

মাননীয় ভাগবতজীর এই বক্তব্যে কেউ কেউ বলছেন যে সঙ্ঘ তার দিশা বদলাচ্ছে। কেউ কেউ মন্তব্য করছেন 'সঙ্ঘের আদর্শবাদের আধুনিকীকরণ হচ্ছে।' বাস্তবে তেমন কিছু নয়। আসলে সঙ্ঘের কাজ যুগানুকূল। সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার গৃহীত প্রস্তাবগুলি পর্যালোচনা করলেই তা স্পষ্ট হবে। এই প্রসঙ্গে শ্রীগুরুজীর (এম এস গোলওয়লকার) 'Bunch of Thoughts-এ মুসলিম সমাজকে বন্ধু রূপে উল্লেখ করা হয়নি বলে কেউ কেউ উল্লেখ করেন। ঘটনা হলো, কথা যখন বলা হয়, তখন তা পরিস্থিতি সাপেক্ষে বলা হয়। তা শাশ্বত নয়। শ্রীগুরুজীর যে শাশ্বত চিন্তা, তার একটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে 'শ্রীগুরুজী—ভিশন অ্যান্ড মিশন'। তাতে তাৎক্ষণিক বিষয় বাদ দিয়ে তাঁর শাশ্বত যে ভাবনা, তা সংকলিত হয়েছে। সেখানে পরিস্থিতি সাপেক্ষে কথাগুলি পাওয়া যাবে না। আর একটি বিষয় হলো, সঙ্ঘ 'বাদ' (ইজম) ভিত্তিক সংগঠন নয় যে ডাঃ হেডগেওয়ারের কাছ থেকে কয়েকটি কথা আমরা জেনেছি, সেই কয়েকটি মাত্র কথা অনুযায়ীই চলবো। সময় পালটায়, সংগঠনের অবস্থাও পালটায়। আমাদের চিন্তা-চেতনাও পালটায় এবং এই পালটানোর অনুমতি আমরা ডাঃ হেডগেওয়ারের কাছ থেকে পেয়ে থাকি। তা না হলে তিনি প্রথমদিনই বলে দিতেন যে আমাদের রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ চালাতে হবে, শাখা শুরু করো। তিনি এমন কোনও কিছুই বিশেষভাবে বলেননি, শুধু ভাবনা দিয়েছেন। সঙ্ঘের কার্যকর্তারা তা প্রয়োগ করেছেন। যা উচিত মনে হয়েছে তা করেছেন, যা মনে হয়নি, তা করেননি। সঙ্ঘ এভাবেই এগিয়ে চলেছে। অর্থাৎ 'Progressive Unfoldment'।

সঙ্ঘের ভাবনা হিন্দুত্ব ভাবনা, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে সঙ্ঘ হিন্দুত্বকে আবিষ্কার করেছে। এই ভাবনা তো আমাদের দেশে যুগ

যুগ ধরে চলে আসছে। এই চিন্তাধারা নিয়ে অনেক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু হিন্দুত্ব নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টির ক্ষেত্রে সব থেকে বড়ো ভূমিকা হিন্দু সমাজেরই। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, সমন্বয়, ত্যাগ, সংযম, কৃতজ্ঞতার মতো শাশ্বত সমুচ্চ মূল্যবোধের নামই হিন্দুত্ব। এই মূল্যবোধের ভিত্তি হলো সত্য। সত্যের বর্ণনা ভিন্ন-ভিন্ন এবং পরস্পর বিরোধীও। কিন্তু সত্য তো একই এবং তা অস্তিত্বের ঐক্যের সত্য। যখন বিশ্ব সুখের খোঁজ বাইরে করছিল এবং বাইরে খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, সেই সময় আমাদের পূর্বপুরুষরা সুখের বা আনন্দের জন্য অন্তঃকরণে ডুব দেওয়ার কথা বলেছেন। ভারতীয় চিন্তায় অপরা বিদ্যা অর্থাৎ জড়-জগতের বিজ্ঞান সম্মত অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে পরাবিদ্যার অর্থাৎ অন্তর জগতের আধ্যাত্মিক অধ্যয়নও শুরু হয়। এই অধ্যয়নের ভিত্তিতেই যুক্তি ও প্রত্যক্ষ অনুভূতিসম্পন্ন মহাপুরুষের পরম্পরা প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের দেশে বরাবরই রয়েছে। আমরা শুধু যুক্তি ও সিদ্ধান্তের কথা বলি না। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে, অনুভবের সঙ্গে এই সত্য দর্শনের কথা বলার মানুষ আজও আমাদের দেশে দেখা যায়। সেই সত্যের ভিত্তিতে জগতের বৈচিত্র্যকে স্বীকার করা, সম্মান করা এবং একসঙ্গে মিলেমিশে থাকা। হিন্দুত্ব তাই সর্বসমাবেশক (All inclusive)। এই পরাম্পরাগত 'সমুচ্চ মূল্যবোধ'-ই হিন্দু, হিন্দুত্ব।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্গপ্রদেশের সারস্বত সমাজের কাছে চন্দ্রনাথ বসুর কিছু পরিচয় থাকলেও সর্বসাধারণ মানুষের কাছে আজ বিস্মৃত প্রায়। তবে একুশ শতকের ভারতবর্ষে বিবিধ ক্ষেত্রে হিন্দুত্বের যে প্রভাব দেখা যাচ্ছে, তাতে চন্দ্রনাথ বসুকে স্মরণ করতেই হয়। কেননা তিনিই প্রথম 'হিন্দুত্ব' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তাঁর সমাজ চিন্তামূলক প্রবন্ধের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি 'হিন্দুত্ব' গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দ। এই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন—"প্রকৃত হিন্দু হওয়ার ন্যায় কঠিন কাজ আর নাই—মহৎ কাজ আর নাই।" এই মহৎ কাজ করার জন্য তিনি হিন্দুজাতির প্রকৃত ইতিহাস সন্ধানের প্রেরণায় 'হিন্দুত্ব' গ্রন্থটি লিখেছিলেন। এই গ্রন্থের নামপত্রে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে 'হিন্দুত্বের প্রকৃত ইতিহাস' কথাগুলি বসিয়েছিলেন।

আজ সারা দেশজুড়ে হিন্দুসমাজের যে পুনর্জাগরণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে তার প্রধান কারণ শতাব্দীপ্রাচীন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ—একথা অস্বীকার করা যাবে না। আজ কেন্দ্রে হিন্দুত্বনিষ্ঠ সরকার গঠিত হয়েছে। ফলে দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকা সমস্যাগুলি সমাধান হচ্ছে। স্বাধীনতার পঁচাত্তরবর্ষ পূর্তিতে—অমৃত মহোৎসবে 'স্ব' অর্থাৎ আমাদের নিজস্বতা—স্বধর্ম, স্বদেশ ও সমাজের বিকাশে সঙ্ঘ বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। গত সাতশো বছর ধরে সংঘর্ষের পর জাতীয় অস্মিতার প্রতীক অযোধ্যায় রামজন্মভূমিতে মন্দির পুনর্নির্মাণ সম্ভব হচ্ছে। আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতাদের অদূরদর্শিতার ফলে একই দেশের মধ্যে যে আর একটি দেশের অস্তিত্ব ছিল, নিজের দেশেই তিন কোটি হিন্দুকে উদ্বাস্তু হতে হয়েছিল, সংবিধানের ৩৭০ ধারা বাতিলের ফলে আজ অখণ্ড ভারতের পথে এক ধাপ অগ্রসর হওয়া গেল। সারা দেশে এক আইন, এক বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর দেশবিভাগের ফলে প্রতিবেশী দেশগুলি থেকে শুধুমাত্র হিন্দু হওয়ার অপরাধে নৃশংসভাবে অত্যাচারিত হয়ে যারা শরণার্থী হিসেবে ভারতে এসেছেন নাগরিকত্ব আইন পাশ হওয়ার ফলে সম্প্রতি তাঁরা নাগরিকত্ব লাভ করেছেন। দেশবিভাগের ফলে যে পাপ হয়েছিল এর ফলে তার অন্তত কিছুটা লাঘব হলো। এখন ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সব কিছুর দেখার যে চেষ্টা চলছে তা রোখবার জন্য 'গ্লোবাল কনসপিরেসি' চলছে। আমাদের দেশে লেফট-লিবারেল -কংগ্রেস-কমিউনিস্ট-সেকুলার গোষ্ঠী এদের এজেন্ট হিসাবে কাজ করছে। এদেশের কিছু বিশ্ববিদ্যালয় ও মানবাধিকার সংগঠন জাতীয় কিছু এনজিও রয়েছে পুরোভাগে। ভারতে নিরন্তর অস্থিরতা জিইয়ে রাখা যাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু তাদের কোনও বাধাই হিন্দু পুনর্জাগরণকে আজ রুখতে পারবে না। এখন যতই বাধাবিপত্তি আসুক না কেন, জাগ্রত হিন্দুসমাজ, যার নেতৃত্বে মূলত রয়েছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, তার ঈপ্সিত লক্ষ্যের পথে এগিয়ে চলছেই। সঙ্ঘের বিস্তার, ক্রমবর্ধমান শক্তি ও তার ইতিবাচক প্রভাবই তার প্রমাণ। বিশেষত হিন্দুত্বের স্বীকৃতি বাড়ছে। এতসবের পরেও ২০১৮-র সেপ্টেম্বরে দিল্লিতে বিজ্ঞান ভবনে আয়োজিত ভাষণে সঙ্ঘের বর্তমান (ষষ্ঠ) সরসঙ্ঘচালক শ্রীভাগবত বলেছেন—"কিন্তু একা সঙ্ঘ বড়ো হলে এমন কী বড়ো ব্যাপার। ইতিহাসে আমরা লেখাতে চাই যে এই দেশে এমন একটি প্রজন্ম তৈরি হয়েছিল, যাঁরা উদ্যোগ নেন এবং আমাদের দেশকে বিশ্বগুরুর স্থানে অভিষিক্ত করে। এই পবিত্র কাজ শুরুর জন্য আসুন, আমরা সম্পূর্ণ সমাজে কর্তব্যবোধ জাগাই।"

তাই সঙ্ঘের জয়ঘোষ—'ভারতমাতা কী জয়।'

ওঁ

পথে চলে যেতে যেতে

এষা দে

নীল টিপিক্যাল বাঙ্গালি। পায়ের তলায় সর্ষে। ছাত্রাবস্থায় সুযোগ পেলেই তার সমগোত্রীয় ভ্রমণপ্রিয়দের নিয়ে ব্যাকপ্যাক এঁটে কত জানাঅজানা জায়গা চষে বেড়িয়েছে। এখন চাকরির কারণে সবাই ছড়িয়ে গেছে নানা শহরে, নানা দেশে। বেশিরভাগ পরিবারবদ্ধ, বন্ধুদের নিয়ে ঘোরার দিন শেষ। নীল অবশ্য একলা, তার বিয়েটা টেকেনি।

এখন ভরসা প্যাকেজ টুর। বিদেশি ভ্রমণ সংস্থার আয়োজনই পছন্দ, তারা খুব পেশাদার। গন্তব্য এবারে মধ্য ইউরোপ। কৈশোর ও যৌবনে বামপন্থী প্রচুর বুকনি শুনেছে সমাজতন্ত্র, ফ্যাসিবাদ বিরোধিতা ইত্যাদি বিষয়ে। আবছা ধারণা মধ্য ইউরোপ হচ্ছে পশ্চিমের ঝটিকা কেন্দ্র। স্বচক্ষে তাই দেখতে বেরিয়েছে।

দুবাই হয়ে দুপুরে ফ্র্যাঙ্কফুর্টে নেমে ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে পৌঁছয়। ভ্রমণ সংস্থার নিখুঁত বন্দোবস্ত। রিসেপশানে নাম বলতেই ঘরের চাবি ও মেসেজ। সন্ধ্যায় লবিতে জমায়েত। অতঃপর যাত্রাসঙ্গীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ। ৪২ জনের সকলেই ইংরেজিভাষী বিদেশি এবং শ্বেতাঙ্গ। আধুনিক কেতায় সব ডাকনামেই পরিচয়। যেন ঘরোয়া সুর, আপনি আজ্ঞের পাট নেই। প্যাকেজ নিয়ে ঘোরা সাহেব-মেম বেশিরভাগ

সিনিয়র সিটিজেন। বড়জোর মধ্যবয়স্ক। শুধু টুর ডিরেক্টর এমা মনে হয় তারই বয়সি, চল্লিশ ছুঁই ছুঁই। হাইট ৫.৫ কী ৬। পাতলা ছিপছিপে, সাদাটে সোনালি চুল, ছাই নীল চোখ। না গ্লামারাস নয়, বরং শান্ত আটপৌরে চেহারা। কেজো পোশাক। প্রথমেই নিজের পরিচয় দেয়, 'স্লোভাকিয়া দেশটার নাম কেউ শুনেছেন কি? আমি সেই দেশের মানুষ, অর্থাৎ স্লোভাক।' প্যাকেজের দর্শন ছাড়া বাড়তি কত কী দেখা যায়, নৈশাহার-সহ সন্ধ্যায় কী কী প্রোগ্রাম আছে, বলা বাহুল্য বাড়তি মূল্যে, তার বর্ণনা। শেষে পরদিন যাত্রার সময়, উপযুক্ত পোশাক ইত্যাদির বার্তা। মেয়েটি বেশ করিতকর্মা। যাত্রীরা বেশিরভাগই যুগল। মোটে জনা তিনেক নীলের মতো একক। প্রত্যেকের পরিচয় খেয়াল করে স্বদেশের লোকের সঙ্গে একই তলায় থাকার ব্যবস্থার করেছে। অপ্রস্তুত মুখে জানালো নীল যে একমাত্র ভারতীয়। তাকে ইংরেজ দম্পতির কাছাকাছি ঘর দিয়েছে। আফটার অল ওদের সঙ্গে ভারতের বহুকালের সম্পর্ক। নীল মাইন্ড করেনি তো? হেসেই ফেলে নীল। 'আরে পাশের ঘরে কে রইল না রইল কী আসে যায়। ঘরে আমরা থাকবো কতক্ষণ। শুধু তো রেডি হওয়া আর ঘুমনো। বাকি সময় সবাই বাইরে এবং এক সঙ্গে। অত জাতি বিচার কী দরকার।'

'দ্যাটস ভেরি নাইস অফ ইউ। জানো, অনেক টুরিস্ট প্রতিবেশী নিয়ে ঝামেলা করে, তাই আমার একটু টেনশান হচ্ছিল।'

নীল অবাক, অন্য কোনো টুর ডিরেক্টরকে ঘর অ্যালট করা নিয়ে টেনশান করতে দেখেনি। মেয়েটি একটু নার্ভাস টাইপ, যেন আত্মবিশ্বাসের অভাব, সব সময় চায় কেউ বলুক হ্যাঁ ঠিক করেছ।

পরদিন টুর শুরু। প্রথা মাফিক ডিরেক্টর চলন্ত কোচ বা বাসে মাইক আঁটা মুখে সামনে বসে। ভ্রমণ তালিকার প্রথম দেশ জার্মানির আদ্যন্ত ইতিহাস বর্ণনা করে যাচ্ছে। অনেকেই বিস্মিত যে জার্মানি নামে কোনো দেশই আদপে ছিল না। ছিল জার্মানভাষী শতশত ছোটো বড়ো মাঝারি রাজ্য। কতকাল ধরে শুধু সংঘর্ষের কাহিনি। পরস্পর মারামারি খেয়োখেয়ি করা রাজ্যগুলিকে শেষে ঘাড় ধরে এক করে বিসমার্ক ১৮৭১ সালে দেশ গঠন করেন। যাত্রীরা যেন একটু উশখুশ করছে। নিউজিল্যান্ডের জ্যাক বলে উঠে, 'আমরা কি হিস্ট্রির টিউটোরিয়েল ক্লাসে?' পুরু চশমা চোখে কানাডার লিজা যোগ করে, 'জার্মানদের সভ্য কীর্তিগুলোর কথা বলুন।' এমা যেন অপ্রস্তুত, 'নিশ্চয় নিশ্চয়, আমি তো এর পরই বলতে যাচ্ছিলাম। জার্মানি প্রায় সর্বক্ষেত্রে বহু প্রতিভার জন্ম দিয়েছে.....', অস্ট্রেলীয় পিটার বাধা দেয়, 'প্লিজ নো মোর লেকচার, দেশটা উপভোগ করতে দিন।' থতমত খেয়ে চুপ করে যায় এমা।

নীল থাকতে না পেরে বলে উঠে, 'টুর ডিরেক্টরকে তাঁর নর্ম্যাল কাজটা করতে দিন।' ততক্ষণে সামলে নিয়েছে এমা। হাসি মুখে বলে, 'আসুন জার্মান সংস্কৃতি এনজয় করা যাক। বিটোভেনের নাইন্থ সিম্ফনি শুনুন।' কোচের স্টিরিও সিস্টেমে বেজে ওঠে সুর তরঙ্গ। আকাশ-বাতাস আচ্ছন্ন করে। কারও কথাবার্তা বলা সম্ভব রইল না। মিনিট পাঁচেক যেতে না যেতে পিছন থেকে জোর গলায় মন্তব্য, 'এনাফ, এনাফ অফ কালচার।' নীল ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে মার্কিন নারীজুটি—ম্যাগি ও ন্যান্সি। আজকাল যুগল শুধু নারী-পুরুষ নয়, সমলিঙ্গেরও হয়। মিউজিক থেমে যায়। 'এমা ডিয়ার, কোনো এক বিশেষ প্রাণীর সামনে মুক্তো ছড়াতে নেই, জানো তো।' প্রাক্তন কলোনির মানুষজনের সাংস্কৃতিক মান নিয়ে টিপ্পনী কাটে ইংরেজ হ্যারি। সবই বোঝে নীল।

বেচারা এমা। এদের নিয়ে চলা কী চাট্টিখানি কথা। কী করা। দুটি সপ্তাহ ধরে সমস্ত দিন ও প্রায় অর্ধেক রাত এক সঙ্গে যাপন। এবং সেই জন্যেই দিন তিনেকেই সবাই দিব্যি স্বচ্ছন্দ হয়ে গেল। এখন চলন্ত কোচে এমার তথ্যবহুল ধারাভাষ্য নিয়ে হাসিঠাট্টাও যেন টুরের হালকা দিক। কেউ গুরুত্ব দেয় না, এমাও গায়ে মাখে না। দেখতে না দেখতে বিশেষ অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে নীল-সহ ধূমপায়ীদের ছোটো উপদলটি। ধূমপান সব হোটেলে ও পাবলিক প্লেসে নিষিদ্ধ। তারা যেন অপরাধী, অতএব জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ, প্রতি হোটেলে তাদের জন্য নির্দিষ্ট পরিসরটিতে গল্পগুজব পরচর্চা। সর্বাগ্রে টার্গেট এমা, 'জানো, ও আসলে জার্মান, ভান করে যেন স্লোভাক', বা 'ডিভোর্সি, একটা চোদ্দ বছরের ছেলে আছে, থাকে বাপের সঙ্গে।' অস্ট্রেলিয়ার ঠোঁটকাটা পিটার ফিসফিস করে বলে, 'আমেরিকান যারা এসেছে সব নির্ঘাত ইহুদি, বাপ-মা হিটলারের গুঁতো খেয়ে ইউএসএ-তে পালিয়েছিল, ছেলেপুলেরা দেশের গল্প শুনে চাক্ষুষ করতে বেরিয়েছে।' নীলও অন্যদের সঙ্গে হিটলারের নিন্দায় যোগ দেয়। বার্লিনে ইহুদি গণহত্যার স্মারক হলোকস্ট মেমোরিয়েলে দাঁড়িয়ে সকলের মতো সেও মর্মাহত। নীরবতায় একটি দুটি কান্নাভরা অস্ফুট কাতরোক্তি। মনটা ভারী হয়ে যায়। বেরিয়ে আসতে আসতে ইংরেজ হ্যারি বলে, 'থ্যাংক গড, বর্বর নাৎসিদের হারিয়ে দিয়ে আমরা ইউরোপে মানুষের মুক্তি ফিরিয়ে আনতে পেরেছি।' নীল দেখে এমার মুখ ম্লান, কী একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল। হাঁটতে হাঁটতে অন্যদের পিছনে ফেলে নীল তাকে প্রশ্ন করে, 'তুমি হ্যারির সঙ্গে একমত নও?'

'বাস্তব ওরকম সাদাকালো নয়। নাৎসিরা জার্মান ইতিহাসে একটা অধ্যায় মাত্র। তাদের একমাত্র পরিচয় নয়।'

'জার্মানদের পক্ষ নিচ্ছ, আশ্চর্য।'

'আমার ফ্যামিলি ওরিজিনালি জার্মান। পূর্বপুরুষ এখন যাকে

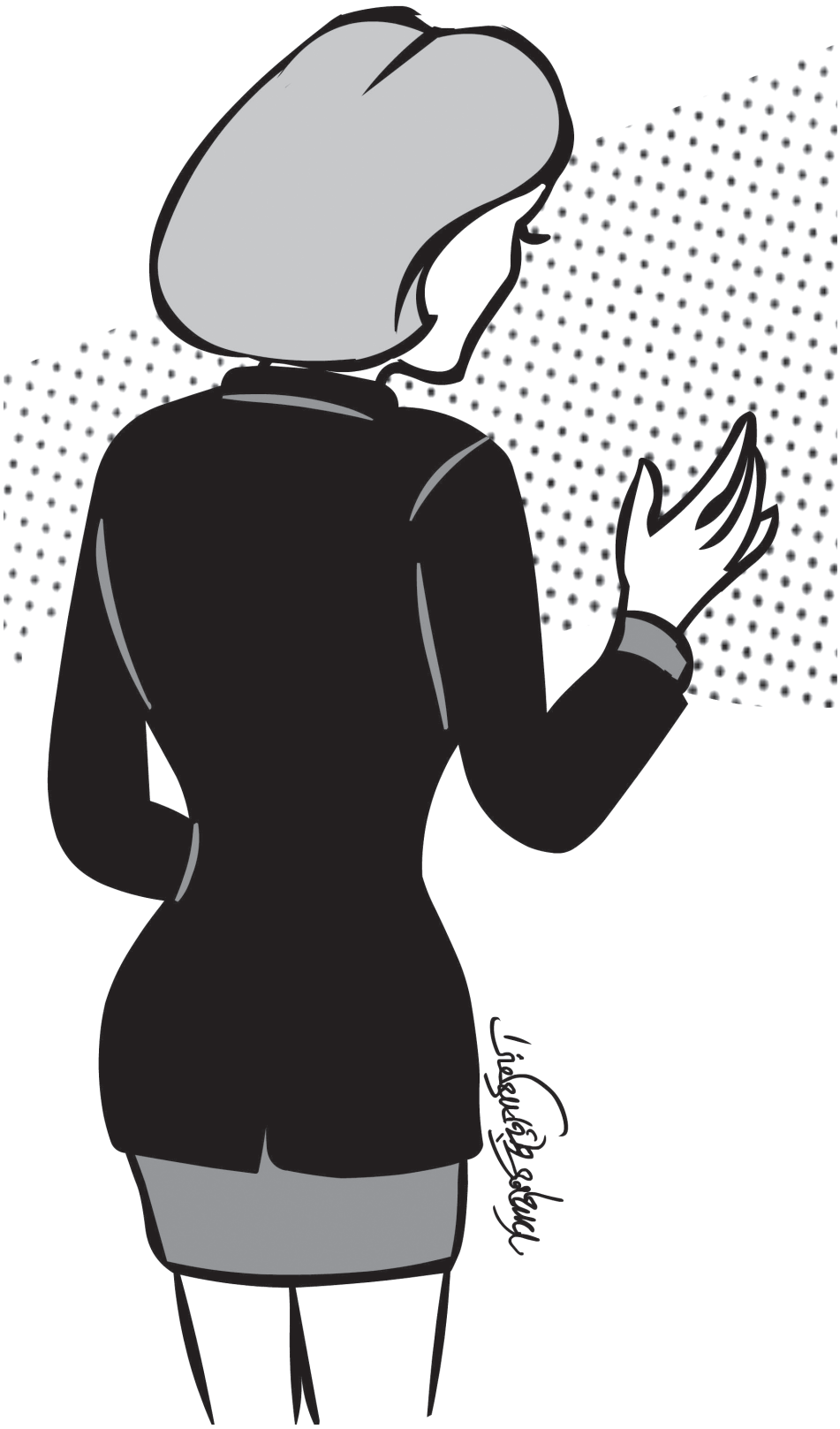

স্লোভাকিয়া বলে সেখানে এসে রয়ে গিয়েছিল।'

'স্বদেশ ছাড়লেন কেন?'

'আরে তখন স্বদেশ-বিদেশ কী? নেশান স্টেটই ছিল না। সেন্ট্রাল ইউরোপ জুড়ে একের পর এক সাম্রাজ্য, প্রথমে হোলি রোমান, তারপর হাবসবুর্গ। আর সাম্রাজ্য মানেই বিভিন্ন জাতির বসবাস। কে জার্মান, কে স্লোভাক, কে বোহেমিয়ান, মানে এখন যারা চেক, কিছু এসে যেত না।'

'লোকাল লোকেদের সঙ্গে সম্পর্ক কেমন ছিল?'

'নো প্রবলেম। লোকাল, আউটসাইডার ব্যাপারটাই ছিল না। তাছাড়া জার্মানরা করিয়ে কম্মে ছিল বলে সর্বত্র সম্মান পেত। ঠাকুর্দা ঠাকুরমার মুখে শুনেছি। স্লোভাকদের সঙ্গে আমরা মিলে মিশে ছিলাম। তাই প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পর সাম্রাজ্য, মানে হাবসবুর্গ শাসন খতম হয়ে গেলে তারা যখন চেকদের সঙ্গে একজোট হয়ে চেকোস্লোভাকিয়া গঠন করল, আমরাও খুশি ছিলাম। খুব উন্নতিও হলো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মানির দখলে গেল। যুদ্ধের শেষে দেশটা সোভিয়েতের অধীনে, কমিউনিস্টদের কবজায়। ঠাকুর্দা ঠাকুরমার মতো লোকেরা হয়ে গেলেন স্টেটের শত্রু। অথচ ওঁরা আদৌ নাৎসি সমর্থক ছিলেন না, বরং ছিলেন পার্টিজ্যান, মানে জার্মান আগ্রাসন বিরোধী সশস্ত্র বিদ্রোহীদের সাপোর্টার। এখন জার্মান মানেই প্রাক্তন নাৎসি। বাবা-মা কলঙ্ক মাথায় নিয়ে বড়ো হলেন। টানাটানির জীবন। দুজনের উদয়াস্ত খাটুনি সত্ত্বেও। এই পরিস্থিতিতেই আমরা দুই ভাই-বোন জন্মাই। একদা গর্বিত জার্মান মধ্যবিত্ত ফ্যামিলি নয়া জমানায় হয়ে গেলেন নিম্নবিত্ত।

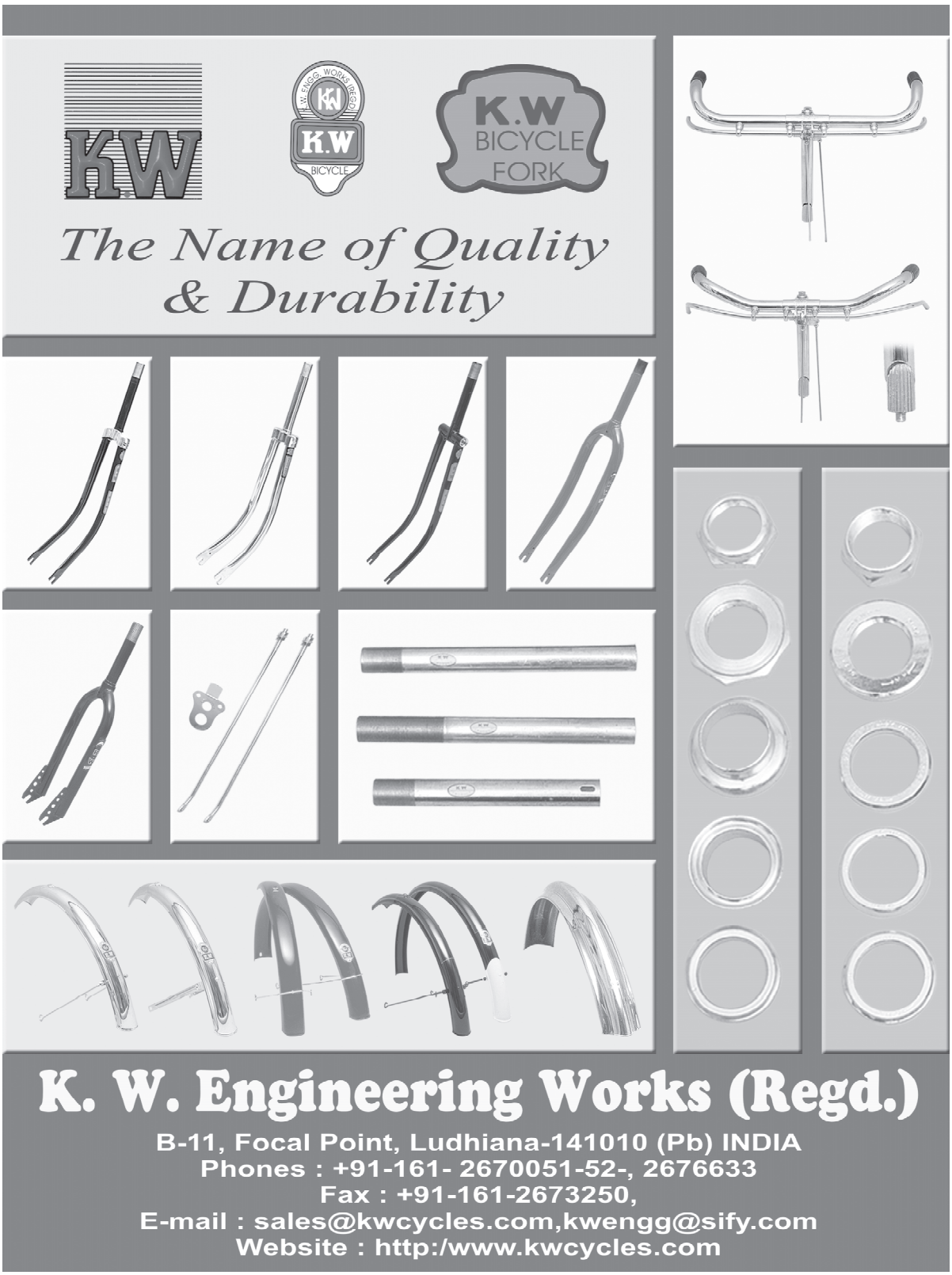
KW
K.W
BICYCLE
K.W
BICYCLE
FORK
The Name of Quality
& Durability
K. W. Engineering Works (Regd.)
B-11, Focal Point, Ludhiana-141010 (Pb) INDIA
Phones : +91-161- 2670051-52-, 2676633
Fax : +91-161-2673250,
E-mail : sales@kwcycles.com,kwengg@sify.com
Website : http:/www.kwcycles.com

নিজেদের আর জার্মান বলতেন না। তবুও ছিলেন নজরবন্দি।'

'তাঁরা তো সাধারণ মানুষ। তবু স্টেটের নজরদারি।'

'জন্ম থেকেই দেখতাম বাড়িতে আইভান আর দিমিত্রি নামে দুজন আংকল নিয়মিত আসতেন। বাবা মা কাজে গেলে আমাদের মানে ছোটোদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতেন, যেন বেবিসিটার। পড়াশোনা খেলাধুলা নিয়ে গল্প করতেন, উপদেশ দিতেন, হাসিঠাট্টা চলত। নিকট আত্মীয়ের মতো। খালি দেখতাম বাবা মা পারলে তাঁদের এড়িয়ে চলেন। রাতে শোয়ার সময় ছাড়া ফ্যামিলির নিজেদের মধ্যে একান্তে বাক্যালাপ বলতে গেলে সম্ভবই ছিল না। এই যা! অনেক বকবক করে ফেললাম। তুমি বোরড হচ্ছ বোধহয়।'

'না না, মোটেই নয়। জানো আমাদের দেশে যুদ্ধ ছাড়াই লক্ষ লক্ষ মানুষের ভাগ্যে বিপর্যয় ঘটেছিল। দেশটা ভাগ হয়েছিল তো....।'

'রিয়েলি? পরে একদিন শুনব। চল সবাই এসে গেছে।'

কোচে উঠে টুরিস্টরা একে একে বসলে এমা যথারীতি মাথা গোনে, সবাই হাজির তো।

সারা সকাল বার্লিনের দ্রষ্টব্য ঘুরে দেখে দুপুরে যে যার মতো হালকা লাঞ্চ খেতে যাচ্ছে। খাওয়ার পর ৩৬ কিমি দূর একদা কাইজারের গ্রীষ্মাবাস পটসডাম দেখার প্রোগ্রাম। এদিকে নীল তো পাকা টুরিস্ট, বার্লিনে আরও কী দেখলে ভালো হয় আগেভাগে ভেবে রেখেছে। কোচ থেকে নেমেই এমাকে বলে, 'আচ্ছা পেরগামন মিউজিয়ামটা কতদূর? ওখানে বিশ্বে সবচেয়ে বড়ো গ্রিক দেবরাজের বেদি রয়েছে যা খোদ গ্রিসেও নেই। রয়েছে ব্যাবিলনের দেবীর ফটক—, 'তার কথা শেষ হতে না হতে এমা সোৎসাহে বলে, 'যাবে? আমারও বরাবর ওটা দেখার ইচ্ছে, একা একা হয়ে ওঠেনি। কিন্তু তোমার লাঞ্চ কী হবে?'

'আরে গুলি মারো লাঞ্চ, খাই তো প্রতিদিন, কিন্তু পেরগামন দেখার সুযোগ জীবনে যদি আর না পাই?'

'বার্লিনের পথঘাট জানা লোক দরকার। চল, মার্কোকে ধরি। এ শহরে ও অনেকদিন গাড়ি চালিয়েছে।' কোচের সারথী মার্কোকে ভজিয়ে তিনজনে দল থেকে টুক করে আলাদা হয়ে প্রায় দৌড়তে দৌড়তে পাবলিক বাস ধরে পৌঁছায় মিউজিয়ামে। খুশিতে এমার মুখ ঝলমল করছে, যেন মন্ত্রবলে তার ব্যক্তিত্বই পালটে গেছে। দেবরাজের বিশাল শ্বেতপাথরে বেদির ইতিহাস, তার স্তম্ভগুলির অপরূপ কারুকার্যের বিশ্লেষণ করতে থাকে, দেখায় ব্যাবিলনের দেবী এস্থারের শোভাযাত্রার বর্ণময় ফটক আর বাহন সিংহের অপূর্ব ঝলমলে চিত্র।

'খ্রিস্টজন্মের বহু কাল আগের প্রাচীন শিল্পকলা। ভাবা যায়?'

'সবই সাকারবাদীদের কীর্তি, খেয়াল আছে তো,' ঠাট্টার সুরে নীল মনে করায়।

'সত্যি, তোমরা প্রতিমাপূজারিরা বিশ্বে সভ্যতা সৃষ্টি করেছিলে, মানতেই হয়'—স্মিত উত্তর এমার। এদিকে মার্কো তাড়া দিচ্ছে। ট্যাক্সি নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে অকুস্থলে ফেরা। 'আরে তোমরা কোথায় ছিলে?' 'এইতো আশে পাশে।' নীল আর এমা চোখ চাওয়াচায়ি করে।

এমন খোলামেলা এমাকে আর পায় না নীল। গাড়িতে বসে ধারাভাষ্য দেওয়া ছাড়া টুরিস্টদের ঘর ঠিক করা, মালপত্র নামিয়ে প্রত্যেককে পৌঁছানো, আবার পরের যাত্রার সময় হিসেব করে সব কোচে ওঠানো, দর্শনীয় স্থানে প্রয়োজনে সকলের টিকিট কাটা, রাতে বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগ দেবার চাঁদা তোলা ও সেখানে যাতায়াতের বন্দোবস্ত করা ইত্যাদি ভ্রমণের পুঙ্খানুপুঙ্খ দায়িত্বের ভারে বেচারা পিষ্ট। তার সঙ্গে একান্ত মেলামেশা দূরস্থান, সাধারণ সামাজিকতারও বিশেষ সুযোগ নেই। প্রথমে সন্ধ্যায় বার্লিনের রেস্তরাঁয় এমাকে বিয়ার অফার করে প্রত্যাখ্যাত হয়ে নীল ঠাট্টা করেছিল, 'এত বড়ো দল নিয়ে এসেছ,তোমার তো স্পেশাল খাতির নিশ্চয়ই ।'

'ঠিক। তোমাদের জন্য জার্মান বিয়র, আর আমার জন্য ফ্রেঞ্চ শ্যাম্পেন।' এমা তাল মিলিয়েছে। তবু কেন কে জানে রাতে গুড নাইট করার সময় দুজনের কথা হয়। এর মধ্যে পরস্পরের পারিবারিক স্থিতি জানা হয়ে গেছে। বিবাহবিচ্ছেদ ও একাকিত্বের অভিজ্ঞতা যেন জাতি-ধর্ম-ভাষার ব্যবধান পেরিয়ে একটা সেতু। হয়তো সম্পর্ক সাময়িক বলেই দূরত্ব অনায়াসে অতিক্রম্য। 'লিয়ামকে ফোন করেছিল এমা? সে এখন কোথায়, তার বাবার কাছে নাকি তোমার? বলছিলে না দাদু দিদিমার কাছে ছুটির সময় তার আসা চাই।' বা 'নীল, দেশে বাবা-মায়ের খোঁজ নিয়েছ? তোমরা ভারতীয়রা তো খুব ফ্যামিলি মাইন্ডেড।'

'তার চেয়েও বেশি মানিমাইন্ডেড। আমাদের কারেন্সিতে এখান থেকে কলকাতায় ফোনের যা খরচ, এমার্জেন্সি ছাড়া স্পিকটি নট।'

ইউরোপে ভিন্ন দেশ হলেও প্রায়শ ভৌগোলিক পরিস্থিতি কাছাকাছি। এমার পক্ষে বাবা-মায়ের খোঁজ নেওয়া সম্ভব, দুজনেই অসুস্থ তাই বেশি রাতে ফোন করে না। 'জানো মা আর্থ্রাইটিসে বড্ড কাবু' বা, 'বাবার হার্টের অবস্থা ভালো নয়।'

জার্মানির প্রথম পর্যায়ের দর্শন সেরে রাতে বিদায়ের সময় এমার বিষণ্ণ মুখ দেখে নীল প্রশ্ন করে, 'কী ব্যাপার?

'কাল থেকে পোলান্ড শুরু।'

'তো?'

'দেশটা দেখবে, ইতিহাস শুনবে। পরে কথা হবে।'

পোলদের ইতিহাস বড়ো করুণ, বেচারিরা বরাবর দাপুটে প্রতিবেশীদের হাতে মার খায়। তাই সব স্মারকই প্রতিরোধ আর বিদ্রোহের। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাজধানী ওয়ারশ শহর মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছিল জার্মানরা। ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল পোলিশ জাতির গৌরবপ্রতীক সংগীতকার শোপ্যাঁর মূর্তি। আত্মসাৎ করেছিল পোলদের জ্ঞানবিজ্ঞান। ওয়ারশ'র ইহুদি বস্তি বা ঘেটো ছিল নাৎসি সাম্রাজ্যে বৃহত্তম, তার নির্মম বিলুপ্তি ইতিহাস হয়ে গেছে। কী করেনি জার্মানরা। এখন সবই দর্শনীয় টুরিস্ট সাইট মাত্র, বিদেশিদের প্রতিক্রিয়া তাৎক্ষণিক, ইশ আহা। হোটেলে ফিরে ডিনারের জন্য পোশাক বদলে রাতের প্রোগ্রামে। রেস্তরাঁয় ঢোকার সময় লোকায়ত সাজে সজ্জিতা সুন্দরীরা প্রত্যেকের হাতে ধরিয়ে দেয় বুড়ো আঙ্গুল সমান গ্লাসে ভদকা, নুন আর টুকরো পাউরুটি। অর্থাৎ খাঁটি পোলিশ রীতির অভ্যর্থনা। অন্যদের মতো নীলকেও এমা বলে দিয়েছিল, 'খাও-না-খাও হাতে করে নিয়ে টেবিলে চলে যেও, নইলে অভদ্রতা হবে।' অতঃপর নারী-পুরুষের বর্ণময় পোলিশ লোকনৃত্য পোলোনেইজ উপভোগ, একের পর এক অজানা নামের সব বিচিত্র পদ আস্বাদন, সঙ্গে অপর্যাপ্ত রেড ওয়াইন। ভুরিভোজের শেষে সাহেব-মেমদের সামলেসুমলে কোচে তুলে হোটেলে নামানোয় এমা ব্যস্ত। সকলের মধ্যেই তাকে সে রাতে বিদায় জানাতে বাধ্য হয় নীল।

সত্যি কথা বলতে কী আজ আর তার সঙ্গে একান্ত কথাবার্তায় আগ্রহ ছিল না, একটু বাধোবাধো লাগছিল। তার জার্মানত্ব যেন পোল্যান্ডে তাদের দুজনের মধ্যে একটা অদৃশ্য পাঁচিল তুলে দিয়েছে। পরের ক'টা দিন সেটা প্রায় অলঙ্ঘনীয় হয়ে ওঠে। বিশেষ করে যেদিন আউসুইৎজ কনসেন্ট্রেশান ক্যাম্পের বিশাল এবং বিস্তারিত নিধন যজ্ঞের বন্দোবস্ত দেখতে হলো, দেখতে হলো চোখের সামনে নিহত নারী-পুরুষ-শিশুদের চিহ্ন, ভাঙা চশমা কী ছেঁড়া পুতুল, সেদিন পুরো দলের সঙ্গে নীলও মানসিকভাবে বিধ্বস্ত। পৃথিবীর সব স্বাদ গন্ধ যেন হারিয়ে গেছে। রাতে সমবেত ডিনারে সকলে নীরব। অতঃপর স্মোক করে ফেরার সময় ধূমপায়ী ছোটো দলটিকে লিফটের কাছে বিদায় জানিয়ে তার গ্রাউন্ড ফ্লোরের ঘরের দিকে যেতে যেতে দেখে প্রায় ফাঁকা হয়ে আসা লবির এক কোণে এমা বসে। সে এগিয়ে আসতেই বলে, 'জানো প্রতিবার এখানে এলে মনে হয় আর পারছি না, কোম্পানিকে রিকোয়েস্ট করি আমাকে অন্য কোনো টুর প্যাকেজের দায়িত্ব দিতে। সেন্ট্রাল ইউরোপে প্রতি পদে জার্মান হিসেবে নিজেকে অপরাধী মনে হয়।'

নীল আশ্বস্ত করে, 'পোল্যান্ড এক্সেপশানাল, এর পর জার্মানির মিত্র দেশ হাঙ্গেরিতে যাবো, নো প্রবলেম।'

'হু! মিত্রদেশ। জানো তো দ্যানিউব নদীর এক দিকে বুদা আর অন্যদিকে পেস্ট মিলে রাজধানী বুদাপেস্ট। একের পর এক সেতু দিয়ে যুক্ত। দেখতে গিয়ে শুনবে নাৎসিরা হেরে পিছিয়ে যাওয়ার সময় সে সব সেতু ধ্বংস করে দিয়ে যায়।

বন্ধুত্বের নমুনা! তাই আমার বাবা-মা, ঠুকর্দা-ঠাকুরমা তো হিটলারকে জার্মানই গণ্য করতেন না, সর্বদা 'হতচ্ছাড়া অস্ট্রিয়ান' বলে উল্লেখ করতেন।'

'কিছু মনে কর না, হিটলার একা সব কিছুর জন্য দায়ী কি? জার্মানরা তো শুধু জার্মানি নামে স্টেটেরই লোক নয়, সারা মধ্য ইউরোপ জুড়ে বিশাল সংখ্যায় ছড়িয়ে আছে। অস্ট্রিয়া পুরো জার্মান, ভিয়েনায় তো সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় জার্মানভাষীর বাস ছিল। এছাড়া চেকোস্লোভাকিয়ায়, পোল্যান্ডে, সুইৎজারল্যান্ডে সময় থেকে তারা আগ্রাসী, মারকুটে। জার্মান উপজাতিরা সভ্য গ্রিক রোমানদের চোখে ছিল বর্বর বা বারবেরিয়ান। আর ইহুদি বিদ্বেষ তো শুধু হিটলারের একার মানসিক অসুখ নয়, ইউরোপে বরাবর ছিল।' উত্তেজিত নীল ছোটোখাটো ভাষণ দিয়ে ফেলে।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে এমা আস্তে আস্তে বলে, 'তুমিও কি আমাকে শুধুমাত্র বর্বর জার্মান হিসেবে দেখ?' তার মুখ বিষাদম্লান, গুটিসুটি মারা দেহের ভঙ্গিতে যেন অপরিসীম লজ্জা। মায়া হয় নীলের, অনুতাপও।

'আরে দূর, পাগল নাকি!' এমার হাতের ওপর হাত রাখে, 'জার্মান হওয়াটা কি একমাত্র পরিচয়? তুমি একটি আধুনিক মেয়ে, আর পাঁচ জনের মতো উদয়াস্ত পরিশ্রম করে রোজগার করছ। ছেলে মানুষ করছ, বাবা মাকে দেখছ, ঠিক আমাদেরই মতো। দলের সবাই তোমাকে খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করে।'

'রিয়েলি? সত্যি বলছ?'

'শুধু কি এফিসিয়েন্সি? এত রকম লোকের হাজারটা বায়নাক্কা তুমি হাসিমুখে বরদাস্ত কর। আমি হলে তো কতবার মেজাজ খারাপ করে ফেলতাম।'

'টুরিস্ট গ্রুপ হচ্ছে একটা পরিবার, সকলের মন মেজাজ বুঝে চলতে হয়।'

'আর তুমি হচ্ছ তার হেড, তাই তো?' মাথা হেলায় এমা। এখন মুখে মৃদু হাসি। 'গুড নাইট', 'গুড নাইট।'

ইউরোপের আবহাওয়ার কোনো মাথামুণ্ডু নেই। এই ঝাঁ ঝাঁ রোদ, এই ঝম ঝম বৃষ্টি। বুদাপেস্টে ঘোরার সময় হঠাৎ এক পশলা রীতিমতো প্রবল বর্ষণ। এমা সবাইকে নিরাপদ জায়গায় নিতে গিয়ে নিজে ভিজে কাক। পরদিন তার গলা বন্ধ, নাক দিয়ে অঝোরে জল, জ্বর, মাথায় যন্ত্রণা। শুধু নীল নয়, দলের সবাই সমবেদনা জানিয়ে উপদেশ দেয়, রেস্ট নাও। সে উপায় নেই। তাকে টুর চালিয়ে যেতেই হবে। নীল হলো ভলান্টিয়ার, 'কী করতে হবে আমাকে বল।' তার ধারাভাষ্যের নোট দেখে দেখে গুছিয়ে মাইকে বলে যায় পরের দর্শনীয় দেশ, একাধিক সাম্রাজ্যের কেন্দ্র অস্ট্রিয়ার ইতিহাস এবং রাজধানী ভিয়েনার মনন ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য। সেখানে পৌঁছে মালপত্র নামানো থেকে যাত্রীদের ঘর বাছাই, সন্ধ্যায় ফ্রি টাইম সদ্ব্যবহারের নানা পরামর্শ এবং পরদিন ভিয়েনা সিটি টুর সম্বন্ধে অগ্রিম বার্তা, সবই মার্কোর সাহায্যে নীল চালিয়ে দেয়। খোঁজ নেয় এমার সঙ্গে এমার্জেন্সি ওষুধ আছে কিনা, খেয়েছে?

'আচ্ছা যদি কোনো ডিরেক্টর টুরের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়ে—', নীল শেষ করার আগেই এমা সজোরে মাথা নাড়ে, বন্ধ গলায় ফিসফিস করে জানায় তেমনটা হতেই পারে না।

'কী আশ্চর্য, মানুষের শরীর বলে কথা। হতে পারে না মানে?'

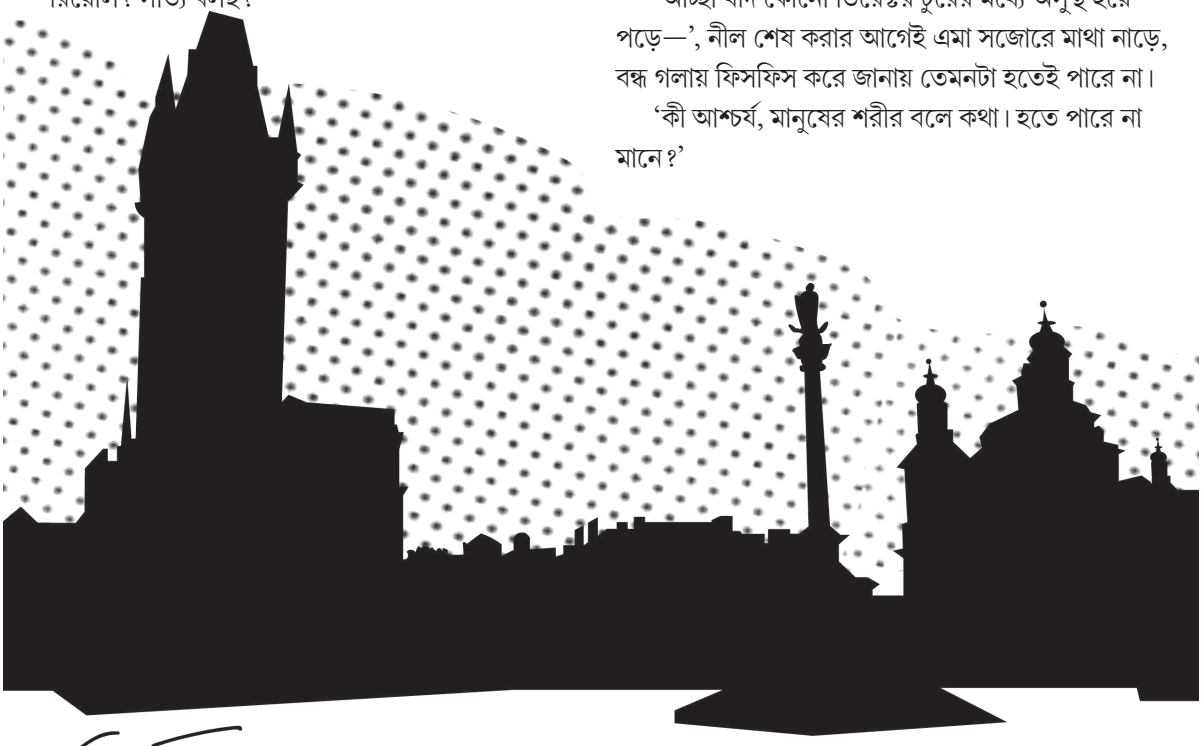

'ট্র্যাভেল এজেন্সি এক্সপেক্ট করে টুর ডিরেক্টরের শরীর হবে লোহার।'

যে সব বিলিত কোম্পানির ওষুধ আমাদের দেশেও পাওয়া যায়, সেই এক কোম্পানির এক ওষুধ কিন্তু ওদেশে অনেক বেশি কাজ দেয়। সবিস্ময়ে নীল দেখে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এমা প্রায় স্বাভাবিক। সকালে কোচে তার হাতে মাইক দেখেই সমস্বরে 'ওয়েলকাম'।

ভ্রমণসূচির একটা পর্যায়ে স্লোভাকিয়ার মধ্যে দিয়ে যাত্রাপথ। চমৎকার ঘন সবুজ নিবিড় বনানী, মাঝে মধ্যে ছোট্ট ছোট্ট কাঠের কুঁড়ে ঘর, শহুরেদের সপ্তাহান্তে ছুটি কাটাবার ক্যাবিন। সকলের এক বাক্যে তারিফ – 'বাহ্, এমা তোমার দেশটা কী সুন্দর।'

'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে চেকোস্লোভাকিয়া সোভিয়েটের দখলে ছিল। ১৯৮৯ সালে কমিউনিস্টদের দেশ থেকে তাড়ালাম, মারামারি হানাহানি ছাড়া। সকলে খুব ধন্যি ধন্যি করল রক্তপাতহীন মখমল বিপ্লব। এবার চেকদের সঙ্গে স্লোভাকদের খুব ভদ্রভাবে ছাড়াছাড়ি। মখমল বিচ্ছেদ, আবার হাততালি। সম্পত্তি ভাগাভাগিতে দেখা গেল সব কলকারখানা ইন্ডাস্ট্রি চেকদের ভাগে আর আমাদের মানে স্লোভাকিয়ার প্রাপ্য শুধু প্রকৃতি, বনজঙ্গল, পাহাড়পর্বত নদীনালা।'

সকলে হেসে এমার ঠাট্টা উপভোগ করে, তার তিক্ততারও ছোঁয়া পায়। রাতে গুডনাইট করার সময় নীল জিজ্ঞাসা করে, 'তোমার সেই আইভান আর দিমিত্রি আংকলদের কী হলো?'

'যেদিন সোভিয়েট আর্মি স্লোভাকিয়া ছাড়ল তার পরদিন থেকে আংকলরা বেপাত্তা। স্রেফ হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। এত বছরের সম্পর্ক, অথচ একটা গুডবাই পর্যন্ত বলে গেল না। আমরা ওদের খুব ন্যাওটা ছিলাম, বিশেষত ছোটো ভাইটা।'

'সব ভালো যার শেষ ভালো। তোমরা এখন ইউরোপীয় ইউনিয়নে। এত বড়ো কোম্পানিতে তুমি কাজ কর। সেটা কম কথা নয়।'

'বটেই তো।' ম্লান হাসি এমার মুখে।

'তবে তুমিতো টুরের সময় দু'সপ্তাহ ধরে ২৪ ঘণ্টা ডিউটি কর। তারপর কি বাড়ি যাও, ফ্যামিলির সঙ্গে সময় কাটাও?"

মাথা নাড়ে এমা, না, সে প্রশ্নই ওঠে না। এপ্রিল থেকে নভেম্বর টুরিস্ট মরসুম। এর মধ্যে কোনো ফাঁক নেই, ছুটি নিয়ে বাড়ি যাওয়া সম্ভবপরই নয়।

নীল অবাক। এই তো সেদিন দেখে মার্কোর বদলে অন্য সারথী। এমা জানায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের নিয়ম অনুযায়ী দৈনিক বাঁধাধরা কাজের ঘণ্টা এবং সপ্তাহে একদিন ছুটি মার্কোর প্রাপ্য। তাই সেদিন তার বিশ্রাম, ভাড়া করা ড্রাইভার ডিউটি করবে। অথচ টুর ডিরেক্টরের কাজের সময়ের হিসেব নেই, নেই ছুটি। নীলের ধূমপায়ী দলটি আলোচনা করে, এমার এমন চাকরির জন্যই বেচারার বিয়েটা টেকেনি । একমাত্র সন্তান ছেলেকেও তাই কাছে রাখতে অপরাগ।

নীল মুখে বলে না, মনে মনে ভাবে, তবু তো তার একটা সন্তান আছে, মোবাইলে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে পারে। রোজ রাতে স্কিনে সামনাসামনি দেখা হয়, কথা হয়। ডিসেম্বর থেকে মার্চ চারমাস মা-ছেলে একসঙ্গে। নীলের তো সে সব বালাই-ই নেই। ও আর মন্দিরা দুজনেই ছিল আইটি প্রফেশনাল, দৈনিক বারোচোদ্দ ঘণ্টা কাজ, অনেক সময় সারা রাত কারণ আমেরিকার দিন মানে আমাদের রাত। সপ্তাহান্তে একত্র দুটি ক্লান্ত প্রাণ, শ্রান্ত শরীর। তখন বিশ্রামই শুধু কাম্য। ক্রমে তাদের নিষ্ফলা সম্পর্ক হয়ে যায় অর্থহীন। অতঃপর নীল একা। ছুটির দিনে ঘুমোয় আর পুরনো হলিউডের ফিল্ম ডাউনলোড করে দেখে।

তাই চেক রাজধানী প্রাগ পরিদর্শনের সময় এমা যখন শহরটিকে ক্ল্যাসিক ওয়ার মুভি অপারেশান ডে ব্রেকের ঘটনাস্থল হিসেবে উল্লেখ করল, তখন জার্মানির চেকোস্লোভাকিয়া দখল ও চেকদের প্রতিরোধের পুরো চিত্রটি নীলের চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে ওঠে। সত্য কাহিনি অবলম্বনে অসামান্য ছায়াছবি। তার মনে পড়ে যায় ফিল্মে জার্মান নাৎসি শাসককে খতম করতে চেক তরুণদের জীবন বলিদান; তাদের এক জনের স্থানীয় লড়াকু তরুণীর সঙ্গে প্রেম, যে প্রেম ক্ষণস্থায়ী, তীব্র, ট্র্যাজিক। আমাদের পাঁচাপাঁচি বাস্তবের নিশ্চিন্ত জীবনে অনুভূতিও তীব্র হয় না।

সেদিন রাতে চেক সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় রেস্তরাঁর ছোট্ট মঞ্চে চলেছে জাতীয় নৃত্য পোলকা। অনুষ্ঠান পরিচালিকা সযত্নে পোলকার প্রাথমিক ক'টি স্টেপ বোঝান, যেখানে সমবেত বিভিন্ন দেশের অতিথিদের আহ্বান করেন নাচে যোগ দিতে। ইতস্তত হাস্যরব, কেউ ওঠে না। তিনি নিজেই তাঁদের মধ্যে থেকে কয়েকটি যুগলকে বাছেন। হয়তো একমাত্র অশ্বেতাঙ্গ বলেই নীলকে হাত ধরে তুলে নিয়ে যান। নীলের প্রতিবাদ, 'আমি নাচই জানি না, তাছাড়া আমি একলা'। এক কোণ থেকে এমার গলা, 'যাও যাও জুড়ি পেয়ে যাবে'। কিন্তু না, রেস্তরাঁয় আর একাকী নারী নেই। পরিচালিকা খপ করে এমার হাত ধরেন, 'ফর এ চেঞ্জ তুমিই পার্টনার হও। তুমি না এলে বেচারার নাচই হবে না।' এমার আপত্তি অগ্রাহ্য করে দুজনকে স্টেজে তুলে দেন মহিলা। বাজনা বেজে ওঠে, আলো পড়ে মঞ্চে। সমবেত স্রোতের টানে তারাও ভেসে যায়। বাকি যুগলদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নীল ও এমা দিব্যি এক দুই তিন করে স্টেপ নেয়। নাচের মধ্যে কখনো এমার সঙ্গে নীলের হাতে হাত, দুটি মুখ কাছাকাছি। ভেসে আসে সুগন্ধীর মৃদু স্পর্শ, বিলিতি কোনো ফুলের হালকা সুবাস। এমার স্মিত মুখে প্রসন্নতা, কোনো জাদুদণ্ডের ছোঁয়ায় তার ভুরু দুটোর মধ্যে উঁচিয়ে থাকা

চিন্তার রেখা অদৃশ্য, নির্ভাজ চোখের প্রান্ত, ঠোঁটের কোণ। দিনের বেলা পনিটেলে আঁট করে বাঁধা চুল এখন ছড়ানো, কপালে, গালের দু'পাশে নেমে এসেছে। শেষ যৌবনের মাধুর্য মাখানো মুখখানা যেন উন্মুখ। কয়েক মিনিট মাত্র। পোলকা মেইড ইজি শেষ। প্রচুর হাততালি, বলাবাহুল্য অপেশাদারদের চেষ্টার সমাদর। মঞ্চ থেকে নেমে যে যার টেবিলে ফিরে যায়। নীলের টেবিল সঙ্গী বয়স্ক মার্কিন দম্পতি ফ্রেড ও মেরি বাহবা দেন। মেরি আবার মন্তব্য করেন, 'নীল, তুমি আর এমা সত্যি মেইড ফর ইচ আদার। চমৎকার জুটি।' সে রাতে দুজনে দূর থেকে পরস্পরকে হাত নেড়ে বিদায় জানায়।

তারপর থেকে কেমন যেন একটা সঙ্কোচ গ্রাস করে দুজনকে। এ ক'দিনের মতো আর ঘুরতে ফিরতে পরস্পরের একান্ত সংস্পর্শে আসে না। যেন এড়িয়ে যায়। রাতে সকলের মধ্যে গুডনাইট। ভ্রমণসূচির অন্তিম পর্যায়ে আবার জার্মানি। মিউনিখে কোথায় থাকল, কী দেখল না দেখল, যেন আবছা ছবি। নীলের মনে শুধু বিদায়ের ঘণ্টা বাজছে। ফ্র্যাংকফুর্টে ফেরার পথে বিখ্যাত রোমান্টিক রোডের ছোট্ট শহরগুলি অপরূপ। একটিতে উৎসবে সাজসজ্জায় পুরো মধ্যযুগীয় আবহ। অন্যরা উপভোগ করে। নীলের মনে কিছুই দাগ কাটে না।

ফ্র্যাংকফুর্টে পৌঁছে দেখে এবারে অন্য হোটেল এবং এটি এয়ারপোর্ট থেকে বহুদূরে। আসার সময় নীলের মতো অনেক টুরিস্টই নিজেরা ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে পৌঁছেছিল। ভ্রমণ সংস্থার ব্যবস্থাপনায় বাড়তি খরচে এয়ারপোর্ট থেকে যাতায়াত দরকার বোধ করেনি। কিন্তু ফেরার সময় দূরত্ব দেখে সকলে এমাকে ধরে পড়ে, গাড়ি চাই। সারাদিনে দুবার কোচের আয়োজন হলো। সকালে ও দুপুরে দুটো ট্রিপ। নীল সেকেন্ড ট্রিপে। কোচে উঠে পিছনে এক কোণে বসে পড়ে। মনটা তার অসাড়। কলের পুতুলের মতো সংস্থার দেওয়া বিশাল ফর্মে ভ্রমণের ভালোমন্দের রিপোর্ট লিখে সকলের সঙ্গে এমার হাতে জমা দিয়েছে, নিয়েছে প্রত্যেকের মেইল আইডি লেখা কাগজের কপি। বিদায়ের আনুষ্ঠানিক পালা শেষ।

বাস ভরতি হয়ে যায়। স্টার্ট করে। কেউই বিশেষ কথা বলে না। টানা দু'সপ্তাহ ধরে হাজারহাজার মাইল ঘোরাঘুরির ক্লান্তি গ্রাস করে। এয়ারপোর্টে পৌঁছে এমিরেটসের ফ্লাইট ধরতে দু'নম্বর টার্মিনালের দিকে যেতে গিয়ে নীল বিস্মিত হয়ে দেখে এমা ড্রাইভারের পাশের আসন থেকে নামল।

'আমাদের পৌঁছাতে তোমার নিজের আসার কোনো দরকার ছিল না। একটা বেলা রেস্ট নিতে পারতে।'

এমা এগিয়ে আসে, 'তোমাদের পৌঁছাতে আসিনি। নেক্সট টুরিস্ট ব্যাচকে ওয়েলকাম করতে এসেছি। কাল থেকে ওদের শুরু। 'তার ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি, দুচোখে গভীর বিষাদ।

'হ্যাভ আ সেইফ জার্নি, নীল।'

'অল দ্য বেস্ট, এমা।' ■

NAVYUG®
COGGED, VEE & POLY BELTS

Environmental Friendly
ISO 14001 : 2015 Certify Unit

NAVYUG

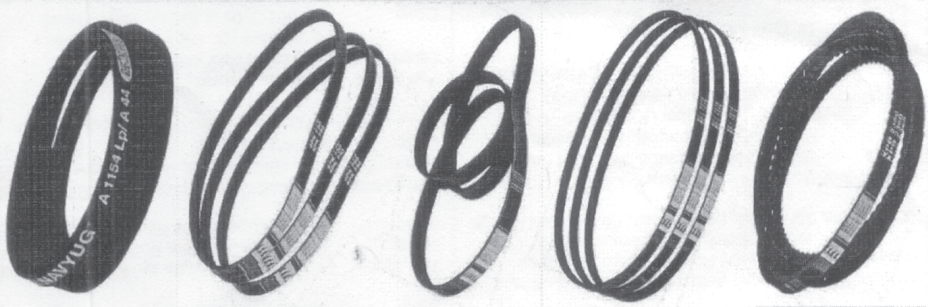

RECOGNISED STAR EXPORT HOUSE BY GOVT. OF INDIA

Manufacturers & Exporters of : Vee, Cogged & Poly Belts
For Industrial & Automotive Application

Winners of Export Excellence Awards from AIRIA & CAPEXIL

Supplies to OEMs, Railways, STUs, ASRTU, BHEL etc.

ACCREDITED
Management System
Certification
MSCB-119

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT
IAF

IS : 2494
ISI
CM/L NO. 9065679

BSCIC Certifications
BSCIC
Private Limited.
ISO 9001:2008

NAVYUG (INDIA) LIMITED

G.T. ROAD, BYE-PASS, JALANDHAR-144 009 (PB.)
Phones : 0181-4299900/ 01/ 02/ 2420551
E-mail : info@navyugbelts.com Website : navyugbelts.com

রামকৃষ্ণ মিশন, ঢাকা

আমাদেরই বাংলা রে....

কুণাল চট্টোপাধ্যায়

হঠাৎ ঢাকায়...

নেহাত ঠেকায় না পড়লে চেতলার লোক কাশীপুরে কিংবা দমদমের কেউ গড়িয়ায় যায় না। দূরত্ব আর একটু বাড়ালে কলকাতার লোকের কাছে উত্তরবঙ্গ মানেই শিলিগুড়ি ছুঁয়ে দার্জিলিং যাওয়া। বৈকুণ্ঠপুরকে জানতে বয়েই গেছে। এই যখন অবস্থা তখন প্রতিবেশী বাংলাদেশ সম্পর্কে আগ্রহ জাগবার প্রশ্নই আসে না। পাসপোর্টের হ্যাপা কে সামলাবে?

ধরে নেওয়া যাক, পুজোয় একজোড়া জামা প্যান্ট কিংবা একটা শাড়ি কম কিনে পাসপোর্ট করে ফেললেন। তাহলে তো আপনি আন্তর্জাতিক নাগরিক। তার ওপর, যখন দাউদ ইব্রাহিম নন, বেকবাগানের বাংলাদেশ হাইকমিশন আপনাকে বিনা পয়সায় ভিসা দিতে তৈরি। তবে মাত্র পনেরো দিনের জন্য। তারপর শ্যামলী- সৌহার্দ্যে (বাংলাদেশের বাসের নাম শ্যামলী, আমাদের দেশের বাসের নাম

With Best Compliments from-

KOHINOOR INDIA (P) LIMITED

Basti Bawa Khel, Kapurthala Road,
Jalandhar - 21 (Pb.) India
Phone : (O) 3050052, 3050057, 3050066
Fax : +91-181-3050014
E-mail : nipun@kohinooronline.com
Web : www.kohinooronline.com

ANOOPAM

METAL INDUSTRIES

ISO 9001-2000 Certified

An ISO 9001 : 2015 Certified Company

Manufacters & Exporters of :

CYCLE PARTS & AIMEX BRAND ALLEN BOLTS-NUTS, GRUB SCREW & TURNING PARTS

B-6, Textile Colony, Industrial Area A, Ludhiana - 141 003 (India)
Tel. (O) : 0161-2226591, 2222326, 4652326
e-mail : anoopam_met@hotmail.com, www.anoopammetal.com

সৌহার্দ্য) করুণাময়ী থেকে রওনা। উভয় ক্ষেত্রেই ভাড়া ২০০৮ সালে দু'পিঠে ১০৯০ ভারতীয় টাকা। এরপর মধ্যমগ্রাম থেকে কোনো এক জমিদার কালিবাবুর রোপণ করা বিশালাকার শতাব্দী-প্রাচীন শিশু মেহগনির ছায়ায় যশোহর রোড ধরে যাওয়া।

চলন্ত বাসে বামনগাছিতে ব্রেকফাস্ট ও মিনারেল ওয়াটার বাসভাড়ার সঙ্গে ফ্রি। যথাসময়ে পেট্রাপোল। পেট্রাপোল যদি ধর্মতলার মোড় হয়, বেনাপোল রাজভবনের পূর্ব গেট। কিন্তু অনেক কিছুতেই নর্থ পোল সাউথ পোল। ইমিগ্রেশনের অবশ্যকরণীয় কাজে বাস থেকে নামতেই ধেয়ে আসে শিশু থেকে বৃদ্ধ ভিক্ষুকের দল। সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে আরবি শব্দের আধিক্য। পড়তে গিয়ে হোঁচট লাগে। রাস্তার মধ্যিখানে বিশাল বৃক্ষের গায়ে শিক্ষা, ভ্রমণ, তীর্থ কিংবা চাকরির লোভে নারীপাচার চক্র থেকে সাবধান হওয়ার বিজ্ঞপ্তি। মনে পড়ে, বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য। চল্লিশ হাজার মহিলা পশ্চিমবঙ্গ থেকে এ পর্যন্ত নিখোঁজ হয়েছে। দারিদ্র্য কাকে, কেমনভাবে মহান করে জানি না। তবে এই জ্বালা অসহ্য হলে মূল্যবোধ বদলাতে বাধ্য।

অচিরেই পথের ধারে এয়ারটেলের শাহরুখ খান, টাটার সৌরভ কিংবা টি.এম.টি ইস্পাতের সঞ্জয় দত্ত উধাও। ব্যাঙ্কের নতুন নতুন নাম। সেই সঙ্গে ইনসাল্লাহ, আসসালামো আলাইকুম আর আজ্ঞের বদলে জী। জলের বদলে পানি। এক সময় পার হয়ে যাই মধুকবির স্মৃতিমাখা কপোতাক্ষ। পরিত্যক্ত রেলপথ। ফরিদপুরে ভাস্কর্যের মোড়, টলটলে কড়াই নদী।

মাগুরায় মধ্যাহ্নভোজনের পর বাস উঠে আসে পদ্মার বুকে বিশাল স্টিমারে। খান তিনেক পণ্যবোঝাই ট্রাক ও বেশ কিছু প্রাইভেট কারের সঙ্গে ঠাঁই নিয়েছে সৌহার্দ্য, শ্যামলীও। পথে যাদের ক্ষিপ্ত বিচরণ, পদ্মায় তারা কতো অসহায়। আসন ছেড়ে গিয়ে উঠি তিনতলার রেস্টুরেন্টে। ডেকের বাজার, হকার, যাত্রী সমেত চলেছে ১৩০০ অশ্বশক্তির বীর জাহাঙ্গীর।

গঙ্গার দুই তীরে চিমনির সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় রবীন্দ্রনাথ কষ্ট পেয়েছিলেন। পদ্মার দুই তীরের সবুজ সেই কষ্ট দেয় না। চলন্ত জাহাঙ্গীরের ত্রিতল ডেকে বসে এক অদ্ভুত উদাসীনতা গ্রাস করে। র‍্যাডক্লিফ সাহেবের মর্জিমাফিক পরোটা ছেঁড়ার মতো একটা মানচিত্রকে দু'ভাগ করা হলো। দেশে দেশে যুগে যুগে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যখন 'গ্রেটম্যানরা' মৌনব্রত পালন করে অবিমৃশ্যকারিতার ইতিহাস রচনা করে। মুর্শিদাবাদ, মালদহর মতো জেলা কিংবা গোটা লাক্ষাদ্বীপ বা জম্মু কাশ্মীরের মতো মুসলমান প্রধান রাজ্য নিয়ে যদি ভারত থাকতে পারে তাহলে একভাষায় কথা বলা এই ভূগোলটা উত্তর বা মধ্যপ্রদেশের মতো অখণ্ড বঙ্গপ্রদেশ থাকতে পরত না? মাঝে মাঝে মনে হয় একটা কাচের গ্লাস হাত থেকে পড়লে ঠিক দু'টুকরো হয় না, অনেক টুকরো হয়। ব্রিটিশ ভারতও তেমনি দু'টুকরো করা হলেও আজ তিনটুকরো হয়েছে। জাহাঙ্গীর আরিচা ঘাট থেকে পাটুরিয়া ঘাটে আসে প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ মিনিট সময়ে।

বাস এক সময় সাভার অতিক্রম করে। জানলা থেকেই দৃষ্টিগোচর হয় প্রখ্যাত স্থপতি মইনুল হুসেইনের গড়া অনবদ্য জাতীয় স্মারকটি। ছুঁচোলো ভাস্কর্যটি আকাশ ফুঁড়ে স্মরণ করছে একাত্তরের শত সহস্র শহিদকে। আলোকসজ্জায় সাজানো এই ন্যাশনাল মেমোরিয়াল।

অবশেষে আসে বুড়িগঙ্গা, সেই সঙ্গে ঢাকা শহরের যানজট। মোতিঝিল সংলগ্ন কমলাপুরে বাসস্ট্যাণ্ড। ঢাকার প্রধান রেল স্টেশনও এই কমলাপুরেই। ঘড়িতে সাড়ে সাতটা বাজে। স্থানীয় সময় আটটা।

এক অদ্ভুত অনুভূতি। বিদেশে এসেছি, অথচ বিন্দুমাত্র মনে হচ্ছে না। এরচেয়ে বরং শ্রীনগর, গোয়া, কোহিমা অনেকটাই বিদেশ মনে হয়। রিক্সা নিয়ে পৌঁছে যাই রামকৃষ্ণ মিশনে। মূল রাস্তা থেকে সংকীর্ণ জনবহুল রামকৃষ্ণ মিশন রোড। সেখানে অবস্থিত উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় ও হসপিটাল-সহ ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশন। চিত্তাকর্ষক মন্দিরে চলছে সন্ধ্যারতি।

মিশন অতিথিশালায় সঙ্গী হিসেবে পেলাম উৎপল কান্তি বৈদ্যকে। ভদ্রলোক কুমিল্লা সরকারি কলেজে ব্যবস্থাপনা বিভাগে অধ্যাপনা করেন। রামকৃষ্ণ ভাবাদর্শের একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত। সেই কারণেই তাঁর এখানে আসা। নৈশভোজের আসরে দেখা হলো মিশন অধ্যক্ষ স্বামী অক্ষরানন্দর সঙ্গে।

মহারাজ ও উৎপলবাবু দুজনেই জানতে চান বাংলাদেশে আমার কোনো আত্মীয় আছেন কি না। উত্তরে বলি, আমার মায়ের জন্মস্থান ঢাকা, বাবার কলকাতা। কিন্তু এখানে আমার কোনো আত্মীয় নেই। তবুও মনে হলো জীবনের অর্ধেকের বেশি তো কেটে গেল। অনেক জায়গার বাঙ্গালি দেখলাম– কটক, শিলচর, শিলং, আন্দামান, বেতিয়া, দিল্লি, দণ্ডকারণ্য এমনকী লন্ডন পর্যন্ত। কেবল পদ্মাপারেই এলাম না। তাই কিছু বাংলাদেশি ছাত্র-ছাত্রীর নিমন্ত্রণ পেয়ে হঠাৎই ঢাকায় চলে এলাম।

অক্ষরানন্দজী জানালেন ১৯১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সেবাকেন্দ্রটি উদ্বোধন করেন তৎকালীন বাংলার গভর্নর কারমাইকেল সাহেব। জানা যায় এই মিশন প্রতিষ্ঠার ঊষালগ্নে ঢাকার নবাব আবদুল গনি মিঞা তাঁর হৃদয়বত্তা প্রসারিত করে এগিয়ে এসেছিলেন।

কাকলি সফিকুলদের সান্নিধ্যে...

সকাল নটা নাগাদ মিশনে হাজির কাকলি আর সফিকুল। কাকলির ভালো নাম নার্গিস লায়লা। দু'জনেই বাংলাদেশ সরকারের পরিসংখ্যান বিভাগের পদস্থ অফিসার। আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনার সুবাদে কলকাতায় অনেকের সঙ্গে এই দু'জনকে ছাত্র হিসেবে পাওয়া। কাকলি বলে, 'সফিকুল যেই জানালো আপনি ঢাকায় এসেছেন তখনই আমার মন চলে গেল

সেই কলকাতার ক্লাসে, যেখানে আপনি বুঝাচ্ছেন কেমন করে বাংলাদেশের মানব উন্নয়ন সূচক হিসাব করতে হয়। কথা প্রসঙ্গে বলেসে, 'আপনি স্যার কেমন সুন্দর বাংলায় কথা কন।'

কাকলিকে বলি, 'আমি তো তোমারই মতো বাঙ্গালি। ওখানে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের দেশগুলি ছাড়া কোরিয়া, ফিলিপিনস, কিউবা, জর্জিয়া, কাজাখস্তান প্রভৃতি দেশের স্টুডেন্টরাও ছিল বলেই ইংরেজি বলতে হতো।' শ্রীলঙ্কাতেও এমন ছাত্র-ছাত্রীদের থেকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পেয়ে বুঝেছিলাম শিক্ষকতার তৃপ্তি কী বস্তু।

বাংলাদেশে না এলে জানা হতো না ভারতবর্ষের বাঙ্গালি ও অন্য প্রদেশবাসীদের শনাক্ত করতে এদের কতোটা বেগ পেতে হয়। আনন্দপ্রসাদ রায় যে রাও বা রাই হয়ে ভিন্নভাষী ভারতীয় হয়ে যায় সেটা ওদের পক্ষে বোঝা কঠিন। আমরা যেমন কাকলিদের আরবি নামে বুঝতে পারি না কে বাংলাদেশের, কে বাহরিনের।

ওরা আমাকে ওদের দপ্তরে নিয়ে যেতে চায়। যখন বললাম আমি নিজেই ট্যাক্সি নিয়ে চলে যাবো, সফিকুল বলে ওঠে, আপনি কেবল অতিথিই নন, আমাদের শিক্ষক। আপনাকে তা হতেই দেব না, ঠিক হলো মধ্যাহ্ন ভোজনের পর আসিফের গাড়িতে ওরা আমাকে নিতে আসবে।

সফিকুল চলে গেলে একা একা কমলাপুরের দিকে যাই প্রথম সকালে ঢাকার সঙ্গে পরিচিত হতে। একটু চা হলে মন্দ হয় না। ঢুকে পড়ি এক ছোটখাট জলপানের দোকানে। কলকাতার অভ্যাস, বাইরে দাঁড়িয়েই চা চাইলাম। আসেন আসেন, ভেতর থেকে ডাক এল, আপনে ইন্ডিয়া থিকা আসছেন?

বললাম হ্যাঁ ভারত থেকে, কিন্তু বুঝলেন কেমন করে? ও বুঝন যায়। আপনেগ কথাবার্তা, জামাকাপড় সবই তো আলাদা। দোকানের অন্য লোকেদের জিজ্ঞাসু চাউনি। অনেকে বলে নতুন শহরকে চিনতে হলে চায়ের দোকান সেরা ঠিকানা। কথাটা ভুল নয়।

বারোটা নাগাদ সফিকুলরা অফিস থেকে গাড়ি নিয়ে আসে। সরকারি পরিসংখ্যান দপ্তরের নানা মাপের আধিকারিকের সঙ্গে দেখা এবং ভাব বিনিময়ের পর চায়ের আসরে বেশ কিছু পুরনো ছাত্র-ছাত্রী এসে যোগ দেয়। আসে অন্যরাও। তাঁদের মধ্যে পরিসংখ্যান দপ্তরেই কর্মরত মহম্মদ হারুন আমার জন্য নিয়ে এসেছে নিজের লেখা যোগাসনের বই। সে বাংলাদেশ জুডো ও ক্যারাটে ফেডারেশনের জাতীয় কোচ এবং বিচারকও।

কাকলি অনুমতি নিয়ে বিদায় নেয়, কারণ বেশি দেরি করলে ঢাকার যানজট ওকে নাকাল করবে। এই শহরের সঙ্গে পহেলা মোলাকাতে যে কোনো নবাগতের চোখে যেটা সবার আগে পড়বে সেটা হলো এখানকার সাইকেল রিকশা। পাশাপাশি বড়ো জোর দেড়জন ভালোভাবে বসতে পারবে। রিকশাগুলোর অলংকরণে এমন কোনো রং নেই যা ব্যবহার করা হয়নি। একটা বিষয় আমি লক্ষ্য করেছি, পাটনাই গোরু যেমন আমাদের দেশি গোরু অপেক্ষা আকারে বড়ো, তেমনই পাটনা, মজফ্ফরপুরের সাইকেল রিকশার চেয়ে কলকাতার সাইকেল রিকশাও আকারে ছোট। ঢাকার রিকশা আরও ছোটো। এশহরের রিকশা নাকি লক্ষাধিক। তার অর্ধেকই বেআইনি। নতুন ঢাকার কিছু এলাকা ছাড়া এই মহানগরীর রাজপথ শাসন করে এই তিনচাকার যানটি। বাস বা অন্য বাহন এদের সমীহ করে। তবে বলতেই হবে আমাদের মতো ছোট রাবার হর্ন না থাকায় এরা শব্দদূষণ ঘটায় না।

রিকশার আধিক্য সত্ত্বেও ঢাকাকে প্রথম নজরেই কলকাতার চেয়ে অনেক বেশি পরিচ্ছন্ন বলে মনে হয়। যেটা চোখে পড়ার মতো সেটা হলো এখানে পাউচে পানপরাগ নেই। নেই কোনো রাস্তার চৌমাথায় চুনের ডিবা নিয়ে খৈনি কুচোনোর লোক। পলিথিন বা প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগও শুয়োরের মাংসের মতো এখানে প্রায় নিষিদ্ধ।

সফিকুল আমাকে নিয়ে আসে ধানমণ্ডিতে শেখ মুজিবুর বাসবভবনে। ১৯৭১ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এই বাসভবনের দেওয়ালে রাশেলের রক্তের দাগের মতো এখনো আমাদের জীবনে টাটকা স্মৃতি। কিন্তু অশেষ দুর্ভাগ্য, রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বাসভবন বন্ধ।

ধানমণ্ডি থেকে চলে আসি জিয়ার সমাধিতে। শাহজাহান নাকি পত্নীপ্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন। ঢাকাতে খালেদা জিয়ার বানানো এই সমাধিটি তাঁর পত্নী প্রেমকেই মনে করায়। অপূর্ব এর পরিকল্পনা। অনেকটা রাজঘাটের ছোঁয়া। সফিকুল জানায় মুজিবুরের সমাধি সৌধটি নির্মিত হয়েছে গোপালগঞ্জ জেলাসদর থেকে ১৯ কিলোমিটার দূরে টুঙ্গীপাড়া গ্রামে।

দু'জনে এসে যাই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংসদ ভবনের সামনে। মূল রাজপথ থেকে অনেকটা দূরে বিশাল বৃত্তাকার সবুজের মধ্যিখানে চিত্তাকর্ষক স্থাপত্য। জনৈক ফরাসি স্থপতি ল্যুই কান মুখ্য নকশাকার। দুশো একর এলাকা নিয়ে জলবেষ্টিত এই ভবনটিকে সামনে রেখে দু'জনে বসে পড়ি। সূর্য অস্ত যাচ্ছে। সফিকুল বলে দিল্লিতে আপনাদের পার্লামেন্ট ভবনকে দেখে আমার কেমন যেন বাজারের মধ্যে বলে মনে হয়েছিল। অথচ কী চমক লাগানো স্থাপত্য।

এক মনোরম স্মরণীয় মুহূর্ত। সফিকুল নিজের মনেই বলে চলে, ঢাকা স্যার আমার চোখের সামনেই খুব দ্রুত বদলে যাচ্ছে। কিছুদিন আগেও স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে দেখেছি বাবাকে গাই দুইতে। এখন কোনো বাড়িতে সে দৃশ্য বিরল। ক্যালকাটার মতো দুধ এখানে এত সহজলভ্যও নয়। লোকের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ছে তো না বরং কমছে। অথচ বসুন্ধরা ম্যলে গেলে মনে হবে আধুনিক ঢাকার বৈভব থাইল্যান্ড মালয়েশিয়ার কাছাকাছি।

সফিকুলের কথাটা ভুল নয়। কলম্বোতেও দেখেছি শ্রীলঙ্কার সংসদ ভবন মূল ভূখণ্ড থেকে বেশ দূরে প্রাকৃতিক এক বিশাল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জলাভূমির মধ্যিখানে। সফিকুল বক্সীবাজার পর্যন্ত আমাকে পৌঁছে দিয়ে বিদায় নেয়। সেখানে গির্দা উর্দু রোডে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের জয়েন্ট সেক্রেটারি অরুণকান্তি আইচের বাড়িতে নৈশ ভোজের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে হবে।

ইত্তেকাফ মোড়ে দাঁড়িয়েছিলাম বাসের জন্য। যাব ইউনিভার্সিটি। পাশেই অপেক্ষারত একটি ছেলে। সর্বাঙ্গে তার শেষ কৈশোরের লাবণ্য। জানতে চাইলাম, কোন বাস ইউনিভার্সিটি যাবে বলতে পারেন? উত্তরে ছেলেটি জানালো সেও যাবে ইউনিভার্সিটি। ছোট মিনিবাসে পাশাপাশি বসে জানা গেল তার নাম মহম্মদ নাকিব মাহাফুজ। এখানকার কোনো একটা কলেজে প্রথম বর্ষের ছাত্র। আইন নিয়ে পড়তে চায়, তাই ইউনিভার্সিটিতে ফর্ম জমা দিতে যাচ্ছে। ঢাকাতে আমি নবাগত শুনে আমার সম্পর্কে ঔৎসুক্য ও সেই সঙ্গে ইন্ডিয়া ও ক্যালকাটা সম্পর্কে আগ্রহ দৃশ্যতই তার বেড়ে গেল। ঢাকাতে প্রায় কাউকেই ভারত বা কলকাতা বলতে শুনিনি।

নাকিবের কথামতো তিন নেতার মাজার স্টপেজে দুজনে নামি। মাজারকে ঘিরে দর্শনীয় স্থাপত্য। সংলগ্ন বিশাল উদ্যান। চোখে পড়ার মতো তার পরিচ্ছন্নতা। ঢাকার রমনা পার্কই হোক কিংবা জিয়া উদ্যান প্রতিটির সংরক্ষণ আমাদের দিল্লির বা ব্যাঙ্গালোরের সঙ্গে তুলনীয়, কলকাতার সঙ্গে নয়। প্রশস্ত রাজপথ ধরে হাঁটতে থাকি দুজনে। মূল রাস্তার ধারে ইউনিভার্সিটির আর্টস ফ্যাকালটি ভবন লাগোয়া জাতীয় কবি নজরুল ইসলামের সমাধি। পরম যত্নে সবুজের সমারোহে শান্ত সমাহিত চত্বর। মনে পড়ে বিদ্রোহীকবির মৃত্যুর আগের বছর তাঁর জন্মদিনে কলকাতার ক্রিস্টোফার রোডের বাসভবনে কলেজ থেকে বন্ধুরা মিলে কবি দর্শনে গিয়েছিলাম। যেন এই সেদিনের ঘটনা– বিগ্রেড প্যারেড গ্রাউন্ডে ইন্দিরা গান্ধী মুজিবুর রহমানের সভা থেকে হেঁটে বরানগরে দাদার সঙ্গে বাড়ি ফেরা নাকিবকে এইসব বলায় তার প্রতিক্রিয়া দেখবার মতো। আমরাও অনেকে রবিঠাকুর-গান্ধীজীর দর্শন-পাওয়া মানুষকে পেলে এমনটাই করি।

বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে যৌবনের চাঞ্চল্য। বিশাল বটগাছকে ঘিরে বৃত্তাকার বেদিতে তাদের ঘনিষ্ঠ জটলা। শহরের মধ্যে বিশাল মুক্ত অঙ্গনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ভাষা শহিদ স্মারক মিনার থেকে বেশি দূরে নয়। এক সময় এসে পৌঁছই কার্জন হল ক্যাম্পাসে। গম্বুজ শীর্ষ আর খিলান-জাফরি সমৃদ্ধ তার লাল বনেদি স্থাপত্য। ব্রিটিশ ভারতের সবচেয়ে বর্ণময় ভাইসরয়ের স্মৃতিকে কী যত্নে ধরে রেখেছে ঢাকা। নাম বদলায়নি। অমলিন তার পারিপার্শ্ব। অন্যদিকে আমরা আমাদের কার্জন পার্ককে কেবল সুরেন্দ্রনাথ উদ্যানই করিনি কিংবা তার অংশবিশেষকে 'ভাষা উদ্যান' বানাবার আদিখ্যেতায় মাতিনি, তাকে কলকাতার বৃহত্তম খোলা ইউরিন্যাল বানিয়েছি। সম্ভব হলে লোকমাতা রাসমণি কিংবা পুতুল সদৃশ মার্কস এঙ্গেলস নাকে দেবার জন্য রুমাল চাইতেন।

ঢাকানগরী কলকাতার চেয়ে বয়সে বড়ো, কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলকাতার অনুজ। বিশ্বভারতী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমবয়সি। কলকাতার দ্বারভাঙ্গা ভবন কিংবা রাজাবাজার ক্যাম্পাসের জেসি বোস, রমনদের মতো ঢাকার কার্জন হল ,জগন্নাথ ক্যাম্পাসও সত্যেন বোস, বুদ্ধদেব বোসদের জন্য গর্ব করে। স্বভাবতই কষ্ট হয় একথা ভাবলে যে, চেন্নাই তার সিনেট হল, মুম্বাই তার জিজাবাঈ টাওয়ার কিংবা ঢাকা তার কার্জন হল রক্ষা করতে পেরেছে, পারেনি কেবল সিনেট হল রক্ষা করতে কলকাতা।

With Best Compliments from :-

RAJKUMAR KARWA

Managing Director

SANAUTO ENGINEERS
(INDIA) PVT. LTD.

Manufacturers of

ENGINEERING COMPONENTS

AEROSPACE, OIL & GAS, AUTOMOTIVE

789, Industrial Estate, Sector - 69

Faridabad - 121 004, Haryana

Tel. : 91 129-2241379 - 2240310

Website : www.sanauto.com

E-mail : info@sanauto.com

এসে যাই জগন্নাথ হল চত্বরে। বেশ কয়েকটা মাঝারি আকারের জলাশয়কে ঘিরে গড়ে উঠেছে এই বিদ্যাঙ্গন। আনাচেকানাচে ছড়িয়ে আছে বেশ কিছু হিন্দু মন্দির। অনেকটা কেম্ব্রিজ, অক্সফোর্ডের কলেজ সংলগ্ন চ্যাপেল কিংবা চার্চের মতো। সবকটি মন্দিরই পরিতক্ত ও অযত্নলাঞ্ছিত। এছাড়া রয়েছে এক বিশাল ক্ষতবিক্ষত বুদ্ধদেবের পদ্মাসনে বসা মূর্তি। তার মুখমণ্ডল বিকৃত, একটা হাত নেই। বামিয়ানের কথা মনে আসে।

সমগ্র বাংলাদেশ জুড়েই ইদানীং সেখানকার মুক্তবুদ্ধির সুশীল সমাজ যে ব্যাপারে উদ্বিগ্ন তা হলো ভাষাকে ছাপিয়ে ধর্মের আত্মপ্রকাশ। সর্বত্রই কম-বেশি এ জিনিস চলছে। আমাদের আর এক প্রতিবেশী নেপালও 'প্রচণ্ড' গতিতে 'হিন্দুরাষ্ট্র' বিশেষণটি মুছে ফেলেছে। রক্তস্নানের পর গণতন্ত্রের হাত ধরে শাক্যসিংহের দেশটি আজ সমাজতন্ত্রে উত্তরণে ব্যস্ত। মনোযোগী তারা এক ধরনের বলশেভিজমের প্রতিষ্ঠায়, যে বলশেভিজমকে বার্ট্রান্ড রাসেল নতুন এক ধর্ম বলে ব্যাখ্যা করেছেন। বাংলাদেশে এরশাদ আগেই সেদেশের নামের সঙ্গে 'ইসলামিক' বিশেষণ জুড়ে দিয়েছেন। অথচ সেখানে ধর্ম নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র গঠনে ভারতের প্রায় প্রতিটি নাগরিকের অবদান সুবিদিত (রিফিউজি রিলিফ স্ট্যাম্প এর ঘটনা স্মর্তব্য)। পৌত্তলিকতার কাঁটা বাছার অভ্যাসের সর্বশেষ দৃষ্টান্ত ঢাকা বিমানবন্দরের পথ থেকে লালনের মূর্তি সরিয়ে ফেলা। অথচ এত কিছুর মধ্যেও হঠাৎ আবিষ্কার করলাম দৃপ্ত ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান স্বামী বিবেকানন্দকে। বছর তিনেক আগে এর আবরণ উন্মোচন করেন ঢাকা মহানগরীর মহানাগরিক।

নাকিব ইতিমধ্যে জানিয়ে দিয়েছে সারাদিন সে আমাকে সঙ্গ দেবে। আমাকে তার কেন ভালো লেগেছে সেই জানে। শরৎচন্দ্র ও নজরুলের সে পাগল ভক্ত। যে শহরে এ পর্যন্ত একজনও ব্যক্তিমানুষের মূর্তি দেখলাম না (যা কিনা ইসলাম বিরোধী) সেখানে একমাত্র ব্যতিক্রম স্বামীজী। এতে যত না অবাক হলাম তার চেয়েও বেশি বিস্মিত হলাম নাকিব যখন ট্যুরিস্ট গাইডের মতো স্বামীজীর দিকে আঙুল দেখিয়ে আমাকে বলল, 'বিবেকানন্দ সেন, বড়ো কবি ছিলেন।'

প্রথমে নিজের কানকে বিশ্বাস হচ্ছিল না। পরক্ষণেই দার্শনিকের মতো ভাবতে লাগলাম এখন আমার কী করা উচিত? বেশ ক'বছর আগে শিলচরের এক অধ্যাপক বন্ধুর কাছে শোনা একটা ঘটনার কথা মনে পড়ল—মণিপুরে মিতেই মণিপুরী আর বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীদের মধ্যে ভাষাগত দ্বন্দ্বে শেষোক্ত দলের কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি কেন্দ্রীয় কোনো মন্ত্রীকে চিঠি দিলে সেই মন্ত্রী উত্তরে সম্বোধন করেছিলেন এই বলে, 'ডিয়ার মিসেস বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী'। আমি নিজেও কি এমন অজ্ঞতা প্রকাশ করিনি যখন বৃন্দাবনের বাসস্ট্যান্ডে জনৈক বিদেশি ইসকন ভক্তর কাছে জানতে চেয়েছিলাম শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিবেদান্ত আমেরিকান ছিলেন কিনা।

নাকিবকে বললাম, স্বামী বিবেকানন্দ কোনদিনও সেন ছিলেন না। এটা তাঁর সন্ন্যাস নাম। তাঁর পূর্বাশ্রমের নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি কবিতা লিখেছেন এটাও ঠিক তবে সেটাই তাঁর আসল পরিচয় নয়। যেমন রবিঠাকুর একসময় কবিরাজি করলেও তিনি ছিলেন মূলত কবি।

এরপর এল নাকিবের দিক থেকে সরল অকপট প্রশ্ন, 'Then who was Vivekananda?'

নেতাজীর থেকে ধার করে উত্তরে বললাম, 'He was a full-blooded masculine personality. He was so great, so profound, so complex, one can go on hours and yet fail to pay the slightest justice to that great man. He came as a tonic to the depressed and demoralized Hindu as well as Muslim mind.' শেষ বাক্যটা পণ্ডিত নেহরুর থেকে ধার করা। কেবল 'as well as Muslim' শব্দগুলো আমার বসানো।

আমরা যারা ভারতীয় হয়ে জন্মে ভারতীয় হয়েই মারা যাই তাদের কাছে রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দের জীবন ও রচনায় 'ভারতীয়' অংশটুকু আমাদের জাতীয়তাবোধের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। অন্যদিকে মুজিবুর রহমান বা মহম্মদ আলি জিন্নার মতো যাঁরা ভারতীয় হয়ে জন্মে বাংলাদেশি ও পাকিস্তানি হয়ে শেষনিঃশ্বাস ফেলেন তাঁদের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ বা স্বামীজী প্রায় একইরকম আবেদন রাখেন। কিন্তু নাকিবদের মতো যেসব বাঙ্গালি বাংলাদেশি হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে এবং কখনো ভারতীয় হবে কিনা ঠিক নেই, তাদের কাছে 'হে ভারত'ভুলিও না'...কিংবা 'ভারত ভাগ্যবিধাতা' এইসব বাক্য কেমন আবেদন রাখে তা জানা বা বোঝা বেশ কঠিন।

নাকিব রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র নয়। তার জন্মাবধি পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডল, শিক্ষালাভ, বেড়ে ওঠার কোনো পর্যায়েই বিবেকানন্দ আসেননি। ওর মার্কস শিটে দেখেছি তাকে একশো নম্বর হাদিশ পড়তে হয়েছে। তার কাছে জীবনানন্দ বা বনলতা সেন যতটা পরিচিত ততটা স্বামী বিবেকানন্দের হওয়ার কথা নয়। তাই তার কাছে স্বামীজী কেবলই কবি বিবেকানন্দ সেন।

স্বামীজী ১৯০১, ১৯ মার্চ ঢাকায় এসে জমিদার মোহিনী মোহন দাসের ফরাসগঞ্জের বাড়িতে মোট সতেরো দিন অবস্থান করেন। এই অবস্থানকালে ঢাকার জগন্নাথ কলেজ হলে এবং পোগোজ স্কুলের মাঠে দুটো ভাষণও দেন।

জগন্নাথ হল চত্বর থেকে নাকিব আমাকে নিয়ে এল ঢাকেশ্বরী মন্দির দেখাতে। সেখান থেকে গুলিস্তানে এসে দুজনে রিকশায় উঠলাম। লক্ষ্য রামকৃষ্ণ মিশন, আমার সাময়িক আশ্রয়। মন্দিরে তখন প্রার্থনা চলছে। মিশনের পাবলিকেশন কাউন্টার থেকে স্বামীজীর বাণী সংগ্রহ, 'Thoughts of Power' পুস্তিকা কিনে তাকে উপহার দিলাম।

ঝাঁকিদর্শনে কক্সবাজার...

মিশন অতিথি ভবনের ম্যানেজার দেবুর কথামত সৌদি পরিবহণের খালেদ ভাইয়ের কাছে গিয়ে কক্সবাজারের অগ্রিম টিকিট

With Best Compliments from -

ARIES ENGINEERS

JALANDHAR

PUNJAB

M: 9815479543

With Best Compliments from -

SANT VALVES PVT. LTD.

G.T. Road, By-pass,
Jalandhar
Pin - 144012 (PB.) India

Mfrs. of **SANT**
IBR CERTIFIED : BRONZE, CAST IRON, CAST STEEL, FORGED STEEL, BOILER MOUNTINGS
IST MARKED : GM VALVES, CI BALL VALVES, SLUICE VALVES, BUTTERFLY VALVES, **'SBM'** BRONZE INDUSTRIAL VALVES
Ph. +91 181-5084693-94-95, 2603308
FAX : +91-181-5062270
E-mail : info@santvalves.com
Website : www.santvalves.com

ARYA TOURIST LODGE

Just 5 Minute walk from New Delhi Rly. Station
Only 1 km. from Cannaought Place
Homely Atmosphare
Day & Night Taxi Facilities
8526, Ara Kashan Road
Ram Nagar, Pahar Ganj
New Delhi - 110055 (India)
Phones : +91 11 43505463 (10 Lines)
Cont : 9811044543
E-mail : info@aryatouristlodge.in
website : www.aryatouristlodge.in

With Best Compliments from :-

AURO MECHANICALS

An ISO 9001 : 2000 Certified Firm

Mfrs. & Expoters of Hardware Nuts & Bolts, Hi-Tensile Fasteners

Auto Parts, Sheet Metal Components

B-20, Bhagwan Mahavir Industrial Complex, Backside Focal Point Sheds

Ludhiana - 141010
Tel. 0161-4610141
M.: 9814000141

করা ছিল। ভাড়া ৯০০ টাকা। সকাল আটটায় বাস ছাড়লো। সাউদিয়া এস আলমের হুইল অন চেয়ার-এ প্রবেশ করেই মনে হল যেন গালফ এয়ারের প্লেনে উঠলাম। গাইড ইউসুফ কম্বল ও মিনারেল ওয়াটার বোতল দিয়ে গেল। দুটো এলসিডি টিভি বাসের মধ্যে। কোরানের দুর্বোধ্য বাণী ও তার দুর্বোধ্যতর বাংলা তর্জমা চলছে। সুইডিস মার্সিডিজে চলেছি বাংলাদেশের ট্যুরিস্ট হটস্পট কক্সবাজার। ক্যাপ্টেন কক্স-এর স্মৃতিবাহী বিশ্বে দীর্ঘতম সৈকতের দাবিদার এই কক্সবাজার। বাসের ভিতরে বিলাসী মধ্যপ্রাচ্য, বাইরে বাংলাদেশ।

সর্বত্র বিদেশি ভাষা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন খুব চোখে পড়ে। এটা কে না জানে মধ্যপ্রাচ্য থেকে ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া এমনকী চীনেও ছড়িয়ে পড়ছে বাংলাদেশের নাগরিক। শহর ছেড়ে বাস ছুটলো পল্লীপ্রকৃতির মধ্যে দিয়ে। সমগ্র বাংলাদেশেই উন্নত পথ পরিবহণের কথা সুবিদিত। চাক্ষুষ করে বলতেই হয় চলন্ত বাসে স্বচ্ছন্দে গাল সেভ করা সম্ভব। শরৎকালের বাংলাদেশ নবীন ধানের মঞ্জরীতে আদিগন্ত সবুজে মোড়া।

কুমিল্লায় মধ্যাহ্ন ভোজনের বিরতি। পদের বাহার নজর কাড়ে। মুরগি, খাসি থেকে রুই, ইলিশ, চিংড়ি, রূপচাঁদ, মরলা, কাচকি, ট্যাংরা, বাতাসি কী নেই? আছে শুটকির ভর্তা। প্লেইন রাইস, ডাল, মিক্সড সবজি আর রসমালাই দিয়ে লাঞ্চ সারলাম।

দুটো নাগাদ বন্দরনগরী চট্টগ্রাম এলো। শৈশব থেকে শোনা এই নগরীর সৌন্দর্যের কথা। আরাকান পার্বত্য ভূপ্রকৃতির তরঙ্গায়িত পথঘাট পার হয়ে গেলাম কর্ণফুলি নদী। এ শহরের একান্ত আপন এই নদী। যেমন তার রূপ, ব্যস্ততা তেমনই। পর্তুগিজ, দিনেমার, ইংরেজ ইতিহাসের ঐশ্বর্যে গড়ে ওঠা বন্দর। এই বন্দর শহরের আছে নিজস্ব স্টক এক্সচেঞ্জ। আমার মনে হয় ভারতের কাছে পূর্ব বাংলাকে হারানো যত না ক্ষতি, চট্টগ্রাম বন্দর হাতছাড়া হওয়া আরো বড়ো বিপর্যয়। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সকলকে নিয়ে এ বন্দরনগরী ঢাকার চেয়ে অনেক বেশি কসমোপলিটন বলে মনে হয়।

এখান থেকে দুটি ছেলে উঠলো। দুজনেই স্থানীয়, কিন্তু থাকে দুবাইয়ে। ছমাস অন্তর এসে পনেরো দিন থাকে। পাশে এসে বসায় আলাপ হয়। একজনের নাম তানসেন। নিজে থেকেই বলল সে, 'আমাদের সঙ্গে থাকতে আঙ্কেল আপনার অসুবিধা নাই তো? আমাদের বন্ধু মানিক আগে থেকেই ওখানে গিয়ে হোটেল বুক করে রেখেছে।' মনে মনে ভাবি এটা মেঘ না চাইতে জল, নাকি বিপদের ফাঁদে পা দেওয়া। তানসেন বলে, 'মানিক চিটাগাঙে ফাস্ট ডিভিশন ফুটবল খেলে। আপনি বলবেন না ইন্ডিয়া থেকে আইছেন। তাইলেই মিনিমাম এক হাজার টাকা চাইবো। আমাদের সাথে থাকলে মাত্র তিন শত।' ঝুঁকি নিয়েই রাজি হলাম। সাড়ে ছটায় পৌঁছলো বাস।

পরদিন তানসেনের ডাকে ঘুম ভাঙলো। আঙ্কেলের সাথে

চন্দ্রনাথ মন্দির, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম

With Best Compliments from -

JATINDRA UDYOG

Specialist in :

HARDENING, TEMPERING, STRESS RELEIVING & CARBURISING OF ALLOY & MILD STEELS

E-6, FOCAL POINT,

LUDHIANA - 141 010 (PB.) INDIA

OFF : 2670368 2674283, RESI. 0161-2673213

MOBILE : 98140-37868

E-mail : mittaljatinder@yahoo.com

With Best Compliments from :-

Banwarilal Associates Pvt. Ltd.

B-17, Ashok Nagar
Ghaziabad
Uttar Pradesh
Pin - 201001

With Best Compliments from :-

M/s. Sant Steel Forgings Private Limited

G. T. Road Bye Pass
Jalandhar - 144012
Tel. 0181-2601719

এতটুকু তঞ্চকতা করেনি এই ভাইপোরা। এক বেলাতেই চোখের দেখা দেখতে হবে কক্সবাজারকে। আর পাঁচটা বিচ রিসর্টের মতো। বেলাভূমির রং কালচে। সারি সারি ছাতার তলায় কাঠের আরামকেদারা। পর্যটকের সংখ্যা তুলনায় খুবই কম। সর্বত্র বর্মীয় জিনিসপত্র বিক্রি হচ্ছে। পোশাক থেকে ড্রাই ফিশ। মনে মনে ভাবি এভাবে ঝাঁকি দর্শনে কক্সবাজার দেখার মানে হয় না। একান্তে পাহাড় ভালো—সাগর সদলবলে। এর সঙ্গে সেন্ট মার্টিন দ্বীপ, রাঙামাটি, কাপ্তাই, ইসলামিক দেশে চাকমা, বৌদ্ধগ্রাম এসব না দেখলে কেবল কক্সবাজার দেখাই বৃথা। কেটে যায় কয়েক ঘণ্টা তারপর এসে বসি বাসে।

তিস-তা-গাঙ, পোর্ট প্রান্তে, চট্টগ্রাম...

পর্তুগিজদের আবিষ্কার এই গ্র্যান্ডপোর্ট সিটি আজ দক্ষিণ এশিয়ার পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতির শহর। বাস থেকে নেমে আসকার দিঘীর পাড়ে রামকৃষ্ণ মিশন যেতে অসুবিধা হলো না। ঢাকার তুলনায় অনেকটাই মধ্যবিত্ত মিশন। নতুন মন্দির নির্মীয়মাণ। পুরনো ছাত্রাবাসে ঠাঁই হলো।

চট্টগ্রাম মানেই বাঙ্গালি আবেগে সূর্য সেন। পিসিমার (সে যুগের চলচ্চিত্র অভিনেত্রী উমাশশী দেবী) কাছে শুনেছিলাম দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে কপালকুণ্ডলা শ্যুট করতে এসে তাঁরা অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ঘটনায় আটকে গিয়েছিলেন। ব্রেকফাস্ট করেই বেরিয়ে পড়ি অস্ত্রাগারের সন্ধানে।

স্বপ্নেও ভাবিনি Culture Shock কথাটা এমনভাবে অনুভব করবো এই চট্টগ্রামে এসে। ম্যাপের নির্দেশ মতো টাইগার পাস, ইউরোপিয়ান ক্লাব হয়ে সেই ঐতিহাসিক অস্ত্রাগারটির সন্ধান পেতে যারপরনাই বেগ পেতে হলো। কেউই হদিশ দিতে পারছেন না। সূর্য সেন, অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ইতিহাস পথচারীদের ভাবলেশহীন মুখাবয়বে কোনো প্রতিক্রিয়া ঘটাচ্ছে না।

জনৈক ট্র্যাফিক পুলিশ শুভ মজুমদারকে ঐতিহাসিক অস্ত্রাগারের হদিশ জানতে চাইলে তিনি জানালেন স্কুলে একবার নাটকে তিনি সূর্যসেন সেজেছিলেন। মনে মনে ভাবি সূর্য সেনের ভূমিকায় এযুগের শুভ মজুমদার না থাকলে দিনের শুভারম্ভে মাস্টারদার স্মৃতিতর্পণ ব্যর্থ হতো। রিকশাওয়ালা রফিককে ডেকে আমাকে তুলে কৃতজ্ঞতার পাশে ঋণী করলেন শুভবাবু। আরমারি এখন অনেকটাই পরিত্যক্ত পুলিশ ব্যারাক। জনৈক হাবিলদার গোছের একজন, নাম আবুল বাশরকে রিকশাচালক রফিক স্থানীয় দুর্বোধ্য ভাষায় যা বললো তার ফলে অমি কিঞ্চিৎ বাড়তি খাতির পেলাম। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তিনি আমাকে দেখালেন একটির পর একটি কক্ষ, যার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েও মর্মান্তিক অবহেলা নিয়ে অবস্থান করছে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার। সেলুলার জেল দেখা চোখে প্রীতিলতা, মাস্টারদাদের এই আত্মবলিদানের তীর্থটি আজ কী নিদারুণ উদাসীনতারই না সাক্ষ্য বহন করছে। বেশ ক'বছর আগে বিপ্লবী গণেশ ঘোষের ভাষণে শুনেছিলাম একের পর এক কক্ষ দখল করে তাঁরা প্রহরীদের বলেছিলেন, 'গান্ধীজী কা রাজ হো গিয়া।' সেই কক্ষগুলোই আজ পরিদর্শন করলাম।

ভূগোলকে অস্বীকার করা অসম্ভব, কিন্তু ইতিহাসকে ভুলিয়ে বা গুলিয়ে দেওয়া যায়। বড়ো জানতে ইচ্ছে করে ভারত না হয় ১৫ আগস্ট মধ্যরাতে হস্তান্তরিত ক্ষমতা পেয়েছে, যেমনটি পিতা পুত্রকে তার গাড়ির চাবি হস্তান্তরিত করে। কিন্তু বাংলাদেশ তো (ভারতীয় সেনার সাহায্যে হলেও) মুক্তি সংগ্রাম করেছে। তিরিশ লক্ষ প্রাণের আত্মবলিদানের বিনিময়ে ছিনিয়ে নিয়েছে মুক্তি। এখানে কি স্কুলপাঠ্যে মহেঞ্জোদরোর পরিবর্তে ১৯৭১ থেকে ইতিহাস পড়ানো হয়? অচেনা অজানা (হয়তো অনাত্মীয়) বাংলাদেশে এসব প্রশ্ন কাউকে করা ঠিক নয়। কেবল বাংলাদেশকে অভিযুক্ত করবো কেন? মজফ্ফরপুরে যে গাছ থেকে ক্ষুদিরাম বসু বোমা ছুঁড়েছিল সেখানেও ক্ষুদিরামের আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন করতে পণ্ডিত নেহরু রাজি হননি। তিনি বলেছিলেন ক্ষুদিরাম 'সন্ত্রাসবাদী' ছিলেন। আমরা সেই ইতিহাস পড়েই বড়ো হয়েছি যে ইতিহাস আমরা লিখিনি।

কলকাতার যেমন গঙ্গা, চট্টগ্রামের তেমন কর্ণফুলি। নাড়ি ছেঁড়া যন্ত্রণায় ভোগা জনৈক বৃদ্ধ শিক্ষক আমাকে এই শহরের একটা হাসপাতালের কথা বলেছিলেন যেখান থেকে এই কর্ণফুলিকে নাকি শূন্যে ভাসমান বলে মনে হয়। দুর্ভাগ্য সে দৃশ্য দেখা হলো না।

মিশন সংলগ্ন আসকার ডি (দিঘি)। রেবতীকান্ত পোদ্দারের জমিতে এই আসকার দিঘি। ভদ্রলোক কলকাতার বসন্ত রায় রোডে চলে গেলে এনিমি প্রপার্টি এই বিশাল দিঘি আজ পানায় ভরা। চারিদিকে টিন টালির দখল করা বসতি। তারই একাংশে পাঁচটি দরিদ্র হিন্দু পরিবার বাস করে। আলাপ হলো তাদেরই একজন রণজিৎ দের সঙ্গে। চুয়ান্ন বছরের রণজিৎবাবুর কন্যা এমবিএ পাঠরতা। এদের হটিয়ে কিছু কায়েমি স্বার্থের লোক কখনো রাশেল স্মৃতি, কখনো জিয়া স্মৃতির নামে দখল করতে চায়। ২০০৫-এ হিন্দুধর্ম কল্যাণ ট্রাস্টের আইনজীবী কল্যাণময় ভট্টাচার্যের উদ্যোগে রাতারাতি লোকনাথবাবার মূর্তি বসিয়ে মন্দিরে নিত্য সেবা শুরু করা হয়। চায়ের দোকানের আসরে এই তথ্য পরিবেশন করলেন পোর্টের প্রাক্তন কর্মী অনন্ত মোহন দাস। কেস এখনো চলছে। বিচারক এসে সরেজমিনে দেখে নাকি বলে গেছেন মন্দির ছিল। নয় ডেসিমেল জমির ওপর এই মন্দির নিয়ে পোর্টের বর্তমান কর্মী প্রভাবশালী বাবুল দেবরায় লড়ছেন। মন্দিরের সাইনবোর্ড দেখে ক্ষিপ্ত দখলকারীরা সেখানে নাকি ডিপ টিউবওয়েল বসাতে চাইছে।

দেশভাগের পর ভারতবর্ষ নামের নিরাপদ গ্যালারিতে এসে যে সব উচ্চবর্ণের বাঙ্গালি হিন্দু সেকুলারিজমের চাষে বেশি মনযোগী, বাবুল দেবরায়রা সেই দলের নয়। ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্টের পর পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানরা নিজেদের জমিটা ধরে

রাখতে পেরেছে, পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা পারেনি। রণজিৎ, বাবুল, অনন্তমোহনরা এখনো ধরে রেখেছে, জন্মাষ্টমীতে সংকীর্তন করছে। জানি না কত দিন পারবে।

চট্টগ্রামের বাংলাভাষা নিয়ে অনেক কথা শোনা যায়। তাই ছেলেমানুষের মতো কিছু লোকাল ডাইলেক্ট শুনতে চাইলে অনন্তদেববাবু আর রণজিৎবাবু খুশি হয়ে দুজনে নিজেদের মধ্যে নকল ঝগড়া করে মন ভরিয়ে দিলেন। এই চাটগাঁইয়ার আড্ডাতেই খবর পেলাম কাছেই চট্টগ্রাম রামকৃষ্ণ মিশনের বর্তমান সভাপতি সর্বজন শ্রদ্ধেয় বিপ্লবী অগ্নিপুরুষ বিনোদবিহারী চৌধুরীর ভদ্রাসন। রঞ্জিতবাবুরা বললেন, যান না পাশেই মুমিন রোডে ওনার বাড়ি। কালবিলম্ব না করে রওনা হলাম।

মাস্টারদার ঘনিষ্ঠ সহকর্মী সাতানব্বই বছরের এই কিংবদন্তী মানুষটি তখন বিশদ বাংলা নামের একটি সংস্থার প্রধানের সঙ্গে দূরদর্শনের জন্য সাক্ষাৎকারে ব্যস্ত ছিলেন। আমার রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচয় পেয়ে শুরুতেই বললেন আপনি আমার ছেলে বিবেকানন্দর মতো। সেও নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন থেকে ১৯৬৯ সনে স্কুল ছেড়ে একটা ব্যাঙ্কে কর্মরত, থাকে বারাসাতে। বলে ঠিকানা ফোন নাম্বার দিলেন। শোনালেন কিছুদিন আগেই নেত্রী হাসিনার আসার গল্প। মাস্টারদার স্মৃতিচারণ-সহ নানান কথার মাঝে বললেন, 'জীবনটা বড়ো তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল।' চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সময় গলায় গুলি লাগা এই অগ্নিপুরুষটির রাজস্থানে দীর্ঘ কারাবাস হয়। তিনদিন ব্রিটিশ শাসনমুক্ত চট্টগ্রামের এই একমাত্র জীবন্ত কারিগরটির সঙ্গে আলাপচারিতায় গায়ে আমার পুলক লাগে, চোখে ঘনায় ঘোর। সমগ্র বাংলাদেশের এই পরমশ্রদ্ধেয় মানুষটিকে প্রণাম করে বিদায় নিলাম। মনে হলো চট্টগ্রামের এক তীর্থদর্শন করলাম জীবন্ত বিগ্রহ সহ।

মিশনের সন্ধ্যারতির সময়ই সন্ধান পেয়েছিলাম তাঁদের। আরতির পর গেলাম দেখা করতে। তিন বোন— ভক্তিময়ী পুরী (৭৭), প্রীতিময়ী পুরী (৭৫) ও শ্রদ্ধাময়ী পুরী (৭৩)। সকলেই সন্ন্যাস নিয়ে মন্দির সংলগ্ন দোতলার একটি ঘরে বাস করছেন। লাগোয়া রান্নাঘর। তাঁরা আট বোনের তিনজন। তাঁদের পিতা দেবেন্দ্র দাস চৌধুরী ফতেয়াবাদে ১৩ বিঘা জমি বাগান পুকুর সমেত দান করেছেন রামকৃষ্ণ মিশনকে। মুণ্ডিত মস্তক, গেরুয়া বসনা তিন সহোদরা এক পরম তৃপ্তি নিয়ে আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করছেন। তাঁরা দক্ষিণেশ্বর, সারদামঠ, আদ্যাপীঠ, বরানগর মঠ দর্শনের অভিজ্ঞতা জানালেন আমাকে। অনুরোধ করলেন ফতেয়াবাদে তাঁদের বাগানবাড়ি দর্শন করতে। কিন্তু সময়াভাবে সেটা সম্ভব হলো না।

নৈশভোজে মহারাজ বললেন, আপনি আমাদের ছাত্রদের সঙ্গে সীতাকুণ্ড ঘুরে আসতে পারেন। কাল সেখানকার আশ্রমে জগদ্ধাত্রী পুজোর দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে ওরা যাচ্ছে।

এর চেয়ে ভালো প্রস্তাব কী হতে পারে? সকাল আটটা পঁচিশের ট্রেনে রওনা হলাম। সঙ্গী পরেশ, অতনু, কমল। কৈবল্যধাম স্টেশনে নেমে রামঠাকুরের আশ্রম দর্শন করে সীতাকুণ্ড রামকৃষ্ণ আশ্রমে চা পান সেরে শুরু হলো সাড়ে তিন কিলোমিটার দূরত্বে ১৩০০ ফুট উচ্চতার চন্দ্রনাথ পাহাড় অভিযান। চট্টগ্রামে সতীর দুটি পীঠের একটি এই চন্দ্রনাথ। এখানে ভৈরব চন্দ্রশেখরের নামে পাহাড়ের নামকরণ। দেবীর নাম ভবানী। এখানে সতীর দক্ষিণবাহু পতিত হয়েছে বলে বিশ্বাস। অন্যপীঠটি হলো সীতাকুণ্ডের সাতমাইল দূরে পর্বতের সানুদেশে নির্জন কুমারী কুণ্ড। মাত্র চারহাত পরিমিত কুণ্ডে দেবীর পিঠ পড়েছে বলে মনে করা হয়। এখানে ভৈরব নিমেষ, দেবী সর্বাণী।

স্বামী বিবেকানন্দ ১৯০১ সালের ৫ এপ্রিল মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী ভগিনী ও আরও কিছু ভক্ত-সহ চট্টগ্রামে আসেন এবং এই তীর্থ দর্শন করেন। একে একে পাহাড়ের পাদদেশে পবিত্র স্বামীজীর স্মৃতিবিজড়িত পঞ্চবটী, শ্মশানকালী, অনুকূল ঠাকুরের সৎসঙ্গ আশ্রম, সীতাকুণ্ড, সীতামন্দির, হনুমানমন্দির, স্বয়ম্ভুনাথ মন্দির দর্শন করতে করতে চড়াই ভাঙা শুরু হলো। বিশেষভাবে নজর কাড়ে শঙ্করমঠ ও সেখানকার অখণ্ড গীতাপাঠের দৃশ্য।

পাহাড় শীর্ষ থেকে দেখা যায় পাশেই অপেক্ষাকৃত নীচে পাহাড় শীর্ষে বিরুপাক্ষ মন্দির। দূর থেকেই বোঝা যায় তার স্থাপত্যশৈলী। এই অঞ্চলের মন্দিরগুলোর মধ্যে বিরুপাক্ষ মন্দিরটাই আমার কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় লাগলেও সেখানে যাওয়া হলো না। চন্দ্রশেখর মন্দির খুলে সঙ্গী সুজন চক্রবর্তী পুজো করে। সুজন কলেজে প্রথমবর্ষের ছাত্র। মন্দিরে অযত্নের চিহ্ন স্পষ্ট। দূ-উ-রে হালকা কুয়াশায় চট্টগ্রাম বন্দরে নোঙরা করা জাহাজ স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়। চারপাশে সবুজে মোড়া তরঙ্গায়িত মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। এই মহাভারতের সুদূর পশ্চিমে দ্বারকা বা উত্তরে অমরনাথ দেখা চোখে এই চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ পাহাড় এক অনন্য অনুভূতি দেয়।

ফিরে আসি আকসার দিঘি মিশনে। শেষ হয় আমার স্বল্পায়ু চট্টগ্রাম সফর। সুবর্ণ এক্সপ্রেসে টিকিট কাটা আছে। রেলপথে একে এক ঘোড়াশাল, দৌলতকান্দি, ভৈরব বাজার, মেঘনা, ব্রাহ্মণ-বাড়িয়া, আখাউরা, কুমিল্লা, ময়নামতি, লাকসাম জংশন ছুঁয়ে ফিরবো ঢাকায়। তারপর কলকাতা। □

নাসিরনগরে জেহাদি আক্রমণে বিধ্বস্ত পরিবার।

ওপারের হিন্দুরা কেমন আছেন

তথাগত রায়

এই প্রশ্নটা কি পশ্চিমবঙ্গে কারুকে জিজ্ঞাসা করতে শুনেছেন, বা এই বিষয়ে ঔৎসুক্য প্রকাশ করতে দেখেছেন? বোধ হয় না। কিন্তু এই জিজ্ঞাসা না করা বা ঔৎসুক্যের অভাব ব্যাপারটা একটু বিচিত্র নয় কি? বাংলাদেশের হিন্দুদের কাছে নিকটতম আত্মীয় হচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা। এই পরিপ্রেক্ষিতে তো পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের তো এই বিষয়ে প্রচুর আগ্রহ থাকা উচিত ছিল, ভারতীয় তামিলরা যেমন শ্রীলঙ্কার তামিলদের সম্বন্ধে সজাগ। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বেশিরভাগ হিন্দু এই বিষয়ে মাথাই ঘামান না। অনেকে আবার খুব আইনজ্ঞ সেজে বলেন, ওটাতো বিদেশ, ওদের নিয়ে আমাদের আগ্রহ কেন থাকবে? এই প্রক্রিয়ায় সাহায্য করেছে ওপার থেকে মার খেয়ে আসা কিছু লেখকের লেখা, যাদের মধ্যে অগ্রগণ্য সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (ফরিদপুর), অশোক মিত্র (ঢাকা) এবং তপন রায়চৌধুরী (বরিশাল), যারা এই ঘটনাবলী হয় বিলকুল চেপে গেছেন আর তা না হলে সাফাই গেয়েছেন।

এইসব 'আইনজ্ঞ'দের বাপ-ঠাকুরদা অনেকেই ওপার থেকে ঘরবাড়ি ছেড়ে, মার খেয়ে এক কাপড়ে সর্বস্বান্ত হয়ে এপারে এসেছেন। অনেকের নিকটাত্মীয়রা খুন হয়েছেন, মা-বোন অত্যাচারিতা হয়েছেন, সব ওপারের সংখ্যাগুরু মুসলমানের হাতে—আকাশ থেকে নেমে কোনো বাঙ্গালি হিন্দুর শত্রু এই কাজ করেনি। কিন্তু নেহরু-গান্ধীবাদের সঙ্গে বামপন্থার এক বিচিত্র মিশ্রণ এবং ভারতে আসার পরে বাঙ্গালি উদ্বাস্তুদের প্রতি নেহরু সরকারের অত্যন্ত ঘৃণ্য ব্যবহার, বাঙ্গালি উদ্বাস্তুদের চিন্তাভাবনা ওলটপালট করে দিয়েছে। এবং কালক্রমে এপারের সংখ্যাগুরু হিন্দুদের মধ্যে একটা ভ্রান্ত ভাবনা তৈরি হয়ে গেছে যে, ওপারে যাই হয়ে থাকুক না কেন, মুসলমানের সম্বন্ধে কোনো বিরূপ সমালোচনা করা চলবে না। করলেই আপনি সাম্প্রদায়িক, সমাজে পতিত, আপনার সঙ্গে একসঙ্গে বসা চলবে না।

এঁরা ভুলে যান, উনিশশো ষাট-সত্তরের দশকে এঁরা বামপার্টিদের প্ররোচনায় পথে নেমে ভিয়েতনামি জনসাধারণের উপর মার্কিন বোমাবর্ষণের বিরুদ্ধে নেচেছিলেন। ভিয়েতনামে মার্কিন হস্তক্ষেপ নিঃসন্দেহে অন্যায় হয়েছিল, এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদও ঠিকই আছে, কিন্তু ভিয়েতনামিরা কি আমাদের কাছে

বাংলাদেশের বা পূর্বপাকিস্তানের হিন্দুদের চাইতে বেশি আপন ছিল? এঁরা ভুলে যান পাঞ্জাবি উদ্বাস্তুদের নিয়ে, পশ্চিম পাঞ্জাবে সংখ্যালঘু হিন্দু-শিখের উপর সংখ্যাগুরু মুসলমানের অত্যাচার নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়। রাওয়ালপিণ্ডির কাছে থোয়াখালসা গ্রামে নব্বইজন হিন্দু-শিখ রমণী কীভাবে কুয়োর ভিতর ঝাঁপ দিয়ে নিজেদের সম্মান বাঁচিয়েছিলেন তা নিয়েও প্রচুর আলোচনা হয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তো ইহুদিদের উপর নাৎসি জার্মানির অত্যাচার সবাই জানে। যত লজ্জা শুধু বাঙালি হিন্দুদের!

কিন্তু মূল প্রশ্নটায় ফিরে আসি। কেমন আছেন বাংলাদেশের হিন্দুরা?

এককথায়, অবশ্যই ভালো নেই। কিন্তু এই ভালো না থাকাটা এত সরল নয়, unqualifiedও নয়। আমি বারপাঁচেক বাংলাদেশে গেছি, হিন্দুদের সঙ্গে মিশেছি এবং তাদের মানসিকতা বুঝবার চেষ্টা করেছি। এই সময়ের মধ্যে আমি হিন্দু সাংবাদিক, হিন্দু রাজনীতিক, হিন্দু ধর্মীয় সংগঠক, হিন্দুর উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে যাঁরা সোচ্চার হন (যাঁদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান দুইই আছেন)। তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছি। এঁদের অনেকে কলকাতায় এসেও আমার সঙ্গে দেখা করে গেছেন, এবং বলেছেন যে পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশি হিন্দুদের নিয়ে ভাবেন এমন লোক বেশি নেই। বাংলাদেশের আওয়ামি লিগ নেতাদের সঙ্গে কথা বলেছি, প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট এরশাদ এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে কথা বলেছি। বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় কূটনীতিকদের সঙ্গেও কথা বলেছি। ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশি কূটনীতিকদের সঙ্গেও বলেছি। এবং বিদেশে, বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী বাংলাদেশিদের সঙ্গেও কথা বলেছি।

এঁদের কয়েক জনের নাম করি। এঁদের মধ্যে আছেন বাংলাদেশি সাংবাদিক কিশোরকুমার সরকার, বিমল প্রমাণিক, সৌম্য ব্যানার্জি, সত্যজিৎ চক্রবর্তী, রাজনীতিক এবং সাংসদ সুকুমাররঞ্জন ঘোষ, বীরেন সিকদার, নারায়ণ চন্দ্র চন্দ, গণেশ হালদার, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, আব্দুর রউফ, উবায়দুল মুক্তাদির চৌধুরী, বাংলাদেশি সাংবাদিক ও ব্যবসায়ী শোয়েব চৌধুরী, বাংলাদেশি কূটনীতিক ও বিজ্ঞানী নিমচন্দ্র ভৌমিক, ডাঃ দীপক দাস, বাংলাদেশি হিন্দুধর্মীয় সংগঠক নারায়ণ সাহামণি, পলাশ কান্তি দে, উচ্চপদস্থ বাংলাদেশি কূটনীতিক ও আমলা গওহর রিজভি, সাখাওয়াত হোসেন, নিসার চৌধুরী, তানভীর মনসুর, সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী, অ্যাডভোকেট রবীন্দ্র ঘোষ, ভারতীয় কূটনীতিক হর্ষবর্ধন শৃংলা, সর্বজিৎ চক্রবর্তী, রিভা গাঙ্গুলি দাশ, সন্দীপ চক্রবর্তী, মার্কিন প্রবাসী বাংলাদেশি শিতাংশু গুহ, টমাস দুলু রায়, দ্বিজেন ভট্টাচার্য, সুকোমল তালুকদার এবং আরও অনেকে। এবং আমার ব্যক্তিগত বন্ধু সালাম আজাদ ও অবশ্যই বিশ্ববিখ্যাত তসলিমা নাসরিন।

বাংলাদেশে হিন্দুদের ভালো না থাকার চেহারাটা কীরকম? সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, হিন্দুদের ওখানে সাধারণভাবে নিরাপত্তা আছে, কিন্তু নিরাপত্তাবোধ নেই। এই দুটোর মধ্যে সূক্ষ্ম তফাত আছে। ধরুন আপনি একজন হিন্দু ভদ্রলোক। দেশ ছেড়ে পালাননি, ময়মনসিং শহরে থাকেন। বাগেরহাট বা নীলফামারীতে কিছু দুষ্কৃতী হিন্দুমন্দির অপবিত্র করেছে বা হিন্দুর বাড়িতে আগুন লাগিয়েছে তাতে আপনার সাধারণভাবে বিচলিত হবার কথা নয়, যেমন ভারতে মণিপুরে জাতিদাঙ্গার খবরে আগরতলার মানুষ বিচলিত হন না। কিন্তু আপনি বাংলাদেশের হিন্দু হলে বিচলিত হবেন, এবং আপনার মনে প্রশ্নের উদয় হবে, বাগেরহাট বা নীলফামারীর পর কি ময়মনসিংহের পালা? এরই নাম নিরাপত্তাবোধের অভাব। বলে রাখা ভালো, শেখ হাসিনার প্রধানমন্ত্রিত্বের কালে এই নিরাপত্তাবোধ নিঃসন্দেহে সংকুচিত হয়েছে (উদাহরণ নাসির নগর ২০১৬, কুমিল্লা ২০২১, গুগল করলে বিশদ বিবরণ জানা যাবে)। শেখ হাসিনার হেফাজতে ইসলামের সঙ্গে মাখামাখি এই নিরাপত্তাবোধের অভাবকে আরও বাড়িয়েছে। তবু বলা যেতে পারে, হিন্দুর নিরাপত্তাবোধ কিন্তু সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়নি, কিছুটা আছে। কিন্তু এর আগে খালেদার আমলে এই নিরাপত্তাবোধ কোন তলানিতে গিয়ে পৌঁছেছিল তা লিপিবদ্ধ করেছেন শাহরিয়ার কবিরের টিম।

এগুলো হচ্ছে বড়ো রকমের নির্যাতনের কাহিনি। কিন্তু উঠতে বসতে হিন্দুদের কীরকম হেনস্থা করা হয় তার বিবরণ লিখে ওঠাই যাবে না। স্কুলের বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা হিন্দুদের খ্যাপায় এই বলে, 'হিন্দু হিন্দু তুলসীপাতা, হিন্দুরা খায় গোরুর মাথা'। কাফের, মালাউন, ইত্যাদি বুলিতো হিন্দুদের গা-সওয়া হয়ে গেছে, এগুলো সহ্য করেই হিন্দুদের যে বাংলাদেশে থাকতে হবে তা তারা জানে। হিন্দু মেয়েরা যদি একটু সুন্দরী হয় তাহলে তাদের দিকে অশ্লীল ইঙ্গিত তো উঠতে বসতে করা হয়। এর বিবরণ তসলিমার 'লজ্জা' এবং 'ফেরা', দুটো বইতেই আছে। এইসব কথা কি পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু মুসলমানদের কখনো শুনতে হয়? বর্তমান রাজত্বের কথা বলছি না, এখন তো তাদের 'দুধেলগাই' আখ্যা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীই দিয়েছেন, কিন্তু এর আগে সিপিএম বা কংগ্রেস আমলেও পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানদের এরকম কথা শুনতে হয়নি।

এর মানে কি বাংলাদেশের সমস্ত মুসলমানই হিন্দুদের ঘৃণা করে? তা মোটেই নয়। বাস্তবে বাংলাদেশি মুসলমানদের মধ্যে তিনটি গোষ্ঠী আছে।

প্রথমটি উদার, তাঁরা মানুষকে মানুষ হিসাবেই দেখেন, এবং তাঁদের মধ্যে মুসলমান-সত্তার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালি-সত্তাও প্রাধান্য পায়। এঁদের মধ্যে যাঁরা অগ্রগণ্য তাঁদের মধ্যে শাহরিয়ার কবিরের নাম আগেই করা হয়েছে। আরও আছেন মুনতাসির মামুন, সালাম আজাদ, আবুল বারকাত প্রমুখ ।

দ্বিতীয় গোষ্ঠীটি মাদ্রাসায় পড়া, এবং পৃথিবীর সব অমুসলমানকেই মনুষ্যেতর প্রাণী মনে করে। দুঃখের বিষয় এদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান, যা দেখতে পাওয়া যায় মেয়েদের মধ্যে হিজাব, এমনকী পর্দার প্রচলনের বৃদ্ধিতে। এরা মনে করে বাংলাদেশ

মুসলমানদেরই দেশ, হিন্দুদের 'হিন্দুস্থানে' বা ভারতে চলে যাওয়া উচিত, এবং সেটা নিশ্চিত করতে হিংসাত্মক কাজে বিশেষ দোষ নেই। শেখ হাসিনার সরকার এদের অনেককে ধরে ফাঁসিও দিয়েছে, যেমন সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী, মতিউর রহমান নিজামী, ইত্যাদি। এরা সাধারণভাবে আওয়ামি লিগ বিরোধী, এবং জামাতপন্থী, তবে প্রকাশ্যে বিএনপি-কে সমর্থন করে।

তৃতীয় গোষ্ঠীটি সবচেয়ে বড়ো। এরা সাধারণভাবে নিজেদের জীবনসংগ্রামে ব্যস্ত থাকে, পাঁচ বখত নামাজও সবাই যে পড়ে তা নয়, হিন্দুদের সঙ্গে আচার-আচরণে খুব শত্রুভাবও দেখায় না। কিন্তু যদি একবার কোনো কারণে হিন্দু নির্যাতন আরম্ভ হয়ে যায় তখন এরা তার প্রতিবাদ তো করেই না, বরঞ্চ সক্রিয় বা আধা-সক্রিয়ভাবে তার সুযোগও নেয়।

সমস্যার কথা হলো, এবার এর কি কোনো সমাধান আছে? একটা সমাধানের কথা অনেকেই বুঝে অথবা না-বুঝে বলেন—হিন্দুরা সবাই এপারে চলে আসুক না। বলাবাহুল্য, এটি একটি defeatist সমাধান, এবং আরও বহুগুণ সমস্যা সৃষ্টি করবে, অর্থাৎ এই বেকার-কণ্টকিত রাজ্যে আরও এককোটির উপর বেকারের আগমন ঘটাবে। অতএব হিন্দুদের ওখানে নিরাপত্তাবোধ নিয়ে থাকতে দিতেই হবে, এবং তারজন্য ভারতকে যথাযথ ব্যবস্থা করতে হবে। এবং এই ব্যাপারে বিজেপিকে, বিশেষ করে দলের পশ্চিমবঙ্গ শাখাকে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে। অন্য কোনো দল এবিষয়ে ব্যবস্থা নেবে না, কারণ মুসলমান ভোটের লোভে সর্বদাই তাদের জিভ দিয়ে জল পড়ছে।

এই সমাধানের রাস্তাটি খুব সরল হবে না, কারণ পশ্চিমবঙ্গে ক্রমাগত অনুপ্রবেশ ও মুসলমানদের সীমাহীন প্রজননের ফলে অবস্থা বেশ ঘোরালো হয়ে গেছে। কিন্তু কিছু করতেই হবে। না হলে সেই এককোটির উপর হিন্দু কালক্রমে ভারতে, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে চলে আসবে। এবং তারপর কী হবে তা না ভাবাই ভালো। কিন্তু এটি একেবারে অন্য বিষয় এবং এরজন্য বিশদ আলোচনা প্রয়োজন। বারান্তরে সেই আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

তথ্যসূত্র ঃ

শ্বেতপত্র, বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ১৫০০ দিন; একাত্তরের ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটি, ঢাকা, ২০০৫, গ্রন্থরাজি।

ভোজবাজি

শেখর সেনগুপ্ত

মেঘের খোঁজে পরিবেশ দপ্তরের তল্লাশিবার্তায় অনেক গরমিল। হাঁটতে হাঁটতে খণ্ড খণ্ড মেঘগুলি কোথায় যে গা-ঢাকা দিল, তার হদিশ দিতে দূরবিনও অসমর্থ। আপাতত বৃষ্টি নাস্তি। ফলে বাড়ছে দাবদাহের আশঙ্কা। তাপ তো শুধুমাত্র প্রকৃতির নয়, সেটা রাজনীতিরও। সামনেই যে পঞ্চায়েত ভোট। তাই ভাষণে লিখনে কত রকমের কাটাকুটি। এ সময়ে নেতা-নেত্রীরা আমের আচারের বদলে যেন ঝাললঙ্কা চিবুচ্ছেন। এহেন পরিস্থিতিতেও অনুত্তম চৌধুরীর বসবার ঘরে যাঁরা সমবেত, তাঁদের একজনও আর যাই হোক, রাজনীতির বাতাসে ডানা মেলে উড়ান দেন না। আসুন, আমরা প্রথমে ওদের পরিচিতি নিয়ে একটু মাথা ঘামাই। সংখ্যায় তাঁরা সাকুল্যে তিন। প্রথমজন অফুরান কল্পনা ও লিখন সামর্থ্যের অধিকারী পাঠকপ্রিয় সাহিত্যিক শিখর দত্তগুপ্ত, যিনি আবার সম্পর্কে গৃহস্বামী, দুঁদে

গোয়েন্দা অনুত্তম চৌধুরীর লতায়-পাতায় মাতুল। মুখ্যত সুপরিচিত গোয়েন্দা কাহিনির স্রষ্টা, এ পর্যন্ত যাঁর প্রকাশিত গ্রন্থসংখ্যা চার ডজনেরও বেশি। সামনেই পূজার মরশুম। লেখালেখির তাগিদ প্রায় তুঙ্গে। কাহিনির উপাদানের সন্ধানে হানা দিয়েছেন ভাগ্নের নিবাসে। কিছুটা রাস্তা হেঁটে আসতে হয়েছে। তপ্ত বায়ুর আছাড়ি-পিছাড়িতে ঘর্মাক্ত; তদুপরি রয়েছে তাঁর দীর্ঘকালীন ব্যাধি কোষ্ঠকাঠিন্য, কিছুতেই চায়ের সঙ্গে বাটারটোস্ট খেলেন না। তৃতীয় আসনে আসীনা অনুত্তম-ভার্যা আঁখি চৌধুরী। অনুত্তম সরকারি গোয়েন্দা দপ্তর থেকে অবসর নিয়ে প্রাইভেট ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি খোলার পর আঁখিই সেই এজেন্সির অন্যতমা হয়ে উঠেছে।

আঁখি-অনুত্তমের একমাত্র সন্তান কুশল এখন ব্যাঙ্গালোরে কম্পিউটার সায়েন্সে দিকপাল হবার সাধনায় দিন ও রাতকে এক করে ফেলছে।

অনুত্তম চৌধুরী সম্পর্কে আমি আর আপনাদের নতুন করে কী জানাবো? সরকারি গোয়েন্দা হিসেবে ভালোই রেকর্ড করেছে। এখন প্রাইভেট গোয়েন্দারূপে খ্যাতি তার আরও বর্ধিষ্ণু। অনুত্তম অবসর নেবার পর তাকে জড়িয়ে আঁখি যে বিজ্ঞাপন জনপ্রিয় বাংলা সংবাদপত্রে ছেপেছিল, তার বয়ানটা এখানে হুবহু তুলে ধরলাম ঃ '৩১ মার্চ, ২০২১, পঃ বঙ্গের ঝানু, খ্যাতিম্যান সরকারি গোয়েন্দা অফিসার শ্রী অনুত্তম চৌধুরী অবসর নিলেন। অতঃপর নিম্নোক্ত ঠিকানায় নিজস্ব আবাসে তিনি চালু করলেন একটি প্রাইভেট ডিডেকটিভ এজেন্সি। আপনারা প্রয়োজনে এই প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নিতে পারেন।'

বিজ্ঞাপনটি ছোট নয়। পকেট কিছুটা হালকাও হয়ে গেলো। বিজ্ঞাপন প্রকাশের ঠিক তিন দিনের মাথায় সাতসকালে ডোরবেলটা বেজে ওঠে। কপাট খুললেন এ বাড়ির সর্বক্ষণের কর্মী জগুদা। প্রবেশমুখে দাঁড়িয়ে আছেন এই হাউসিং কমপ্লেক্সের জবরদস্ত প্রমোটার বসন্তলাল খেমকা।

'চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে কথা ছিল।'

'উনি আছেন। ভেতরে আসুন।'

খেমকা এলেন। অনুত্তমের সঙ্গে চললো পারস্পরিক আলোচনা দু'চারটা কথার পরই বেরিয়ে এলো খেমকার বিনম্র আবেদন, '... পরশু সানডে। এ গুড ডে ফর অল অফ আস। ওই দিনই এই কমপ্লেক্স 'রাধাকুঞ্জ'-এর প্রতিষ্ঠা দিবস। আ হলি ডে। আমি এবার ওই দিনে একটা অনুষ্ঠান করতে চলেছি। এখানকার সকলে তো থাকবেনই। তাছাড়া আসবেন কাউন্সিলর,চেয়ারম্যান, বহু বিশিষ্টজন। আমি চাই, সেই সভার সভাপতি হবেন এখানকারই একজন ফ্ল্যাটওনার, আপনার সাহিত্যিক মামা মিঃ শিখর দত্তগুপ্ত। আপনি ওনাকে রাজি করান।'

খেমকার কথা শেষ হতেই প্রবীণ লেখক শিখর দাত্তগুপ্ত খানিকটা কাঁপা গলায় জানালেন, 'আরে, আপনি আর লোক পেলেন না। আমার বয়সটা দেখুন। আপনি লোকাল এমএলএ অথবা পুরসভার চেয়ারম্যানকে ধরুন। আমি মশাই এমন কী?

খেমকা জানালেন, 'চেয়ারম্যান আউট অফ স্টেশন। কুলুতে গিয়েছেন সপরিবারে। আর আপনি একজন পপুলার রাইটার।'

'না, তেমন পপুলার হতে পারিনি', মামা নিজেই একটি প্রস্তাব দিলেন, 'আপনি বরং এলাকার কৃষ্ণমন্দিরের সন্ন্যাসী পুরোহিতকে এনে বসাতে পারেন সভাপতির আসনে।'

খেমকা পত্রপাঠ মামার প্রস্তাবকে উড়িয়ে দিলেন। তিনি কিছুতেই অনুত্তমের মামার কোনও বিকল্পকে মান্যতা দিতে রাজি নন। সাহিত্যিক শিখর দত্তগুপ্তকে প্রস্তাবিত সভার সভাপতিত্ব করতেই হবে!

দুই

চিনারপার্ক থেকে রাধাকুঞ্জের দূরত্ব এতই সামান্য যে এখানে দাঁড়িয়ে চিৎকার করলে যেন তার শব্দ গিয়ে অচিরে পৌঁছবে চিনারপার্কে। এই এলাকাতেই আবক্ষশিল্পের অতীব রমরমা। কারা, কীভাবে যে আধা কোটি, এক কোটি টাকা খসিয়েও বাহারি ফ্ল্যাট বাড়ি হাসিল করেছেন, করে চলেছেন, ভাবলে অনেকেরই মাথা ঘোরাবে। এ এলাকারই সবচেয়ে সাধারণ মানের তথা ক্ষুদ্রতম হাউসিং কমপ্লেক্সটিরই নাম 'রাধাকুঞ্জ'। এরই প্রথম বার্ষিকী প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হলো। সভাপতির চেয়ারে গিয়ে বসতেই হলো অনুত্তমের লেখক মামা শিখর দত্তগুপ্তকে। ভাষণ দেবার ক্ষমতা যে মামার আদৌ কম নয়, তার সবুদও মিললো। বিশেষত তাঁর বক্তব্যের বুনিয়াদে রয়েছে অর্থনীতি বিষয়ক বিবিধ জটিল ও তাত্ত্বিক তথ্যের সংমিশ্রণ। ধান ভাঙতে গিয়ে শিবের গীতিও বিলক্ষণ।

উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে অনুত্তম থাকলেও আঁখি আসেনি। আঁখি তার এক বান্ধবীকে বগলদাবা করে গিয়েছে উল্টোডাঙ্গার 'উত্তরণ' বিক্রয়কেন্দ্রে পছন্দসই শাড়ি কিনতে। শাড়ি কিনতে মেয়েরা তো বেশ কিছুক্ষণ সময় নেবেই। বড়বড় টানটান নীল ছোব কাপড়ের গুণাগুণ নির্ণয়ে নিশ্চয় একান্ত ব্রতী।

'রাধাকুঞ্জ'র ব্লক মাত্র চারটি অর্থাৎ এখানে ফ্ল্যাটের সংখ্যা সাকুল্যে চৌষট্টি। এদের মধ্যে এযাবৎ বিক্রি হয়েছে মাত্র তেইশটি। ক্রেতাদের সিংহভাগ এনআরআই। তাঁদের মধ্যে পজেশন নিয়েছে সাকুল্যে আটটি পরিবার। লক্ষণীয়, সেই আট কর্তাই কম-বেশি প্রৌঢ়ত্বের ঊর্ধে। সকলেই কর্মক্ষেত্র থেকে

অবসরপ্রাপ্ত। একজন প্রায় অথর্ব। আবার একজনের ঘটেছে প্রবল স্মৃতিবিভ্রম।

ফর্মাল সভা শেষ হবার পর অনুত্তম ও তার মামাসমেত সেই অষ্ট গৃহস্বামীকে নিয়ে অতিকায় অফিসঘরে জাঁকিয়ে বসলেন প্রমোটার খেমকা। গদিসাঁটা কোচগুলির বাহার আছে। অফিসঘরটিও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। গোঁসা করবার অবকাশ কারও নেই। বরং কেমন যেন একটা ঘুম ঘুম আমেজ। প্রোমোটারের টেবিলের ওপর সাদা-নীল ফুল, পিছনে গণেশদেবের বাঁধানো ছবি, ঘরের বাইরে কিন্তু শালিখরা ধুলোয় স্নান করছে। ধূপকাঠি পুড়ছে। সুগন্ধ। ঘর থেকে অনেকটা দূরে একটা ষাঁড় একইসঙ্গে দুটো গোরুকে কবজা করবার চেষ্টায় ভূমিকম্প না এনে ছাড়বে বলে মনে হয় না।

গলায় খানিক মেয়েলি সুর এনে খেমকা বলতে শুরু করে দিলেন, 'আমার খুনে ব্যবসায়ের বীজ পুঁতে দিয়েছিলেন আমার দাদামশাই। তাঁর ছিল লোহালক্কড়ের দোকান বড় বাজারে। সেখানে দেরাজের ওপর বসানো থাকতো পাথরের তৈরি মস্ত এক লক্ষ্মীমূর্তি। আমি ফিজিক্সের গুড এম.এসসি হয়েও চলে এলাম রিয়েল স্টেটসের কারবারে। প্রচুর রেস্ত যে ছিল, তা কিন্তু নয়। ভাগ্যিস ওই মনোরম ব্যক্তিত্বের মানুষ গুপ্তসাহেব আমাকে ব্যাঙ্ক থেকে লোন পাইয়ে দিলেন। তাই—'

খেমকা যাঁর দিকে আঙ্গুল তুললেন, উপস্থিত সকলেরই নজর তাঁর ওপর নিবদ্ধ হলো। ছোটখাটো চেহারা, কপালে চন্দনের টিপ। সাধুসজ্জনের মতো নির্লিপ্ত ভাব, চোখে দামি মেটালের চশমা, ফুলহাতা শার্টের রং যেন গ্রিন ব্যানানা রং। বয়স যাই হোক, দেহ ধরে রেখেছে তারুণ্য, তবে মস্তিষ্ক কেশবিরল; চুল যে ক'টা আছে, সবই ধবধবে।

বিনায়ক গুপ্ত সবিনয়ে বললেন, 'আমি ছিলাম দেশের সবচেয়ে বড়ো বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের একজন ব্রাঞ্চম্যানেজার। মিঃ খেমকা যখন লোনের জন্য অ্যাপ্লাই করেন, আমি খবর নিয়ে বুঝলাম, এই লোক টাকা মারার চেষ্টা করবেন না। তাই কিছু নিয়মকানুন উপেক্ষা করেই আমি তাঁকে ব্যাংকলোনের ব্যবস্থা করে দিই। আমি নিজেও স্টাফলোন নিয়ে খেমকার কাছ থেকে একখানা ফ্ল্যাট কিনে ফেললাম।'

খেমকা খেই ধরলেন, 'সব রামজির কৃপা। আমিও একজন সাচ্চা দোস্তকে পেয়ে গেলাম।'

খেমকা একটু থেকে দূরে বসে থাকা এক অতি বৃদ্ধের কাছে

জানতে চাইলেন, ‘প্রফেসর, অনুষ্ঠান কেমন লাগলো?’

বৃদ্ধ যেন হতবাক, ‘অনুষ্ঠান! কীসের অনুষ্ঠান?’

‘ও গড, এরমধ্যেই সব ভুলে গেলেন! আমি নিজে আপনাকে ধরে ধরে নিয়ে গেলাম!’

জানা গেল, এই হাউসিং কমপ্লেক্সে নব্য আগত বয়স্ক ব্যক্তিটির নাম মিঃ জগন্নাথ ভক্ত। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে ডক্টরেট হয়েছেন কয়েক দশক আগে। খানকয়েক সারগর্ভ গ্রন্থের রচয়িতা। অধ্যাপনা করতে করতে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এখন চলাফেরায় খুব কষ্ট। স্ত্রীর সর্বক্ষণ প্রহরাই ভরসা।

‘আমরা এখন আট জন বৃদ্ধ। সংখ্যাটা আরও বাড়বে, যেহেতু আরও তিন/চার জন বুড়ো মাঝে মাঝে এসে খবর নিয়ে যান, খেমকাজির কাছ থেকে আর একটু কম দামে ফ্ল্যাট কেনার আশায়।’

কথাগুলি যিনি বললেন, সেই বয়স্ক মানুষটি বসে আছেন শিখর দত্তগুপ্তর পাশের চেয়ারে। নাম দেবব্রত কুশারী। কর্মজীবনে ছিলেন পোস্টাল ইনেসপেক্টর। সারা জীবনে বিয়েই করলেন না। খেমকার কাছ থেকে একখানা ফ্ল্যাট কিনে কীভাবে যে একাকিত্বকে জয় করছেন, তা আলোচনার বিষয়।

এঁদের আলোচনা ও রসালাপ যখন ধাপে ধাপে ওপরের দিকে উঠছে, আচমকা নিভে গেল সকল আলো। লোডশেডিং। পরমুহূর্তে ঘর আলোকিত ব্যাটারির আলোয়। .... কারোর অনুরোধের অপেক্ষা না করেই এবার যিনি নিজের বিষয়ে বলতে শুরু করলেন, তিনি বয়সে সমবেতদের সমবয়সি হলেও দেহকাঠামো যে যথেষ্ট মজবুত তা বুঝতে ভুল হয় না। তাঁর উচ্চারণও খুব স্পষ্ট, ‘আমার নাম সাধন সেনগুপ্ত। চেহারা দেখে নিশ্চয় অনুমান করতে পারছেন, আমি নিয়মিত শরীরচর্চা করে থাকি। কপালে যেটুকু ঘাম জমে, তা মুছতে একখানা মেয়েলি রুমালই যথেষ্ট। আমি তো আসলে একজন ব্যায়ামশিক্ষক। কলকাতায় দু’-দুটো ব্যায়ামাগার আমি চালাই। আমার স্ত্রী মীরা সেনগুপ্ত বাড়িতে বেশ কয়েকজন মহিলাকে যোগব্যায়াম শেখান। এটাই আমাদের প্রফেশন। এর থেকে মাসে যত টাকা উপার্জন হয়, তাতে সংসার চালাতে গিয়ে দমে যাই না। কেবল শরীর নয়, মনের জোরও বাড়ে শরীরচর্চার মাধ্যমে। জয়েন্ট ফ্যামিলির অন্তর্নিহিত সুবিধা ও গুরুত্ব আমি ও আমার স্ত্রী ভালোভাবেই উপলব্ধি করে থাকি। দুই ছেলে। তাদের বিয়ে দিয়েছি। দু’জনই ভারতীয় রেলের কর্মী। একজন থাকে মালদায়, অন্যজন শিলিগুড়িতে। কোনও রাজনৈতিক দলের হয়ে গলা ফাটাই না।’

সময় গড়াতে গড়াতে সন্ধ্যা পার হয়ে ঢুকে পড়েছে রাত্রিতে। তাপপ্রবাহ অব্যাহত। এই বিষয়ে দিনের সঙ্গে রাতের পার্থক্য ঊনিশ-বিশ। মিঃ খেমকার সৌজন্যে আর এক রাউন্ড চা হয়ে গেল। দু’ প্যাকেট লম্বা সিগারেটও এসে পড়ল টেবিলে। পাঁচজন ফ্ল্যাট বাসিন্দার পরিচিতি মন দিয়ে শুনলেন মামা। তিনি মানুষদের নিয়ে চর্চা করেই থাকেন; কারণ তিনি যে এখন সৃষ্টিশীল লেখক। পরিচিতি প্রদান কিন্তু বাকি রয়েছে আরও তিনজনের। সুগত পাল, সমীর বসু ও মোল্লা আতাউল্লা মণ্ডল। সুগত পালের লোহালক্কড়ের দোকান ভিআইপি রোডের ওপর কৈখালিতে। নিউটাউনেও ফ্ল্যাট কিনেছেন। কিন্তু থাকতে চান রাধাকুঞ্জে। সমীর বসুকে অনেকে জমি-বাড়ির দালালরূপেই চেনেন। আগে রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাতেন। এখন এই বিষয়ে বিলকুল নিশ্চুপ। বয়স্কা স্ত্রীর মাথায় এখনও আধহাত ঘোমটা। সমীরবাবুর বেশ কিছু জায়গাজমি রয়েছে বর্ধমানের তেজগঞ্জে। সেখান থেকে ধানবেচা টাকা আসে। মাঝে মাঝে তেজগঞ্জে যান। সেখানে তাঁর মেজাজের প্যাটার্ন অনেকেটাই আলাদা।

এবং এই আতাউল্লা মণ্ডল। গালভর্তি সাদা-কালো দাড়ি। হোমিওপ্যাথি করেন, রেজিস্ট্রেশন থাকলেও হোমিও কলেজের ডিগ্রিটি তাঁর নেই। নম্র, মিষ্টিভাষী। কিন্তু পরিস্থিতির দাবিতে স্বর চড়িয়ে মেজাজ দেখাতেও জানেন। বিবি রহিমা বাম আমলে পুর কাউন্সিলর হয়েছিলেন একটা টার্মের জন্য। প্রতিদিন দু’জনে একলোটা করে দুধ খান। আতাউল্লার প্রাকটিস মন্দ নয়। খেমকা ফ্ল্যাটের যে দর হেঁকেছিলেন, আতাউল্লা ও রহিমাবিবি তা নিয়ে বারগেনিং করেননি। একলপ্তে সব টাকাটাই নগদে টেবিলের ওপর রেখেছেন। ছেলে হিপ্পা বাইক ছুটিয়ে নিজের উপস্থিতিকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলছে দ্রুত। উল্টোডাঙ্গায় একটা বড়ো ফলের দোকানের মালিকানা তার। বহিনের শাদি দিয়েছে রাজাবাজারের আর এক ফলদোকানির সঙ্গে।

এই শেষ তিন কুশীলবের বিবরণ সবিস্তারে বেরিয়ে এলো খেমকাজিরই বচন থেকে। মামা চোখ বুজে সব শুনলেন। কী ভাবছেন? এই চরিত্রগুলিকে নিয়ে একখানা উপন্যাস লিখবেন? কিন্তু তিনি যে মুখ্যত একজন গোয়েন্দা কাহিনির লেখক ,এখানে রহস্যটা কোথায়?

তিন

সংবাদপত্র যদি আয়না হয়, তাহলে সেখানে চোখ বোলালে অনেক পাঠকেরই হৃদকম্প উপস্থিত হবে। খবরের এমতো দ্যোতনা অনস্বীকার্য।

তিনটা খুন, দুটো রেপ, এক পার্টির সতত ব্যস্ত মাঝারি

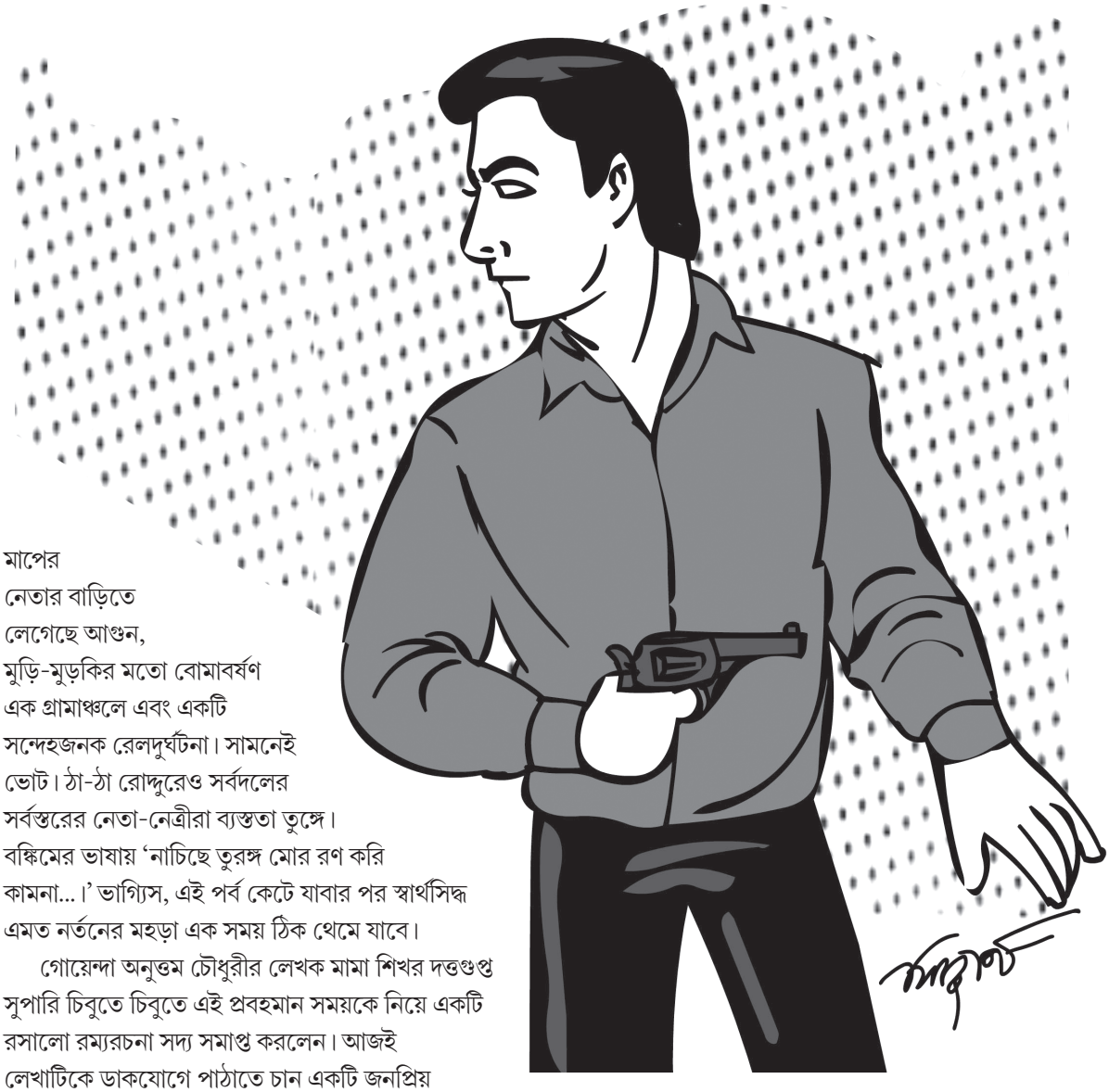

মাপের
নেতার বাড়িতে
লেগেছে আগুন,
মুড়ি-মুড়কির মতো বোমাবর্ষণ
এক গ্রামাঞ্চলে এবং একটি
সন্দেহজনক রেলদুর্ঘটনা। সামনেই
ভোট। ঠা-ঠা রোদ্দুরেও সর্বদলের
সর্বস্তরের নেতা-নেত্রীরা ব্যস্ততা তুঙ্গে।
বঙ্কিমের ভাষায় 'নাচিছে তুরঙ্গ মোর রণ করি
কামনা...।' ভাগ্যিস, এই পর্ব কেটে যাবার পর স্বার্থসিদ্ধ
এমত নর্তনের মহড়া এক সময় ঠিক থেমে যাবে।

গোয়েন্দা অনুত্তম চৌধুরীর লেখক মামা শিখর দত্তগুপ্ত সুপারি চিবুতে চিবুতে এই প্রবহমান সময়কে নিয়ে একটি রসালো রম্যরচনা সদ্য সমাপ্ত করলেন। আজই লেখাটিকে ডাকযোগে পাঠাতে চান একটি জনপ্রিয় সাপ্তাহিক পাঁচমিশেলি পত্রিকায়। ছাপা তো হবেই; সেইসঙ্গে মিলবে কাঙ্ক্ষিত দক্ষিণাও। রহস্য গল্প, উপন্যাস লেখার ফাঁকে ফাঁকে এই ধরনের লেখা চালিয়ে যেতে পারলে লেখকের কৌলীন্য বাড়ে। ...বেশ কিছু-দিন ধরে অনুত্তম ও আঁখির সঙ্গে মাতুলের যোগাযোগটা কমে এসেছে। অনুত্তমের ডিটেকটিভ এজেন্সি আজ অবধি একটি কেসও পায়নি। আসলে মানুষের মন থেকে আস্থা তথা নির্ভরতাসূচক মানসিকতা ক্রমেই কমে আসছে। অদ্ভুত এক টলমল ভাব। কখন যে বিনা কারণে কার গলায় বিষাক্ত কাঁটা বিধে যাবে, আগাম বলে দেওয়া বহু ক্ষেত্রেই অসম্ভব। আর মাত্র মাস চারেক বাদে বাঙ্গালিদের সবচেয়ে বড়ো উৎসব। নয়-নয় করেও গোটা তিনেক উপন্যাস এবং ছয়টি ছোটগল্প তাঁকে নামাতেই হবে খ্যাত-স্বল্পখ্যাত গুটি কয়েক জনপ্রিয় সাহিত্যপত্রের শারদসংখ্যার জন্য।

কিন্তু রচনা যে করবে, তাদের মালমশলা আর কতটুকু। অধিক কল্পনায় খাবি খেতে মনের সায় কতটুকু! সেই অভাবপূরণার্থেই মোবাইলের বোতাম টিপে ভাগ্নে অনুত্তমকে পাকড়ালেন।

'অনু।'

'বলো, মামা।'

'কেসটেস কিছু পেলি?'

'এক্কেবারে নিল।'

'অতবড়ো বিজ্ঞাপন দিলো আঁখি। তারপরও—'

'আমি এখনও ধৈর্য হারাইনি।'

'কোনও কেস এলে আমাকে কিন্তু অবশ্যই জানাস। আমি, আবার রয়েছি প্লটের সন্ধানে।'

'সিওর।'

লেখক মামাকে আশ্বস্ত করে মোবাইলটাকে বুকপকেটে ঢোকাবার মিনিট তিনেকের মধ্যে সেটা আবার পল রবসনের গান শোনাতে শুরু করে।

এবার ফোন এসেছে মিঃ খেমকার কাছ থেকে। গলার স্বর

LAUREL

With Best Wishes From-

PRAKASH-PRAMOD BAID

Laurel Securities Private Limited

(Member of National Stock Exchange of India Ltd.)

LAUREL ADVISORY SERVICES
PRIVATE LIMITED
(Investment Advisor Mutual Fund Distributor)

JAIN BAID & COMPANY
(Chartered Accountants)

909-910, Diamond Heritage, 16, Strand Road, 9th Floor, Kolkata - 700001
Phone No. 66153334-39, Fax No. 66153341 Email ID - prakash_laurel@yahoo.com

শারদীয়ার শুভ মুহূর্তে সকলকে জানাই প্রীতি,
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন—

With Best Compliments from :

C. S. SALES (INDIA) PVT. LTD.

18, Amratala Street, 1st Floor
Kolkata - 700 001

উত্তেজনায় বা আতঙ্কে কম্পমান।

'খেমকা জি! কী খবর?'

'সাংঘাতিক খবর। মার্ডার! রাধাকুঞ্জে! হেনস্থার একশেষ!'

'বলেন কী?'

'আমার স্বপ্নের প্রজেক্ট। আর সেখানেই খুনখারাপি। কী যে...' অস্থির, আতঙ্কিত খেমকার গলার স্বর বুজে আসতে চাইছে। পাশে এসে দাঁড়িয়েছে আঁখি। অনুত্তম তাকে বললো, 'আমাদের এজেন্সির প্রথম কেসটা এসে গেলো।'

'খুলে বলো।'

'তোমার নিশ্চয় মনে আছে, মাত্র ক'দিন আগে খেমকাজি এসেছিলেন রাধাকুঞ্জের প্রথম প্রতিষ্ঠাদিবসে আমন্ত্রণ জানাতে।'

'মনে আছে।'

'তুমি অনুষ্ঠানে না গেলেও আমি গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখলাম, উপস্থিতি কেবল রাধাকুঞ্জের আটটি পরিবারের। আট বৃদ্ধ আবাসিক। আটজনই তাঁদের কর্মজীবনে কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছেন। আট জনের মধ্যে একজনকে বাদ দিলে বাকি সাতজনই যেন ক্রিজে সেঁটে থাকা রাহুল দ্রাবিড়। ভুল শট মেরে আউট হবার বান্দা নন। আঁখির তীক্ষ্ণ প্রশ্ন, 'তো সেই দ্রাবিড়সম বৃদ্ধই কী খুন হলেন?'

'না। খুন যিনি হলেন, তিনি ছিলেন একজন স্পষ্টবাদী, সাহসী সাংবাদিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ। সকলের নিকট ছিলেন সরস এবং মুক্তমনের মানুষ। নাম অসীম সরকার।'

'নাম ও পরিচিতি সম্পর্কে আমি ওয়াকিবহাল। গত সপ্তাহে একটি পত্রিকায় ওঁর লেখা একটি চমৎকার আর্টিকেলও পড়লাম। নাম 'এই সরকার, নির্বাচন এবং মানসিকতা।'

'মামাকে খবর দিচ্ছি। তুমি কি যাবে?'

'এখন নয়।'

ডাক পেতেই মামা হাজির। ততক্ষণ আঁখিও তার সিদ্ধান্ত বদলেছে—সেও যাবে রাধাকুঞ্জে। প্রকৃতি যথারীতি মারমুখী। তাপ প্রবাহ হিংস্র—পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি। নির্বাচনে ক্ষমতাশীল দলের এলেমেলো দাপাদাপি,—নির্বাচনী যুদ্ধের আবহে তাঁদের আর তেমন অনুকূল মনে হচ্ছে না।

অনুত্তম ইতিমধ্যে খেমকাকে জানিয়ে দিয়েছে, তার কোনও চারচাকা গাড়ি নেই। বরাবর সরকারি গাড়িতেই যাতায়াত করেছে একটার পর একটা কুয়াশাবৃত রহস্যকে আলোতে নিয়ে আসতে। ফলে খেমকা তাঁর নিজেরই চারচাকাটিকে পাঠালেন গাড়ির ড্রাইভার সমেত। আঁখি ও অনুত্তমকে নিয়ে সেই গাড়ি আবার ফিরে চললো। হাউসিং কমপ্লেক্সে ঢোকার মুখে দাঁড়িয়ে অপেক্ষমান খেমকা। বিচলিত। ঠোঁটের কোন থেকে হাসি লুপ্ত। দু'চোখের দৃষ্টিতে বিভ্রান্তি। স্বরে ঈষৎ কম্পন, 'আপনি আসাতে আমার অস্থিরতা একটু কমলো।' অনুত্তম ও আঁখিকে নিয়ে খেমকা তাঁর অফিসঘরে গিয়ে ঢুকলেন। কথা কয়েক ধাপ পার হতেই অনুত্তম খেমকাকে বললো, 'খেমকাজি, প্রথমেই আমি আপনাকে একটা কথা মনে করিয়ে দিতে চাই। বিষয়টা হলো, আমি কিন্তু এখন আর পুলিশ ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে যুক্ত নই। আমি একশো ভাগ প্রাইভেট গোয়েন্দা। আমার কাজের ধারা সম্পূর্ণ নিজস্ব। প্রথমেই আপনার মুখ থেকে গোটা বৃত্তান্তটা শুনে নিতে চাই। তারপর কাজে হাত দেওয়া।

'তাহলে, এখুনি চলুন আমার অফিসঘরে।'

'চলুন।'

চা এলো বিস্কুট সমেত।

অনুত্তম টানা বলতে থাকে, 'যে কোনও খুনের পিছনে কতগুলি অবধারিত কারণ থাকে। এমনকী রাজনীতি ও তজ্জনিত রেষারেষি। আপনার সঙ্গে বিস্তারিত কথা তো হয়নি। কিন্তু যেহেতু আপনি আমার সার্ভিস হায়ার করতে চাইছেন, আপনার জানা ও অনুমিত সকল তথ্য ও মতামত আমাকে জানতেই হবে।'

খেমকা নিজের কপালে ও গালে রুমাল ঘষলেন। বললেন, আমি শঙ্কিত এ কারণে যে, অসীম সরকার খুন হওয়াতে রাধাকুঞ্জের সমস্ত সুনাম কবরস্থ হলো। আমি সেই সর্বনাশকে চিনে নিতে চাই।'

সামান্য বিরতির পর খেমকা আবার বলতে থাকেন, 'অসীম সরকারকে এখানে এনেছিলেন ব্যাংক অফিসার মিঃ গুপ্ত। সরকার নামি সাংবাদিক ছিলেন। তাঁর স্ত্রী রত্নাময়ী দেবী এককালে সরকারি কলেজের অধ্যাপিকা ছিলেন। অসীমবাবু অজাতশত্রু ছিলেন না। জরুরি অবস্থার সময় সরকারবিরোধী একাধিক লেখার জন্য হাজতবাসও হয় তাঁর। বলতেন, আমার টাকার জোর কম; তাই কমদামে যদি চারতলাতেও একটা ছোট ফ্ল্যাট পাই, কিনতে পারি। তখন 'সি' ব্লকে চারতলার ছোটো ফ্ল্যাটটা আমি তাঁকে কমদামে বিক্রি করি। অসীমবাবু স্থানীয় লোকদের সঙ্গে মেলামেশা কম করতেন। লেখালেখি নিয়েই ব্যস্ত। তবে তাঁর স্ত্রী রত্নাদেবী খুব সোশ্যাল। এই কমপ্লেক্সে যতজন মহিলা আছেন, সকলের সঙ্গে তাঁর ছিল বন্ধুত্ব। এ বাড়ি ও বাড়ি ঘুরতেন।'

খেমকা ঈষৎ বিরতি দিলেন। তারপর আবার বলতে থাকেন, 'অসীমবাবু যে সন্ধ্যাতে খুন হন, মিসেস সরকার তখন ছিলেন গ্রাউন্ডফ্লোরের জগন্নাথ ভক্তের ফ্ল্যাটে। মিঃ ভক্ত কানে খাটো, স্মরণশক্তিও খুব দুর্বল। সামাজিকতা রক্ষা করতেন তাঁর মিসেস নিশাদেবী। মিসেস সরকার নিশাদেবীকে নিয়ে বের হলেন স্থানীয় বটতলা মার্কেটে গিয়ে টুকটাক কিছু কিনতে। ফিরে এলেন এক ঘণ্টার মধ্যে। আর ওই সময়ের মধ্যেই খুন হলেন অসীম সরকার। রত্নময়ীদেবী দেখলেন, দরজা ভেজানো। ঠেলতেই খুলে গেল। দেখলেন সেই ভয়াবহ মর্মান্তিক দৃশ্য। অসীম সরকারের প্রাণহীন, রক্তস্নাত দেহটা নিঃসাড়ে পড়ে

আছে মেঝেতে। মাথা ফেটে চৌচির। রক্তে ভেসে গিয়েছে গোটা ফ্লোর।'

খেমকা চোখ বুজলেন। নীরব।

অনুত্তমের প্রশ্ন, 'তারপর?'

খেমকা পুনরায় শুরু করেন, 'আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে রত্নময়ী দেবীর আর্তনাদ। থানায় আমিই খবর দিলাম। পুলিশ এসে গেল। কেস ডায়েরি লেখা হলো। বডি তুলে নিয়ে যাওয়া হলো পোস্টমর্টমের জন্য। খবর পেয়ে দু'জন সাংবাদিকও এলেন। প্রচুর ছবি তোলা হয়েছিল। খবরটা একদিন বাদে কাগজেও স্থান পায়। কিন্তু সুরাহা? কেন হলো এমন? প্লিজ, আপনি নিন কেসটা। আপনার প্রাপ্য আমরা মেটাতে পারবো।'

অনুত্তম বললো, 'পুলিশের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন। আমিও রাখবো। এটা কোন থানার আন্ডারে?'

'এয়ারপোর্ট থানা।'

'মিস্টার হারাধন হলেন অফিসার ইন-চার্জ।'

'উনি এসেছিলেন।'

'আমি তাঁর সঙ্গেও আলোচনা করবো। এখন, সবার আগে বিনায়ক গুপ্তর সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'খুনের স্পটে যাবেন না?'

'সেটা তো এতক্ষণে বহুজনের যাতায়াতে গুরুত্ব প্রায় হারিয়েছে। খানিক পরে গেলেও চলবে।'

অনুত্তমরা তিনজনই খেমকাকে অনুসরণ করে। 'বি' ব্লকের দ্বিতলে মিঃ গুপ্তর ফ্ল্যাট। ব্যাংকের বড়ো অফিসার ছিলেন। অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ক অনেক বই। আবার একটা দাবার বোর্ডও রয়েছে।

অনুত্তমের প্রশ্নের জবাবে গুপ্ত ভাঙাগলায় জানালেন, 'আমি কেবল হতভম্ব নই, আতঙ্কিত। রাধাকুঞ্জ ছিল শান্ত, শান্তির জায়গা। সেখানে একী কাণ্ড। আমিই তো অসীমকে এখানে নিয়ে এসেছিলাম।'

'কেন নিয়ে আসেন?'

'কারণ আমাদের নিবিড় বন্ধুত্ব। তা ছাড়া মিঃ খেমকা একজন বিশিষ্ট ভদ্র প্রমোটার।'

'জানলাম, অসীমবাবু খুন হয়েছেন ভর সন্ধ্যায়। এ বিষয়ে আপনার অভিমত কী?'

গুপ্তর উত্তর, আমি কী অভিমত দেবো? তাকিয়ে আছি তো আপনারই মুখের দিকে। অসীমের বউ তখন ঘরে নেই। অসীম ঘরে একা। হাউসিং কমপ্লেক্সের গার্ড বাহাদুরের নজর এড়িয়ে খুনি ঢুকতে পেরেছিল অসীমের ফ্ল্যাটে। অসীম আচমকা আক্রান্ত হলো। মাথা ফেটে চৌচির।'

অনুত্তম প্রসংশা করে, 'খুব সংক্ষেপে সঠিক ছবিটা জানালেন। তবে একটা কথা ভুললে চলবে না। ফ্ল্যাটের দরজা ছিল বন্ধ; অর্থাৎ আততায়ীকে কলিংবেল টিপতে হয়েছে।'

'রাইট, রাইট। এখানে কিন্তু আবার প্রতিটি ফ্ল্যাটের প্রবেশদ্বারে 'আই হোল'ও সেট করা আছে।'

এবার মুখ খুললেন অনুত্তমের লেখক মামা, 'অসীম সরকারকে কিন্তু আমার বেশ শক্তপোক্ত চেহারার মানুষ বলে মনে হয়েছে। তাঁকে মাথা ফাটিয়ে খতম করতে পেরেছে যে লোক, সে যে কতদূর বলশালী সেটাও ভেবে দেখা উচিত। তবে আক্রমণটা দলবদ্ধভাবেও হতে পারে।'

খেমকা আচমকা বলে উঠলেন, 'রাধাকুঞ্জের সেরা বলবান ব্যক্তি নিশ্চয় সাধন সেনগুপ্ত। ব্যায়ামবীর। তবে—'

বাক্য অসমাপ্ত থাকে।

চার

সম্ভাব্য যে সময়সীমার মধ্যে অসীম সরকার খুন হন, এই কমপ্লেক্সের গেটে পাহারা দিচ্ছিল জিৎ বাহাদুর। তিন দিকে সাড়ে সাত ফিট উঁচু প্রাচীর। গোটাটাতেই গাঁথা আছে পেরেক। জিৎ বাহাদুর বুক চিতিয়ে জানিয়ে দিলে ওই সময়ে একটা মাছিও রাধাকুঞ্জে ঢুকতে পারেনি। আর বিকেল থেকে রাত অবধি রাধাকুঞ্জ থেকে বেরিয়েছিলেন মাত্র দু'জন মহিলা—অসীম সরকারের স্ত্রী রত্নময়ীদেবী এবং ডাঃ ভক্তের গৃহিণী নিশাদেবী। দু'জন কথা বলতে বলতে ফিরেও আসেন ঘণ্টাখানেকের মধ্যে। তারপরই ভেতরে ঢুকে রত্নময়ী দেবীর সেই বুকফাটা আর্তনাদ।

বহুক্ষণ চুপ করে সব শোনার পর মুখ খুললো আঁখি, 'এর অর্থ এখানকার আটজন বৃদ্ধের মধ্যে যে কোনও একজন অসীমবাবুর খুনি।'

অনুত্তম বললো, 'এবং সেই বৃদ্ধ খুনির বাহুবল বিস্ময়কর।'

বললেন, 'বৃদ্ধদের মধ্য থেকে বাদ দেওয়া উচিত ড. জগন্নাথ ভক্তকে। নিতান্ত অশক্ত মানুষ। কানে কম শোনেন, কোনও বিষয়কেই মাথায় বেশিক্ষণ ধরে রাখতে অক্ষম।'

মামা বললেন, 'আমরা তাহলে রাধাকুঞ্জের সবচেয়ে বলবান বৃদ্ধটির কাছেই যেতে পারি। সাধন সেনগুপ্ত।'

অতঃপর সাধনবাবুর খোঁজে গিয়ে হতাশা বাড়ে। তিনি তো তাঁর কয়েকজন ছাত্রকে নিয়ে তিনদিন আগে পুরী গিয়েছেন। এখনও ফেরেননি। তাঁকে তাহলে সম্ভাব্য অপরাধীদের তালিকা থেকে বাদই দিতে হলো।

খেমকার চোখে চোখ রেখে অনুত্তম বললো, 'এবার তাহলে আমাদের যেতে হচ্ছে আতাউল্লা মণ্ডলের কাছে।'

খেমকা ঈষৎ বিব্রত, ‘আতাউল্লা তো এখন তাঁর চেম্বারে বসে রোগী দেখছেন।’

‘আমরা তাহলে তাঁর চেম্বারেই যাবো’—বললো অনুত্তম। চেম্বার দূরে নয়। সেটা এলাকার বটতলা বাজারে ঢোকার মুখে। ওখানে জনবসতি ঘন। রাজনীতি নিয়ে চর্চাও চলে খুব।

আতাউল্লার চেম্বারটি সেখানকার এক আটপৌরে বাড়ির দ্বিতলে। আতাউল্লা একজন রোগীকে হোমিও ড্রপ খাওয়াচ্ছেন মুখ হা করিয়ে। বাতাসে স্পিরিটের গন্ধ।

চারজনকে বসতে দেবার মতো চেয়ার না থাকায় খেমকাকে আসন দিতে হলো একটা টুলে। শুরু করলো অনুত্তম, ‘আমরা আসছি মিঃ সরকারের খুনের ব্যাপারে আপনার সঙ্গে খানিক আলোচনা করতে। আমি গোয়েন্দা, অ্যাপয়েনটেড বাই মিঃ খেমকা।’

‘বলুন।’

‘দুটো ব্যাপার স্পষ্ট। প্রথম, খুনটা হয়েছে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা থেকে রাত আটটার মধ্যে।’ মর্গের রিপোর্টও তাই-ই। দ্বিতীয়, খুনি বহিরাগত নয়। সে রাধাকুঞ্জের মধ্যেই ছিল।’

‘আমার কাছে কী জানতে চান?

‘সেই দিন ওই সময়ে আপনি কোথায় ছিলেন?’

‘আমি প্রতিদিন সকাল ন’টায় এবং সন্ধ্যায় পৌনে সাতটায় চেম্বার খুলে বসি। সেদিনও এর ব্যতিক্রম হয়নি। আর রাত দশটার আগে চেম্বার কাল অবধি বন্ধ হয়নি। আজও হবে না।’

অনুত্তম এবং মামা একই সঙ্গে দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন। একজন বোরখা-ঢাকা মহিলা তাঁর বালকপুত্রর হাত ধরে উঠে আসছেন।

বের হবার আগে অনুত্তমের বেমক্কা প্রশ্ন, ‘অসীম সরকারকে আপনার মানুষ হিসেবে কী রকম মনে হতো?’

‘পারফেক্ট জেন্টেলম্যান। তবে সকলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা পাতাতেন না। বিশেষত যাঁরা রাজনীতি করতে এসে দলত্যাগ করেন, প্রায়ই তাঁদের এড়িয়ে যেতেন। আর একটা কথা, স্যার, আমার বিবির সঙ্গে অসীমবাবুর স্ত্রীর খাতির একেবারে গলায় গলায়।’ এবার আবার সিঁড়ির রেলিং ধরে নীচে নামা।

খেমকা জানতে চান, ‘এবার কী দেবদত্ত?’ নো। দেবদত্তকে আমি তালিকার বাইরেই রেখেছি। বরং, চলুন সুগত পালের লোহার দোকানে।’

দোকানটা তো তেমন কাছে নয়। গাড়িতে চেপে পৌঁছতে প্রায় মিনিট পনেরো। কৈখালির মোড়ে সেই লোহালক্কড়ের

দোকান। এখন ক্রেতাদের সংখ্যা মাত্র দু'জন হলেও দোকানের হাল যে ফেলনা নয়, বোঝা যায় বিস্তর মালপত্তরের বহর দেখলে। গদিতে আসীন সুগত পাল। শরীরে চর্বি, মাথায় টাক, গাত্রবর্ণ মধ্যম, থল থলে চর্বি।

দু-পাঁচ কথার পরই খেমকার মুখের দিকে তাকিয়ে সুগত বলতে থাকেন, 'অকপটে বলছি, কেবল রাধাকুঞ্জে নয়, আমার আরও দুটো বাড়ি কেনা আছে। একটা সন্তোষপুরে, অন্যটা মধ্যমগ্রামে। কিন্তু আমাদের ফাস্ট প্রেফারেন্স রাধাকুঞ্জ। সেখানে কী হয়ে গেল! সমস্ত রূপরেখা যেন মুছে গেল।'

অনুত্তমের প্রশ্ন, 'কাল সন্ধ্যায় কোথায় ছিলেন?'

'কোথায় আবার! এই দোকান, সেই দোকান!

'আমার আরও একটি জিজ্ঞাসা আছে।'

'বলুন, স্যার।'

আপনি তো অসীম সরকারের প্রতিবেশী হয়ে আছেন প্রায় বছর খানেক ধরে। মানুষটি সম্পর্কে আপনার অভিমত জানতে চাই।'

পালের মুখে অসহায়তার ছাপ, 'আমি আর কী বলবো। উনি ছিলেন নামি ও সাহসী সাংবাদিক। জরুরি অবস্থা জারি হলে জেল খেটেছেন। আবার প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কে গভীর জ্ঞান। শোনা কথা, ওঁর সংগ্রহে বাকি সুদূর অতীতের গুটিকয়েক মুদ্রাও রয়েছে। পুরাতত্ত্বের টানেই কিছু ভিন দেশেও পাড়ি জমিয়েছিলেন। ফলে জলের মতো টাকা খরচ হয়েছে। লাভ কতটুকু হয়েছে, তা নিয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ। উলটে এই নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে মন কষাকষি। অসীমবাবু মিশতেন খুব কম লোকের সঙ্গেই। যাঁদের বোলচাল বেশি, তিনি তাঁদের এড়াতেন।

'তাহলে রাধাকুঞ্জে কার সঙ্গে অসীমবাবুর মেলামেশা বেশি ছিল?

আমি যতটা জানি, ঘনিষ্ঠতা তাঁর দু'জনের সঙ্গে। একজন দীর্ঘ দিনের পরিচিত বিনায়ক গুপ্ত। অন্যজন জগন্নাথ ভক্ত।'

'মিস্টার ভক্ত, তিনি তো চলাফেরাই করতে পারেন না প্রায়, কানেও কম শোনেন। স্মৃতিশক্তিও দুর্বল।'

'কী জানি। শুনছি, ওঁদের দু'জনের ঘনিষ্ঠতা অনেক বছরের। ভুললে চলবে না, জগন্নাথ ভক্ত তাঁর মধ্যবয়সে বিশিষ্ট অধ্যাপক ছিলেন। খান কয়েক বইয়েরও লেখক। আবার, অসীমবাবুর স্ত্রী রত্নময়ী হলেন জগন্নাথ ভক্তর অর্ধাঙ্গিনী নিশাদেবীর বিশেষ বান্ধবী। দুটি পরিবারের অবস্থান অতি ঘনিষ্ঠ।' এই অবধি বলে পাল বুঝি অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। আবছা উচ্চারণে বললেন, 'অসীমবাবু খুন হবার তিনদিন আগে বেলা তিনটে নাগাদ একজন সাহেব ঢুকেছিলেন রাধাকুঞ্জে। অনুত্তম নড়েচড়ে বসে, 'সাহেব?'

'হ্যাঁ। সত্যিকারের সাহেব। চামড়া ধবধবে, চুল সোনালি, চোখ নীল, লম্বায় ফুট ছয়েক তো হবেই। আমি তখন দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে এসেছি দুপুরের খাওয়াদাওয়া সারতে, একটু বিশ্রামও দরকার। দারোয়ানের খাতায় দেখলাম, নাম সেই সাহেবের অ্যান্টনি ফিশার। দেখা করতে এসেছেন জগন্নাথ ভক্তর সঙ্গে। গাড়িতে করে আসেননি। এদেশের অটোর সওয়ারি হয়ে। ভরদুপুর দৈবাৎ আমার নজরে এসে যান। আমার ধারণা হলো, জগন্নাথ ভক্ত তো একসময় সুপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। কত তাবড় শিক্ষাবিদদের সঙ্গে পরিচয় ছিল। আগন্তুক হয়তো তেমনই একজন।'

'হতেই পারে। সাহেব হয়তো অথর্ব জগন্নাথ ভক্তকে ছুঁয়ে চারতলায় চলে যান অসীম সরকারের কাছে।' পাল মাথা বাড়ান, 'না, অসীমবাবুর ফ্ল্যাটে সাহেব ঢোকেননি। কারণ, আমার স্ত্রী সরকার ম্যাডামকে সব জানাতে তিনি যেন হতবাক। তাঁদের ফ্ল্যাটে এখন কেন, কোনও কালেই সাহেবটাহেবের পদার্পণ ঘটেনি আজ অবধি।

সুগত পালের দোকান থেকে যখন বের হলেন তারা, তখন রাত পৌনে ন'টা।

খেমকার প্রশ্ন, 'আজ কি আর কাউকে প্রশ্ন করতে চান আপনি?'

অনুত্তম জোর দিয়ে বললো, 'অবশ্যই। রাত যতই হোক, জিজ্ঞাসাবাদের পর্বটা শেষ করতে চাই। চলুন, এবার সমীরবাবুর কাছে।'

খেমকা ঈষৎ বিব্রত। কিন্তু মামা ও আঁখি নির্বিকার। অনুত্তমকে তারা হাড়ে হাড়ে চেনে। যে অবধি সত্যের নাগাল না পাচ্ছে, সে তার জালকে গোটাবে না। সময়-অসময়ের তোয়াক্কা করবার পাত্র সে কোনও দিনই নয়। গাড়িতে ঠাসাঠাসি হবেই। তাদের মধ্যে অনুত্তম ভাবনার অতলান্তে ডুবে আছে। এক সময় সে বিবেকবাণী উচ্চারণ করে, 'সত্যের জন্য সব কিছুকেই ত্যাগ করা যায়, কিন্তু কোনও কিছুর জন্যই সত্যকে ত্যাগ করা যায় না।'

সমীর বসুর ফ্ল্যাট 'বি' ব্লকের তিনতলায়। বসু বাড়িতেই আছেন। তাঁর ব্যস্ততা অন্যান্য আবাসিকদের তুলনায় এককাঠি বেশি। খালি গায়ে হাঁটুর ওপর লুঙ্গি গুটিয়ে স্বয়ং গুচ্ছের তরকারি কাটতে বসে গিয়েছেন। একটা বড়ো গামলায় কেটে কুটে রাখছেন পটল, ঝিঙা, কাঁকরোল, ভিন্ডি, কুমড়ো ও উচ্ছে। মালুম হয়, তিনি তাঁর স্ত্রীর প্রতি কতটা সমব্যথী। ডোরবেল বেজে উঠলে দরজা খুললেন বোস গিন্নী। বিরক্তিতে তাঁর একরকম রণমূর্তি। তবে দরজার বাইরে খেমকাকে দেখে নিজেকে সামলে নেন। এই বয়সেও তাঁর শাড়ির জেল্লা চমকপ্রদ। মাথায় সাচ্চা ও নকল চুলের জোয়ার। ঘোমটাকে সামান্য টেনে নিলেন।

আবার সেই চা-বিস্কুটের পরিবেশন। প্রশ্নোত্তরে অংশ

নিলেন সমীরবাবুর স্ত্রীও। একসময় জানালেন, 'আমার বাপের বাড়ি চট্টগ্রামে। দেশভাগের আগেই বাবা-মা চলে আসেন। এখানে যখন এলাম—'

হাত তুলে স্ত্রীকে থামিয়ে সমীরবাবু বললেন, 'তখন আমার কাছে আছে মাত্র হাজার পনেরো টাকা। ওই নিয়েই শুরু হলো জমি-বাড়ির দালালি। ছেলে তখন প্রায় শিশু। এখানে তখন জলের দরে জমি মেলে। পঞ্চাশ পঞ্চান্ন টাকায় এক কাঠা জমি মেলে। তিন বিঘে জমি কিনে ফেলেছিলাম প্রথম লপ্তেই। অবশ্য ওর মধ্যে রয়েছে কিছুটা জলাভূমিও। পরে সেই জমিই খেমকাবাবুকে বেচে দিয়ে পেয়ে গেলাম ষোলো লাখ।'

অনুত্তম মৃদু হেসে মাথা নাড়ে, 'তো জমি কেনায় অলিখিত খরচও কিছু থাকে। যেমন ধরুন মস্তান বিদায়, পলিটিক্যাল পার্টির ফান্ডে টাকা ঢালা।'

'সে আর বলতে', সমীরবাবু মাথা নাড়ান, 'এদেরও খাই মেটালে সব রূপরেখাই নষ্ট করে দেবে। এ ধরনের বুদ্ধিবৃত্তি না থাকলে আদপে পার্টি পলেটিক্স সঙ্কীর্ণ হতে হতে শেষ হয়ে যাবে যে। বুদ্ধিমানরা নিঃশব্দে এসব মেনে নেন।'

নিজের ইতিহাস জানাতে জানাতে সমীরবাবু যেন ঈষৎ ক্লান্ত। জলের গেলাস খুঁজছেন। যেন তখন শূন্যস্থান পূরণ করতে এগিয়ে এলেন সমীরবাবুর স্ত্রী, 'সমর এখন পৌঁছেছে এখানে। আমাদের একটিই ছেলে, বাবুল। নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। বয়সও হলো। কিন্তু বিয়ে করবে না। ব্যবসা থেকে ভালো ইনকাম। ট্যাক্স ফাঁকি দেয় না। এ তল্লাটে বিল্ডিং ম্যাটিরিয়ালসের সবচেয়ে বড়ো কারবার ওর। বর্ধমানে ধানি জমি। অভাবের দিন শেষ।'

'চমৎকার। বাবুলকে তো দেখলাম না।'

—অনুত্তম বলে।

'দেখবেন কী করে। আর ক'দিন বাদে ভোট। বাবুলকে ঠেলে পাঠানো হয়েছে কাকদ্বীপে। এ সময়ে পার্টির জন্য জানকবুল। ফোনে কথা হয়।'

অনুত্তমের দৃষ্টি আবার সমীরবাবুর মুখের ওপর, 'আসল কথায় আসা যাক। অসীম সরকার খুন হলেন। মাথা চূর্ণবিচূর্ণ। প্রতিবেশী হিসেবে আপনার অভিমত কী?'

সমীরবাবু হতচকিত, 'আমি কী বলবো! সাঙ্ঘাতিক মর্মান্তিক ঘটনা! আমরা কিন্তু পরস্পরের তেমন একটা ঘনিষ্ঠ ছিলাম না। আঁতেল লোক। আর আমি জমি-বাড়ির দালাল। দুই মেরুর বাসিন্দা।'

অনুত্তমের হালকা হাসি, 'তা হলে ওই আঁতেলের সঙ্গে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠতা ছিল কার?'

'মেলামেশাটা বেশি ছিল গুপ্ত সাহেবের সঙ্গে। আর মাঝে

মাঝে দেখা যেতো জগন্নাথবাবুর ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে আসতে। আর জগন্নাথবাবুও তো বিদ্বান ব্যক্তি, যদিও হাঁটাচলা প্রায় করতেই পারেন না।'

বাড়ির বাইরে পা বাড়িয়েই আচমকা ঘুরে তাকিয়ে সমীর বসুকে প্রশ্ন করে অনুত্তম, 'যে রাতে অসীমবাবু খুন হলেন, সেই দিনই শেষ বেলায় একজন সাহেব ঢুকেছিল রাধাকুঞ্জে। আপনি কি দেখেছেন?'

'সাহেব! না, না।' সেইক্ষণেই স্বামীর পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা মিসেস বোস বলে উঠলো, 'আমি দেখেছি। নিশাদি সেই সাহেবকে ডেকে নিয়ে ঢোকালেন তাঁদের ফ্ল্যাটে।'

'ধন্যবাদ।'

খেমকার হয়তো ধারণা হয়েছিল, অনুত্তম চৌধুরী জগন্নাথ ভক্তর ডেরায় আর ঢুঁ মারতে যাবে না। কিন্তু কোত্থেকে এক সাহেবের প্রসঙ্গ এসে যাওয়ায় এবার হয়তো ওই প্রায় পঙ্গু, প্রায় বধির ও নিতান্ত দুর্বল স্মৃতির অধিকারী মানুষটার ফ্ল্যাটেও গিয়ে হাজির হবে সদলবলে। রাতও তো দশটা পার হতে চললো। কথার পিঠে কথা। শুনতে শুনতে প্রমোটারও নিজেও ক্লান্ত। ভেবেছিলেন, একতলায় ভক্তর ডেরায় এবার ঢুকতে হবে।

কিন্তু বাস্তবে অনুত্তম চললো ঊর্ধ্বমুখে। সেই অভিশপ্ত চারতলা ফ্ল্যাটের দিকে—যেখানে গত সন্ধ্যা রাত্রিতে প্রাক্তন সাংবাদিক এবং দক্ষ পুরাতত্ত্ববিদ অসীম সরকারকে খুন করা হয়েছিল। সিঁড়ির দেয়ালে টিউব লাইট। অসীমবাবুর নামডাক যতই থাক, উপার্জন ছিল কম ও অনিয়মিত। প্রাচীন গ্রহরত্ন, মুদ্রা এই সমস্ত খোঁজাখুজিতে অনেক টাকা বেরিয়েও যায়। অথচ লোকটার কী মানসিকতা দেখুন, সংগৃহীত একটি বস্তুও বিক্রি করবেন না, হাতছাড়া করবেন না, যদিও চোরাবাজারে একবার ছাড়তে পারলে দু'পকেট ভর্তি টাকা আটকাবে কে?

অনুত্তমের নজর ধারালো, 'আপনাকে তিনি এসব বলেছিলেন?'

'হ্যাঁ। হিসেব অনুসারে আমার এখনও দেড়লাখ টাকা পাওনা। এরকম নিঃখরচায় তাঁকে আমি একটা চোরাকুঠুরিও করে দিয়েছি বাথরুমটার সঙ্গে। ওখানেই নাকি ভদ্রলোক তাঁর মূল্যবান প্রত্নরত্ন লুকিয়ে রাখতেন।'

'বাঃ! তা এ খবর এখানকার কে কে জানেন?' —সম্ভবত কেউই নয়। আমাকে দিয়ে যেহেতু কুঠুরিটা করতে হয়েছিল, এ তথ্য অন্যের কাছে অজানা থাকবারই কথা। আপনাকেই প্রথম জানালাম।

'আর কেউ জানেন না?'

শারদীয়ার অভিনন্দন সহ—

Usha Kamal

‘অসীমবাবু গৃহদেবতার পা ছুঁয়ে বলেছিলেন, দুনিয়াতে মাত্র তিন জন সেই চোরাকুঠুরির বৃত্তান্ত জানেন। তাঁরা হলেন অসীম সরকার স্বয়ং, দ্বিতীয় জন তাঁর স্ত্রী রত্নময়ী সরকার এবং শেষজন হলো এই অধম খেমকা।’ সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বিবরণ দিতে দিতে খানিক হাঁফাতে থাকেন খেমকা। সিঁড়ির যেখানে শেষ, সেখানে কিছু কালো পায়রার সংসার। আঁখি রুমাল দিয়ে তার নাক চেপে ধরে।

ডোরবেল বেজে উঠতেই দরজা খুলে গেলো। ভেতরে আলো জোরালো। দরজা যিনি খুললেন তিনি সরকার পরিবারের কেউ নন। তিনি জগন্নাথ ভক্তের স্ত্রী নিশা ভক্ত। বড়ো ঘরটা থেকে বেরিয়ে এলেন রত্নময়ী। চোখে-মুখে কাতরতা। খেমকা তাঁকে বললেন, ‘পুলিশের ওপর সবটা ছেড়ে না দিয়ে একজন প্রাইভেট গোয়েন্দাকেও লাগালাম। ইনিই তিনি—অনুত্তম চৌধুরী। একমাস আগেও ছিলেন সরকারি সিআইডি। এখন তাঁর প্রাইভেট এজেন্সি। আর ইনি তাঁর স্ত্রী আঁখি চৌধুরী। স্বামীকে রহস্যভেদে সাহায্য করেন। আমিই ওঁদের প্রথম ক্লায়েন্ট। অনুত্তম বাবুর মামা শিখর দত্তগুপ্ত সাহিত্যিক।’

রত্নময়ীদেবী সকলকে বসালেন। ভগ্নস্বরে বললেন, ‘অনুত্তম চৌধুরীর সুনাম আমার অবগত নয়। আর মিস্টার দত্তগুপ্তের একখানা গোয়েন্দা উপন্যাস আমি পড়েছি। আজ উনি জীবিত থাকলে সারারাত ধরে জমিয়ে গল্প করতেন।’

দু’হাতে মুখ ঢাকলেন রত্নময়ী। আঁখি তাঁর পিঠে হাত রাখে। মিসেস নিশা ভক্ত এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন অনুত্তমের দিকে। তারপর রত্নময়ীকে বললেন, ‘তুমি এনাদের সঙ্গে কথা বলো। আমি যাই। উনি অনেকখন ধরে একা বসে আছেন।’

অনুত্তম তখনই নিশাদেবীকে বলে ওঠে, ‘প্লিজ, যাবেন না। আমি আপনার সঙ্গেও কিছু কথা বলবো।’

মিসেস ভক্ত থমকে দাঁড়ান, ‘উনি অত রাত অবধি জেগে বসে থাকবেন।’

‘একদিন থাকবেন। বুঝিয়ে বলবেন।’

‘আপনি বরং একদিন কষ্ট করে আসবেন আমাদের ফ্ল্যাটে।’ নিশাদেবী বেরিয়ে যান।

অনুত্তমের দৃষ্টি ঘোরে এই ঘরের সর্বত্র। দূরে এককোণে

একটা মাথাভাঙা ফুলদানি। ফুলগুলি কেমন বিবর্ণ। ঘরটি কিন্তু পরিসরে বড়ো। তবে পরিচ্ছন্নতার অভাব বিলক্ষণ। এক দিকের দেয়ালে কাঠ ও কাঁচের আলমারিতে ঠাসা বই। একজন বিদ্বান ও বিদুষীর ঘর বলে কথা। অনুত্তমের প্রথম প্রশ্ন, 'আপনাদের ছেলে বা মেয়ে এখানে থাকে না?'

রত্নময়ী জানান, 'আমাদের একটিই ছেলে। সে ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টারের বিজ্ঞানী। বিয়ের পর বউকে নিয়ে মুম্বাইতেই থাকে। দেখা হয় কালেভদ্রে।'

'ছেলে খবর পেয়েছে?'

'দিয়েছি। কালকেই নিশ্চয় আসবে।'

অনুত্তম অন্য ছবিগুলির ওপর নজর ফেরায়। একটি ছবিতে দেখা গেল, অসীম সরকারের দিকে লাঠি উঁচিয়ে রয়েছেন একজন পুলিশ অফিসার। পুলিশের ভ্যানে তোলার ছবি। সম্ভবত কোনও সরকার বিরোধী লেখা ও আন্দোলনের ফলশ্রুতি। রয়েছে আরও তিনটি বাঁধানো ছবি। একটিতে এক ঝাঁক টেরাকেটার মূর্তি। আর একটিতে আলাউদ্দিনের প্রবর্তিত মুদ্রা। তৃতীয়টিতে বর্ধমানের তেজগঞ্জে বিদ্যাসুন্দরের প্রতিষ্ঠিত মা কালীর মূর্তি। এ ছাড়া বাকি রয়েছে প্রাচীন সুমেরীয় তিনটি মুদ্রা, যা কোনও একটি চোরকুঠুরিতে লুক্কায়িত।

অনুত্তম জানতে চায়, 'রাধাকুঞ্জের কেউ কি জানে সেই তিনটি মুদ্রার কথা?'

'জানেন একমাত্র খেমকাজি। উনিই তো চোরকুঠুরির নির্মাতা। কথা দিয়েছিলেন, জীবন থাকতে কারোর কাছে ওই তথ্য ফাঁস করবেন না।'

খেমকা বললেন, 'আমি কথার খেলাপ করি না। এইমাত্র আধঘণ্টা আগে সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় মিস্টার চৌধুরীকে অবহিত করি এ বিষয়ে। কারণ, আমার মনে হয়েছে, তদন্তকারী গোয়েন্দার এটা জানা জরুরি।'

অনুত্তম ঘুরে তখনই রত্নময়ীকে প্রশ্ন করে, 'অ্যান্টনি ফিশার কত টাকা দিতে রাজি হয়েছিলেন ওই প্রত্নসম্পদ মূর্তিটির জন্য?'

রত্নময়ী যেন ঝাঁকুনি খেলেন এই জিজ্ঞাসায়। উত্তর দেবার বদলে পালটা জানতে চান, 'আপনি অ্যান্টনি ফিশারকে চেনেন?'

অনুত্তম বললো, 'ম্যাডাম, ভুলে যাবেন না, আমি মাত্র একমাস আগেও সরকারি গোয়েন্দার দায়িত্ব পালন করেছি। প্রচুর রেকর্ড নিত্য ঘাঁটতে হতো নিবিষ্ট চিত্তে। অপরাধীকে পাকড়াতে কত ধ্যাড়ধেড়ে এলাকায় এপাশ ওপাশ চষে বেড়িয়েছি। আজ আমরা যাকে অ্যান্টনি ফিশার নামে জানি, তিনিই হয়তো একসময়ে ছিলেন যোসেফ পিটারসন। কত কিছুর রাখঢাক বজায় রেখে কাজে নামে প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদের চোরাকারবারিরা, মেঠো চোরচোট্টার মতো মোটাদাগের কাজকর্ম করলে তাদের কি চলে?

রত্নময়ী এখনও ধুকছেন, 'ষোলো লাখ টাকার অফার!'

'ওই রত্নের খোঁজ ফিশার পেল কোন সূত্রে?'

'সেই খোঁজদাতার নাম ড. জগন্নাথ ভক্ত। আগেই বলেছি, মূর্তিটাকে দামোদর নদের চর থেকে তুলে আনতে ড. ভক্ত ওকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন।'

'এর অর্থ জগন্নাথ ভক্ত নিজেকে যতটা অসুস্থ দেখান, ততটা কাহিল তিনি নন।'

'এ কথা আমি বলতে পারবো না। দেখি তো চুপচাপ চোখ বুজে ইজিচেয়ারে দেহকে এলিয়ে রাখেন। কারোর সঙ্গে কথা বলেন না। কেউ বললে তা না শোনার বা না বোঝার ভান করেন।'

'অথচ একজন চোরাচালনকারীকে হাজির করালেন রাধাকুঞ্জে। বাঃ। যাক, অসীমবাবু নিশ্চয় ফিশারের প্রস্তাবে রাজি হননি।'

'জেলে যেতে হলেও তিনি রাজি হতেন না। বরং প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন ড. ভক্তের প্রতি। তখনই নীচে নামতে চেয়েছিলেন। আমি অনেক বুঝিয়ে তাঁকে নড়তে দিইনি।'

অনুত্তমের কপালের শিরাটা দপদপিয়ে ওঠে, 'এবার বলুন তো গত সন্ধ্যায় আপনার অভিজ্ঞতা কতটা মর্মান্তিক হয়েছিল?'

রত্নময়ীর দু'চোখ আরও ছলছলে। বারেকের জন্য বাথরুম ঘুরে এসে স্বর প্রায় স্বাভাবিক রেখে বলতে থাকেন, আমরা দু'জনই ঠাকুরভক্ত। রামকৃষ্ণ মিশন এবং ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ— দুই স্থানেই যেতাম। ওই পুরাতত্ত্বের নেশা আমাদের প্রায় গরিব করে ছাড়লেও আমাদের অসুখী করতে পারেনি। ছেলের কাছে হাত পাততাম না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছি। প্রকৃত সৎ মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করেছি। ঠাকুরের কাছে একটাই প্রার্থনা, আমাদের এই জীবনযাত্রায় যেন বিঘ্ন না আসে। তবুও বিঘ্ন ঘটলো। সন্ধ্যা সাতটার কিছু পরে নীচ থেকে নিশাদি এলেন। আমাদের দু'জনের মধ্যে তো খুব ভাব। আমার স্বামীর সঙ্গেও ভক্তদার প্রায় গলায় গলায়। দু'জনে মিলে অতীত যুগের নিদর্শন খুঁজেছেন এখানে সেখানে। সেদিন নিশাদি এসে বললেন, বাগুইআটির বাজারে যাবেন শাড়ি কিনতে। আমিও গেলাম তাঁর সাথী হয়ে। কিন্তু রাধাকুঞ্জ থেকে বের হবার মুখে বাধা। একদল বাইকচালক তরুণ এসে ভিড় জমিয়েছে কমপ্লেক্সের গেটে। উদ্দেশ্য, বিশেষ এক রাজনৈতিক দলের ছোটো ছোটো কাগুজে পতাকা গুঁজে দিয়ে যাবে এখানকার প্রতিটি ফ্ল্যাটের জানালা বা অন্য কোনও ফাঁকফোকরে। ভোট তো একেবারে দুয়ারে। তাই অমন কাজ।

ফ্ল্যাটবাসীদের আপত্তি স্বাভাবিক। যাই হোক, আমরা দু'জন গজগজ করতে করতে দোকানে গেলাম। মেজাজ খারাপ থাকায় যা কিছু কেনবার, তাড়াতাড়ি কিনে ফেললাম। রাধাকুঞ্জে

রাত আটটার মধ্যে ফিরেও এলাম। নিশাদি থাকেন একতলায়। প্রায় মিনিট খানেক ধরে বেল বাজবার পর ডক্টর ভক্ত হাঁপাতে হাঁপাতে এসে দরজা খুললেন। গায়ে জামা বা গেঞ্জি নেই। পরনে কেবল একটা তোয়ালে। সেটা আবার ভেজা। দৃষ্টিতে অবশ্য সচেতনতা। আমাকে দেখে ঘাড় কাত করলেন।'

রত্নময়ী সামান্য বিরতি টানলেন তাঁর কথায়। জল খেলেন এক গেলাস। চোখে-মুখে আতঙ্ক ও অস্থিরতা। সকলের দৃষ্টি তাঁর মুখের ওপর। তিনি পুনরায় বলতে থাকেন, 'আপনারা বিশ্বাস করুন, এই একতলা থেকে চারতলায় উঠতে আমার বেশ কষ্ট হচ্ছিলো। এরকম কিন্তু হয় না। খালি মনে হয়েছে, আমি কোনও বিপদে পড়তে চলেছি। বিচিত্র হ্যালুসিনেশন। নিজের ফ্ল্যাটের সামনে দাঁড়িয়ে দেখলাম, দরজা ভেজানো। এ রকম কিন্তু কখনো হয় না। কারণ আমার হাজব্যান্ড খুব সাবধানী। বেল না বাজালে দরজা খোলেন না। আর অপরিচিত লোককে চট করে ঘরে ঢোকান না। হয়তো তাঁর এরকম আচরণের কারণ, তিনি সর্বক্ষণ সচেতন— আমাদের ফ্ল্যাটে রয়েছে বহু লক্ষ টাকার প্রত্নসামগ্রী। আমি তাই ভেজানো দরজা দেখে অবাক। তারপর দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই দেখতে পেলাম সেই অবিশ্বাস্য ভয়ংকর দৃশ্য! উঃ সহ্য হয় না। দু'হাতে আবার মুখ ঢাকলেন রত্নময়ী। কেঁপে কেঁপে উঠছে তাঁর দেহ। এবার আঁখিই তাকে ধরে নিয়ে যায় বেসিনের সামনে। রত্নময়ী দু'বার বমি করলেন। জানালা দুটো খুলে দেওয়া হলো। রত্নময়ী কিছুটা যেন সামলে উঠলেন। তখনও আঁখি তাঁকে ধরে রেখেছে। এরপর রত্নময়ী খুব কম কথায় তাঁর অভিজ্ঞতার কথা জানালেন, 'আমি দেখলাম, ফ্ল্যাটের দরজা খোলা। ভেতরে ঢুকতেই রক্তে ভিজে গেল আমার দুই পায়ের পাতা। রক্ত আমার স্বামীর। দেহটা পড়ে রয়েছে। মাথাটা ফেটে কয়েক টুকরো...।'

পাঁচ

রাত এগারোটা। অত রাতেই জগন্নাথ ভক্তর ফ্ল্যাটে কয়েক জনকে নিয়ে অনুত্তম ঢুকলো। তারা নিজেরাই সুবিধা মোতাবেক চেয়ার ও সোফা দখল করে নেয়। ডক্টর ভক্ত যেন প্রায় ঘেরাও হলেন তাদের দ্বারা। দেয়ালে দুটো টিউব লাইট। এসি চলছে। ইজিচেয়ারে যেন বাদুড়ের মতো ঝুলছেন ড. জগন্নাথ ভক্ত। কথা শুরু করে অনুত্তমই, 'আমরা লজ্জিত। এতরাতে এসে ঢুকলাম অপনাদের ফ্ল্যাটে। এলাম কেবল এই কারণে যে, আপনারা মৃত অসীম সরকারের সবচেয়ে কাছে লোক ছিলেন। আপনারাই রত্নময়ী দেবীর প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষী। আপনারা হয়তো জানেন কিংবা নাও জানতে পারেন যে, রত্নময়ীদের ফ্ল্যাটে একটি চোরকুঠুরি রয়েছে, যেখানে রক্ষিত আছে একটি অতি মূল্যবান প্রত্নতাত্ত্বিক দেবীমূর্তি। অনেক বিশেষজ্ঞের সঙ্গে আলোচনা করে জানলাম, ওই বিরল মূর্তিটির বাজারদর পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা।

অনুত্তম যখন কথাগুলি বলছে, আঁখির পর্যবেক্ষণী দৃষ্টি তখন ড. জগন্নাথ ভক্তর ওপর। নানা ভাবনা আসে যায়। অনুত্তম সবিনয়ে তার বক্তব্য শেষ করে, '... তাই রত্নময়ীদেবীকেও নিরাপদ বলা যায় না। ওই বস্তুর লোভে খুনি কখন যে তাকেও টার্গেট করে বসবে, বোঝা দুষ্কর। আপনারা একতলায় সাবধানে রাতটা কাটান। আমি পুলিশের সঙ্গেও কথা বলছি। আজকের রাতটা ঘটনাবহুল হয়ে উঠতে পারে।'

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসবার সময় অনুত্তম দেখলো, ড. ভক্ত প্রায় উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে আছেন। দু' চোখে যেন কীসের ব্যাকুলতা। খেমকার অফিস ঘরে ঢুকে অতঃপর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে অনুত্তম চৌধরী যা করলো, তা বুঝি একমাত্র তার পক্ষেই সম্ভব। উপস্থিত কারোর ভাবনার জালকে ছিন্ন হবার সুযোগ সে দিলো না। হাঁকডাক অশ্রুত। প্রথম নির্দেশ খেমকার প্রতি 'আপনি এক্ষুনি বাহাদুরকে পাঠিয়ে স্থানীয় হোটেল থেকে আমাদের ক'জনের জন্য রুটি-তরকারি আনান রাতের খাবারের জন্য। খরচ কিন্তু আমার। দ্বিতীয়ত, আপনার বাড়িতে ফোন করে জানিয়ে দিন, আপনি রাতে ফিরতে পারছেন না। তৃতীয়ত, কালক্ষেপ না করে এক্ষুনি এয়ারপোর্ট থানার ইনচার্জ মিঃ হরিসাধন দাসকে জানান আমার কথা এবং অনুরোধ করুন, জনাকয়েক পুলিশকে পাঠাতে। কারণ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অপরাধী এ রাতেই হাতেনাতে ধরা পড়বে। চতুর্থত, আমি এখনই 'সি' ব্লকের চারতলায় একা উঠে যাচ্ছি। আমার খাবার ঢাকা দিয়ে রাখবেন। পরে এসে আমি খাবো। আর আপনার ফোনে আমি মিসকল দিলে আপনারা সকলে ছুটে আসবেন 'সি' ব্লকের চারতলায়। ব্যাস, আর কথা নয়। আমি বেরিয়ে যাচ্ছি।'

শিকারকে তাক করা শ্বাপদের তীব্রতা নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল অনুত্তম। কেউ কোনও কথা বলবার ফুরসত পেলো না। বাইরে ফুরফুরে বাতাস। আসছে বেলফুলের সুবাস। পায়ে বুট থাকা সত্ত্বেও ছুটন্ত অনুত্তম একরকম নিঃশব্দ। এ রাতের রঙ্গমঞ্চে সে-ই তো একমেবদ্বিতীয়ম্ নায়ক।

চারতলায় উঠে এসেছে অনুত্তম চৌধুরী। এই শীর্ষে ফ্ল্যাটের সংখ্যা চার। চারটির মধ্যে মাত্র একটিকে বিক্রি করতে পেরেছেন খেমকা এবং সেই নিবাসে এই মুহূর্তে রত্নময়ী সরকার সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ। অনুত্তম কিন্তু চারতলাতেই দাঁড়িয়ে পড়লো না। সে আরও এক রাউন্ড সিঁড়ি ভেঙে উঠে গেলো ছাদে পৌঁছে

যাবার দরজার সামনে। ঠেলা মারতেই দরজা খুলে যায়। ছাদ প্রশস্ত। কিন্তু তার অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে বিস্তর অব্যবহার্য বস্তু সামগ্রী—সিমেন্ট ও বালির ডজন ডজন শূন্য ব্যাগ, ভাঙা ইটপাটকেল, ছেড়া লেপ-তোষক, ভাঙা চেয়ার, কাঠকুটো ইত্যাদি ইত্যাদি। সেই ছাদে এক চক্কর কেটে দরজার একপাশে ওত পেতে দাঁড়িয়ে পড়ে অনুত্তম। অপরাধীকে হাতেনাতে ধরবার শপথ তার। নিজেকে দমন করে সে সিগারেট ধরাবার তাড়নাকে দাবিয়ে রাখে।

কিছুক্ষণ পুতুলবৎ অপেক্ষমান থাকবার পর সে শব্দ শুনতে পেলো,—কেউ একজন সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠে আসছে।....

এক সময় চাঁদের সাদা আলোতে সে দেখতে পেলো আততায়ীকে। সে কোনও বৃদ্ধ জড়ভরত নয়। তার দেহ বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। দেখলে মনে হবেই যে এই লোকটা এমন এক দেহে রূপান্তরিত হয়েছে, যার দেহে অমিত বল এবং দু' চোখে যুগপৎ কামনা ও হিংস্রতা। হাতে একটা প্রমাণমাপের শাবল। ছাদটা এক চক্কর ঘুরে সে এক পা নেমে গিয়ে দাঁড়ালো চারতলার ফ্ল্যাটের সামনে। বেল পুশ করে। রত্নময়ী দরজা খোলার আগেই অনুত্তম পিস্তল উঁচিয়ে লোকটার মাথায় তা ঠেকায়, শ্বাসচাপা গলায় বলে 'শাবলটাকে হাত থেকে ফেলে দিন মিস্টার ভক্ত। এক মুহূর্তে আপনার জীবন শেষ হয়ে যাবে আমার কথা না শুনলে?

ভক্ত হাঁ করে তাকিয়ে আছেন পিস্তল ও অনুত্তমের মুখের দিকে। রত্নময়ী দরজা খুলছেন।

নীচে এসে থামলো পুলিশের কনভয়। □

ইতিহাসের উপেক্ষিত নায়ক

ড: নারায়ণ চক্রবর্তী

সেই মানুষরা পৃথিবীতে নমস্য যাঁরা ইতিহাসের গতিপথ বদলে দিয়েছেন। সাধারণ মানুষ তাঁদের নামে জয়ধ্বনি দেয়। তাঁরা ভগবান হিসেবে পুজিত হন। এমনই একজন মানুষ যিনি আমার বাল্য বয়সে গাল টিপে আমায় আদর করেছেন, আমার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেছেন, তাঁর কথা আজ বলব। তিনি আমার বাবার থেকে বছর আটেকের বড়ো ছিলেন, তাই বাবাকে 'ভবানী' বলে নাম ধরে ডাকতেন। তাঁর কথা লিখতে গিয়ে এমন কিছু ঐতিহাসিক সত্যের মুখোমুখি হতে হয়েছে যে, সেকথা না লিখলে হয়তো কালের স্রোতে মিথ্যার ইতিহাসে গা ভাসানোই শুধু হবে না, সেই দেবতুল্য অসমসাহসী প্রচারবিমুখ মানুষটির, যিনি কলকাতা তথা দক্ষিণবঙ্গের হিন্দু বাঙ্গালির অস্তিত্ব রক্ষার অন্যতম কান্ডারি, তাঁর প্রতি চরম অবিচার করা হবে।

আজ গঙ্গার পূর্বদিকের কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের হিন্দু বাঙ্গালিরা নিরুপদ্রবে সপরিবারে স্বাধীন ভারতে বাস করছেন, তাঁরা শুধু শ্যামাপ্রসাদ নন, এককভাবে যে মানুষটির কাছে সর্বাধিক ঋণী, তিনি হলেন এই ঋষিতুল্য পুরুষ গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, যিনি গোপাল মুখার্জী হিসেবে পরিচিত। বৌবাজারে মেডিক্যাল কলেজের উলটোদিকে তাঁর পৈতৃক পাঁঠার মাংসের দোকান ছিল। তাই লোকমুখে তাঁর 'গোপাল পাঁঠা' নাম অধিক পরিচিত। অল্প বয়সেই এই দোকানের ভার তাঁর উপর বর্তায়। সেই থেকে তাঁর এমন নাম। এটি কোনো বিদ্রূপাত্মক নাম নয়।

গোপাল মুখার্জীর জন্ম হয় ৩২/১, মলঙ্গা লেনের পৈতৃক বাড়িতে। জন্মতারিখ ১৩ মে, ১৯১৩। ছোটবেলা থেকেই গোপাল শরীরচর্চা ও বিভিন্ন সেবামূলক কাজকর্মে গভীর উৎসাহ দেখাতেন। তাঁর মামা ছিলেন স্বনামধন্য দেশপ্রেমিক

বিপ্লবী অনুকূল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। হয়তো মামার প্রভাবেই গোপাল অহিংস রাজনীতির গান্ধীবাদী আন্দোলনে উৎসাহ পাননি। তিনি যুবক বয়সেই রাজনীতি সচেতন থাকলেও সরাসরি দলীয় রাজনীতিতে নাম লেখাননি। তিনি সামাজিক কাজকর্ম এবং অন্যান্য অনেক ধরনের সমাজসেবামূলক কাজের সুবিধার জন্য এলাকার (কলেজস্ট্রিট, বৌবাজার অঞ্চল) যুবকদের নিয়ে 'ভারতীয় জাতীয় বাহিনী' নামের একটি সংস্থা, যাকে ক্লাব বলাই ভালো, তৈরি করেন। তখনকার সময়োপযোগী স্বাস্থ্যচর্চা, লাঠিখেলা ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে এই দলের ছেলেরা অনাথ গরিব মেয়েদের বিয়ের বন্দোবস্ত করা থেকে শ্মশানযাত্রী, ঘাটকাজ ইত্যাদি করতেন। গোপাল ছিলেন এদের অবিসংবাদী নেতা। হৃদয়ের প্রসারতা, যেকোনো সামাজিক কাজে সাহায্য করার দায়বদ্ধতা এবং দল পরিচালনার কুশলতার কারণে গোপালের নেতৃত্ব কখনো চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েনি। নেতৃত্ব দেওয়ার সহজাত প্রবৃত্তি ও অকুতোভয় চরিত্রের সঙ্গে সব কাজে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতাই গোপালকে অনন্যসাধারণ নেতা হিসেবে গড়ে তুলেছিল। ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সমর্থনে গোপাল ও তাঁর দল ঝাঁপিয়ে পড়ে। গান্ধীজীর প্রতি গোপালের ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার অভাব না থাকলেও তাঁর অহিংস আন্দোলনের প্রতি গোপালের আস্থা ছিল না। এর কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথমত, গোপালদের ব্রাহ্মণ পরিবার হলেও তাঁরা ছিলেন শাক্ত, মা কালীর উপাসক। যে কারণে বৌবাজারের দোকানেই শুধু নয়, আমি স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বেলেঘাটার সরকার বাজারে এবং গোপালের দোকানের আশেপাশে অন্যান্য পাঁঠার মাংসের দোকানেও সাইনবোর্ড দেখেছি 'বিখ্যাত বাঙ্গালী পাঁঠার মাংসের দোকান'। পাশে জবাফুলের মালা পরিহিতা মা কালীর ছবি। দোকানের ভিতরে মা কালীর ছোট মূর্তির সামনে পাঁঠাকে এক কোপে বলি দেওয়া হতো। এই পদ্ধতিতে মায়ের পুজোয় বলি হয়। আজকাল একে 'ঝটকা' পদ্ধতি বলে। এটি শাক্তমতে বলির স্বীকৃত পদ্ধতি। বলির পর রক্ত ও মাংস মায়ের কাছে নিবেদনের পর তা বিক্রির জন্য বাইরে আনা হতো।

মনে আছে, আমি তখন খুব ছোটো। একদিন বাবার সঙ্গে সরকার বাজারের দোকানে গিয়েছি। সেদিন দোকানে গোপাল নিজে ছিলেন। উনি বাবার সঙ্গে কথায় কথায় বললেন, সকালে পাঁঠাবলির সময় খাঁড়া পাঠার গলায় আটকে যায়। বলিতে বিঘ্ন ঘটে। সেজন্য ওই পাঁঠার মাংস অপবিত্র ধরে নিয়ে তা আর বিক্রির জন্য দেওয়া হয় না। পাঁঠাটা বাজারের পিছনে মুসলিম বস্তির মানুষদের দান করে দেওয়া হয়। গোপালের এই ব্যবসায়িক সততা এখন আশা করা যায় না। এই ঘটনার কথা মনে থাকায় আমি বড়ো হয়ে যখন নিজে বাজারে গিয়েছি, পাঁঠার মাংস কিনলে সর্বদা গোপালের দোকান থেকেই কিনেছি। আরেকটি কথা, গোপালের দোকানে সর্বদা পাঁঠার মাংসই বিক্রি হতো, রেওয়াজি খাসির মাংস নয়। এখন মোগলাই পদ রান্নার জন্য রেওয়াজি খাসির প্রচলন হয়েছে যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বামপন্থী মানসিকতায় ইসলামি প্রভাবের জন্য বাঙ্গালির রুচি বদলের নিদর্শন। আগে বাঙ্গালির পাতে, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে কচি পাঁঠার মাংসের ঝোল পড়ত। এখন রেজালা, বিরিয়ানি, কোপ্তা-কাবাবের জন্য রেওয়াজি খাসির রমরমা। এভাবে খাদ্যাভ্যাসেও ধীরে ধীরে ইসলামীকরণ ঘটেছে সচেতনভাবে। অথচ, আগে হালাল মাংস খাওয়ার গোঁড়ামি বাঙ্গালি মুসলমানদের মধ্যে বিশেষ না থাকলেও এখন তা প্রায় সব মুসলমান মেনে থাকেন। বাঙ্গালির সমাজ ও ধর্ম সচেতনতার সংজ্ঞা ভারতের অন্যান্য অঞ্চল, বিশেষত উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের থেকে আলাদা। ব্রাহ্মণ গোপালের পৈতৃক ব্যবসার মাংসের দোকানে পাঁঠা কেনা ও বিক্রির পর পাঁঠার মাথা, খুর, শিং-সহ চামড়া কিনে নিত মুসলমান ব্যবসায়ীরা। এখানে লক্ষণীয় হলো, জিন্নার দাদু যখন ব্রাহ্মণ হয়ে মাছের ব্যবসা শুরু করেন, তখন সমাজ তাঁকে একঘরে করে। সেই অপমানে তিনি সপরিবার মুসলমান হয়ে যান। কিন্তু গোপালের পরিবার ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর পৈতৃক মাংসের ব্যবসায় কোনভাবেই সামাজিক বা ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতা আসেনি। এটাই ভারতের পূর্ব ও পশ্চিমের হিন্দু সমাজের ধর্মীয়বোধের পার্থক্য। বিশেষ করে বঙ্গপ্রদেশে বঙ্কিম ও বিবেকানন্দের প্রভাবে ধর্মীয় চেতনার মধ্য দিয়ে যেমন দেশাত্মবোধ ও দেশপ্রেমের উন্মেষ হয়েছিল, তার ফলস্বরূপ ইংরেজ শাসকদের কাছে বাঙ্গালিরা সন্দেহের তালিকায় ছিল। ফলশ্রুতিতে এমন কিছু প্রশাসনিক পদক্ষেপ করা হয়, যার জন্য ভারতের রাজনীতি ও প্রশাসনে বাঙ্গালির নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ অনেক কমে গিয়েছিল। ইংরেজ প্রথম থেকেই সার বুঝেছিল, বাঙ্গালিকে তার জাতীয়তাবাদী, স্বাধীনতাকামী চেতনাকে শুধুমাত্র পুরস্কার দিয়ে প্রাদেশিকতার জালে আটকে রাখা যাবে না। বাঙ্গালিকে শায়েস্তা করার প্রথম পরিকল্পনা ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ যখন হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল বাঙ্গালির মিলিত প্রতিবাদ আন্দোলনে ১৯১১-তে রদ করতে বাধ্য হলো, তখন ইংরেজ সরকার চেষ্টা করে গেছে বাঙ্গালি বিশেষত হিন্দু বাঙ্গালি যারা জাতীয়তাবোধের মধ্যে ধর্মীয় অনুমোদন আনতে পেরেছে দেশমাতৃকার রূপ কল্পনা, সর্বজনীন দুর্গাপূজা প্রচলন ইত্যাদি তাদের কীভাবে বিভক্ত করে ছত্রভঙ্গ করা যায়। এ কাজে ইংজেদের সাহায্য করেছে কংগ্রেসের ক্ষমতালিপ্সা ও নেতৃত্বের confusion, সেইসঙ্গে মুসলিম লিগের ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন না করে হিন্দু-বিরোধী আন্দোলনে নামা। এমনকী কমিউনিস্ট পার্টির তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক পি সি যোশী ১৯৪৬ সালে রীতিমতো বিবৃতি দিয়ে মুসলিম লিগের এই ভূমিকার কথা স্বীকার করেছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তিতে একটি ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। তা হলো, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইংরেজের অর্থনীতি ভেঙে পড়া এবং সেই সঙ্গে ভারত-সহ এশিয়া ও আফ্রিকার ব্রিটিশ এবং অন্যান্য মিত্রশক্তির উপনিবেশগুলির স্বাধীনতালিপ্সা প্রবল

হয়ে ওঠা—বিশেষভাবে মিত্রশক্তির উপনিবেশগুলি বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন তাদের সর্বস্বপণ করে মিত্রশক্তির হয়ে লড়াইয়ে সেনা-সহ অন্যান্য resource দেওয়ার মূল্য দাবি করতে থাকে। এমন পরিস্থিতিতে যখন ব্রিটিশ রাজশক্তি বুঝতে পারল, তাদের ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে পাততাড়ি গুটানোর সময় এসেছে, তখন তারা এমন কলকাঠি নাড়ার চেষ্টা করল যাতে স্বাধীনতা পেলেও উপমহাদেশে ভারতীয় জাতীয়তাবোধ মাথা চাড়া না দিতে পারে। তখন সেই ঘোলা জলে ব্রিটিশরা তাদের অর্থনৈতিক লুঠপাট জারি রাখার চেষ্টা করতে পারবে!

ইংরেজদের কাছে ভারতের ঐক্যবদ্ধ স্বাধীনতা আন্দোলনের গতিপথ রুদ্ধ করার সুবর্ণ সুযোগ এসে গেল। দক্ষিণ আফ্রিকা ফেরত আইন-ব্যবসায়ী মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ভারতের মাটিতে অহিংসা আন্দোলন শুরু করলেন। একথা সত্য যে, কংগ্রেস কেন এই মানুষটিকে তাদের প্রধান পরামর্শদাতা মেনে নিয়েছিল তা রহস্যাবৃত। আবার এই গান্ধীজী ইসলামি সাম্প্রদায়িক আন্দোলন খিলাফতকে সমর্থন করে দেশের হিন্দুপ্রধান কংগ্রেস দলের সমর্থন দিলেন। অথচ, তার পরেও মূলত হিন্দুদের দল কংগ্রেস তাঁকে মাথায় করে রাখল। এর একাধিক কারণ আছে। প্রথমত, গান্ধীজীর মাঠে-ময়দানে লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা নেই। দ্বিতীয়ত, ইসলামি ইতিহাস ও তাদের ধর্মীয় অনুশাসন বিষয়ে গান্ধীজীর অজ্ঞতা। তৃতীয়ত, অহিংসা বিষয়ে গান্ধীজীর রাজনৈতিক নেতৃত্বকে প্রোমোট করার কাজে কংগ্রেস নেতৃত্বের একাংশকে সহায়তা করে ব্রিটিশ রাজশক্তি।

গোপাল মুখার্জীর গান্ধীজী সম্পর্কে মূল্যায়ন তাঁর বিচক্ষণ সমাজ চেতনার ইঙ্গিত বহন করে। গোপালের কথায়, গান্ধীজী ছিলেন কংগ্রেসের শীর্ষতম নেতা। কিন্তু তাঁর অহিংস আন্দোলন দেশের স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য কতটা কার্যকরী, সে বিষয়ে তাঁর সন্দেহ ছিলই। বিশেষত জিন্নার নেতৃত্বে যেখানে মুসলিম লিগ নেতৃবৃন্দ তাঁদের আন্দোলনকে যে অহিংস পথে চালাবে না সে বিষয়ে তাঁরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বারবার ঘোষণা করেছেন। আবার গোপালের নিজের মুখের কথায় তিনি ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসুর একনিষ্ঠ সমর্থক। নেতা হিসেবে তিনি সুভাষচন্দ্র বসুর মত ও পথকেই বিশ্বাস করতেন। গোপাল মুখার্জী সম্পর্কে যে লিখিত তথ্য মিলেছে তা খণ্ডিত এবং একপেশে। গোপাল নেতাজীর আদর্শে বিশ্বাসী থেকে দেশের একমাত্র শত্রু হিসেবে ইংরেজের দিকেই আঙ্গুল তুলেছিলেন। সেজন্য পযবর্তী সময়ে সক্রিয় রাজনীতিতে যোগদানের সুযোগ পেয়েও তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন।

গান্ধীজীর বিপ্লবীদের প্রতি ঘৃণা এতটাই ছিল যে, তিনি বিপ্লবীদের ক্রিয়াকলাপের তীব্র সমালোচনা ও বিরোধিতা করে ব্রিটিশদের হাত শক্ত করেছিলেন। ভগৎ সিংয়ের ফাঁসি মকুবের অনুরোধ করতে পর্যন্ত তিনি অস্বীকার করেন। তাছাড়া, গান্ধীজীর স্নেহধন্য সীতারামাইয়াকে কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনে হারানোর জন্য তিনি কংগ্রেসের অভ্যন্তরে সুভাষচন্দ্রকে সভাপতি হিসেবে কাজ করতে নোংরা রাজনীতি করে বাদ দিয়েছিলেন। এমনকী শেষমেষ জওহরলালের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে সুভাষচন্দ্র বসুকে কংগ্রেস সভাপতির পদ এমনকী কংগ্রেস ছাড়তে বাধ্য করেন। তাছাড়া, অনুকূলচন্দ্র মুখার্জীর ভাগ্নে হিসেবে বিপ্লবীদের প্রতি গান্ধীজীর মনোভাব গোপালকে গান্ধীজীর নেতৃত্বের সম্পর্কে সন্দিহান করে তুলেছিল। তিনি গান্ধীজীর তথাকথিত অহিংস আন্দোলনকে মুসলিম লিগের হিংসার রাজনীতির বিরুদ্ধে শক্তিহীন প্রয়াস হিসেবে দেখতেন। ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষার কারণে জওহরলাল সুভাষচন্দ্রের বিরোধিতার জন্য INA-এর বিরোধিতা করাকে গোপাল দেশের জনগণের প্রতি বিরোধিতা মনে করেছিলেন। সেইসঙ্গে তিনি গান্ধীজীর দুর্বলতা ও প্রত্যক্ষ সংগ্রামের অভিজ্ঞতা না থাকার কারণে তাঁর মত ও পথকে সমর্থন না করলেও তাঁর ভারতভাগের বিরোধিতার ঐকান্তিকতাকে বিশ্বাস করতেন। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, কংগ্রেসের বড়ো বড়ো নেতারা অর্থাৎ জওহরলাল ও তাঁর দলবল দ্রুত ক্ষমতা হস্তান্তরের পর আয়েস করার লোভে ভারতভাগে সায় দিয়ে গান্ধীজীকে প্রায় অপাঙ্‌ক্তেয় একজন নেতা 'বাপুজী' বানিয়ে রেখেছিল! রাজনীতির এসব নোংরা খেলা দেখে গোপাল আর রাজনীতিতে নাম লেখাতে চাননি।

গোপাল রাজনীতি সচেতন মানুষ হলেও সামাজিক কাজকর্ম এবং সাধারণ মানুষকে বিপদে আপদে সাহায্য—যেমন মড়া পোড়ানো থেকে দুঃস্থ পরিবারের মেয়ের বিয়ে দেওয়া, এলাকার বাইরে থেকে কর্মসূত্রে আসা মানুষজনের মাথা গোঁজার ব্যবস্থা করা—এইসব কাজে তিনি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোনো ধর্মীয় বিভেদ করতেন না। একই সঙ্গে বৌবাজারের মুসলমানদের সঙ্গে তাঁর ব্যবসায়িক কারণে যোগাযোগ ছিল। অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সবাই গোপাল এবং তাঁর দলের ছেলেদের সমাজসেবী হিসেবেই চিনতেন, পছন্দ করতেন। এভাবে এলাকার যুবকদের মধ্যে গোপালের স্বাভাবিক নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা হয়ে যায়। আবার শরীরচর্চা, বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলার মাধ্যমে গোপাল তাঁর দলের ছেলেদের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থাও রেখেছিলেন।

হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক থাকার কারণে গোপালের কাছে ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসের পরপরই, বিশেষ করে ২৯ জুলাইয়ের পর খবর আসে যে কিছু মুসলমান নেতার কথাবার্তা এবং কাজকর্ম ভালো ঠেকছে না। এই সময় প্রতিদিন রাজনৈতিক নেতাদের বিবৃতি ও কাজকর্মের দিকে নজর করলেই বোঝা যাবে যে, কলকাতার মানুষদের মধ্যে ধর্মীয় বিভেদের পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা চলছিল!

বৃহত্তর জাতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে যখন নেহরু ও জিন্নার ক্ষমতাভোগের লালসার কারণে শেষপর্যন্ত ক্যাবিনেট মিশনের

সব প্রস্তাব একের পর এক বাতিল হলো, তখন গান্ধীজী ভারতভাগের প্রস্তাবে সম্মতি দেওয়ার পর যা দাঁড়ালো, তা হলো, দেশের মুসলমানদের জন্য পশ্চিম ও পূর্বের দুটি খণ্ড তাদের ধর্মের ভিত্তিতে দেওয়া হবে আর বাদবাকি অংশ ভারতে থাকবে যার প্রথম নেতৃত্ব কংগ্রেসের। ইতিমধ্যে কংগ্রেসের সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদের টার্ম শেষ হয়ে যাওয়ায় গান্ধীজীর আগ্রহে কংগ্রেসের সভাপতি হলেন ইংরেজ বড়লাট মাউন্টব্যাটেনের পছন্দের মানুষ, তাঁর স্ত্রী এডুইনার ঘনিষ্ঠ জওহরলাল নেহরু। যখন দেশের পশ্চিম ও পূর্ব দুই দিকের মুসলমান জনসংখ্যার আধিক্যের কারণে ওই দুই খণ্ডের পাকিস্তানে যাওয়া নিশ্চিত হলো, তখন জিন্না-সহ মুসলিম লিগ নেতৃবৃন্দ চেষ্টা করতে শুরু করল, কীভাবে বেশি বেশি জমি পাকিস্তানে ঢোকানো যায়। গোপাল পরবর্তী সময়ে এক সাক্ষাৎকারে এই প্রসঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছিলেন, ''যদি এই সময় সুভাষচন্দ্র থাকতেন, তা হলে জিন্না, নেহরুরা কিছুতেই দেশভাগ করার সাহস পেতেন না''। তদানীন্তন বঙ্গ প্রদেশের জনসংখ্যার ৫৫ শতাংশ মুসলমান এবং ৪৫ শতাংশ হিন্দু হওয়ায় মুসলিম লিগ সমগ্র বঙ্গপ্রদেশকে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তির দাবি করে! গোপালের নিজের কথায়, ''গান্ধী-নেহেরু এই দাবির বিরোধিতা করেনি''। অর্থাৎ বঙ্গপ্রদেশকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করতে তাঁদের কোনো আপত্তি ছিল না! ১৯৪২ সালে কংগ্রেস, বিশেষত জওহরলালের ইচ্ছেতে সিদ্ধান্ত নেয় যে, ব্রিটিশরা ভারতকে স্বাধীনতা (dominion status) দিলেও তাদের সামরিক বাহিনীকে রেখে দিক। সাভারকর মনে করতেন, সুভাষ ভীতি এর কারণ। জওহরলাল চেয়েছিলেন, সুভাষের INA ও জাপানের সম্মিলিত বাহিনীকে ব্রিটিশ সামরিক শক্তি পরাস্ত করুক। এখানে জওহরলালের ব্যক্তিস্বার্থ তাঁর কাছে একমাত্র বিবেচ্য ছিল, সঙ্গে সুভাষ-ভীতি! দেশের মঙ্গল তাঁর মাথায় ছিলই না! ব্রিটিশের স্তাবকতা করে এবং গান্ধীজীর আশীর্বাদ ম্যানেজ করে ব্রিটিশের উচ্ছিষ্ট হিসেবে পাওয়া খণ্ডিত ভারতের দায়িত্ব নেওয়া তাঁর একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল। সেইসঙ্গে ভারতে তিনি চেয়েছিলেন সুভাষ এবং তাঁর INA-কে শেষ করতে। এ বিষয়ে অকাট্য প্রমাণ, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে জওহরলাল তাঁর সরকারে ব্রিটিশ দ্বারা INA উপর চাপানো নিষেধাজ্ঞা বজায় রাখেন। জওহরলালের সুভাষ-বিদ্বেষ এবং পরবর্তী সময়ে বাঙ্গলাকে পাকিস্তানে দেওয়ার বিষয়ে তাঁর মৌনসম্মতিনিঃসন্দেহে জওহরলাল তথা কংগ্রেস থেকে বাঙ্গলাকে দূরে সরিয়ে দেয়। সেজন্য স্থানীয় কংগ্রেস নেতাদের, যেমন প্রফেসর নির্মল ঘোষ, জগন্নাথ কোলে, শত ঘোষের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগতভাবে যথেষ্ট ভালো সম্পর্ক থাকলেও তিনি কখনো কংগ্রেসের ডাকা মিটিং, মিছিলে শামিল হননি।

এই সময়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ডাকা ২৯ জুলাই, ১৯৪৬ সালের ডাক ও তার ধর্মঘট যখন সম্পূর্ণভাবে সফল হলো, তখন কমিউনিস্টরা ভাবল, দেশের কিছু হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানরাও বোধহয় তাদের সমর্থন করছে। ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে এই ধর্মঘটের প্রভাব না পড়লেও পড়ল গিয়ে কমিউনিস্টদের নিজেদের চিন্তাধারার উপর। তারা জানত, দেশের মুসলমান নেতৃত্ব 'প্রথমে ধর্ম তারপর অন্য কিছু'---এই মতবাদে বিশ্বাসী। সেজন্য কমিউনিস্টরা উদ্বেলিত আনন্দে 'প্রথমে পাকিস্তান দিতে হবে' আওয়াজ তুলল। তারা লক্ষ্য করল না, ওই একই দিনে বম্বেতে মুসলিম লিগের সর্বভারতীয় কাউন্সিলের সভায় প্রস্তাব ঘোষণা করা হলো ১৬ আগস্ট, ১৯৪৬, ডাইরেক্ট অ্যাকশান ডে! আশ্চর্য ব্যাপার হলো, কমিউনিস্ট পার্টির দলগতভাবে এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানানো! এখানেই শেষ নয়,কমিউনিস্ট নেতারা দেশজুড়ে ডাইরেক্ট অ্যাকশান ডে-র সমর্থনে প্রচার, মিটিং-মিছিল শুরু করে দিল। এমনকী ১৬ আগস্টের অক্টারলোনি মনুমেন্টের (বর্তমান শহিদ মিনার) পাদদেশে মুসলিম লিগের যে অত্যন্ত প্ররোচনামূলক সভা হয়, সেখানে মঞ্চ আলো করে কমিউনিস্ট দলের পক্ষ থেকে জ্যোতি বসু উপস্থিত ছিলেন।

এই সময় মুসলিম লিগের কাছের দৈনিক পত্রিকা 'মর্নিং নিউজ' কমিউনিস্টদের ধর্মঘটের বিরোধিতা করে লেখে, বম্বের লিগের সভার সিদ্ধান্ত 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' অর্থাৎ ডাইরেক্ট অ্যাকশান, ধর্মঘট নয়। প্রথম থেকেই ভারতের ইতিহাসে কমিউনিস্টরা মুসলিম লিগের দ্বিতীয় সারি হিসেবে কাজ করলেও স্বার্থের সংঘাতে কমিউনিস্টদের সক্রিয় বিরোধিতা করতে মুসলিম লিগের আটকায়নি। দেশের কমিউনিস্টরা প্রথম পর্যায়ে লিগের সঙ্গে মিলে যৌথ মিছিল, মিটিং করে। এসব প্রত্যক্ষ করে গোপাল তাঁর 'ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর ছেলেদের যে কোনো পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত থাকতে বললেন। ১ আগস্ট থেকে ১৬ আগস্ট, ১৯৪৬, 'মর্নিং নিউজ' কাগজে প্রতিদিন প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নামে হিন্দু-সংহারে সাধারণ মুসলমানদের প্ররোচিত করা হয়।১ তারিখ খাজা নাজিমুদ্দিন সব মুসলমান যুবককে 'মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড'-এ যোগ দিতে আহ্বান করলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, এই মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডের কলকাতার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন তদানীন্তন ইসলামিয়া কলেজ (বর্তমান মৌলানা আজাদ কলেজ)-এর ছাত্র মুজিবুর রহমান, যিনি পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হন। ৫ আগস্ট মুসলিম ইন্সটিটিউট হলে নাজিমুদ্দিন তাদের এই ন্যাশনাল গার্ডের সমাবেশে 'পবিত্র কোরান ও ইসলামের নির্দেশ' পালন করার কথা বললেন! ৮ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী গোলাম হুসেইন সুরাবর্দি ১৬ আগস্ট বাংলায় সরকারি ছুটি ঘোষণা করলেন। কারণ, ওই দিন হজরত মহম্মদ তাঁর ধর্মযুদ্ধ শুরু করেন, যার পরিণতিতে জয়লাভ করে তিনি পবিত্র মক্কা শহরের কর্তৃত্ব পান। মুসলিম লিগের ছোটো-বড়ো নেতারা সকলেই প্রত্যক্ষ সংগ্রামকে কংগ্রেসের মতো শান্তিপূর্ণ না রেখে সরাসরি শক্তি প্রয়োগের পক্ষে ওকালতি করেন। জিন্না প্রত্যক্ষ হুমকি দিয়ে বলেন, ''To-day we have also forged a pistol and are in a

শরণার্থীদের সঙ্গে গোপাল মুখার্জি ও শ্যামাপ্রসাদ।

position to use it'' (Ref. : Amrita Bazar Patrika, 31st July, 1946)। সুরাবর্দি সব মুসলমানকে বলেন, ''Marshal all your forces under the banner of Muslim League''। ৯ আগস্ট কলকাতার মেয়র মহম্মদ উসমান প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। সেইদিন প্রতিটি মসজিদে মুসলিম লিগের প্রতিনিধি থাকার ঘোষণা করা হয়। বলা হয়, রমজান শুরুর পরই মহান আল্লা বিধর্মীদের বিরুদ্ধে জিহাদের নির্দেশ দেন। মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডের সদস্যদের খাকি পোশাক ও সবুজ টুপি পড়ার ফরমান দেওয়া হয়– এক ধর্মীয় যোদ্ধা দলের ইউনিফর্মের রূপ দেওয়ার অভিপ্রায়। রেলের মুসলিম কর্মীদের নিয়েও একই রকমভাবে মুসলিম ন্যাশনাল কোর গঠন করা হয়। এই সময় কমিউনিস্টদের ভূমিকা ছিল বিনা বাক্যব্যয়ে মুসলিম লিগের স্বার্থ দেখার তাবেদারি করা।

সুরাবর্দি বাঙ্গলার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর থেকে বাঙ্গলার পুলিশবাহিনীতে ধীরে ধীরে বিহার ও ইউপির উর্দুভাষী মুসলমানদের ব্যাপকভাবে নিয়োগ করতে শুরু করেন। তখন এর কারণ বোঝা না গেলেও ১৯৪৬-এ তা পরিষ্কার বোঝা গেল। এখানে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা দরকার। ভারতের মুসলমানদের মধ্যে যিনি প্রথম আধুনিক শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে ছিলেন, সেই স্যার সৈয়দ আহমেদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে কে কে আজিজের বিশ্লেষণ হলো, হিন্দু ও মুসলমান দুটি পৃথক জাতি। সেজন্য ভারতে সর্বদা মুসলমানরা সংখ্যালঘু থাকার কারণে মুসলমানরা কখনোই ভারতে অবাধ গণতন্ত্রের পক্ষে সহমত হতে পারে না। আসলে বিদেশ থেকে এসে যে আক্রমণকারীরা ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার করে এত বছর প্রভূত্ব চালিয়েছে, তার উত্তরাধিকার (legacy) বহন করার মানসিকতা নিয়ে চলেছে পরবর্তী মুসলিম সম্প্রদায় তা তারা যতই ধর্ম পরিবর্তনকারীর উত্তরাধিকার নিয়ে চলুক। ভারতের মুসলমানদের এই এক সমস্যা। এই সময় রাজনীতির মারপ্যাঁচে কংগ্রেস নেতৃত্বের এক বড়ো ব্যর্থতা হলো, ভারতীয় হিন্দুদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা ও অস্পৃশ্যতাকে দুর করার চেষ্টা না করা। যদিও গান্ধীজী অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে কিছু কসমেটিক আন্দোলন করেছেন, কংগ্রেস নেতৃত্বের নিম্নবর্ণের মানুষের মধ্যে

কাউকে নেতৃত্বের প্রথম সারিতে না আনা তাদের মারাত্মক ভুল। আবার মুসলমান নেতৃবৃন্দ প্রায় সকলেই আশরাফি মুসলমান হলেও বাঙ্গলার মুসলমানরা প্রায় সকলেই ধর্মান্তরিত নিম্নবর্গীয় আজলাফি মুসলমান। বিহারের আশরাফি মুসলমানরা তাদের নিজেদের কবরস্থানে কখনো কোনো আজলাফি বা আতরাফি মুসলমানের কবর দিতে দেবে না। মুসলমানদের মধ্যে যে এই বর্ণভেদকে ব্যবহার করে তাদের মধ্যে বিভেদের চেষ্টা কখনো কংগ্রেস করেনি। মনে হয়, গান্ধীজী এটি জানতেন না আর জওহরলালদের এই রাজনৈতিক বোধই ছিল না। এসব সত্ত্বেও মুসলিম লিগ নেতৃত্ব সব মুসলমান সম্প্রদায়কে এক করার কাজে মসজিদ ও স্থানীয় ধর্মীয় নেতাদের ব্যবহার করেছে। পক্ষান্তরে কংগ্রেস নেতৃত্ব হিন্দুধর্ম ও সাধু-সন্ন্যাসীদের বিদ্রূপ করে রাজনীতি থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দিয়েছে।

গোপালের পড়াশোনা বেশি না থাকলেও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, হিন্দুদের বাঁচতে হলে বর্ণভেদ নয়, শুধু হিন্দু হয়েই বাঁচতে হবে। তাছাড়া, তাঁর পরিচিত যেসব নিম্নবর্গীয় শ্রমজীবী মুসলমান দাঙ্গায় আটকে গিয়েছিলেন, গোপাল আর তাঁর দলের ছেলেরা সেইসব শ্রমিকদের মুসলমান মহল্লায় পৌঁছে দেন। এখানে গোপালের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিপক্কতার পরিচয় মেলে।

স্যার সৈয়দ আহমেদের উত্তরাধিকার বহনকারী ব্যারিস্টার জিন্না এবং ব্যারিস্টার গোলাম হুসেইন সুরাবর্দি যখন বুঝতে পারলেন, ইংরেজ শাসক ভারত ভাগ করে পশ্চিম ও পূর্ব, দুটি খণ্ডে মুসলমানদের জন্য দেবে, তখন দেশের রাজনীতিকরা নতুন করে তাদের হিসেব কষতে শুরু করলেন। এটা ঠিক যে, বিপ্লবী কর্মকাণ্ড, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের INA-র ক্রিয়াকলাপ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক মন্দা ব্রিটিশদের ভারত ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছিল। একথা পরবর্তী সময়ে প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এটলি এবং বাবা সাহেব আম্বেদকর BBC-কে দুটি পৃথক ইন্টারভিউতে জানিয়েছিলেন। যেহেতু প্রাথমিকভাবে ঠিক হয় ভারতকে ত্রিখণ্ডিত করে দুটি পৃথক দেশে কমনওয়েলথের মধ্যে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস দেওয়া হবে, ব্রিটিশরা স্বাভাবিক যুক্তিতেই তাদের পছন্দের রাজনীতিকদের হাতে দুটি দেশের শাসনভার অর্পণ করতে চাইবে। গোপাল পরবর্তীকালে বিদ্রূপ করে বলেছিলেন, ''দেশের স্বাধীনতা গান্ধীজীর চরকা কাটা আর অহিংসার কারণে আসেনি''।

যখন বোঝা গেল, ইংরেজ শাসক পাকিস্তানের দুটি খণ্ড মুসলিম লিগ আর ভারতের বাকি অংশ কংগ্রেসের হাতে দিয়ে যাবে, তখন দুই দলের নেতৃত্ব নিজেদের মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল আর সেইসঙ্গে তাদের চিন্তায় কিছু মৌলিক বদল এল। সহিংস স্বাধীনতার আন্দোলনকে গান্ধী-নেহরুর কংগ্রেস যেমন তীব্র বিরোধিতা করেছে, তেমনি লিগও স্বাধীনতার জন্য সহিংস আন্দোলনের বিরোধিতা করেছে। পরবর্তীকালে পাকিস্তানকে জিন্না-সহ লিগ নেতারা যেমন নিজেদের জমিদারি ভাবতেন, তেমনি জওহরলাল নেহরু ভারতকে ব্রিটিশ প্রদত্ত তাঁর জায়গিরদারি মনে করে শাসন করার চেষ্টা করেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের বিকৃত ইতিহাস পড়তে মানুষকে বাধ্য করা হয়েছে। বেলেঘাটায় যে ছাগলের দুধ গান্ধীজী খেতেন, সেটিকে খুঁটিতে বাঁধার দড়িটি সংরক্ষণ করা আছে। গান্ধীজীর পাদুকা সংরক্ষিত আছে। কিন্তু ক্ষুদিরাম থেকে ভগৎ সিং কারোর ফাঁসির দড়ি পাওয়া যায় না। বীর সাভারকর সশস্ত্র সংগ্রামের সঙ্গে ভারতীয়ত্বের কথা বলতেন বলে গান্ধী-নেহরুর ইজারা নেওয়া কংগ্রেস তাঁর বিরোধিতা করেছে। বাঙ্গলার এত যে বিপ্লবী ফাঁসির দড়িতে বা ব্রিটিশের গুলিতে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, তাদের কাউকেই কংগ্রেস নেতৃত্ব স্বীকৃতি দেওয়া দূরে থাক, তাদের মত ও পথের বিরোধিতায় ব্রিটিশ রাজশক্তির পথই অনুসরণ করেছেন। এমনকী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতীয়দের ব্রিটিশ রাজের সমর্থনে দাঁড়াতে বলে কংগ্রেস এবং মুসলিম লিগ 'একই বৃন্তে দুটি কুসুম' হয়ে ব্রিটিশ রাজের কাছে আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভের খোয়াব দেখতে থাকে। যখন ১৯৪৫-৪৬ সাল নাগাদ ব্রিটিশ সরকার ভারতকে খণ্ডিত স্বাধীনতা দেওয়া মনস্থ করে, কালনেমির লঙ্কাভাগের মতো লিগ বনাম কংগ্রেস কলহ শুরু হয়। লিগ নেতারা জানতেন যে, কংগ্রেসের দিকে জনসমর্থন থাকলেও গান্ধীজীর অহিংস নীতি আর জওহরলাল-সহ প্রথম সারির কংগ্রেস নেতৃত্বের গায়ে পাউডার মেখে শখের রাজনীতির সঙ্গে লড়তে হলে তাদের জনসমর্থনে ভাঙ্গন ধরাতে হবে। সেইমতো তারা সারা দেশের মুসলমানদের ধর্মের নামে সঙ্ঘবদ্ধ করতে শুরু করল। এই কাজে তারা মসজিদের ইমাম ও মৌলবিদের ক্ষমতা এবং অর্থের লোভ দেখিয়ে বশীভূত করল।

কংগ্রেসের নির্বোধ, অনভিজ্ঞ ও দাম্ভিক নেতৃত্ব প্রকাশ্যেই বিদ্রূপ করত। কংগ্রেস নেতৃত্ব যেহেতু কোন রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে যায়নি, তারা সর্বদা একবগ্গা নীতি—'গণতন্ত্রে সংখ্যাধিক্যের জয়' মতকে একমাত্র গ্রহণযোগ্য মনে করে বসে রইল। কিছু মুসলমান নেতা লিগের সঙ্গে না গিয়ে কংগ্রেসে থেকে গেলেন এই ধারণায় যে, সংখ্যাধিক্যের জোরে কংগ্রেসের ক্ষমতা লিগের তুলনায় বেশি হবে। ওদিকে লিগের পরিকল্পনা ছিল ভিন্ন। তারা ধর্মযুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়ে সাধারণ মুসলমানদের উদ্দেশে বিশেষ করে নমাজের পর, মসজিদ থেকে জ্বালাময়ী বক্তৃতায় ইসলামকে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানাতে শুরু করল। লিগ নেতারা, বিশেষত সুরাবর্দি প্রধানমন্ত্রী থাকায় , বাঙ্গলায় প্রশাসন ও পুলিশকে ব্যবহার করে পুরো তাদের তথাকথিত স্বাধীনতা-আন্দোলনকে হিন্দু-বিরোধী ধর্মীয় সংগ্রামে পরিবর্তন করল। অথচ, লিগ ও কংগ্রেস, দুই দলই ব্রিটিশ রাজশক্তির সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে ভারত ভাগের প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়। তারপর ভারতভাগ যখন স্বীকৃত হলো, তখন লিগ নেতৃত্ব কংগ্রেসের উদ্ভট 'ধর্মনিরপেক্ষতা' এবং

'অহিংস' নীতির সুযোগে দেশের মুসলমানদের হিন্দুদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে প্ররোচনা দিতে লাগল। তাদের সামনে যুদ্ধজয়ের পুরস্কার হিসেবে জমি, ধন-সম্পত্তি ও নারীদেহ সম্ভোগের লোভ দেখাতে লাগল।

কলকাতায় বিভিন্ন মসজিদে অস্ত্র সংগ্রহ করে রাখা হলো। মুসলিম মহল্লায় ন্যাশনাল গার্ডের যুবকরা অস্ত্রশস্ত্র জড়ো করতে শুরু করল। কমিউনিস্টরা লিগের দাবির সমর্থনে যৌথ মিটিং, মিছিল করলেও তারা নাকি বুঝতেই পারেনি লিগের আসল উদ্দেশ্য। সমর মুখোপাধ্যায়ের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী মুসলমান এলাকায় আগেরদিন প্রচার করলেও তাঁরা নাকি বুঝতেই পারেনি লিগ যে এমন দাঙ্গার চক্রান্ত করেছে (অমলেন্দু সেনগুপ্ত, উত্তাল চল্লিশ ঃ অসমাপ্ত বিপ্লব; ১৯১-১৯২)। কমিউনিস্টরা হিন্দুদের চরম ক্ষতি করার চক্রান্তে যে দলগতভাবে শামিল হয়েছিল, তা এই বোকাবোকা এবং ন্যাকা যুক্তিতেই বোঝা গেছে।

অথচ গোপাল মুখার্জীর মতো রাজনীতির বাইরের জগতের অনেকেই রাজ্যের লিগ সরকার প্রযোজিত হিন্দু-নিধন কার্যাবলীর প্রতিরোধের জন্য দরকারি প্রাথমিক প্রস্তুতি সেরে নিয়েছিলেন। হিন্দুমহাসভা যখন তীব্রভাবে ১৬ আগস্টের মুসলিম লিগের ডাকা ধর্মঘটের বিরোধিতা করে, তখন কংগ্রেস খানিক দায়ে পড়ে এবং বাঙ্গলায় দলরক্ষার তাগিদে মৌখিকভাবে ধর্মঘটের বিরোধিতায় নামে। ততদিনে লিগ নেতৃত্ব কংগ্রেসের মৃদু ইংরেজ বিরোধিতার সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষতার বুলিকে সঠিকভাবে পড়ে নিয়েছে। তারা আক্রমণাত্মক অবস্থান নিয়ে ১৬ আগস্ট বাঙ্গলায় সরকারি ছুটি ঘোষণা করে। ওই সময় পাড়ায় পাড়ায় যেখানে হিন্দু প্রাধান্যের ক্লাব ছিল, তাদের অধিকাংশ হিন্দু মহাসভার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েছিল। গোপাল নিজস্ব বাহিনীর হাতে রিভলবার, বোমা ও হ্যান্ড গ্রেনেড দিয়ে তাদের আসন্ন যুদ্ধের মোকাবিলায় তৈরি থাকতে বলে। গোপাল এসব অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আসা আমেরিকান সৈন্যদের কাছ থেকে। মণিকুন্তলা সেন 'সে দিনের কথা' গ্রন্থে (১৭০-১৭১ পাতা) লিখেছেন, ''কিছু একটা অঘটন ঘটবে এটা সবাই অনুমান করেছিল। সুতরাং হিন্দুরাও পাড়ায় পাড়ায় তৈরি হলো''।

১৬ আগস্ট, ১৯৪৬-এ অক্টারলোনি মনুমেন্টে লিগ নেতাদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দি এবং খাজা নিজামুদ্দিন বিশেষ করে তীব্র ভাষায় হিন্দু তথা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক ধ্বংসলীলা চালানোর আর্জি জানান। সুরাবর্দি বলেন, তিনি প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন, কোনো মুসলিম যুবককে কোনো অপরাধের জন্য তাঁর অনুমতি ছাড়া গ্রেপ্তার করা যাবে না। এইসঙ্গে কলকাতার মেয়র মহম্মদ উসমান মুসলমান দাঙ্গাকারীদের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য কর্পোরেশনের গাড়ি ব্যবহার করতে দেন। সুরাবর্দির নির্দেশে এই দাঙ্গাকারীদের সরকারি খরচে জ্বালানি এবং অন্যান্য সাহায্য দেওয়া হয়। মনুমেন্টের মিটিং শেষ হওয়ার আগেই ধর্মতলার মসজিদ থেকে নমাজের পর উন্মত্ত জনতা লাঠি, তরোয়াল এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বেরিয়ে এসে হিন্দুদের দোকান-সম্পত্তি লুঠ করতে শুরু করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মিটিং ফেরত জনতা বিভিন্ন মহল্লায় ছড়িয়ে যায়—ভাঙচুর, লুঠপাট এবং মহিলাদের শ্লীলতাহানি-সহ হিন্দুদের খুন করার খবর আসতে থাকে। মিটিং শেষে সুরবর্দি সোজা লালবাজারের কন্ট্রোল রুমে চলে যান। সেখান থেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে থাকেন। তাঁর উদ্দেশ্য, আপরাইট ইউরোপীয় পুলিশ অফিসাররা যাতে মুসলমান দাঙ্গাকারীদের কোনো বাধা না দিতে পারে। এমন দাঙ্গা পৃথিবীর ইতিহাসে আরেকটি খুঁজে পাওয়া যাবে না, যেখানে শাসকদল একটি সম্প্রদায়কে শুধু তাদের ধর্ম বিশ্বাসের জন্য নির্মূল করার কাজে সরকারি যন্ত্রকে ব্যবহার করতে নেমে পড়ে। মসজিদ থেকে সরাসরি দার-উল-হার্বকে দার-উল-ইসলামে রূপান্তরের ফরমান দেওয়া হয়।

জিন্না থেকে শুরু করে মৌলানা আক্রম খান, খাজা নাজিমুদ্দিন, মহম্মদ উসমান এবং পালের গোদা সুরাবর্দি সকলে যে উত্তেজক বক্তৃতা দিতেন সেইসবের নির্যাস হচ্ছে, লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান। এই লড়াই ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে নয়। তাঁরা তো পাকিস্তান দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই লড়াই হিন্দুদের বিরুদ্ধে—যত হিন্দুদের ভয় দেখিয়ে খতম করে দেওয়া যাবে—ততই পাকিস্তানের সীমানা বাড়ানো যাবে।

কংগ্রেসের শক্তি হলো তাদের সমর্থক হিন্দুদের সংখ্যাধিক্য এবং গণতন্ত্রে এই সংখ্যাধিক্যের কারণেই কংগ্রেস ভোটযুদ্ধে লিগকে হারিয়ে দিতে পারে। তাই জিন্না-সুরাবর্দিরা পাকিস্তান গঠনের প্রক্রিয়ার মধ্যে কোনো গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যেতে চায়নি। ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান গঠনের সিদ্ধান্ত হয়ে যাওয়ার পর তারা যে গোপন অ্যাজেন্ডায় কাজ চালাতে চাইল সেই ভয়ংকর পরিকল্পনা হলো, দেশের মধ্যে যতটা সম্ভব হিন্দুদের খতম করে এবং ভয় দেখিয়ে ধর্ম পরিবর্তন করিয়ে নিলে মুসলমান জনসংখ্যা অনেকটাই বেড়ে যাবে। তখন এলাকাভিত্তিক মুসলমান জনসংখ্যার ভিত্তিতে তারা ব্রিটিশের থেকে পাকিস্তানের জন্য বেশি জমি দাবি করতে পারবে। এই সময় নেহরুর ক্রিয়াকাণ্ড লিগের ঘৃণ্য পরিকল্পনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে সহায়ক হয়। এর দুরকম ব্যাখ্যা হতে পারে। নেহরুর রাজনৈতিক নির্বুদ্ধিতা লিগের পরিকল্পনার বাস্তবতাকে বুঝতে বাধা দিয়েছে; অথবা, বাঙ্গলা-বিহারের হিন্দুদের মধ্যে সশস্ত্র সংগ্রামী ও প্রতিবাদী বিপ্লবীদের সংখ্যা বেশি থাকায় (যাদের নেহরু-গান্ধী জুটি ব্রিটিশদের চিন্তার সঙ্গে সহমত হয়ে সন্ত্রাসবাদী মনে করতেন।) বাঙ্গলার হিন্দুদের বাঁচাতে কংগ্রেসের সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার ইচ্ছে তেমন ছিল না। অবশ্য বাঙ্গলার কংগ্রেস নেতারা—বিজয় সিংহ নাহার এবং প্রদেশ সভাপতি সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ ১৬ আগস্টের ধর্মঘটের বিরুদ্ধে বিবৃতি দেন। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে

হিন্দু-মহাসভা প্রাদেশিক আইন পরিষদে ধর্মঘটের বিরুদ্ধে প্রস্তাব আনলে তা ৩১—১৩ ভোটে বাতিল হয়ে যায়। এই সময় কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা ন্যক্কারজনক ছিল। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন কমিউনিস্ট ইতিহাসবেত্তা, যারা মিথ্যার জাল বুনে গবেষণাপত্র লিখে সমাজে বুদ্ধিজীবী হয়েছেন, তাঁরা সে সময় যে হিন্দু যুবকেরা কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে রীতিমত মুসলমান খুনি, গুন্ডাদের সঙ্গে লড়াই করে হিন্দুদের প্রাণ বাঁচালো, তাঁদের গুন্ডা আখ্যায় দেগে দিল। বোঝা যায়, সুরাবর্দির প্ল্যান বানচাল হওয়ায় লিগের মতো কমিউনিস্টরা হতাশা থেকে এই মিথ্যাচার করেছে। এরা গোপাল মুখার্জীর মতো বীর, উদার মানুষকে পর্যন্ত গুন্ডা বলে স্ট্যাম্প করেছে। এভাবে কমিউনিস্টরা নিজেদের জিহাদি, হিন্দুবিরোধী তথা ভারত-বিরোধী হিসেবে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে চিহ্নিত করেছেন। ইতিহাস এইসব অর্ধশিক্ষিত ধান্দাবাজ মিথ্যাচারী কমিউনিস্টদের মুখোশ খুলে দিয়েছে।

একদিন গোপাল মুখার্জী তাঁর বেলেঘাটা সরকার বাজারের দোকানে আমার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেছিলেন, ''বাবার মত বিদ্বান হও''। বাবাকে কথায় বলেন, ''ভবানী, এই যে তোমাদের বইপত্রে লেখা হয়, মুসলমান শাসকরা নাকি খুব সংস্কৃতিবান আর তাদের শাসনে নাকি দেশের অনেক উন্নতি হয়েছিল তা আমি মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, অতশত জানি না, শুধু জানি এদেশে মুসলমানরা অনেক কবরখানা বানিয়েছে। কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বানিয়েছে কি?'' একজন সাধারণ মানুষের অসাধারণ পর্যবেক্ষণ। তাঁর নিজের বক্তব্য অনুযায়ী বলতে হয়, তিনি সাধারণ গরিব মুসলমানদের কখনো বিরোধিতা করেননি।

যাক সে কথা। ফিরে আসি ১৬ আগস্ট, ১৯৪৬এ। সেই সময়ের বাল্যজীবনের স্মৃতি যাদের আছে, সেই ভয়াবহতা ভয়ংকর দুঃস্বপ্নকেও হার মানায়। মনুমেন্টের সামনে লিগের মিছিল শুরু হওয়ার আগেই বিচ্ছিন্নভাবে উত্তর ও মধ্য কলকাতায় ছুরি মারা শুরু হয়। মিছিল থেকে বটেই, সুরাবর্দির লিগ সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে এবং লিগ পরিচালিত কলকাতা কর্পোরেশনের লরিতে করে মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডের ছেলেরা নারা লাগায়—আল্লাহু আকবর আর লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান।

প্রথম মারধোরের ঘটনা ঘটে সকাল ৬টা নাগাদ মানিকতলা ব্রিজে। এক হিন্দু গোয়ালার দুধের ড্রাম লুঠ করে তাকে বেধড়ক পেটানো হয়। তার পরপরই মানিকতলা মোড়ের 'দেশবন্ধু মিষ্টান্ন ভাণ্ডার' লুঠ হয়। এখানে স্থানীয় মসজিদ থেকে বেরিয়ে লিগ ক্যাডাররা, যাদের কমিউনিস্ট ইতিহাসবিদরা 'শান্তির দূত' বলেন, আমহার্স্ট স্ট্রিটের মোড়ের শীতলা মন্দির ভাঙে এবং বেছে বেছে হিন্দুর দোকানে লুঠপাট চালায়। এখানে অবাঙ্গালি কালোয়ারদের বাধায় তারা সাময়িকভাবে পিছু হটে। কেশব সেন স্ট্রিটের একজন মুসলমান নুর মহম্মদ তাঁর দোকান বন্ধ করতে রাজি হন না বলে লিগের ছেলেরা তাঁকে এমনভাবে মারে যে তিনি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। কিছু কমিউনিস্ট আর ছুপা লিগ সমর্থক হিন্দু নামধারী কমিউনিস্ট ধান্দাবাজ লিখেছেন, মনুমেন্টের মিটিঙের পর যে মিছিল বেরোয় তা হিন্দু এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় নাকি তাদের উপর ইট মারা হয়। এই প্ররোচনার ফলেই নাকি দাঙ্গা বাঁধে। এটি সর্বৈব মিথ্যা সঙ্ঘবদ্ধ ঘৃণ্য হত্যালীলা চালানোর পরিকল্পনাকে না দেখে এভাবে তাকে সমর্থন করা শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেয়েও দুর্বল যুক্তি। এই মিথ্যাচার এখন পুরো খসে পড়েছে। প্রমাণ এক, নুর মহম্মদের মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির রেকর্ডের সময় সকাল ৭ টা বেজে ১৫ মিনিট। নুর মহম্মদের বয়ানেই জানা যায় যে, তাঁর উপর আক্রমণ করেছিল লিগের লোকেরা। প্রমাণ দুই, পরবর্তী ভর্তি একজন ছুরিকাহত হিন্দু। সময় ৭টা ৩৫ মিনিট। ক্যাম্পবেল হাসপাতাল (বর্তমান নীলরতন সরকার)। প্রথম ছুরি মারা একজন হিন্দুকে ভর্তি করা হয়, সময় সকাল ৯টা। কারমাইকেল হাসপাতালেও (বর্তমান আরজিকর) প্রথম ছুরি মারা রোগী ভর্তি হয় সকাল ৭টা ৪৫ মিনিটে। তিনিও একজন হিন্দু। হিন্দুদের মারধোর এবং লুঠপাট শুরু হয় সকাল থেকেই। তবে এসব বিক্ষিপ্তভাবে উত্তর কলকাতা এবং পূর্বের কিছু অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। দুপুরের আগেই টালা ব্রিজের দিক থেকে শ্যামবাজারের দিকে এক উন্মত্ত জনতা 'আল্লা হু আকবর, লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' ধ্বনি দিতে দিতে এগোতে থাকে এবং আশেপাশের হিন্দুদের দোকানপাট ও রাস্তার উপরের বাড়িঘর লুঠ করার চেষ্টা করতে থাকে।

একটি ব্যাপার খুব পরিষ্কার। গোপালের ছেলেরা খবর নিয়ে এসেছে কীভাবে সশস্ত্র জিহাদিরা হিন্দুদের আক্রমণ, লুঠতরাজ করছিল এবং এদের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিয়ে জ্বালানি-সহ লরি ও গাড়ি দিয়ে সক্রিয় সহযোগিতা করছিল বাঙ্গলার লিগ সরকারের প্রশাসন। সুরাবর্দি নিজে লালবাজারের কন্ট্রোল রুমে বসে থেকে পুলিশকে নিষ্ক্রিয় থাকার আদেশ দেন। এদিকে পুলিশের ইউরোপীয় অফিসারেরা ব্রিটিশ সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দাঙ্গা থামানোর কোনো চেষ্টা করেনি। Modern Review-তে ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে একটি প্রবন্ধে একজন ব্রিটিশ সাংবাদিক লেখেন, ১৪ আগস্ট, ১৯৪৬-এ ব্যারাকপুরের সামরিক অফিসারদের এক বৈঠকে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হলে কী করবে সে বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হয়—''when riot begins, we will not interfere. If the people wants swaraj, let them fight for it''। ভারতীয়দের মধ্যে ধর্মের ভিত্তিতে লড়াই হলে তারা একে অপরের সঙ্গে লড়াই করে হীনবল হোক এটাই ভারত ত্যাগের আগে ব্রিটিশ মানসিকতা। এর থেকে বোঝা যায়, ১৯৪৬ এর দাঙ্গা বাঁধানোর পুরো চক্রান্ত করা হয় সুরাবর্দি সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে; সে সময় যাঁরা দাঙ্গার পূর্বাভাস পাননি বলে জানিয়েছিলেন, তাঁরা মিথ্যাচার করেছেন। এমনকী ব্রিটিশরা আসন্ন দাঙ্গায় তাদের ভূমিকা কী হবে তা নিয়ে মিটিং করে সিদ্ধান্ত নিল, আর কমিউনিস্ট এবং

গান্ধী-জওহলালরা কিছুই জানত না, তা অসম্ভব। সুরাবর্দিকে এ কাজে পূর্ণ সহযোগিতা করে বিভিন্ন মসজিদ কর্তৃপক্ষ, ইমাম, মৌলভিরা। সাধারণ খেটে খাওয়া মুসলমান ও যুবকদের প্রলুব্ধ করা হয় লুঠের সামগ্রীসহ হিন্দু-নারী সম্ভোগের লোভ দেখিয়ে। মসজিদে এসব কাজকে জায়েজ এবং সাচ্চা মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য হিসেবে প্রতিদিন বোঝানো হতো।

গোপাল তাঁর দলের ছেলেদের উপর কড়া নির্দেশ দেন, যেন কোনো রমণীর, তা হিন্দু বা মুসলমান যে ধর্মেরই হোক না কেন, গায়ে হাত দেওয়া না হয়, তাদের উপর অত্যাচার দূরের কথা। তাছাড়া বহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে তিনি ও তাঁর আদেশে তাঁর ছেলেরা সাধারণ মুসলমান মজুর ও শ্রমিক, যারা দাঙ্গায় অংশ নেয়নি, কিন্তু দাঙ্গার মধ্যে পড়ে গেছে তাদের safe passage-এর বন্দোবস্ত করে নির্বিঘ্নে মুসলমান এলাকায় পৌঁছানোর বন্দোবস্ত করেছেন। গোপালের নিজের বয়ানে ১৬ আগস্ট (১৯৪৬) সকাল থেকে মুসলিম লিগের আচরণে কলকাতায় উত্তেজনার পারদ চড়তে থাকে। লিগের একটা বড়ো মিছিল ময়দান থেকে বেরিয়ে বৌবাজার হয়ে হ্যারিসন রোডের দিকে যেতে থাকে। তারা মুহুর্মুহু স্লোগান দেয় লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান। দেহভঙ্গিমায় তাদের আক্রমণাত্মক মেজাজ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল। এর মধ্যে খবর এলো বেলেঘাটা ব্রিজের কাছে দুজন হিন্দু গোয়ালাকে লিগের গুন্ডারা কেটে ফেলে রেখেছে। এই খবর শুনে গোপাল স্থির করেন, এবার কিছু করা প্রয়োজন বিশেষত লুঠতরাজ এবং রক্তক্ষয় অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। সেজন্য তিনি ১৯৪২ এর আন্দোলনের সময় যে ছেলেদের নিয়ে 'ভারতীয় জাতীয় বাহিনী' নামের সংগঠন তৈরি করেন, তার সদস্যদের ডেকে পাঠান এবং তাদের বলেন, মূল চেষ্টা হবে লুঠপাঠ বন্ধ করা ও সেইসঙ্গে দাঙ্গাকারীদের নিরস্ত্র করা। তিনি এটা বুঝেছিলেন যে, হিন্দু-মুসলমান যদি শুধু ধর্মের কারণে নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি করে, তাহলে ক্ষতি উভয় ধর্মের মানুষের। সেজন্য তিনি তাঁর ছেলেদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে তাদের চাঁদনিচকের দিকে মুসলমান বস্তির ভিতর থেকে আসা দাঙ্গাকারীদের আটকানোর দায়িত্ব দিলেন আর মলঙ্গা লেন-সহ তাঁর পাড়ার দায়িত্বে নিজে রইলেন। তাঁর সাথে সর্বদা দুটি লোডেড রিভলবার রাখতে শুরু করলেন। তিনি হাতে খোলা সোর্ড নিয়ে যখন নিজের মলঙ্গা লেনের বাড়ির সামনে এলেন, বাড়ির দরজা ভিতর থেকে বন্ধ আর বাড়ির সামনে দাহ্য আবর্জনা জড়ো করে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। যাতে আগুনে বাড়ি পুড়লে পরিবারের সবাই বেরিয়ে আসতে বাধ্য হবে। তিনি তখন দেখলেন, উলটোদিকের পানের দোকান ভেঙে একজন লুঠের চেষ্টা করছে। তখন গোপাল সোর্ডের এক কোপে লুঠেরাকে দু'টুকরো করে দিলেন। এই সময় এক লোহার রডে ধাক্কা লেগে সোর্ডটা ভেঙে গেল। তারপর নিজের বাড়ির সামনের আগুন নিভিয়ে তিনি পাশের বাড়ির দিকে নজর দিলেন। সেখানে চাঁদনিচকে বিভিন্ন দোকানে কাজ করা মুসলমান কর্মচারীদের একটি মেস ছিল। ওই মেসে ৩৫০ থেকে ৪০০ লোক থাকত। এছাড়া সেখানে salvation army-র বাড়িতেও কিছু মুসলমান কর্মচারী থাকত। তিনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে এইসব গরিব মুসলমান কর্মচারীদের বের করে নিয়ে তাদের চাঁদনির বস্তিতে পাঠালেন। বিকেল নাগাদ কড়েয়ার দিক থেকে ব্যান্ড বাজিয়ে একদল মুসলমান ময়দানে আসছিল। তাদের দলটা পথিমধ্যে হিন্দুর দোকান পেলেই তা লুঠের চেষ্টা করছিল। গোপাল তাঁর পূর্বপরিচিত ওই এলাকার কিছু মুসলমান ছেলেকে ডেকে বললেন, 'এসব এখুনি বন্ধ করতে হবে'। এতে দু'পক্ষেরই ক্ষতি। ইতিমধ্যে গোপালের নির্দেশ মেনে তাঁর ছেলেরা অমিতবিক্রমে লুঠেরাদের উপর নির্দয়ভাবে আঘাত হানতে শুরু করেছে। পরদিন মুসলিম ARDS ওদের ওয়েলিংটন স্কোয়ারের জমায়েতে গোপালকে শান্তিবৈঠকে

ডাইরেক্ট অ্যাকশনে হিন্দুদের দোকান ভাঙচুরের পর।

ডাকলে গোপাল লোডেড রিভলবার দুটি পকেটে ঢুকিয়ে সেখানে মিছিলের মানুষদের সঙ্গে শান্তি আলোচনার জন্য হাজির হলেন। কিন্তু গোপাল লক্ষ্য করলেন, যে তারা ধীরে ধীরে গোপালকে বলয়ের মধ্যে ঘিরে ফেলছে। তখন হঠাৎ পকেট থেকে রিভলবার বের করে গোপাল ফায়ার শুরু করলেন। দাঙ্গাবাজদের হতচকিত করে তিনি দুটি বাড়ি ডিঙ্গিয়ে তৃতীয় বাড়ির সদর দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে পাঁচিল টপকে পিছন দিক দিয়ে পালিয়ে যান। তাঁর কথা অনুযায়ী, ''আমি ভয়ে পালাইনি। অযথা মানুষ খুন করতে চাইনি বলে নিজেকে বাঁচাতে শূন্যে গুলি করতে করতে পালিয়েছিলাম''।

ধীরে ধীরে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'-এর স্বরূপ হিন্দু রাজনীতিকরা, বিশেষত কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট নেতারা বুঝতে পারে। কমিউনিস্টরা যদিও প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মিছিলের উপর ইটবৃষ্টির মতো মিথ্যা অভিযোগ সাজিয়ে হিন্দু-নিধনের স্বপক্ষে যুক্তি সাজানোর চেষ্টা করে, সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস লিগের বিরোধিতায় রাজনৈতিক বক্তব্য দেওয়া ছাড়া আর কিছুই প্রায় করেনি।

এমতাবস্থায় মধ্য ও মধ্য-উত্তর কলকাতার বিভিন্ন ক্লাব এবং আখড়ায় গোপাল মুখার্জী ও তাঁর ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর ছেলেরা মুসলমান দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে কার্যকরী প্রতিবাদ গড়ে তোলে। গোপালকে কমিউনিস্ট এজেন্টরা ইতিহাসবিদ সেজে গুন্ডা বললেও গোপাল প্রথম দিন অর্থাৎ ১৬ আগস্টে সেভাবে প্রতিরোধ গড়েননি। ১৭ তারিখ থেকে তাঁরা ময়দানে নামেন। যদিও ১৬ তারিখ থেকেই গোপালের কাছে অত্যাচার ও হিন্দু নিধনের খবর আসছিল, কয়েকটি বিশেষ ঘটনা তাঁকে দ্রুত প্রতি আক্রমণে যেতে প্ররোচিত করে।

প্রথম ঘটনাটি গোপালের নিজের মুখে বলা। বৌবাজার স্ট্রিটে ওয়াছেল মোল্লার দোকানের দোতলায় হরেন ঘোষ মহাশয়ের অফিস ছিল। গোপাল-সহ এলাকার সবাই তাঁকে চিনতেন। তিনি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা (arranger) করতেন। উদয়শঙ্কর-অমলাশঙ্করদের বহু অনুষ্ঠান তিনি করিয়েছেন। হরেন ঘোষ থাকতেন ৩৯ নম্বর মদন বড়াল লেনে। ১৬ আগস্টের ঠিক আগে একদিন তাঁর অফিসের পাশের ফ্ল্যাটের বাসিন্দা এক বাইজি হরেন ঘোষের কাছে একটি কাগজ এনে বলে, 'ঘোষ সাহেব, দেখুন তো এটি কোন দরকারি কাগজ কিনা'। বাইজি লেখাপড়া জানতেন না। ওই বাইজির খদ্দেরদের মধ্যে সুরাবর্দি ছিলেন, উনি মাঝেমাঝে সেখানে ফুর্তি করতে আসতেন সেটা এলাকার মানুষজন জানত। বাইজি আরও বলল, 'আজ সুরাবর্দি সাহেব এসেছিলেন। উনি যাওয়ার সময় এই কাগজটা ফেলে গেছেন'। হরেন ঘোষ কাগজটা একঝলক দেখেই তা ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে ফেলে দিয়ে বললেন—''না না দরকারি নয়, এ বাজে কাগজ। বাইজি তখন নিশ্চিন্ত মনে বলল, 'তব ঠিক হ্যায়'। বাইজি বেরিয়ে যেতেই হরেন ঘোষ ওই কাগজটি তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি অফিস বন্ধ করে বেরিয়ে পড়েন। বাড়ি ফিরে কাগজটি ভালো করে দেখে বুঝলেন, এটি একটি ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের ছক। প্ল্যান এঁকে দেখানো হয়েছে কীভাবে গঙ্গার পূর্বদিককে হিন্দুশূন্য করে এই পুরো হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলকে মুসলমান প্রধান জায়গা হিসেবে দেখিয়ে কলকাতাকে (পূর্ব) পাকিস্তানের মধ্যে ঢোকানো হবে—এটি তার নীলনকশা। এমনকী ডিনামাইট দিয়ে হাওড়া ব্রিজ উড়িয়ে দেওয়ার ছক পর্যন্ত সেখানে ছিল।

তখন হরেন ঘোষ ঠিক করলেন, এই চিঠি কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল নেহরুর কাছে পাঠাবেন যাতে সুরাবর্দির এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র বন্ধ করা যায়। কাজের সূত্রে হরেন ঘোষের জওহরলালের আগেই আলা পপরিচয় ছিল। সেই সূত্রে তিনি এই কাগজটি জওহরলালের কাছে পাঠালেন। হরেন ঘোষ নিজেই একথা গোপালকে বললে গোপাল তাঁকে তখন থেকেই তাঁর অফিসে যাওয়া বন্ধ করতে বললেন। গোপালের রাজনৈতিক বিচক্ষণতায় তিনি বুঝতে পারলেন, এই চিঠি জওহরলালের কাছে গেলে হিতে বিপরীত হবে। কিন্তু হরেন ঘোষ গোপালের কথা শুনলেন না। তিনি বললেন, ''আমি কারো ক্ষতি করিনি। সেজন্য আমার ক্ষতিও কেউ করবে না''।

পরের দিন হরেন ঘোষের অফিস লুঠ হয়। তারপর হরেন ঘোষের দেহের বিভিন্ন অংশ পাওয়া যায় বৌবাজারের সাহেবদের কোয়াটারের সামনে বীভৎসতার নতুন ইতিহাস লেখা হয়। এরপর আরও খবর আসতে লাগল। কমলালয় স্টোর্স লুঠ হলো। তারপর কে সি বিশ্বাসের বন্দুকের দোকান লুঠ হতে গোপালের ভ্রূ কুঞ্চিত হলো। খবর এল রাজাবাজারের ভিক্টোরিয়া কলেজে হিন্দু মেয়েদের উপর মুসলমান দাঙ্গাবাজরা পাশবিক অত্যাচার করেছে। বলাৎকার করে স্তন কেটে নেওয়া, যৌনদ্বারে ছুরি ঢুকিয়ে চিড়ে দিয়ে খুন করার মধ্যে এক পাশবিক হিংস্রতার ছাপ মেলে। এই হিংস্রতাকে রাজনৈতিক মদতে ধর্মের নামে যারা মান্যতা দেয়, গোপাল তাদের মানবতার শত্রু বলে চিহ্নিত করে তৎক্ষণাৎ প্রতিরোধে নামার সংকল্প নিলেন। সেই মোতাবেক তিনি তাঁর ছেলেদের ডেকে সিদ্ধান্তের কথা জানালেন। তাদের কাছ থেকে আরও বীভৎসতার খবর পেলেন—মায়ের কোল থেকে শিশুকে টেনে নামিয়ে আছড়ে মারার পর ওই মাকে নরপশুরা কীভাবে ধর্ষণ করেছে তা শুনলেন। মৃত মায়ের ছিন্নভিন্ন জননাঙ্গ রক্তে ভেসে যাওয়ার দৃশ্যের কথা শুনলেন প্রত্যক্ষদর্শীদের থেকে। মেটিয়াবুরুজের প্রায় ২০০ জন ওড়িয়া ও বিহারি হিন্দু মজুরদের নৃশংসভাবে খুন করে জেহাদি দাঙ্গাবাজরা। মেটিয়াবুরুজের পান্না চ্যাটার্জীর বাড়ির সমস্ত পুরুষ সদস্যকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়। শুধু একজন বেঁচে যান বাথরুমে দরজা বন্ধ করে রেখে। ওই বাড়ির মহিলাদের কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। এমনকী রাজনীতিক নওশের আলি প্রত্যক্ষ সংগ্রামে শামিল হননি বলে তাঁর বাড়ি লুঠের চেষ্টা করে লিগের ন্যাশনাল গার্ডের' ভলান্টিয়াররা। মধ্য কলকাতায় কংগ্রেস নেতা বিজয় সিংহ

নাহার, ইন্দুভূষণ বিদ ও দেবেন দে গোপালকে সশস্ত্র প্রতিরোধ করতে অনুরোধ জানান। গোপাল রাজি হন। ছেলেদের মধ্যে অস্ত্র ভাগ বাঁটোয়ারা করে দেওয়ার পর নিজে আমেরিকান কোল্ট লোডেড অবস্থায় কোমরে বাঁধেন। তারপর ছেলেদের উদ্দেশে বলেন, ''তোমরা মনে রাখবে একটি হিন্দুর প্রাণের বদলা নিতে দশটি লিগ-জিহাদির প্রাণ নেওয়া চাই। সেইসঙ্গে মনে রাখবে, সাধারণ খেটে খাওয়া মুসলমান মানুষ যখন আশ্রয় চাইবে, তাদের নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দেওয়া তোমাদের কর্তব্য। তেমনি মনে রাখবে সুরাবর্দির কুকুরগুলোকে যেমন কোনোরকম দয়া দেখানো যাবে না, তেমনি কোনো মুসলমান রমণীর গায়ে যেন হাত না পড়ে''। গোপাল আরও বলেন, ''ওরা ওদের ধর্মস্থানে জানোয়ারের শিক্ষা পেলেও আমরা আমাদের ধর্মের মনুষ্যত্বের শিক্ষা ভুলব না''। তারপর গোপাল তাঁর পৈতৃক বৌবাজারের মাংসের দোকানের ভিতরের মা কালীর মূর্তির পা স্পর্শ করে এই অন্যায়ের বিধান করার প্রতিজ্ঞা করেন। তিনি সাধারণ মানুষ হয়ে হাতে অস্ত্র তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন শাসকের নিষ্ক্রিয়তা ও প্রচ্ছন্ন মদতে হিন্দু-নিধন যজ্ঞ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে।

১৬ আগস্ট বেলা গড়িয়ে গেলে মিছিল ফেরত মুসলমান জনতা রাস্তায় যথেচ্ছ ভাঙচুর চালায়। বিশেষ করে মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায়। মেটিয়াবুরুজ, কলাবাগান বস্তি, পার্কসার্কাস, বেলেঘাটা খালের ধার দিয়ে পার্কসার্কাসের দিকে যাওয়ার রাস্তা, মিঁয়াবাগান বস্তি এবং রাজাবাজার সব জায়গায় হিন্দুদের উপর এক কায়দায় লুঠ, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ ও খুন করা হয়। মহিলাদের উপর অত্যাচার প্রসঙ্গে তাদের গণধর্ষণের পর স্তন কেটে নেওয়ার ঘটনা ব্রিটিশ সাংবাদিক ও ইতিহাসবিদ Leonard Oswald Mosley পর্যন্ত তাঁর প্রতিবেদনে লিখেছেন। রাস্তায় বিভিন্ন জায়গায় শব পড়ে থাকতে দেখা যায়। ঘটনার আকস্মিকতায় হিন্দুরা প্রথমে সেভাবে প্রতিরোধ গড়তে পারেনি। এই সময় হুগলী নদী দিয়ে বেশ কিছু হিন্দু পরিবার নদীর পশ্চিমপাড়ে যাওয়ার চেষ্টায় ডিঙ্গি নৌকা করে যখন নদী পার হতে যায়, মাঝ নদীতে মুসলমান সারেং ও বার্জের মাঝি-মাল্লারা নৌকাগুলিকে ইচ্ছাকৃতভাবে ধাক্কা মেরে ডুবিয়ে দেয়। ফলে অসংখ্য মানুষ, স্ত্রী-সন্তান-পরিবার-সহ ডুবে যায়। যারা সাঁতরে পাড়ে ওঠার চেষ্টা করে তাদের বৈঠা দিয়ে এবং অন্য ধারালো অস্ত্রের আঘাতে হত্যা করা হয়। এসব কারণে এই তথাকথিত দাঙ্গায় কত লোকের প্রাণ যায় তার সঠিক হিসেব পাওয়া যায় না। এই তথ্য সরকারি নথিতেই স্বীকার করা হয়েছে।

মুসলিম লিগের প্রাদেশিক সরকার প্রযোজিত এই হিন্দু-নিধন যজ্ঞ এবং লুঠতরাজে এমন আক্রোশের সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়াকে কোনো সভ্য সমাজ চুপ করে দেখে যেতে পারে না। সেদিন বাঙ্গলার হিন্দুরা বুঝলেন, এই আঘাত যা ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে ধাবিত হওয়ার কথা, তাকে ধর্মের মোড়কে হিন্দু জনগণের নির্মূলীকরণের (ethnic cleansing) দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হলো। বিশেষত বাঙ্গলায় এটি করার উদ্দেশ্য, পুরো বঙ্গপ্রদেশকে পাকিস্তানে ঢোকানো। সেদিন ব্রিটিশ রাজশক্তি, যাদের হাতে সুসজ্জিত সেনাবাহিনী ছিল, তারা যেমন সেনা নামায়নি, তেমনি কলকাতা পুলিশের ইউরোপীয় অফিসাররাও নিশ্চল ছিল। সুরাবর্দি পরেরদিন ১৭ আগস্টেও লালবাজারের কন্ট্রোল রুমে বসে আদেশ দিতে লাগলেন। যেসব মুসলমান দাঙ্গাকারীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে, তাদের সবাইকে তিনি তৎক্ষণাৎ ছেড়ে দেবার আদেশ দেন। ১৭ তারিখ সকাল থেকে মুসলমান দাঙ্গাকারীরা আগের দিন যেখানে শেষ করেছিল, সেখান থেকে শুরু করল। এদিকে গোপাল মুখার্জীর ছেলেরাও রাস্তায় নামল। বৌবাজারে এক মুসলমান যুবক একটি দোকান লুঠ করতে গেলে গোপাল তাকে বাধা দেয়। তখন সে গোপালের পেটে চাকু মরতে গেলে গোপাল এককোপে তার দেহ টুকরো করে দেয় (গোপালের রেকর্ডেড স্বীকারোক্তি)। তারপর গোপাল ও তাঁর ছেলেরা যেখানেই মুসলমানরা আক্রমণ করেছে, সেখানেই প্রত্যাঘাত করেছে। তারা সাধারণ পোশাকে সেনাবাহিনীর ডিসিপ্লিন মেনে কাজ করেছে। এদিকে গোপাল ১৯৪২ সালের সশস্ত্র প্রতিরোধের সময় থেকে অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় করার চেষ্টায় ছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিতে তিনি বুঝেছিলেন, ইংরেজরা যেদিন ভারত ছেড়ে যাবে সেদিন হিন্দু ভারতবাসীর চরম শত্রু হবে মুসলমান রাজনীতিকরা। বিশেষত মুসলিম লিগ। সেজন্য তিনি আমেরিকান সেনাদের মধ্যে যারা ব্ল্যাক তাদের থেকে খুব সহজে রিভলবার ও কার্তুজ জোগাড় করতেন। একটা রিভলবার ও ১০০ কার্তুজের ক্রেটের দাম কখনো ২৫০ টাকা আবার কখনো এক বোতল মদ। এছাড়াও তিনি তাদের থেকে হ্যান্ড গ্রেনেড ও বোমা পর্যন্ত জোগাড় করে রেখেছিলেন। এই অসম সাহসী মানুষটি যখন গ্রেট ক্যালকাটা কিলিঙের নায়ক সুরাবর্দিকে হত্যার পরিকল্পনা করেন, শুধু একটি দুর্ঘটনায় তাঁর পরিকলনা ভেস্তে যায়। তাঁর দলের তিনজন ছেলেকে পিস্তল ও হ্যান্ড গ্রেনেড দিয়ে একটি জিপে করে পাঠানো হয় সুরাবর্দিকে খতম করার জন্য। দুর্ভাগ্যবশত ওই জিপটি বেলেঘাটায় ঢোকার মুখে রেল লাইনের উপর যে ব্রিজ আছে, সেখান দিয়ে যাওয়ার সময় পিছলে নীচে লাইনের উপর পড়ে যায়। তিনটি ছেলেই লাইনের পাশে লোহার রডের উপর গেঁথে গিয়ে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারায়।

এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন। দাঙ্গার দ্বিতীয় দিন, ১৭ আগস্ট থেকে হিন্দুরা যে প্রতিরোধ শুরু করে, তার জন্য কলকাতায় বসবাসকারী মারোয়াড়ি, পাঞ্জাবি শিখ সম্প্রদায় এবং অন্যান্য অবাঙ্গালি হিন্দুদের অবদান অস্বীকার করা যায় না। তাঁরা টাকা-পয়সা থেকে ধরে সব রকম logistic support দিয়েছিলেন গোপালের দলকে। শুধু গোপালের দল নয়, বেলেঘাটার আরেক তথাকথিত 'মস্তান' যুগল চন্দ্র ঘোষ এবং রতন ঘোষ তাঁদের 'আখড়া' থেকে দাঙ্গাবাজদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শুরু করেন। যুগল চন্দ্র ঘোষের বাড়ি বেলেঘাটার মিঁয়াবাগান বস্তির থেকে খানিক দূরে। মিঁয়াবাগান

বস্তি হলো এক বিশাল মুসলমান বস্তি, প্রায় সবাই গরিব মুসলমান। এই খেটে খাওয়া মানুষের এক বড়ো অংশকে ব্রেনওয়াশ ও প্রলোভনের ফাঁদে জড়িয়ে সুরাবর্দি ও তাঁর দল মুসলিম লিগ, মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিনদের দিয়ে মোটিভেট করিয়ে হিন্দু-নিধন ও সম্পত্তি লুঠপাটে নামায়। তারা 'আল্লা হু আকবর'-এর সঙ্গে নারা লাগায়, 'কায়েদ-এ- আজম জিন্দাবাদ' এবং 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান'। যুগল ঘোষের নিজের বয়ান অনুযায়ী, দাঙ্গা শুরু হবার পরপরই কংগ্রেস নেতা সুরেশ চন্দ্র মজুমদার যুগলকে ডেকে বলেন, ''যুগল, এ দাঙ্গা বন্ধ করার একমাত্র উপায় হচ্ছে পালটা মার''। যুগল রাজি হলে সুরেশবাবু যুগলকে তাঁর গাড়িটা এই কাজে ব্যবহারের জন্য দেন। তারপর তাঁর সাহায্যে যুগল তাঁর ছেলেদের নিয়ে পূর্ব কলকাতার বিভিন্ন হিন্দু ব্যবসায়ী ও কারখানার মালিকদের থেকে হাজার, দু'হাজার টাকা করে অনুদান নিয়ে তহবিল তৈরি করে ছেলেদের বলেন, ''একটা জিহাদি খতম করলে দশ টাকা পাবি। আর আহত করলে পাঁচ টাকা''। এভাবে তিনি এলাকার শক্তসমর্থ যুবকদের প্রতিরোধে নামিয়ে দিলেন। এখানেও যুগল ছেলেদের একটি নীতি মেনে চলতে আদেশ করেন। কখনো কোনো মহিলার গায়ে হাত দেওয়া চলবে না আর যারা গোলমাল করছে তাদের ছাড়া কোনো সাধারণ মুসলমানকে মারবে না।

সুরাবর্দির হিন্দু-নিধনের জিহাদ দ্বিতীয় দিন মধ্যাহ্নের পর থেকেই বুমেরাং হতে থাকে। প্রশাসন ও লিগের মদতে যে মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডের গুন্ডাবাহিনী কলকাতার রাস্তা দাপিয়ে বেড়িয়েছে আর নিজেদের নরপশুর পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে, তারা যখন গোপালের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বাহিনীর সামনে পড়ল তখন পালানোর পথ পেল না। ওদিকে শহরের পূর্বপ্রান্তে যুগলের ছেলেরা তখন বেলেঘাটা, মিঁয়াবাগান বস্তির গুন্ডাদের মোকাবিলা করছে। এখানেও যুগলকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেন গোপাল। যখন সুরাবর্দি দেখলেন, তাঁর লিগের ছেলেরা মার খাচ্ছে, অন্যদিকে বিশেষত গোপালের ছেলেদের দাপটে লিগের গুন্ডারা নেতাদের কাছে নিরাপত্তা চাইছে, তখন তিনি বাঙ্গলার গভর্নর Frederick John Burrows -এর কাছে সেনা নামানোর আর্জি করেন। Burrows যদিও আগেই সেনা নামাতে পারতেন, তিনি তা করেননি। কারণ তিনিও চেয়েছিলেন, সুরাবর্দির গুন্ডাবাহিনী হিন্দুদের এথনিক ক্লিনজিং চালিয়ে যাক। সেটা ব্যারাকপুরের সেনা অফিসারদের মিটিঙের সিদ্ধান্ত মোতাবেক। এই Burrows নিজেও সুরাবর্দির মতোই বাঙ্গলা ভাগের বিপক্ষে ছিলেন। তিনি বাঙ্গলার পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তি চেয়েছিলেন। যখন বিভিন্ন মহল থেকে সুরাবর্দিকে ১৪৪ ধারা জাড়ি করতে, কার্ফু জারি করে সেনা নামাতে অনুরোধ করা হচ্ছে, সুরাবর্দি সে সব কর্ণপাত দুরের কথা, নিজে লালবাজার কন্ট্রোলরুমে বসেছিলেন যাতে তাঁর উপস্থিতিতে তাঁর আদেশ ছাড়া পুলিশ কেনো পদক্ষেপ না করতে পারে। তার পর যখন ১৭ তারিখ থেকে গোপালের দলবল লিগের জিহাদি গুন্ডাদের (যার একটি বড়ো অংশ ছিল লিগের ছাত্র সংগঠন মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডের সবুজ টুপি পরা বাহিনী) বেদম প্রহার করতে শুরু করল, তখন সুরাবর্দি, খাজা নাজিমুদ্দিনরা প্রমাদ গুনলেন। এদিকে তখন পূর্ব-কলকাতায় এন্টালি, মিঁয়াবাগান ও বেলেঘাটার মুসলমান গুন্ডাদের প্রতি আক্রমণের মুখে ফেলে দিয়েছেন যুগল ও তাঁর দল। এই চাপের মুখে সুরাবর্দি ১৭ তারিখ সন্ধ্যা থেকে শুধু কার্ফু জারি করা নয়, উপদ্রুত এলাকার নামে লিগের সমর্থক ও গুন্ডাদের প্রোটেকশনের জন্য সেনা নামাতে বললেন। ১৮ আগস্ট সেনাবাহিনী বেলেঘাটায় টহল দেওয়ার সময় দেখা গেল তাঁরা রুটমার্চের পর যখন এক জায়গায় জড়ো হয়ে নিজেদের উপস্থিতির হিসেব নিচ্ছিল, তখন দেখা গেল, একজন সৈনিক নিখোঁজ। অ্যান্ড্রু হোয়াইটহেডকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে যুগল ঘোষ এই ঘটনার উল্লেখ করে বলেছেন তখন মিলিটারিরা একটা কম্পাসের মতো যন্ত্র বের করে তার কাঁটার নির্দেশিত পথে এগিয়ে যেতে যেতে মুসলমান বস্তির মধ্যে একটি বিশেষ ঘরের দিকে এগোতে থাকল। ওই ঘরের সামনে শিশুকোলে মুসলমান মহিলারা মিলিটারিদের ভিতরে ঢুকতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছিল। মিলিটারিরা তখন তাদের ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে ঘরে ঢুকে তাদের জওয়ানের মৃতদেহ বের করে আনে। ওই জওয়ানকে ছুরি মেরে খুন করা হয়। মিলিটারি প্রথমে জওয়ানের দেহ বের করে খোলা জায়গায় নিয়ে এসে রাখল। তারপর তারা এমন তাড়া করল যে, মুসলমান যুবকরা ত বটেই, মহিলা, শিশুরা পর্যন্ত পড়িমরি করে ছুটে খাল পেরিয়ে রাজাবাজারের বস্তির দিকে পালাল। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, লিগের গুন্ডাদের হিন্দু-সংহারের ছক যার পোশাকি নাম 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম', তার রূপায়ণে সেনাবাহিনীর উপস্থিতি ক্ষেত্রবিশেষে অসুবিধার সৃষ্টি করছিল। আবার গোপাল মুখার্জীর নেতৃত্বে তাঁর ছেলেরা যখন প্রতিআক্রমণে লিগের মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডের কোমর ভেঙে দিচ্ছিল, তখন তাদের নিজেদের গুন্ডা বাহিনীকে রক্ষা করার জন্য সেনা না ডেকে সুরাবর্দির অন্য উপায় ছিল না। ১৯ আগস্ট যদিও সেনাবাহিনী কলকাতার রাস্তায় টহল দিচ্ছিল, যেখানেই লিগের গুন্ডারা আক্রমণের চেষ্টা করেছে, লিগ গুন্ডারা হিন্দুদের থেকে প্রবল বাধা পেয়েছে। সারা কলকাতা জুড়ে হিন্দুদের এই আত্মরক্ষার অনুঘটকের নাম গোপাল চন্দ্র মুখার্জী বা 'গোপাল পাঁঠা'। সেজন্য সুরাবর্দির সরকার প্রথমেই পুলিশ ও সেনাবাহিনীকে গোপালের জন্য 'shoot to shight' আদেশ দেয়। উদ্দেশ্য গোপালকে হত্যা করতে পারলে হিন্দুদের প্রতিরোধ ক্ষমতাই শেষ হয়ে যাবে।

এন্টালিতে ১৬ তারিখ বিকেল থেকে লিগের গুন্ডারা দলবদ্ধভাবে হিন্দুদের দোকান লুঠ ও তাদের বাড়িতে আগুন লাগাতে চেষ্টা করে। ১৭ তারিখ বিকেল থেকে গোপাল মুখার্জী এবং রাম চ্যাটার্জীর নেতৃত্বে হিন্দুদের প্রতিরোধ ও প্রতিআক্রমণ শুরু হয়। এখানে গোপালকে সঙ্গ দেন কংগ্রেসের বিজয় সিংহ

নাহার, দেবেন দে ও ইন্দুভূষণ বিদ। শোভাবাজারের মুসলমান বস্তির ভেতরে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র মজুত করে লিগের গুন্ডারা হিন্দুদের আক্রমণ করে। এখানেও গোপালের নেতৃত্বে তাঁর ছেলেরা বস্তির ভেতরে ঢুকে ওইসব অস্ত্রশস্ত্র বের করে নেয়। ওই সময় লিগের গুন্ডাদের সঙ্গে লড়াইয়ে গোপাল তাদের পালাতে বাধ্য করে। বিখ্যাত অঙ্কের মাস্টারমশাই যাদব চক্রবর্তীর আমহার্স্ট স্ট্রিটের বাড়িতে রাজাবাজার থেকে দলবদ্ধভাবে লিগের গুন্ডারা আক্রমণ হানলে তাঁর পুত্র ডঃ এস চক্রবর্তীর উপর আক্রমণ এবং বাড়ির মহিলাদের শ্লীলতাহানির চেষ্টা করা হয়। এই খবর গোপালের কানে পৌঁছলে তিনি তাঁর বাছাই করা কয়েকজন যুবককে নিয়ে এই গুন্ডাদের প্রতিরোধ করেন। কয়েকজনের লাশ পড়ে যাওয়ার পর গুন্ডারা পালিয়ে যায়।

সুরাবর্দির জল্লাদদের প্রথম থেকেই হিন্দু-প্রতিরোধ বাহিনীর মূল কান্ডারি গোপালকে যেন-তেন-প্রকারেণ খতম করার ছক কষা ছিল। তা shoot to sight আদেশেই পরিষ্কার। তবু হিন্দু-প্রতিরোধের মূল কাণ্ডারি, তখনকার বাঙ্গালি, অবাঙ্গালি সকলের নয়নের মণি গোপালকে ধরতে তারা ব্যর্থ হয়। এই পর্যায়ে কমিউনিস্টরা তাদের ঘৃণ্য চক্রান্ত থেকে সরে না গিয়ে দাঙ্গার কারণ হিসেবে হিন্দুমহাসভা ও কংগ্রেসের প্ররোচনামূলক বক্তৃতাকে দায়ী করে। তারা গোপাল ও যুগলকে গুন্ডা হিসেবে দেখায়। তারা নিহত লিগের গুন্ডাদের খেটে খাওয়া শ্রমিক, মজুর হিসেবে সাজানোর চেষ্টা করে। একই সঙ্গে, বিভিন্ন পত্রপত্রিকার ছবিতে কলকাতার রাস্তায় যে বিহারি হিন্দু রিকশাওয়ালা, জনমজুর, মুঠে এবং মেটিয়াবুরুজে ২০০ বিহারিও ওড়িয়া শ্রমিকের মৃতদেহ দেখা যায়, সে বিষয়ে মুখে কুলুপ এঁটে থাকে। কমিউনিস্টদের লেখা এই সময়ের ইতিহাস ৯০ শতাংশ মিথ্যা, ১০ শতাংশ চেপে যাওয়া আর ১০০ শতাংশ লিগের সমর্থনে প্রচার।

তবে একথাও সত্য যে কলকাতার সব মুসলমানই কিন্তু লিগের হিন্দু-নিধন কর্মসূচিতে শামিল হননি। যদিও পরবর্তী সময় বিভিন্ন ইসলামি ইতিহাসবেত্তা অন্যরকম ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, তৎকালীন সরকারি গোয়েন্দা রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, প্রধানমন্ত্রীর (তখন বাঙ্গলার আইনসভার নেতাকে মুখ্যমন্ত্রী নয়, প্রধানমন্ত্রী বলা হতো। সে মোতাবেক সুরাবর্দি বাঙ্গলার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন) গাড়িতে করে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশ নেওয়া লিগের গুন্ডাদের জন্য খাবার দাবার, অস্ত্রশস্ত্র, পেট্রোল, কেরোসিন নিয়ে যাওয়া হয়। ময়দানের সভায় সুরাবর্দি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, তাদের লিগ কর্মীদের 'কাজে' পুলিশ হস্তক্ষেপ করবে না। এমনকী স্বরাষ্ট্র দপ্তরের নোটে দাঙ্গা ও লুঠপাটে পুলিশের সরাসরি অংশগ্রহণের অভিযোগ করা হয়। ২০ আগস্ট, ১৯৪৬, তারিখের The Statesman কাগজে দাঙ্গার জন্য সরাসরি মুসলিম লিগকে দায়ী করেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। পুলিশের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেন ফজলুল হক। ছাত্রনেতা আনিসুজ্জামান তীব্র ভাষায় লিগের গুন্ডাদের নিন্দা করে বলেন, কলকাতার মানুষ দেখেছে কীভাবে সশস্ত্র মিছিলকারী লিগওয়ালারা রাস্তায় হিন্দুদের দোকানে লুঠপাট চালাচ্ছে তখন সুরাবর্দির পুলিশ সঙের মতো দাঁড়িয়ে দেখছে আর হাসছে। তিনি এই দাঙ্গার জন্য শুধুমাত্র মুসলিম লিগ নেতৃত্বকেই দায়ী করেন (প্রবাসী, আশ্বিন সংখ্যা, ১৯৫৩)। ২০ আগস্ট, ১৯৪৬ এ The Statesman-এর সম্পাদকীয় নিবন্ধে লেখা হয়, এই দাঙ্গা ছিল– a political demonstration of the Muslim League।

১৬ থেকে ১৯ আগস্ট, ১৯৪৬, সারা কলকাতা জুড়ে স্তূপাকার মৃতদেহ, শকুনের ওড়াউড়ি চলেছিল। তার মধ্যে মনুষ্যত্বের কিছু আইল্যান্ড ছিল। সেগুলির উল্লেখ করা প্রয়োজন। বালিগঞ্জে এক মুসলমান হায়দর আলির পরিবারকে আশ্রয় দেন প্রতিবেশী হিন্দুরা। আমির আলি এভিনিউতে টি এন ঘোষের পরিবারকে বাঁচান সেখানকার মুসলমান প্রতিবেশীরা। লিগের নেতাদের সকলেই সুরাবর্দী মার্কা ছিলেন না। ব্যতিক্রমী লীগ নেতা পার্কসার্কাসের লাল মিঁয়া কয়েকটি হিন্দু পরিবারকে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দেন। শ্যামবাজারে হিন্দু-মহাসভার নেতা দেবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে তিনি কয়েকজন মুসলমানকে আশ্রয় দেন। গুপ্তপ্রেসের মালিক অজয় বসুও কিছু মুসলমান পরিবারকে আশ্রয় দেন। কবি বিষ্ণু দের স্ত্রী প্রণতি দের কথা থেকে জানা যায়, কালিঘাটের সতীন মুখার্জী রোডে তাঁদের পাড়ায় মুসলমান গুন্ডারা এসে ১৬ আগস্ট ছররা বন্দুক থেকে গুলি চালালে স্থানীয় গোয়ালা সম্প্রদায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং পরে তিনজন মুসলমানকে ধরে তাদের দুজনকে মারার পর কবি বিষ্ণু দে তৃতীয় আহত ব্যক্তিটিকে স্থানীয় কংগ্রেস অফিসে পৌঁছে দেন। কলকাতার হিন্দুদের বড়ো কিছু ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান কমলালয় স্টোর্স, সি সি বিশ্বাসের বন্দুকের দোকান, ভালিয়া স্টোর্স এবং ভারত কলাকেন্দ্র এগুলো ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই লুঠ হয়। এর থেকে বোঝা যায় যে এই দাঙ্গা এবং লুঠপাট উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও পূর্বপরিকল্পিত ছিল। বড়াবাজারের হিন্দু মাড়োয়ারি ও কলকাতার শিখ ব্যবসায়ীরা এসব দেখে ভীত হয়ে হিন্দু প্রতিরোধ বাহিনী বিশেষ করে গোপালকে সমস্ত রকমভাবে মদত দেন।

এসব থেকে কয়েকটি বিষয় পরিষ্কার। প্রথমত, গোপাল মুখার্জী এবং তাঁর ছেলেরা আক্রমণকারী ছিলেন না। দ্বিতীয়ত, তিনি না থাকলে, তাঁর বাহিনী প্রতিরোধে না নামলে 'দি গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং'-এ কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল পুরোপুরি হিন্দু শূন্য হয়ে যেত এবং হিন্দু মহাসভা ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের শত চেষ্টা সত্ত্বেও বাঙ্গলার পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তি আটকানো যেত না। অন্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো—এই তথাকথিত দাঙ্গায় বহু হিন্দু রমণীর শ্লীলতাহানি, ধর্ষণ ও হত্যার কথা বিদেশি ইংরেজ সাংবাদিকদের লেখায় উল্লেখ থাকলেও মুসলমান রমণীদের ক্ষতিসাধনের কথা কোন বিদেশি সাংবাদিকের লেখায় বা সংবাদপত্রের পাতায় দেখা যায় না। কিছু অসমর্থিত উক্তির ভিত্তিতে তা পাওয়া যায় শুধুমাত্র

কিছু ইসলামি ও জিহাদি ইসলামের 'ধর্মনিরপেক্ষ' সমর্থক কমিউনিস্টদের লেখায়, যার কোনোটিই সত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়।

তাঁর মানবিকতার কারণে গোপাল মুখার্জী বাঙ্গালি হিন্দুর কাছে মুক্তিসূর্য নায়ক। গোপাল নেতাজীর সমর্থক হলেও তিনি ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়কে অসম্ভব শ্রদ্ধা করতেন। ডাক্তার রায়ও গোপালকে বিশেষ স্নেহ করতেন। তা সত্ত্বেও গোপালের নিজের বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলা যায়, ''আমি কোনোদিন রাজনৈতিক দলে ছিলাম না। আমি মানুষের জন্য, মানুষের প্রয়োজনে, মানুষকে সাহায্য করতাম মাত্র''। যদিও পরের পছর গান্ধীজী বেলেঘাটায় শিবিরে এলে পর যুগল ঘোষ তাঁর কাছে অস্ত্র সমর্পণ করে পুরোপুরি অহিংস গান্ধীবাদী হয়ে যান; গোপাল কিন্তু তা হননি। গান্ধীজীর শিবিরেও গোপালকে নিয়ে এক মজার ঘটনা আছে। গান্ধীজী দি গ্রেট ক্যালকাটা কিলিঙের সময় চুপ করে ছিলেন। একবারও কলকাতায় আসেননি। তিনি তখন নোয়াখালিতে। আবার নোয়াখালির হিন্দু গণহত্যার সময় তিনি বিহারে। গান্ধীজী যখন বেলেঘাটার শিবির থেকে তাঁর কাছে অস্ত্র সমর্পণ করে 'অহিংসা পরম ধর্ম' মন্ত্রে শপথ নেওয়ার জন্য ডাক দিলেন, তখন অনেক ছেলেছোকরা তাঁর কাছে টোকেন অস্ত্র সমর্পণ করলেও গোপাল এসবকে পাত্তা দিলেন না। এদিকে দি গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং রুখে দেওয়ার সর্বাধিক কৃতিত্ব যার, সেই গোপাল মুখার্জী যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর অস্ত্র সমর্পণ না করছেন, ততক্ষণ গান্ধীজীর এই অস্ত্র সমর্পণ শিবির সমাজে মান্যতা পাবে না। সেজন্য তদানীন্তন স্থানীয় কংগ্রেস নেতা শত ঘোষ, ইন্দুভূষণ বিদ, জগন্নাথ কোলে বারবার চেষ্টা করেও যখন গোপালকে গান্ধীজীর কাছে নিয়ে যেতে ব্যর্থ হলেন, তখন গান্ধীজীর সচিব অধ্যাপক নির্মল বসু নিজে এসে গোপালকে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করার অনুরোধ করেন। গোপাল তখন দেখা করার প্রস্তাবে রাজি হলেন। গান্ধীজীর সামনে যাওয়ার পর যখন তাঁকে অস্ত্র সমর্পণ করতে বলা হলো, তখন তিনি বললেন, ''অস্ত্র সমর্পণের কোনো প্রশ্নই আসে না। সবাই ভাঙা, জংধরা, কোনো কাজে লাগে না এমন সব অকেজো অস্ত্র জমা দিচ্ছে। আমি তাও দেব না। যে অস্ত্র দিয়ে আমি মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছি; মা-বোনের সম্মান রক্ষা করেছি, সে অস্ত্র এখানে জমা দেওয়া অপরাধ। এমনকী, যদি একটা সূঁচ দিয়েও কাউকে আঘাত করে থাকি, আমি সেটিও জমা দেব না।'' দৃঢ়চেতা, সংকল্পে অটল এই মানুষটির কাছে গান্ধীজীও সেদিন চুপ করে যান।

কয়েকদিন পরে আরও মজার ঘটনা ঘটল। গোপালের বয়ানেই তা শোনা যাক, ''গান্ধীজীর দি গ্রেট ক্যালকাটা কিলিঙের সময় অনুপস্থিত থাকা, নোয়াখালিতে হিন্দু গণহত্যা বন্ধ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হওয়ার পরে তিনি যখন হিন্দু হত্যার প্রধান রূপকার সুরাবর্দির সঙ্গে তাঁর 'আশ্রম'-এ রোজ বসতেন, তখন ধীরে ধীরে হিন্দু যুব সমাজ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। গান্ধীজীর শিবির আক্রমণ করে বোমা মারা হলো। গান্ধীজীকে শিবির গুটিয়ে চলে যেতে বলা হলো। গান্ধীজীর শিবিরের প্রাত্যহিক প্রার্থনা রামধুন বন্ধ হয়ে গেল। সুরাবর্দির পুলিশ, এমনকী সেনাবাহিনীর গোর্খা ব্রিগেড নামিয়েও গান্ধীজীর শিবিরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যাচ্ছিল না। তখন আবার গোপালের ডাক পড়ল। গান্ধীজী তাঁর শিবির রক্ষার জন্য গোপালকে অনুরোধ করলে গোপাল দায়িত্বশীল নেতার মতো বললেন, ঠিক আছে; তবে দুটি শর্তের বিনিময়ে তিনি শিবির রক্ষার দায়িত্ব নেবেন---প্রথমত, সুরাবর্দির জিহাদি পুলিশ-সহ পুরো সেনাবাহিনীকে সরিয়ে নিতে হবে; দ্বিতীয়ত, গান্ধীজীকে লিখে দিতে হবে যে, গোপালের ছেলেরা সশস্ত্র অবস্থায় গান্ধীজীর শিবির পাহারা দেবে এবং প্রবেশদ্বার নিয়ন্ত্রণ করবে। এমনকী প্রয়োজনে তারা তাদের অস্ত্র ব্যবহার করতে পারবে। কী অদ্ভুত! যিনি অহিংসার পূজারি, যিনি মার খেলে, অত্যাচারিত হলে তা সহ্য করার পরামর্শ দেন, তিনি নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য গোপালকে শর্ত মেনে অস্ত্র প্রয়োগের কথা লিখে দিলেন। গোপালের নিজের বক্তব্য অনুযায়ী তিনি এই অনুমতিপত্রটি একসময় হারিয়ে ফেলেন। তাঁর ভাষায় এটি 'হেবী লস্'। এ কথা তিনি Andrew Whiteheard এর কাছে ইন্টারভিউর সময় বলেন।

গোপালের কাজের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলতে হয়, স্বাধীনতা লাভের সময় লোকবল ও জনপ্রিয়তা ভাঙিয়ে অনায়াসে গোপাল নেতা-মন্ত্রী হতে পারতেন। কিন্তু তিনি তাঁর ব্যবসা ও সমাজসেবার মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখলেন। আজকের দিনে গোপালের এই আচরণ মহান বললেও কম বলা হয়। সুভাষ বসুর অনুগামী গোপালের একটি বক্তব্য খুব প্রাণিধানযোগ্য, ''জিন্নার মুসলিম লিগ যখন ভারতের স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে দেশকে টুকরো করতে বদ্ধপরিকর, তখন গান্ধীজী কিছুতেই ভারতভাগের সম্মতি দেননি। সেজন্য কংগ্রেসও ভারতভাগের বিরোধিতা করে। কিন্তু কিছু কংগ্রেস নেতা, বিশেষভাবে জওহরলাল বলেন, আমরা অনেক কষ্ট করেছি, আমাদের বয়স হচ্ছে, এখন আমরা আয়েশ করব। সেজন্য তিনি ভারতভাগ মেনে নিলেন। বিশেষ করে Mountabatten-এর স্ত্রী Edwina (জওহরলালের বিশেষ বন্ধু) জহরলালকে ভারতভাগে রাজি করালেন। এদিকে নেতাজী ইতিমধ্যে ইম্ফল পৌঁছে খবর পাঠালেন, তোমরা ভারতভাগ করো না। আমি আসছি। দেশের স্বাধীনতা আসছে''। এর থেকে বোঝা যায়, তখন দেশের প্রথম সারির রাজনীতিকদের দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা কেমন ছিল।

পরিশেষে বলি, ১৯৪৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ গঠনের সিংহভাগ কৃতিত্ব যদি ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে দেওয়া হয়, তাহলে, সেই পশ্চিমবঙ্গের হৃদয় কলকাতার মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার কৃতিত্ব নিশ্চয়ই গোপাল মুখার্জীর। সে কারণে স্বার্থান্বেষী মহল বারবার বিভিন্নভাবে এই নায়ককে কালিমালিপ্ত করেছে বা তাঁকে অবজ্ঞা করেছে। আজ স্বাধীনতার অমৃতকালে সত্যকে তুলে ধরা একান্ত প্রয়োজন। □

অভিশপ্ত নিঃসঙ্গ মহাবীর অশ্বত্থামা

নন্দলাল ভট্টাচার্য

অমৃত নয়, বিষ দাও।

হে কৃষ্ণ, বলতে বাধ্য হচ্ছি, তুমি একচক্ষু হরিণ। তাই হলাহলের মতোই তীব্র জ্বালাময়ী অমরতা দিলে আমাকে।

আচ্ছা কৃষ্ণ, তোমার সঙ্গে তো আমার কোনো বৈরিতা নেই। আমি তো কখনই আক্রমণ করিনি তোমাকে। প্রার্থী হয়েও তো কখনো দাঁড়াইনি তোমার দুয়ারে। তোমাকে ভক্তি করে পূজা করেছি—তারও তো কোনো নজির নেই। তাহলে কেন দিলে এই অমরতা। শাস্তি দেওয়াই যদি তোমার বাসনা তাহলে কেন দিলে না অন্য শাস্তি। কেন প্রাণে মারলে না আমাকে।

শরনিক্ষেপের পূর্ব মুহূর্তে উন্নতশির, স্ফীতবক্ষ ধানুকির মতোই প্রশ্নবাণগুলি ছোঁড়েন অশ্বত্থামা। দ্রোণপুত্র দ্রোণী। কুরুক্ষেত্র মহারণে কৌরবদের শেষ সেনাপতি।

কিন্তু কে দেবে তাঁর প্রশ্নের উত্তর। কেউ তো নেই এই মুহূর্তে তাঁর সামনে।

এই মুহূর্তই-বা কেন? কৃষ্ণের ওই অমরতা দানের পর থেকেই তো তিনি নিঃসঙ্গ। কেউ নেই তাঁর চারপাশে। তিনি অস্থির। পাক-খাওয়া লাট্টুর মতো কেবলই ঘুরছেন। সঙ্গীহীন অশ্বত্থামা একাই ঘুরে বেড়াচ্ছেন সারা বিশ্বে। কোথাও তিলেক দাঁড়াবার উপায় নেই তাঁর। একা-একেবারে একা তাঁকে এই ভাবেই ঘুরে বেড়াতে হবে। এটাই নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তাঁর বিধাতারূপী কৃষ্ণ। শিবের বরে তাঁর জন্ম। তিনিও তো তাঁকে দেন অমরত্বই।

পরিক্রমণরত অশ্বত্থামা তাই এক অনির্দেশের উদ্দেশেই ছুঁড়ে দেন কথাগুলি। হে কৃষ্ণ, এত নির্দয় তুমি। সকলে বলে, তুমি দয়াময়, ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু, তোমার অকৃপণ করুণার স্পর্শ পায় তোমার ভক্তরা অবিরত, সর্বসময়। তাহলে আমার প্রতি তোমার এমন বিপরীত আচরণ কেন?

তুমি কি জান না, নিঃসঙ্গতা কী ভয়ংকর? ময়াল সাপের মতোই পেঁচিয়ে থাকে সব সময়। বিষ দংশনে একবারে শেষ করে দেওয়া নয়, ক্ষণে ক্ষণে প্যাঁচের মাত্রা কমিয়ে বাড়িয়ে যেন চূর্ণবিচূর্ণ করে দেহ। যন্ত্রণায় অস্থির হতে হয়। কিন্তু ময়ালের সেই পাক শিথিল হয় না কখনই। দুর্বিসহ সেই জীবনের ভার ক্রমেই হয়ে ওঠে দুর্বহ। তবুও মুক্তি নেই তা থেকে।

অশ্বত্থামা মনে মনে বিচার করেন, মুনি-ঋষি-তপস্বীরাও তো সবকিছু ছেড়ে নির্জনে তপস্যা করেন। তাঁদের কাছে তো জীবন হয় না এরকম দুর্ভার। তাহলে নিঃসঙ্গ মানুষ কেন ভোগে এমন যন্ত্রণায়।

অশ্বত্থামা ঋষিপুত্র। ব্রাহ্মণ হয়েও শস্ত্রবিদ্যাতেই বেশি পারদর্শী। তা বলে তিনি শাস্ত্রজ্ঞানহীন নন। বরং বিভিন্ন শাস্ত্রে তাঁর জ্ঞান অনেকেরই ঈর্ষার কারণ। তাই ওই মুহূর্তের নিঃসঙ্গ জীবনযন্ত্রণার কারণ খুঁজতে তাঁর দেরি হয় না।

নির্জনে যাঁরা তপস্যা করেন---তাঁদের সামনে থাকে একটি লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যই তাঁদের এই নির্জনে বসে তপস্যা। স্বেচ্ছায় তাঁরা

বেছে নেন এই পথ। তাছাড়া নির্জন সেই পরিবেশে তাঁরা সর্বক্ষণ ডুবে থাকেন ধ্যানের গভীরে। অন্তরে অনুভব করেন ধ্যেয়ের উপস্থিতি সর্বক্ষণ। সে কারণে পার্থিব ওই নির্জনতার কোনো বেদনাই স্পর্শ করতে পারে না তাঁদের। তাই আর যাই হোক, কোনো সময়ই তাঁরা নিজেদের নিঃসঙ্গ মনে করেন না। বরং পরমের সঙ্গে মিলনের আনন্দে তাঁরা মগ্ন থাকেন সবসময়। পার্থিব কোনো কিছুই ওই মুহূর্তে তাঁদের অ-সুখের কারণ হয় না।

যাঁরা ভাগ্যের পরিহাসে অথবা বিধির বিধানে নিঃসঙ্গ হন, তাঁদের সামনে কোনো লক্ষ্য থাকে না—থাকে না পরম কিছু পাওয়ার আশাও। তাই প্রতিটি মুহূর্ত সঙ্গীহীনতার প্রদাহ বিষে নীল হয়ে ওঠে। সাপে না কাটলে যেমন বোঝা যায় না সেই বিষের যন্ত্রণা, একইভাবে নিজের সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় নিঃসঙ্গ না হওয়া শাস্তি নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণাও অনুভব করা যায় না। অভিশপ্ত অশ্বত্থামা কথাটা অনুভব করতে পারেন মর্মে মর্মে।

শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে একরাশ অভিমানভরা অভিযোগ উগরে দিয়ে অশ্বত্থামা এখন একটু শান্ত। শান্ত চিত্তেই এবার তিনি নিজের জীবনপাতায় চোখ বোলাতে থাকেন।

॥ দুই ॥

দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা। মহাবীর তিনি। কিন্তু জন্ম থেকেই কিছুটা বিড়ম্বিত। বিধাতা তাঁর সঙ্গে এক অদ্ভুত খেলা শুরু করেন প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই। তাই মহত্ত্বে যাঁর অধিকার থাকার কথা, যিনি হতে পারতেন নরলোকে এক মহান কীর্তির অধিকারী, শেষ পর্যন্ত বিধাতার ছলনায় সর্বনন্দিত না হয়ে হলেন, নিন্দিত পুরুষ। রণপণ্ডিত, বহু দিব্যাস্ত্রের অধিকারী হয়েও শেষ পর্যন্ত কাপুরুষতার কালো কাপড়ের নীচে ঢাকা পড়ল তাঁর সব কীর্তি। সততার পথে সবসময় বিচরণ না করার জন্যই তাঁকে দিতে হল চরম মূল্য। নিঃসঙ্গ অবস্থায় পরিভ্রমণ তাঁর মর্ত্যলোকে—কিন্তু লোকচক্ষুর আড়ালে। পূতিগন্ধময় দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ায় থাকতে হয় তাঁকে সবসময় লোকচক্ষুর আড়ালে। ফলে অমর হয়েও তিনি রয়ে গেছেন মনুষ্য সমাজের বাইরে।

পিতামহ ঋষি ভরদ্বাজ। বহু শাস্ত্রবিদ্ তো বটেই সেইসঙ্গে কেবল শস্ত্রবিদ্ নন। বিভিন্ন আগ্নেয়াস্ত্র-সহ অসংখ্য অস্ত্রের নির্মাতা তিনি। আশ্রম ছিল তাঁর হিমালয়ের গঙ্গাদ্বার অর্থাৎ আজকের হরিদ্বারে। অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও শস্ত্রবিদ হয়েও অর্থের দিকে নজর ছিল না তাঁর। সে কারণেই তাঁর আশ্রমের নিত্যসঙ্গী ছিল দারিদ্র্য।

পিতা আচার্য দ্রোণ। পিতার মতোই শাস্ত্র ও শস্ত্রবিদ। জন্ম তাঁর কিছুটা অলৌকিক ভাবেই। সেই সূত্রে ছিলেন দৈবীসম্পদে ধনী। কিন্তু পার্থিব সম্পদে ছিলেন অতি দরিদ্র। তবে সে দারিদ্র্য ছিল তাঁদের অহংকার। কেননা, অর্থ না থাকলেও পরমার্থ সংগ্রহ ও বিদ্যাবত্তায় তাঁরা ছিলেন সকলের শ্রদ্ধেয়।

মাতামহ মহর্ষি গৌতম। অন্যনাম তাঁর শরদ্বান। শরের সঙ্গে

জন্ম তাই এই নাম। তাঁরই ছেলে-মেয়ে কৃপ আর কৃপী। তাঁদেরও জন্ম কিছুটা অলৌকিকভাবে।

ঋষি ভরদ্বাজ মৃত্যুর আগেই শরদ্বানের মেয়ে কৃপীর বিয়ে ঠিক করেছিলেন তাঁর ছেলে দ্রোণের সঙ্গে। ভরদ্বাজের মৃত্যুর পর কৃপীর সঙ্গেই বিয়ে হয় দ্রোণের। তাঁরা তখন থাকতেন গঙ্গাদ্বার বা হরিদ্বারে ঋষি ভরদ্বাজের আশ্রমেই। পরিবারে সদস্য বাড়ল কিন্তু আয় বাড়ল না সেইভাবে। তাই নিত্য অভাবের সঙ্গেই তাঁদের বসবাস।

দ্রোণ আর কৃপীরই একমাত্র সন্তান অশ্বত্থামা। জন্মের পরই কেঁদে ওঠেন অশ্বত্থামা। সকল শিশুর ক্ষেত্রেই ঘটে এটা। তাই এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু অশ্বত্থামা কাঁদেন একটু ভিন্নভাবে। তার প্রথম কান্না যেন ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের মতো। অমন অস্বাভাবিক আওয়াজ শুনে সকলে বলে, ছেলের নাম হোক অশ্বত্থামা। একই সময় শোনা যায় এক দৈববাণীও এ ছেলের নাম হোক অশ্বত্থামা। এর জন্মের সঙ্গে অশ্বহ্রেষার মতো গুরুগম্ভীর ধ্বনিতে দিগ্‌বিদিক প্রতিধ্বনিত করল, তাই এর নাম অশ্বত্থামাই হওয়া উচিত। দ্রোণ সায় দিলেন তাতে। অশ্বত্থামাকে পেয়ে এক অনাস্বাদিত পুলকে ভরে ওঠে দ্রোণের মন। বুঝতে পারেন তিনি,

তাঁর জন্মের পরও এমনই হয়েছিল পিতা ভরদ্বাজের। বাবা-মায়ের মনকে নন্দিত করে বলেই তো পুত্রের অন্য নাম নন্দন।

হৃদয় কেবল নন্দিত হলেই তো হবে না, তাকে পরিপালনের ব্যবস্থাও তো করতে হবে। কিন্তু সেদিকে তেমন নজর নেই দ্রোণের। পিতা ভরদ্বাজের মতোই ব্রাহ্মণের শাস্ত্রচর্চার স্বাভাবিক বৃত্তির পরিবর্তে অস্ত্র নিয়ে চর্চা এবং শিক্ষা দেওয়াটাই তাঁর বেশি পছন্দ। তাই রণবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার জন্য রাজার আশ্রয় নিতে চান তিনি।

দ্রোণ চাইলেও সুযোগটা আসে না সহজে। ফলে আশ্রমে অভাবের হাঁ-মুখ ক্রমেই বড়ো হতে থাকে। আর তারই মধ্যে ঘটল একটি ঘটনা। যা পরবর্তীতে কুরুক্ষেত্র মহারণের চালচিত্র তৈরি করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

অশ্বত্থামা তখনও শিশু। খেলাধুলোর সঙ্গীদের মধ্যে ছিল বেশ কয়েকজন ধনীর দুলাল। তাঁরা খেলাধুলোর মধ্যেই তারা খেত দুধ। অশ্বত্থামা এবং তাঁর মতো গরিবের ঘরের ছেলেরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত তা। তাদের কারও বাবা-মায়েরাই ছেলেদের দুধ খাওনোর মতো সামর্থ্য ছিল না। তাই ছেলেদের কষ্টে বুক ফাটলেও কিছু করার মতো অবস্থা ছিল না তাদের। অশ্বত্থামার বাবা-মায়ের অবস্থাও তাই। কিন্তু ছেলের দুধের জন্য বায়নাটা বড়ো বুকে বাজে তাঁদের। আর তাই একটা উপায়ের কথা ভাবতে থাকেন দ্রোণ। আর তখনই তাঁর মনে পড়ে যায় রাজা দ্রুপদের কথা।

এক সময় দ্রুপদ আর দ্রোণ একই সঙ্গে খেলাধুলো করতেন। কথায় কথায় দ্রুপদ একদিন বলে, বন্ধু একদিন আমি রাজা হব। তখন তোমার যদি কোনো দরকার পড়ে তাহলে আমার কাছে এসো। দরকারে আমার রাজত্বের অর্ধেকটাও দিয়ে দেবো তোমাকে।

সেই কথা মনে পড়ায় দ্রোণ গেলেন পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের কাছে। গিয়ে হলো এক বিচ্ছিরি অবমাননাকর অভিজ্ঞতা।

ছেলেবেলার কথা ভেবেই পাঞ্চাল রাজসভায় গিয়ে দ্রুপদকে বলেন দ্রোণ-বন্ধু চিনতে পারছ? আমি দ্রোণ। তুমি বলেছিলে দরকারে তোমার কাছে আসতে। আমার ছেলের দুধ খাওয়ার ভারী শখ। বন্ধু, তুমি আমাকে একটা গাভী দেবে?

বন্ধু কথাটা শুনেই বিদ্রূপে ঝলসে ওঠেন দ্রুপদ—বন্ধু! কে বন্ধু? তুমি কি জানো না যে বন্ধুত্ব হয় সমানে সমানে। একজন ভিখিরির সঙ্গে রাজার বন্ধুত্ব? তুমি ভাবলে কী করে? গাভী! না ওসব হবে না। এসেছো যখন, একমুঠো চাল দিতে পারি তোমাকে। আর ভবিষ্যতে কখনও বন্ধু বলে আসবে না আমার কাছে। আমাদের দুজনের অবস্থার পার্থক্যের কথাটা মাথায় থাকে যেন।

অপমানিত দ্রোণ কোনো কথা না বলে সঙ্গে সঙ্গে রাজসভা থেকে বেরিয়ে আসেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন এর প্রতিশোধ তিনি নেবেনই। উচিত শিক্ষা দেবেন দ্রুপদকে।

আশ্রমে ফিরে আরেক হৃদয় ছেঁড়া অভিজ্ঞতা। ধনীর দুলালরা অশ্বত্থামাকে পিঠুলিগোলা খাওয়াচ্ছে আর অশ্বত্থামা দুধ খাচ্ছি, দুধ খাচ্ছি বলে আনন্দে নাচছে। তার নাচ দেখে ছেলেগুলো বলছে, ধিক্ দ্রোণকে— ছেলে তার দুধ আর পিটুলির তফাতটা পর্যন্ত জানে না।

পরপর দুটো ঘটনায় দ্রোণ আর বসে থাকলেন না। তিনি প্রায় ধুলো পায়েই চলে যান হস্তিনাপুরে শ্যালক কৃপের কাছে। কৃপ ছিলেন কুরু বালকদের অস্ত্রশিক্ষক। দ্রোণ কিন্তু কৃপের সুপারিশে নয়, একটি অন্য ঘটনার মধ্য দিয়ে কৌরব পাণ্ডবদের অস্ত্রগুরু হয়ে ওঠেন। সেখানে তাদের সঙ্গে পুত্র অশ্বত্থামাকেও শেখাতেন। অবশ্য সেটা গোপনে। আর তারজন্য নিতেন এক ছলনার আশ্রয়।

দ্রোণের ওই প্রয়াস দেখে আড়ালে হাসলেন অশ্বত্থামার ভাগ্যবিধাতা। আর তাই দ্রোণ যা চাইলেন, বাস্তবে তা হলো না। বলা যায় একবারেই বদলে গেল পাশার দান। অশ্বত্থামাকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী করা গেল না কোনোমতেই।

দ্রোণ দেখেছিলেন তাঁর শিষ্যদের মধ্যে সবচেয়ে তীক্ষ্ণধী অর্জুন। গুরুর কাছ থেকে অতি দ্রুত সবকিছু শিখে নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে তার। অশ্বত্থামার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে একমাত্র অর্জুন। হয়তো অশ্বত্থামাকে ছাপিয়েও যেতে পারে। তাই তিনি শুধুমাত্র অশ্বত্থামাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি নিলেন এক কৌশল।

প্রতিদিন শিক্ষাপর্বের শেষে তিনি সকলকে দিতেন এক গোছা করে বাণ আর একটি করে পাত্র। বাণগুলি ধুয়ে পাত্র ভরে জল আনার নির্দেশ দিতেন তিনি। আর সেখানেই আশ্রয় নেন এক কৌশলের।

অশ্বত্থামা ছাড়া অন্যদের যে পাত্র দেওয়া হতো সেগুলির মুখ ছিল খুবই সরু। এত সরু যে জল ভরতে সময় লাগত অনেক। অন্যদিকে অশ্বত্থামার পাত্রটির মুখ অনেক বড়ো। মুহূর্তে ভরে যেত তা। ফলে অশ্বত্থামা ফিরে আসতেন সকলের আগে। হাতে সময়টাও পাওয়া যেত অনেক।

ব্যাপারটা অর্জুনের চোখ এড়াল না। তাই অর্জুনও আশ্রয় নেয় আরেক কৌশলের। বরুণাস্ত্র প্রয়োগ করে অশ্বত্থামারও আগে ফিরে আসে অর্জুন। ফলে দ্রোণের পক্ষে আর অশ্বত্থামাকে আলাদা শিক্ষা দেওয়া হলো না। বরং একইসঙ্গে অর্জুনও শিখতে থাকে নানা গূঢ় রণকৌশল ও অস্ত্রচালনা। শক্তি আর শিক্ষায় অশ্বত্থামা আর অর্জুন হলো সমকক্ষ। কেউ কারও চেয়ে কম না, বেশিও নয়।

অশ্বত্থামার ভাগ্যদেবতার এই খেলাই তাঁর ভবিষ্যৎকে টেনে ফেলে দেয় একবারে ঘন অন্ধকারের গহ্বরে। মহাবলী হয়েও অশ্বত্থামা শেষপর্যন্ত চিহ্নিত হয় রইলেন স্বধর্মচ্যুত, নৃশংস এক মানসিকতার জঘন্য প্রতীক হিসেবে। কিন্তু সত্যিই কি অশ্বত্থামাকে এভাবে চিত্রিত করা উচিত? সত্যিই কি এটাই তাঁর আসল রূপ?

প্রশ্নটা খুবই সাদাসাপটা। উত্তর কিন্তু অত সহজ নয়। তার কারণ, এসব ক্ষেত্রে খোলা চোখে যেটা দেখা যায় সেটাই সত্যি নয় সবসময়। যেমন অশ্বত্থামা যদি অবতারপুরুষ হয়ে থাকেন, তাহলে অমন অমানবিক হলেন কী করে? এর উত্তরেই এসে পড়ে ধর্মের কথা। ধর্মের পথ ভারী সূক্ষ্ম। তার স্বরূপও তাই। একই ধারায় বোঝা যায় না সবকিছু। আপতদৃষ্টে যেটাকে অমানবিক বলা হচ্ছে সেটাই হয়তো ছিল তাঁর অবতরণের অন্যতম শর্ত। সেই শর্ত পূরণের জন্য সচেতনভাবেই অমন ব্যবহার করেন তিনি। সে কারণেই সব কিছুর উত্তর এককথায় দেওয়া সম্ভব নয়।

অশ্বত্থামা শিবাবতার। ধর্ম সংস্থাপনের জন্যই এই অবতারের আবির্ভাব। শিবপুরাণের মতে, পৃথিবীতে শিব উনিশবার অবতাররূপে আবির্ভূত হয়েছেন। এই উনিশ অবতারের মধ্যে হনুমান ও অশ্বত্থামা অমর। বাকি সতেরোটি অবতারের আবির্ভাব ঘটেছিল নির্দিষ্ট এক-একটি কাজ করার জন্য। সেই কাজটি মিটে যাওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই ঘটেছে তিরোভাব।

কাহিনি— কৃপীকে বিয়ে করার পর শিবকে পুত্র হিসেবে চেয়েছিলেন আচার্য দ্রোণ। তাঁর সেই প্রার্থনা পূরণের জন্যই শিবের আবির্ভাব অশ্বত্থামা রূপে। শিবের তৃতীয় নয়নের মতোই অশ্বত্থামার কপালে ছিল একটি অপরূপ সুন্দর মণি। সেই মণির দীপ্তিতে প্রভাবিত চারিদিক। এই মণিটি ছিল অত্যন্ত দৈবীশক্তিসম্পন্ন। এই মণিটি তাঁকে দিয়েছিল ক্ষুধা, তৃষ্ণা থেকে মুক্তি। এই সহজাত মণিটিই ছিল অশ্বত্থামার সমস্ত বৈশিষ্ট্যের উৎস। ওই মণিটি তাঁকে বহু যুদ্ধে করেছে জয়ী। অন্যকথায় মণিটির জন্যই অশ্বত্থামা এই মর্ত্যলোকে দীপ্তিমান সূর্যের মতোই ছিলেন বিরাজমান।

।। তিন।।

অশ্বত্থামা অমিতবিক্রম। অদম্য শৌর্যের অধিকারী তিনি। তবুও নতুন অস্ত্র প্রয়োগের কলাকৌশল আয়ত্ত করার জন্য থাকতেন সতত ব্যস্ত। পুত্রের এই আগ্রহ ও দুর্বলতার কথা জানতেন আচার্য দ্রোণ। অশ্বত্থামা যে তাঁর প্রিয়শিষ্য অর্জুন সম্পর্কে এক ধরনের অসূয়া পুষে রেখেছেন মনে সেকথাও অজানা নয় আচার্য দ্রোণের। কিন্তু তিনি জানেন, অস্ত্রবিদ্যায় দক্ষ হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। সেই সঙ্গে এটাও জানেন, অর্বাচীন, অবিবেকী বা দূরদৃষ্টিহীন ব্যক্তিকে সবসময় সবকিছু দেওয়া উচিত নয়। অপ্রাজ্ঞকে কিছু দিলে তার অপপ্রয়োগের আশঙ্কা থাকে খুবই বেশি।

এতো জানার পরও, দ্রোণ কিন্তু নীতিনিষ্ঠ হতে পারেন না। তাই অর্জুনকে শিখিয়েছেন যে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগের কৃৎকৌশল, এতদিন অশ্বত্থামাকে তা না শেখালেও শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্ত বদলালেন দ্রোণ। পুত্র কিছু হঠকারী জেনেও তাকে বঞ্চিতের দলে রাখতে পারলেন না তিনি। একেই বলে বোধহয় আপত্যস্নেহ। এই ধরনের স্নেহ অতীতে বহুবার মহাসংকটের কারণ হয়েছে। জেনেও দ্রোণ সেদিন ডাকলেন পুত্র অশ্বত্থামাকে। যজ্ঞশালায় একান্তে বসলেন তিনি।

স্পষ্টভাষায় আচার্য দ্রোণ বলেন, আজ আমার একটি সিদ্ধান্ত বদলাচ্ছি আমি। জানি না তাতে হিত হবে কিনা। আমি জানি তোমাকে, তোমার স্বভাব চরিত্রও খুব ভালো ভাবেই জানা আমার। তুমি হয়তো আমার নির্দেশকেও অমান্যও করবে একদিন। তবুও আজ আমি তোমাকে শেখাব এক মহাভয়ংকর অস্ত্রের প্রয়োগ প্রণালী। এ অস্ত্র সমগ্র বিশ্বকে ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখে। তাই সুস্থির মনে শেখো সব—আর কখনই এর অপপ্রয়োগ করবে না। যদি করো তাহলে প্রতিপক্ষের হয়তো চরম ক্ষতি হবে, কিন্তু সেইসঙ্গে তোমার হবে সীমাহীন সর্বনাশ—যার দায় হয়তো বইতে হবে সারাটা জীবন। এক দুর্বহ জীবন তখন তোমাকে তাড়িত করবে। তাই সাবধান, খুব সাবধান।

বাধ্য ছাত্রের মতো মাথা নাড়েন অশ্বত্থামা। ইঙ্গিতেই কথা দেন অক্ষরে অক্ষরে মানবেন তিনি পিতার নির্দেশ। কিন্তু চিত্তচাঞ্চল্য রোধ করতে পারেন না অশ্বত্থামা। আর সেটাই হয়ে দাঁড়ায় লখিন্দরের লৌহবাসরের সেই ক্ষুদ্র ছিদ্র এবং সে কারণেই পিতার শঙ্কাই সত্য হয়, অশ্বত্থামাকে দিতে হয় চরম মূল্য।

সেদিন যজ্ঞশালায় আচার্য দ্রোণ পুত্রকে শেখান বিশ্বধ্বংসী ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগের সব কলাকৌশল। সেই অস্ত্র সংবরণের পথও বলে দেন তিনি। বলেন, অর্জুনকে এই বিদ্যা আমি শিখিয়েছি আগে। আমি জানি, অর্জুন সঠিকভাবেই এই বিদ্যায় হয়েছে দীক্ষিত। আজ তোমাকেও দিলাম সেই বিদ্যা। কিন্তু সাবধান, কোনোদিন কোনো

অবস্থাতেই অপপ্রয়োগ করবে না এর। এতটুকু এদিক ওদিক হলে ঘটবে মহা সর্বনাশ। তাই আবারও বলি সাবধান। খুব সাবধান।

ব্রহ্মাস্ত্র পাওয়ার আনন্দে অশ্বত্থামা তখন যেন মুক্ত আকাশে ডানামেলা পাখি। অর্জুন যে অস্ত্রবিদ্যায় তাঁর চেয়ে আর এগিয়ে নেই এই বোধে কিছুটা আত্মহারা। সে কারণেই পিতার আশঙ্কাই হলো সত্য। এই বিদ্যাই অশ্বত্থামার ভবিষ্যৎকে করল একবারে বিপর্যস্ত। সেই সঙ্গে তিনি হলেন এক কলঙ্কিত সেনানায়ক।

মহাভারতের বীরদের মধ্যে অশ্বত্থামা অনন্য। মহাবীর্যবান তিনি। তাঁর বীরত্বকে সম্মান জানান তাঁর শত্রুরাও। অশ্বত্থামা শাস্ত্রজ্ঞ, ধর্মজ্ঞও। সেই সঙ্গে তিনি কিছুটা অবিবেকী। দৃষ্টি তাঁর সবসময়ই এক ধরনের কালো পর্দায় ঢাকা। তাই দূরদৃষ্টির অভাব বারেবারেই বিড়ম্বিত করেছে তাঁকে। বলা যায় এটাই তাঁর দূরদৃষ্টি। এরই জন্য ঘটেছে স্খলন। কিছুটা উদ্ধত, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য অশ্বত্থামার মধ্যে তাই মহানায়ক হবার বহু গুণ থাকলেও জীবননাট্যে তিনি চিহ্নিত হয়েছেন শেষে ঘৃণ্য খলনায়ক হিসেবেই। নিজের ওজন অর্থাৎ ক্ষমতা ও দক্ষতার সীমা সম্পর্কে অজ্ঞানতাই বহু সময় তাঁকে সকলের কাছে করে তুলেছে হাস্যাস্পদ।

পিতার কাছ থেকে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগের সব কলাকৌশল শেখার পর তাঁর আত্মোদ্ধত মানসিকতা তাঁকে আরও বেশি অহংকারী করে তোলে। আক্ষরিক অর্থেই তখন তিনি 'ধরাকে সরা' বলে মনে করতে থাকেন। তারই ফলে হতে হয় লোকচক্ষুতে হেয়। এমনকী তাঁর মিত্রপক্ষ কৌরবরাও তাঁর বীর্যবত্তার কথা জানা সত্ত্বেও তার স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট কার্পণ্যেরই পরিচয় দিয়েছেন। সে কারণেই কুরুক্ষেত্র মহারণে সেনানায়ক হিসেবে তাঁকে অভিষিক্ত করা হয়েছে সকলের শেষে। পরাজিত সেনাপতি হিসেবে সব দায়িত্ব তাঁর ওপর চাপানোর জন্যই বোধহয় এই সিদ্ধান্ত।

সেসব তো পরের কথা। ব্রহ্মাস্ত্র পাওয়ার পরই অশ্বত্থামার নজর পড়ল কৃষ্ণের সুদর্শন চক্রটির ওপর। মনে হলো, ওই চক্র একমাত্র তাঁর হাতেই শোভা পেতে পারে। অন্য কারও হাতে নয়। দাম্ভিকতার তরঙ্গে সওয়ার হয়েই তাই তিনি একদিন ছুটলেন দ্বারকায়। গেলেন সরাসরি কৃষ্ণের কাছে। তাঁর মনে হলো সুদর্শন চক্রের অধিকারী হলে তিনি হবেন কৃষ্ণের চেয়েও বড়ো বীর।

চিন্তার ওই উদ্ধত হাওয়ায় স্ফীত হয়ে অশ্বত্থমা সেদিন বলেন হে কৃষ্ণ, ত্রিভুবনের সব অস্ত্রই রয়েছে আমার ঘরে। এত রকম অস্ত্র যে কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। সেইসব অস্ত্রের সেরাটি হলো ব্রহ্মাস্ত্র। সত্যি কথা বলতে কী, এখন আমি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তবুও বলছি, এতো অস্ত্রের অধিকারী হয়েও আমি তৃপ্ত নই। তাই তোমার সঙ্গে একটা জিনিস অদলবদল করতে চাই।

—তাই নাকি! তা কী অদলবদল করতে চাও—বলো তো দেখি!

বিশেষ কিছু নয়। তোমাকে আমার ব্রহ্মাস্ত দিয়ে দিতে চাই। জানো তো ব্রহ্মাস্ত্রের মূল্য ও মহিমা। এটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধ্বংস করতে পারে।

—তা আমাকে কী দিতে হবে?

—দিতে হবে তোমার ওই সুদর্শন চক্রটি। আমার ধারণা আমার

হাতে ছাড়া আর কোথাও মানায় না ওটি।

অশ্বত্থামার কথা শুনে কৃষ্ণ ভালো মানুষটির মতোই বলেন, ঠিকই বলেছো তুমি। অবশ্যই ওটা তুমি নিতে পারো।

অশ্বত্থামা আহ্লাদিত। তিনি তো জানেন না কৃষ্ণের ওই সুদর্শন আসলে বিষ্ণুচক্র। তাই তড়িঘড়ি বলেন, তাহলে দাও আমাকে।

—অবশ্যই দেব। তবে একটা কথা তোমাকে জানিয়ে রাখি। সুদর্শন কিন্তু কোনো সাধারণ চক্র নয়। তুমি ওটা ঠিক ঠিক ব্যবহার করতে পারবে তো? ভেবে দেখো। পরে কিন্তু আমাকে দোষ দিতে পারবে না।

—না, না। তোমাকে দোষ দেব কেন? ওই চক্রের কথা কী বলছো, বিশ্বের সব অস্ত্রই আমার কাছে একটা খেলনা মাত্র।

হাসেন কৃষ্ণ। বলেন, বেশ তুমি নাও তবে ওটি।

হাত বাড়ান অশ্বত্থামা, কৃষ্ণও স্মরণ করেন সুদর্শনচক্রকে। বলেন, ওহে সুদর্শন, অশ্বত্থামা তোমাকে চাইছেন। তা এখন থেকে তুমি হও অশ্বত্থামার শস্ত্রশালার একটি অস্ত্র।

কথাগুলি বলতে বলতে কৃষ্ণ তাঁর হাতের সুদর্শনটি ছেড়ে দেন।

অশ্বত্থামা দেখেন এক আপাতচক্র ধেয়ে আসছে তাঁর দিকে। অশ্বত্থামা বলেন, তিষ্ঠ, তিষ্ঠ।

কিন্তু, সুদর্শন শোনে না কোনো কথা। বেগতিক দেখে অশ্বত্থামা দুহাত দিয়ে ধরতে যান চক্রটি। চক্রে হাত লেগেছে কী লাগেনি, চিৎকার করে ওঠেন তিনি—জ্বলে গেল, জ্বলে গেল আমার হাত, সারাটা শরীর। চাই না আমার ওই চক্র। তোমার সুদর্শন তোমারই থাক।

হাসেন কৃষ্ণ। চক্রও শোভা পায় তাঁর হাতের কড়ে আঙুলে। আর মাথা নীচু করে চলে যান অশ্বত্থামা। তখনও তিনি জানেন না বিষ্ণুর হাতের ওই চক্র কৃষ্ণের হাতে শোভা পাচ্ছে এই দ্বাপর যুগে অধর্মের বিনাশ করে ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য।

দ্বারকা থেকে বিদায় নেন অশ্বত্থামা। হাত পুড়িয়ে তিনি ফেরেন নিজের আবাসে। এটা অবশ্য কুরুক্ষেত্র দ্বন্দ্বের আগে পাণ্ডবদের বনবাসে থাকার সময়ের ঘটনা।

।। চার ।।

পাওয়া এবং না-পাওয়ার আলো-আঁধারিতে ভরা অশ্বত্থামার জীবন। সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য দুই তার জীবনে এসেছে দিন ও রাত্রির মতো। সব কিছুকেই তিনি যে স্থিতপ্রজ্ঞের মতো মেনে নিতে পেরেছিলেন তা নয়। শিবাতার হয়েও একধরনের লোভ তাঁকে প্ররোচিত করেছে অন্ধকার জগতে প্রবেশের জন্য। অবশ্য এই লোভ তাঁর সহজাত নয়। পরিস্থিতি তাকে প্রলুব্ধ করেছে। সেই প্রলোভনের ফাঁদে পা দেওয়ার ফলেই তাঁর জীবন হয়ে ওঠে বেশ

With Best Compliments from -

Ganpati Laminators

&

Packagers Pvt. Ltd.

Mfg. of HDPE and PP Woven Bags and Fabric

কিছু অনর্থ ও সর্বনাশের পৃষ্ঠপট।

শৈশবে তাঁর মধ্যে যদি দুধের জন্য কাঙালপনা দেখা না দিত তাহলে দ্রোণ হয়তো দ্রুপদের কাছে যেতেনই না। হয়তো তাহলে কুরুক্ষেত্রের দ্বন্দ্বে তাঁদের ভূমিকাটাও হত অন্যরকম।

দুধের মতোই অশ্বত্থামার আকর্ষণ ছিল তেজি টগবগে অশ্বের প্রতি। তাঁর ওই আকর্ষণ বা আকাঙ্ক্ষার কথা জানতে পেরেছিলেন দুর্যোধন। তিনি তাঁকে দিয়েছিলেন একটি ভালোজাতের তেজি অশ্ব। আর ওই অশ্বের বিনিময়ে দুর্যোধন যেন কিনে নিয়েছিলেন অশ্বত্থামাকে। পিতা দ্রোণ মহারণে কৌরবপক্ষে যোগ দিয়েছিলেন 'অন্নদাস' হবার অনিবার্য পরিণতি হিসেবেই। কিন্তু অশ্বত্থামার সে ধরনের কোনো বাধ্যাবাধকতা ছিল না। তবুও তিনি কৌরবদের পক্ষেই যোগ দেন। সেটা দুর্যোধনের প্রতি কৃতজ্ঞতার কারণেই। নাহলে তিনি পাণ্ডবপক্ষেও যোগ দিতে পারতেন। কেননা, অর্জুন ছাড়া অন্য পাণ্ডবদের সঙ্গে তাঁর অসদ্ভাব তো ছিলই না, বরং প্রীতিরই সম্পর্ক ছিল তাঁর।

অর্জুনের প্রতি তাঁর বিরাগের মূলে ছিল ঈর্ষা। অর্জুন বীরত্বে তাঁর সমান অথবা কিছু বেশি এমন বোধই ছিল ওই অসূয়ার কারণ। অর্জুনকে সহ্য করতে না পারার কারণেই অশ্বত্থামা হন কৌরবসঙ্গী। তবে কেবল ঈর্ষা নয়, ভাগ্যও বাদ সেধেছিল এক্ষেত্রে। তাঁকে কলঙ্কিত নায়ক হিসেবে চিহ্নিত করার জন্যই ভাগ্য তাঁকে করেছিল কৌরবপন্থী।

একথা সত্য, সেই কিশোরবেলায় অস্ত্রশিক্ষার সময় থেকেই দুর্যোধনের সঙ্গেই অশ্বত্থামার বিশেষ সৌহার্দ্য গড়ে উঠেছিল। সেটা দু'জনের কিছু স্বভাবগত মিলের কারণেও হতে পারে। আবার এক্ষেত্রে হয়তো তাঁর ভেতরে বাসা বেঁধে থাকা লোভই নিয়েছিল একটা গোপন ভূমিকা। কুরুকুলোদ্ভব হলেও সেই সময় দুর্যোধন এবং তাঁর অন্যান্য ভাইয়েরা ছিলেন রাজপুত্র। হস্তিনাপুরের সিংহাসনে তখন বিরাজ করতেন কৌরবদের পিতা অন্ধ মহারাজা ধৃতরাষ্ট্র। আর তাই রাজানুগ্রহ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাতেই সাগরমুখি নদীর মতোই অশ্বত্থামাও মিলেছিলেন কৌরবসঙ্গমে।

দুর্যোধনের সঙ্গে সবসময় যাঁরা থাকতেন এবং নানা অনভিপ্রেত কাজে প্ররোচিত করতেন সেই শকুনি, দুঃশাসন, কর্ণের মতো অশ্বত্থামাও ছিলেন তাঁদেরই দলে। তাকে নিছক স্তাবকের ভূমিকায় তিনি ছিলেন না যুদ্ধের আগে। বরং এই মহাযুদ্ধ যাতে এড়ানো যায় তারজন্য বারবার পরামর্শ দেন তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে। দুর্ভাগ্য, ভীষ্ম, বিদুর, দ্রোণ ইত্যাদির মতো তাঁর হিতকথাতেও সায় দেননি ধৃতরাষ্ট্র বা দুর্যোধন। এবং সেই কারণেই অনেকের মতোই অশ্বত্থামাও থেকে যান পরাজিতদের দলেই।

দ্বিতীয়বার পাশা খেলার উদ্যোগ নিতেই ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর প্রমুখ কয়েকজন সুহৃদের সঙ্গে অশ্বত্থামাও ধৃতরাষ্ট্রকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান এই দ্যূতক্রীড়া বন্ধের জন্য। বলেন, আর খেলার দরকার নেই। সর্বত্র শান্তি বিরাজ করুক।

কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র সে কথায় কান দেন না। ফলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বাঁধভাঙা বন্যার জলের মতোই দ্রুত প্রবাহিত হয় হস্তিনাপুরের দিকে।

।। পাঁচ ।।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কুরু-পাণ্ডব দুই পক্ষেই যেসব মহাবীর নিজেদের বীরত্ব প্রকাশ করেন অশ্বত্থামা তাঁদেরই একজন। তিনি ছিলেন বহু দিব্য ও পার্থিব অস্ত্রের অধিকারী। যুদ্ধও করেছেন অকুতোভয়ে। কোনো সময়ই তাঁকে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা নিতে দেখা যায়নি। দুর্যোধনের সঙ্গে সখ্যের কারণেই যুদ্ধের একবারে শেষ দিনে সেনাপতি হিসেবে তিনি যে ভূমিকা নেন তা তাঁকে চিরকালের মতো কালিমালিপ্ত করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই যুদ্ধেই মাঝে মাঝে তিনি যে ভূমিকা নেন তাতে বোঝা যায় বিচারবুদ্ধির দিক থেকে তিনি যথেষ্ট প্রাজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন।

কুরুক্ষেত্র সমরের পনেরো দিন অন্যায় যুদ্ধে নিহত হন দ্রোণ।

With Best Compliments From :-

RTS POWER CORPORATION LIMITED

Manufacturers of

E. H. V. GRADE TRANSFORMERS

From 25 KVA to 40 MVA, 132 KV Class

HEAD OFFICE
56, Netaji Subhas Road, Kolkata - 700 001
Phones : (033) 2242-6025 / 6054
Fax No, : (033) 2242-6732
E-mail : rtspower@vsnl.net
pkgoswamy@gmail.com

HOWRAH WORKS:
Jaladhulagari
Dhulagarh, Sankrail,
Howrah - 711 302

JAIPUR WORKS :
C-174, Vishwakarma Industrial Area, Chomu Road, Jaipur - 302 013
Phone No. : 2330-405 / 2330-269
Fax No. : 0141 2330315
email : rtspower@sancharnet.in

AGRA WORKS :
Mathura Road, P.O. Artoni, Agra - 282 007
Phone No. : (0562) 2641-431

Associate Concern
ABHAY TRANSFORMERS & SWITCHGEARS
O. T. Road, Balasore (Orissa)
Phone No. BLS 262319
Tele fax : BLS 263875

শোকে ভয়ংকর হয়ে ওঠেন অশ্বত্থামা। তারও মধ্যে কিন্তু তাঁর শুভবুদ্ধি লোপ পায়নি। কৌরবপক্ষে দুর্যোধনের সঙ্গে সবসময় থেকে যে কয়েকজন নিজেদের বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরতে পেরেছেন অশ্বত্থামা তাঁদেরই একজন। কেবল তাই নয়, এই যুদ্ধ করার জন্য যাঁরা দুর্যোধনকে সবচেয়ে বেশি প্ররোচিত করেন তাঁদের প্রত্যেকেরই সেই কাজের পিছনে সক্রিয় ছিল নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি। ব্যতিক্রম সম্ভবত অশ্বত্থামা। নিজে সর্বশক্তি দিয়ে সংগ্রাম করেছেন। কিন্তু দুঃশাসন নিহত হওয়ার পর প্রকৃত সুহৃদের মতোই দুর্যোধনকে সন্ধি করার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন অশ্বত্থামা। বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ করে বলেছিলেন, মহারাজ, অনেক হয়েছে, এবার ক্ষান্ত হন। ইতিমধ্যেই দু'পক্ষেরই অনেক বীর নিহত হয়েছেন। এখনও যাঁরা জীবিত আছেন তাঁদের বাঁচতে দিন। সন্ধি করুন পাণ্ডবদের সঙ্গে। তাতে কেবল দু'পক্ষ নয় মঙ্গল হবে সমস্ত মানুষেরই।

এরপরই অশ্বত্থামা শুনিয়েছিলেন শাস্ত্রনির্দিষ্ট হিতকথা, বলেছিলেন, বিজ্ঞপুরুষরা বলেন, বন্ধু হয় চাররকম—সহজাত, সন্ধিজাত, অর্থ দ্বারা উপার্জিত এবং প্রতাপবশত স্বয়ং উপনীত। পাণ্ডবরা আপনার সহজাত বা স্বাভাবিক বন্ধু। সন্ধির মাধ্যমে তাঁদের সঙ্গে আবার বন্ধুত্ব করুন। তাতে কেবল আপনার নয়, সারা জগতের মঙ্গল হবে।

অশ্বত্থামার সঙ্গে সহমত দুর্যোধন, তবুও সন্ধিতে অনীহা। পালটা যুক্তির অবতারণা নিজের সিদ্ধান্তের সমর্থনে। তাই তখনও শেষ হলো না যুদ্ধ। তখনও যে সম্পূর্ণ হয়নি কৌরবকুল নিধন। তাই চলতে থাকে যুদ্ধ।

যুদ্ধের অষ্টাদশ দিন। বন্দরের কাল হবে শেষ। যবনিকা পতন কেবল সময়ের অপেক্ষায়। ওই দিনই নিহত হন সেনাপতি শল্য। অভিষেক হলো সেনাপতি পদে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার।

আগের কথা। দ্রোণ তখন সেনাপতি। অশ্বত্থামা তাঁকে প্রণাম করে বলেন, আশীর্বাদ করো বাবা, আমি যেন যুদ্ধে জয়ী হতে পারি। দ্রোণ কিন্তু বলেন, আমার আশীর্বাদ নয়, যুদ্ধে জয়ী হও নিজের ক্ষমতায়।

বাবার সে নির্দেশ কোনো সময়েই ভোলেননি অশ্বত্থামা। যুদ্ধের প্রতিটি মুহূর্তেই নতুন নতুন অস্ত্রের প্রয়োগে পাণ্ডবশিবিরে ত্রাস সৃষ্টি করেন তিনি। দ্রোণ নিহত হওয়ার পরদিনই পাণ্ডব এবং পিতৃহন্তা ধৃষ্টদ্যুম্নকে হত্যার উদ্দেশে নারায়ণ অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন অশ্বত্থামা। এই অস্ত্র দ্রোণকে দিয়েছিলেন স্বয়ং নারায়ণ। বাবার কাছ থেকে সেটি পান অশ্বত্থামা। এতদিন এই অস্ত্র প্রয়োগের প্রয়োজন অনুভব করেননি তিনি। কিন্তু পিতৃবধের প্রতিশোধে এই অস্ত্রেরই প্রয়োগ এবার। অব্যর্থ সেই অস্ত্র থেকে বাঁচার জন্য শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে পাণ্ডবরা সকলে রথ, অস্ত্র সব কিছু ফেলে মাটিতে নেমে অস্ত্রকে করেন পৃষ্ঠ প্রদর্শন। নারায়ণী অস্ত্র তাই ফিরে যায় অশ্বত্থামার কাছেই।

যুদ্ধের আঠরো দিনে প্রায় সব সৈন্য হারিয়ে দুর্যোধন দ্বৈপায়ন হ্রদে লুকিয়ে থাকেন। কিন্তু পাণ্ডবরা সে খবর পেয়ে যায়। তাঁরা অবরোধ করেন ওই হ্রদ। বাধ্য হয়ে বেরিয়ে আসেন দুর্যোধন। শুরু হয় ভীমের সঙ্গে গদাযুদ্ধ। কৃষ্ণের ইঙ্গিতে নিয়ম ভেঙে ভীম আঘাত করেন দুর্যোধনের উরুতে। ভগ্নউরু দুর্যোধনকে নিদারুণ প্রহারে মর মর অবস্থায় রেখে চলে যান পাণ্ডবরা।

তারপরই আসেন অশ্বত্থামা, তাঁর মাতুল কৃপাচার্য এবং কৃতবর্মাকে নিয়ে। মুমূর্ষু দুর্যোধনকে কথা দিয়ে যান নবনিযুক্ত সেনাপতি অশ্বত্থামা, সেই রাতেই হত্যা করবেন পাণ্ডবদের।

দুর্যোধন বলেন, যুদ্ধে কেউ হত্যা করতে পারেনি ওদের। তুমি যদি সেটা পারো তাহলে মৃত্যুর মুহূর্তে সেটাই হবে আমার সবচেয়ে বড়ো সান্ত্বনা।

অশ্বত্থামা রাতের গভীরে পাণ্ডবশিবির আক্রমণের কথা বলেন। বাধা দেন কৃপাচার্য। বলেন, সেটা অন্যায়। যুদ্ধের নিয়মনীতি লঙ্ঘন হবে তাতে। রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় কাউকে আক্রমণ বা হত্যা করা হবে না এটাই যুদ্ধের আগে ঠিক করেছিল কৌরব ও পাণ্ডবরা। এখন সেই নিয়ম ভাঙাটা হবে অতি গর্হিত অনৈতিক কাজ।

অশ্বত্থামা প্রায় গর্জে ওঠেন। কীসের অন্যায়? যুদ্ধে ও প্রণয়ে তো কোনো কিছুই অন্যায় নয়। আর আমাকে ন্যায় অন্যায় কথা বলছো, কিন্তু যেদিন শিখণ্ডিকে সামনে রেখে নিরস্ত্র ভীষ্মকে শরশয্যায় শায়িত করা হয়, তখন তো এই অন্যায়ের কথা ওঠেনি। যেদিন শঠতার আশ্রয় নিয়ে আমার বাবা দ্রোণকে বধ করা হয়, তখন কোথায় ছিল এই অন্যায় বোধ? পুরো যুদ্ধটাই তো হয়েছে ন্যায়নীতি বিসর্জন দিয়ে, তাহলে এখন কেন উঠছে সেই প্রশ্ন?

অশ্বত্থামার এই প্রশ্নের মুখে নিশ্চুপ কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা। অশ্বত্থামা বলেন, রাতেই দেখেছি একটা ঘটনা—বুঝেছি, শত্রুকে আক্রমণ করতে হয় তার অসতর্ক মুহূর্তে। পশুপাখিতে যদি এ ধরনের নীতি নিতে পারে তাহলে আমরা ওপরে গেলে তা অন্যায় হবে কেন?

অশ্বত্থামার কথায় কিছুটা অবাক কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা। তাঁদের সবিস্ময় জিজ্ঞাসা, কী সে ঘটানা? কী দেখে নিচ্ছ এই কৌশল?

অশ্বত্থামা বলে, দেখেছিলুম দিনেরবেলায় এক বিধ্বস্ত প্যাঁচাকে।

—প্যাঁচা?

—হ্যাঁ। প্যাঁচারা দিনের বেলায় দেখতে পায় না, এটা তো সকলেরই জানা। কোনো কারণে ওই প্যাঁচাটা কোটর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল। তাকে দেখেই এক ঝাঁক কাক আক্রমণ করে প্যাঁচাকে। দিনে দৃষ্টিহীন প্যাঁচা কিছুই করতে পারে না, কোনোরকমে প্রাণ বাঁচায় সে।

—তারপর?

—রাতেরবেলা সেই প্যাঁচাকেই দেখলাম অন্য রূপে। অন্ধকারেও সবকিছু দেখতে পাওয়া প্যাঁচাটা গাছে গাছে কাকের

বাসায় চালাচ্ছে হামলা। ঠোঁট আর নখের আঘাতে ছিন্নভিন্ন করছে ঘুমিয়ে থাকা কাকগুলিকে। ভেঙে তছনছ করে দিচ্ছে কাকের বাসাগুলি। এই দৃশ্য দেখেই বুঝেছি, শত্রু যখন অপ্রস্তুত অথবা অসহায়, তখনই তাকে আক্রমণ করতে হয়। আর তাতেই পাওয়া যায় সাফল্য। এবার বলতো, পাখির রাজ্যে যদি এই নিয়ম চলে তাহলে আমরা ওই পথে যাব না কেন?

এই যুদ্ধকৌশল অজানা নয় কৃপাচার্যদের। ফলে উড়িয়ে দিতে পারেন না অশ্বত্থামার কথা। তাই নীরবেই সঙ্গী হন তাঁর।

যুদ্ধ জয়ের উল্লাস তখন পাণ্ডব শিবিরে। পাণ্ডবরা পাঁচ ভাই-ই শিবির ছেড়ে দূরে গঙ্গাতীরে। কৃষ্ণও গেছেন অন্যত্র। রণক্লান্ত বেশিরভাগ সেনানায়ক এতদিন পর একটু নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রামের সুযোগ পেয়ে গভীর সুষুপ্তিতে মগ্ন। এমন সময় এগিয়ে যান ত্রয়ী। তবে তখনই হামলা করেন না তাঁরা। নেন আরও একটু সময়। গভীর হোক ওদের নিদ্রা। তখন পাঠাবেন তাদের চিরনিদ্রার দেশে।

সকলেই নিশ্চিন্ত, সুরক্ষার ব্যবস্থাতেই রয়েছে ঢিলেমি। শিবির প্রায় অরক্ষিত। আর সেটাই হর্ষের কারণ অশ্বত্থামাদের। শিবিরে ঢুকতে গিয়ে কিন্তু দেখেন, প্রহরীরা না থাকলেও শিবির রক্ষা করছেন স্বয়ং মহেশ্বর।

ত্রস্ত কৃপাচার্যরা। অশ্বত্থামা কিন্তু নির্ভয়। শিবাবতার তিনি। তাই শিবকে তুষ্ট করতে এগিয়ে যান। নানাভাবে করেন তাঁর পূজা। পাঠ করেন মহাদেবের মনোরঞ্জক নানা মন্ত্র ও স্তোত্র। তুষ্ট আশুতোষ, অন্তর্হিত হন তিনি। যাওয়ার আগে অশ্বত্থামাকে দিয়ে যান ভয়ংকর চন্দ্রহাস খড়্গ।

এবার ত্রয়ী আরও নির্ভয়। অশ্বত্থামা কৃপাচার্যদের বলেন, শিবিরে ঢুকবেন কেবল তিনি একা। বাইরে থাকবেন ওঁরা দুজন। বাইরে থেকে কেউ এলে বা শিবির ছেড়ে যারা পালাতে যাবে সকলকে শেষ করবেন তাঁরা।

অশ্বত্থামা যেন কালান্তক শমন। অথবা শ্মশানের নৃশংস জহ্লাদ। খড়্গ হাতে ঢোকেন শিবিরের ভিতরে। নিস্তব্ধ চারিদিক। সকলেই নিদ্রিত। সামনেই দেখেন ধৃষ্টদ্যুম্নকে। পিতৃশোক জেগে ওঠে যেন ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি। সজোরে মারেন লাথি ঘুমন্ত ধৃষ্টদ্যুম্নকে। চুলের মুঠি ধরে করেন মুষ্ঠাঘাত। অস্ত্রহীন, অপ্রস্তুত ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রতিরোধ করার আগেই খড়্গাঘাতে তাঁকে করেন ছিন্ন মুণ্ড।

একই ভাবে হত্যা করেন উত্তমৌজা, যুধামন্যু, শিখণ্ডিকে। রক্তনেশায় পাগল অশ্বত্থামা পাণ্ডবদের না পেয়ে নৃশংসভাবে শেষ করেন দ্রৌপদীর পাঁচ তরুণ পুত্রকে।

যেন সাঙ্গ হলো এক নরমেধ যজ্ঞ। অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য, কৃতবর্মা যেন যজ্ঞের ঋত্বিক। তিনজনেরই দেহ ভেসে যাচ্ছে নররক্তে। চোখেতে রয়েছে ঘাতকের ক্রূর দৃষ্টি। ওই মুহূর্তে ত্রয়ীর কেউ-ই যেন এ মর্ত্যলোকের মানুষ নন। তাঁরা যেন তিন নররাক্ষস।

অথচ তিনজনই শাস্ত্রজ্ঞ, নীতিনিষ্ঠ। কিন্তু অদ্ভুত এক প্রতিশোধের নেশায় তাঁরা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। এ যেন পরাজিতের শেষ মরণকামড়। তাই ওঁদের কারও মনের আকাশেই জমেনি অনুশোচনার ঘন মেঘ। পাপবোধও বিচলিত করেনি এতটুকু। বরং পিশাচের ভূমিকায় সাফল্যের আনন্দে আত্মহারা ত্রয়ী। নীতিযুদ্ধে যা পারেননি, অনৈতিক পথে সে কাজেই সিদ্ধ হওয়ার আহ্লাদে তারা দ্রুত ছোটেন দ্বৈপায়ন হ্রদে।

সেখানে পৌঁছে তাঁদের সব উল্লাস রূপান্তরিত গভীর বিষাদে। ভগ্ন উরু দুর্যোধনের তখন বাকি কেবল শেষ কয়েকটি শ্বাসগ্রহণ। শমন-দুয়ারে পা-রাখা দুর্যোধনকে ওভাবে দেখার দুঃখকে দূরে সরিয়ে অশ্বত্থামা বলেন, মহারাজ, পেরেছি আমরা। শুনে খুশি হলেন, পাণ্ডবদের করেছি নির্বংশ। দ্রৌপদীর পাঁচটি সন্তানই যমালয়ে এখন।

একথায় মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তেও দুর্যোধন যেন দীপ্তমান। অনাস্বাদিত এক আনন্দে উদ্ভাসিত তাঁর নয়ন। সেই মুহূর্তে সব ব্যথাবেদনা, এমনকী আসন্ন মরণের কথাও ভুলে অদ্ভুত এক আনন্দে বিকৃতস্বরে বলেন দুর্যোধন, সখা, তুমিই আমার প্রকৃত বন্ধু। এই আঠোরো দিনে বড়ো বড়ো রথী মহারাথীরা যা পারেননি, কেবল এক রাতে সে কাজ সাঙ্গ করে আমার বিদায়ের মুহূর্তকে রাঙিয়ে দিলে তুমি, করলে আনন্দ-উচ্ছ্বাস। ধন্যবাদ তোমাকে—অনেক ধন্যবাদ।

কথাগুলি শেষ করেই চোখ বুজলেন দুর্যোধন চিরকালের মতো। নীরব হলেন চিরতরে।

রাতের অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে। পুবের আকাশ ক্রমেই রক্তাক্ত। সেই অরুণাভার দিকে নজর যেতেই চমকে ওঠেন অশ্বত্থামা। এতক্ষণ তিনি ছিলেন যেন এক ঘোরের মধ্যে। নতুন ভোরের নতুন সূর্য কিন্তু অশ্বত্থামার মনে নতুন কোনো আনন্দের বার্তা নিয়ে এলো না। পরিবর্তে একটা গা শিরশিরে ভয় তাঁকে অবসন্ন করে তোলে। একটা হৃদয়ভাঙা আতঙ্ক তাঁকে গ্রাস করতে থাকে।

পাগলা কুকুরের মতোই একটা আতঙ্ক তাড়া করছে তাঁকে। পঞ্চপাণ্ডব নিশ্চয়ই এতক্ষণে পৌঁছে গেছে শিবিরে। সব দেখে পাণ্ডবরা হয়তো অস্ত্র হাতে তাঁরই সন্ধানে ছুটে আসছে। একবার ধরতে পারলেই তাঁর জীবনটাকে ছিনিয়ে নিয়ে নিষ্প্রাণ শবে পরিণত করবে তারা।

অশ্বত্থামা ইতি উতি তাকান। কোথায় পাবেন একটা নিরাপদ জায়গা। কোথায় গেলে এই জীবনটাকে বাঁচাতে পারবেন ভেবেই অস্থির অশ্বত্থামা। পাচ্ছেন না সমাধানের কোনো রাস্তা। নিরাপদ জায়গার সন্ধান পাচ্ছিলেন না বলেই আরও বেশি চঞ্চল আরও বেশি আতঙ্কিত অশ্বত্থামা। বুঝতে পারেন, এই ব্রহ্মাণ্ডে পাণ্ডবদের হাত থেকে বাঁচবার মতো কোনো জায়গা নেই। যত মহাবীরই হোন না কেন, আজই পাণ্ডবদের হাতে যাবে তাঁর জীবন। একটু আগে পুব আকাশের জবাকুসুম সবিতা মনে যে আনন্দের হিল্লোল তুলেছিল সেটাই এখন যেন মহাকালের মহিষের মতন ধেয়ে আসছে তাঁর দিকে। বদলাচ্ছে আকাশের রং। রজতশুভ্র অথবা

হীরকদ্যুতিতে ঝলমল সদা খলখল হাসিতে চমকে চমকে ত্রাসিত।

শেষ আছে সবকিছুর। একসময় ভয় তাড়িত অশ্বত্থামার চোখের তারায় জীবনের ঝিলিক। অশ্বত্থামার মনে হয়, পেয়ে গেছেন তিনি ঠিকানা—নিরাপদ আশ্রয়ের। তাই আর দেরি নয়। তিনি এখন গঙ্গামুখি। লক্ষ্য, ব্যাস প্রমুখ মুনিদের আশ্রম। সেখানেই রণসাজ ছেড়ে ক্ষৌমবস্ত্রে অশ্বত্থামা যেন ব্রহ্মচারী। আশা, ঋষি আশ্রমে রক্তপাত ঘটাবে না পাণ্ডবেরা। বেঁচে যাবেন তিনি।

শিবিরে ফিরে পাণ্ডবরা তখন নিশ্চিত, কৌরব পক্ষে জীবিতদের মধ্যে একমাত্র অশ্বত্থামাই ঘটাতে পারে এমন বর্বরের মতো কাজ। তাই জলপ্রপাতের মতো তীব্রবেগে ছুটছেন ভীম আর ভয়ংকর একটা কিছু নিবারণের জন্য বাকি চার পাণ্ডবও তাঁরই অনুগামী।

ব্যাসাশ্রমে এসে থমকে দাঁড়ান সকলে। ক্রূরকর্মা অশ্বত্থামা এখন মহর্ষি ব্যাসের সামনেই বসে আছেন। দেখেই দাঁত কিড়মিড় বৃকোদর বলেন, ওহে বকধার্মিক, এখুনি পাবে তুমি তোমার পাপের বেতন।

অশ্বত্থামা দেখেন, শর ও শরাসন হাতে ভীম তাঁরই দিকে তাকিয়ে আছেন রক্তচোখে। পেছনে রয়েছেন অর্জুন, যুধিষ্ঠির। রয়েছেন তাঁদের রথের সারথি স্বয়ং বাসুদেব। অশ্বত্থামা বুঝতে পারেন এই ব্রহ্মচারী বেশ হয়তো রক্ষা করতে পারবে না তাঁকে। তাই তিনিও এবার অস্ত্রধারী। তাঁর নিশ্চিত বোধ—আবার হবে যুদ্ধ। হয়তো এই শেষবার।

একটু আগের ভয় ঝেড়ে ফেলে দাঁড়ান অশ্বত্থামা। সব ন্যায়নীতি ধর্ম ভুলে কেবলমাত্র নিজেকে বাঁচাবার জন্য ছিঁড়ে নেন একমুঠো ঘাস। তারপর সক্রোধে মন্ত্র উচ্চারণে সেই ঘাসে সংযোজন করেন দিব্যাস্ত্র—ব্রহ্মশির। 'পাণ্ডববংশ ধ্বংস হোক'—এই পরুষবাক্য উচ্চারণ করে ছোঁড়েন সেই অস্ত্র। সেই ব্রহ্মাস্ত্র তখন বিশ্ব বিনাশনে কালানলে দীপ্ত।

দেখেই বিপদ গোনেন শ্রীকৃষ্ণ। তাই অর্জুনকে বলেন, আর দেরি নয়, আচার্য দ্রোণের কাছ থেকে পেয়েছো যে ব্রহ্মাস্ত্রের সন্ধান, এবার তাই প্রয়োগ করে। নিজের জন্য নয় এই বিশ্বকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য নিক্ষেপ করো তা। স্তব্ধ করো অশ্বত্থামার ওই অস্ত্রকে। কুরুক্ষেত্র মহাসংকটের সময়ও ব্যবহার করেননি যে ব্রহ্মাস্ত্র এবার কৃষ্ণের কথায় যথানিয়মে সেই অস্ত্রই প্রয়োগ করেন অশ্বত্থামার ক্রূর বাসনার অবসান ঘটাতে।

আকাশে মুখোমুখি দুই প্রদীপ্ত সূর্য। জগৎজুড়ে হাহাকার, বুঝি মহাপ্রলয় ঘনিয়ে এলো। অবস্থা দেখে চঞ্চল দেবর্ষি নারদ আর মহর্ষি ব্যাস। দাঁড়ালেন তাঁরা দুই অস্ত্রের মাঝখানে। তাঁদের তপঃপ্রভাবে দুই অস্ত্রই তখন স্থির।

অর্জুন তাঁদের প্রণাম জানিয়ে বলেন, অশ্বত্থামার অস্ত্র নিষ্ক্রিয়

করতেই অস্ত্র ছুঁড়েছি আমি। এখনই প্রতিসংহার করতে পারি আমি এটা। কিন্তু পাপাত্মা অশ্বত্থামা তখন অস্ত্রপ্রভাবে আমাদের সকলকে ভস্ম করে দেবে। তাই সকলের যাতে মঙ্গল হয় তেমন একটা কিছু করার নির্দেশ দিন আপনারা।

কথাগুলি বলেই অর্জুন প্রতিসংহার করলেন তাঁর অস্ত্র। সত্যব্রত পরায়ণ, ব্রহ্মচারী ও গুরুসেবা পরতন্ত্রীরাই কেবল করতে পারেন এই কাজ।

অশ্বত্থামা কিন্তু ব্যর্থ হলেন অস্ত্র প্রতিসংহারে। বললেন, রাগে উন্মত্ত হয়ে এই অস্ত্র নিক্ষেপ করেছি আমি। কিন্তু পারছি না অস্ত্রকে ফিরিয়ে আনতে। পাণ্ডববংশ ধ্বংস করতেই আমি ছুঁড়েছিলাম এ অস্ত্র। এখন আমি কী করব?

ব্যাসদেব বলেন, সত্য তোমার কথা। ক্রোধশূন্য হও। তোমার মাথার মণিটি যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে নিজের প্রাণ রক্ষা করো।

দোনামনা করেও অশ্বত্থামা রাজি হন সেকথায়। তারপর বলেন পাণ্ডব বধূদের গর্ভে আঘাত করবে এই অস্ত্র—এখন কী করবো?

ব্যাস বলেন, বেশ সেটাই করো। আর অন্য কারও ক্ষতি করার চেষ্টা করো না।

তাই করেন অশ্বত্থামা। সেই সময় কৃষ্ণ বলেন, লোকে তোমাকে পাপ-পরায়ণ কাপুরুষ বলে। তুমি বালকঘাতী, তাই তোমার ওই অস্ত্রে অভিমন্যু-জায়া উত্তরার গর্ভস্থ সন্তান অবশ্যই মারা যাবে। কিন্তু আমি তাকে বাঁচিয়ে তুলবো। তোমাকে কিন্তু তোমার পাপের ফল ভোগ করতেই হবে।

হলোও তাই। অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রে বিগতপ্রাণ হলো উত্তরার গর্ভস্থ সন্তান। শ্রীকৃষ্ণ যোগবলে প্রাণ সঞ্চার করলেন সেই সন্তানের— পাণ্ডব বংশধর পরীক্ষিতের।

এবার অশ্বত্থামার পাপকর্মের শাস্তিভোগের পালা। শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতে অশ্বত্থামার মাথার সেই সহজাত মণিটি টেনে ছিঁড়ে নিলেন ভীম। রক্তে ভেসে যেতে থাকে মুখ।

হতপ্রভ অশ্বত্থামা। মুখ বেয়ে ঝরে পড়ছে রক্ত। তাঁর তখন সেই রূপ দেখে দয়া হবে যে কোনও মানুষের। করুণায় হয়তো বিগলিত হবে মনও। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নির্বিকার। মহাকালের মতোই নির্মম—কঠোর তাঁর কণ্ঠ। দ্রোণপুত্রকে শোনালেন তিনি তাঁর শাস্তির কথা। আসামিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার সময় বিচারকের মুখ যেমন ভাবলেশহীন-অকম্পিত, ঠিক সেইভাবে।

বলে চলেন কৃষ্ণ, হে দ্রোণপুত্র, তুমি পাপকর্মরত কাপুরুষ। ব্রাহ্মণ হয়েও নির্দয় তোমার হৃদয় ক্ষত্রিয়ের মতো। যে ভাবে নিদ্রিত বালক এবং অন্যান্য বীরদের হত্যা করেছো, ইতিহাসে তার কোনো পূর্ব নজির নেই। এই নৃশংসতার জন্য আজ থেকে তুমি হবে নিঃসঙ্গ—অবলম্বনহীন। কেউ কথা বলবে না তোমার সঙ্গে। তুমি থাকবে মৌন হয়ে। তোমার এই পাপাবধের জন্য ভয়ানক কুষ্ঠ

With Best Compliments From -

South Calcutta Diesels Pvt. Ltd.

Sales & Service

225-D, A. J. C. Bose Road, Kolkata - 700 020

Phone : 2302-5250/ 3/ 4, Fax : 033-2281-2509 / 2287-6329,

E-mail : scdtodi@scdtodi.com

Authorised Dealers of

BOSCH LTD. BOSCH, GMBH-GERMANY,

DEUTZ, A. G., GERMANY

LOMBARDINI - ITALY, V. M. MOTORI - ITALY

ব্যাধিতে আক্রান্ত হবে তুমি। পুঁজ রক্তে ভেসে যাবে দেহ। দুর্গন্ধে ভেসে যাবে চারদিক। ঘৃণায় প্রকৃতিও বিরূপ তাকবে তোমার প্রতি।

আগামী তিনহাজার বছর তোমাকে ঘুরে বেড়াতে হবে নির্জন অরণ্য প্রদেশে। চিরজীবী হয়েও তুমি থাকবে একলা–নিঃসঙ্গতাই হবে তোমার একমাত্র সঙ্গী।

অশ্বত্থামাকে একলা রেখে চলে যান সকলে সেখান থেকে।

।। সাত ।।

অশ্বত্থামা চলছেন—শুধুই চলেছেন। কিন্তু চরৈবেতি তাঁর মন্ত্র নয়। সামনে নেই কোনো লক্ষ্যও। তাই এ চলা বড়ো যন্ত্রণার—বড়ো নিরানন্দময়।

কলুর বলদের মতোই তিনি ঘুরছেন। এক স্থান থেকে অন্যত্র। বিরাম নেই—বিশ্রাম নেই। শুধুই ঘুরে বেড়ানো। অশ্বত্থামা ভাবেন, কলুর বলদ তো বেঁচে থাকে একটা আশায়। একসময় থামবে ঘানি। সে পাবে বিশ্রাম। যাই হোক মিলবে আহারও। কিন্তু তাঁর তো সেটুকু পাওনাও নেই। বিরামহীন তাঁর এ জীবন।

আকাশের দিকে তাকান অশ্বত্থামা। তাঁরই মতো পরিক্রমাগত এ তপন। অথবা মহাজগতে আবর্তিত সূর্যকে ঘিরেই চলছে পৃথিবীর যে পথ পরিক্রমা—তার মধ্যে তো একটা ছন্দ রয়েছে। রয়েছে এক ধরনের আনন্দ। সে আনন্দ চলার গতিতে। ওই গতিই যে জীবন।

অশ্বত্থামা ভাবেন, তাঁর কাছে এই গতি তো জীবন নয়, এ হলো দুঃসহ এক ভার। তিনি এই গতি থেকে মুক্তি চান। কিন্তু তিনি চাইলেও তাঁর বিধাতা সেটা চান না। তাই এক্কাগাড়ির চাবুক খাওয়া ঘোড়ার মতোই তাঁকে টেনে যেতে হচ্ছে—এ জীবন—যার থেকে মুক্তি চান তিনি। থেমে গিয়ে নিঃশেষ হতে চান। কিন্তু তাঁর সেই চাওয়ার কোনো মূল্য নেই। তাই চলতেই হবে তাঁকে।

মনের সঙ্গে কথাবার্তা চলে অশ্বত্থামার। মনকেই বলেন, পাপী তিনি। খুনি তিনি। মানুষ হয়েও অমানুষ। তা বলে তিনি কি একটু সান্ত্বনাও পেতে পারেন না কারও কাছ থেকে? একটি মমতাময় হাতের ছোঁয়া কি আর পাবেন না কোনো দিন? এই আকাঙ্ক্ষাই জল হয়ে ঝরে পড়ে অশ্বত্থামার দুই চোখ বেয়ে। কানে বাজে শ্রীকৃষ্ণের অমোঘ সেই বাণী—

হে অশ্বত্থামা।
চিরজীবী তুমি এক
অশরীরী প্রেত—
নিরালম্ব—সতত চলমান।
ভুবনের এতো পাপভার
বইবে যে একা তুমি
জেনো অনিবার।
আদর-ভালোবাসা
শিয়রে ছলছল আঁখি
অলীক সে স্বপ্ন—
তাতে নেই কোনো অধিকার
বিড়ম্বিত জীবনে তোমার।
তুমি শুধু ভারবাহী
হতভাগ্য প্রাণী
একাকী টানবে এই
জীবনের ঘানি।

[মধ্যপ্রদেশের বুরহানপুর থেকে কুড়ি কিলোমিটার দূরে সাতপুরা পাহাড়ের চুড়ায় আসিরগড় দুর্গ। এই কেল্লাতে নাকি আজও রয়েছেন অশ্বত্থামা। কেল্লার শিবমন্দিরে রোজ করেন পূজা। প্রতি সকালে এই শিবলিঙ্গের কাছে দেখা যায় টাটকা ফুল আর আবির। কে যে সবার আগে এখানে পূজা করেন তা কেউ দেখেনি। হাজার হাজার বছর ধরে এই মন্দিরেই নাকি পাপস্খলনের জন্য পূজা করে যাচ্ছেন অশ্বত্থামা—এটাই প্রচলিত বিশ্বাস।

অশ্বত্থামার দেখা পেয়েছিলেন বিখ্যাত পাইলট বাবাও। ভারতীয় বিমান বাহিনীর প্রাক্তন বিমানচালক পাটলট বাবার দাবি, অশ্বত্থামা রয়েছেন হিমালয়ের উপজাতিদের মধ্যে। রোজ নাকি এক শিব মন্দিরে প্রার্থনা করেন, অর্ঘ্যও দেন।

এমনি নানা কিংবদন্তী রয়েছে মহাভারতের অভিশপ্ত বীর সেনাপতি অশ্বত্থামা সম্পর্কে। এসব বিশ্বাস নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। তবে ভারতীয় পরম্পরায় সপ্ত অমরের অন্যতম অশ্বত্থামা। আজ অমর যখন তখন দেখা পাওয়াটাকে অবিশ্বাস্য বলে উড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা একটা থাকেই। তাই তো বিশ্বাস-অবিশ্বাসের বাতাবরণে ভেসে বেড়ায় অশ্বত্থামার অস্তিত্বের কথা।] □

With Best Compliments From-

S. K.
KAMANI

With Best Compliments from :

PIONEER PAPER AND STATIONERY PVT. LTD.

(Quality Ex-Book Manufacturer with latest technology & Exporter)

REGD OFFICE & WORKS:

74, BELIAGHATA MAIN ROAD
KOLKATA-700 010
PHONE: 2370-4152, FAX: 91-33-2373-2596

Email: pioneerpaperco@gmail.com

Visit Our Website: - www.pioneerpaper.co

শারদীয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন—

বেনারসী, সিল্ক, তাঁত শড়ীর বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

প্রিয় গোপাল বিষয়ী ®

স্থাপিত - ১৮৬২

বড়বাজার ঃ ৭০, পণ্ডিত পুরুষোত্তম রায় স্ট্রীট (খেংড়াপট্টী), কোলকাতা - ৭,
ফোন ঃ ২২৬৮ ৬৪০২, ২২৬৮-২৮৩৩
২০৮, মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা - ৭, ফোন ঃ ২২৬৮ ৬৫০৮

গড়িয়াহাট ঃ ১১৩/১এ, রাসবিহারী এভিনিউ, ট্র্যাঙ্গুলার পার্কের বিপরীতে,কোলকাতা - ৭০০ ০২৯, ফোন ঃ ২৪৬৫-৮২৪৬

কাঁচড়াপাড়া ঃ ৬৯/ডি, বাগ স্টেশন রোড, বাগ মোড়, কাঁচড়াপাড়া-৭৪৩ ১৪৫
ফোন ঃ ৭০৪৪০৬২০০০, ২৫৮৫ ৩৩৩৩

এছাড়া আমাদের আর কোনো শাখা নেই

পঞ্চম ব্রহ্মাণ্ড

সন্দীপ চক্রবর্তী

মেয়েটির কথা শুনে আমি শুধু অবাক হয়েছি বললে কম বলা হয়। আমি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেছি। আমি ওকে কোনওদিন দেখিনি। সুন্দরী মেয়েদের ব্যাপারে আমার তীব্র কৌতূহল। একবার

দেখলে চট করে ভুলি না। সেখানে এরকম চোখে পড়ার মতো সুন্দর একটা মেয়েকে দেখলে আমার নিশ্চয়ই মনে থাকত। আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলতে পারি মেয়েটিকে আমি চিনি না। অথচ ও আমার সম্বন্ধে সব কথা গড়গড় করে বলে যাচ্ছে। আমার নাম, কলকাতায় কোথায় থাকি, কোন ব্যাঙ্কে চাকরি করি, আমার বাবা-মা কোথায় থাকেন—সব।

আমি মাথা নীচু করে বসে ভাবছিলাম। অস্বীকার করব না আমার টেনশন উত্তরোত্তর বাড়ছিল। কী চায় মেয়েটা? আমাকে নিয়ে কেন ওর এত কৌতূহল? আমাকে চুপ করে থাকতে দেখেই বোধহয়, মেয়েটা বলল, 'আমি কিন্তু আপনার আরও একটা গোপন কথা জানি অঞ্জন।'

শিরদাঁড়া দিয়ে একটা হিমেল স্রোত নেমে গেল। মেয়েটা পুলিশের লোক নয় তো! আজকাল তো শুনেছি লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগে মেয়েরাও কাজ করে। কিন্তু মেয়েটা যদি পুলিশের লোক হয়ও, আমার কী যায় আসে? কারণ দশ বছর আগে যা ঘটেছিল তাতে লালবাজারের বাঘা বাঘা গোয়েন্দারাও তো আমার কোনও যোগাযোগ খুঁজে পায়নি। আমি তখন কৃষ্ণনগরে। মামার বাড়িতে। হঠাৎ মাথায় একটা আইডিয়া এল। পুলিশটুলিশ নয়, মেয়েটা নিশ্চয়ই ব্ল্যাকমেল করার ধান্দায় আমার কাছে এসেছে। সত্যিই যদি তাই হয় তা হলে অবশ্য আমার বিপদ আছে। প্রমাণ কিছুই করতে পারবে না কিন্তু জলঘোলা করে টাকা আদায় করতে পারে... না, ভয় পেলে চলবে না। আগে জানতে হবে মেয়েটা কতটা জানে।

যথাসম্ভব স্বাভাবিক ভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী জানেন আপনি?'

'কী জানি?' হাসল মেয়েটা। হাসলে গালে দিব্যি টোল পড়ে। ফ্যানের হাওয়ায় বেসামাল চুল সামলে মেয়েটা বলল, 'আপনি... না, থাক। আজ সব কথা বললে আপনার টেনশন বাড়বে। আমি পরশু আবার আসব। তখন বলব।'

আমাকে কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়ে মেয়েটা ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেল। আমি হতভম্বের মতো বসে রইলাম অনেকক্ষণ। কী করব কিছুই বুঝতে পারছি না। হঠাৎ চোখ পড়ল নেমকার্ডটার ওপর। মেয়েটা এসেই আমায় কার্ডটা দিয়েছিল। তখন দেখা হয়নি। সুন্দর মুখ দেখে মাথাটা ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। এখন ভালো করে দেখলাম। মেয়েটার নাম অর্পিতা সোম। নামের নীচে মেয়েটার পরিচয়। রিসার্চ অ্যানালিস্ট। ঠিকানা ফিফথ গ্যালাক্সি। আমার মাথা আরও ধাঁধিয়ে গেল।

বাড়ি ফিরলাম চিন্তার পাহাড় মাথায় নিয়ে কলকাতায় আমি একা থাকি। মাস ছ'য়েক আগে একটা প্রমোশন পাওয়ার পর ব্যাংকলোন নিয়ে পাটুলির কাছে ফ্ল্যাট কিনেছি। মাসে মাসে ইএমআই দিতে হয়। বাবা-মা থাকেন বালুরঘাটে। দু'জনেই অসুস্থ। প্রত্যেক মাসে ওদের জন্যেও একটা বেশ মোটা অঙ্কের টাকা পাঠাতে হয়। মেয়েটা যদি আমাকে ব্ল্যাকমেল করে তা হলে এতগুলো দিক আমি সামলাব কী করে? রাতে ঘুমোতে পারলাম না একটা বিশ্রী আতঙ্কে পাশবালিশ জড়িয়ে জেগেই কাটিয়ে দিলাম রাতটা।

অফিসে গিয়েও রেহাই নেই। কাজে একটুও মন বসছে না। একটা মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে। মেয়েটা কলকাতায় কোথায় থাকে জেনে নেওয়া উচিত ছিল। ওর নেমকার্ডে লোকাল কোনও অ্যাড্রেস নেই। ফোন নাম্বারও না। যদি থাকত, আমি ফোন করে বলতাম, কাল নয় আপনি আজই চলে আসুন। আমি আর এই টেনশন নিতে পারছি না। কিন্তু মেয়েটা যখন কার্ডটা দিল তখন আমার কার্ড দেখার কথা মনেই পড়েনি। তারপর মেয়েটা এমন হঠাৎ করে চলে গেল যে ওকে জিজ্ঞাসা করারও সুযোগ পেলাম না। ইস! কী যে ভুল করলাম! এখন আর সংশোধনের উপায় নেই। কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে। মনে হল হাফ সিএল নিয়ে বাড়ি চলে যাই। কিন্তু তাও হল না, পিয়োন এসে বলল, ম্যানেজার ডাকছেন। বুকটা ধড়াস করে উঠল। মেয়েটা ম্যানেজারকে কিছু বলে দেয়নি তো? ঢক ঢক করে এক গ্লাস জল খেয়ে দৌড়লাম ম্যানেজারের ঘরে।

'এই যে অঞ্জন, ব্যাংকে তোমার তিন বছর হয়ে গেল অথচ এখনও এন্ট্রিতে এত ভুল হয় কী করে? দ্যাখো কী করেছ!'

কম্পিউটার স্ক্রিনে এক্সেল শিটটা দেখে আমার চক্ষু চড়কগাছ। সত্যি খুব বড়ো ভুল হয়ে গেছে। ....'সরি স্যার। আমি এখনই ঠিক করে দিচ্ছি।'

'এই রিপোর্ট পাঠিয়ে দিলে তো চারিদিকে ঢি ঢি পড়ে যেত। সবাই বলত এই ব্রাঞ্চে বোধহয় সবাই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাজ করে।'

সব ঠিকঠাক করে অফিস থেকে বেরোতে আমার ছ'টা বেজে গেল। হেমন্তর সন্ধ্যে। ঠাণ্ডা ঝিরঝিরে হাওয়ায় প্রাণ জুড়িয়ে যায়। কিন্তু এখন আমার এসবে মন নেই। একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা ছুটলাম পাইকপাড়ায়। ছোট মাসির বাড়িতে। আমার ছোট মেসো পুলিশের বড়ো অফিসার ছিলেন। একমাত্র ছোটো মেসোই বলতে পারে এখন আমার কী করা উচিত। কিন্তু আজ বোধহয় দুর্ভাগ্য আমাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। ছোটো মাসি বলল, 'তোর মেসো তো একটা সেমিনারে গেছে। ফিরতে রাত হবে। রিটায়ার করার পর দুটো নেশা হয়েছে বাবুর। পড়াশুনো আর সেমিনার। তা, মেসো নেই তো কী হয়েছে আমি তো আছি। আয় বোস। দই কাতলা বানিয়েছি, দু'টো খেয়ে যা।'

দই কাতলা খাওয়ার ইচ্ছে আমার ছিল না। পেটের অসুখের বাহানা বানিয়ে

ফিরে এলাম। রাতে ছোট মেসোকে ফোন করতে গিয়ে মনে হল আমি বোধহয় একটু বেশিই ভয় পাচ্ছি। মেয়েটি তো এখনও কিছু বলেইনি। আগে বলুক তারপর না হয় মেসোর সাহায্য নেব। আমি মোটেও সাহসী নই। কিন্তু মাঝে মাঝে হঠাৎ সাহসী হয়ে যাই। তখন অনেক সময় হঠকারিতার বশে বিপজ্জনক কাজ করে ফেলি। আজ সন্ধ্যে পর্যন্ত মেয়েটাকে আমি ভয়ই পেয়েছি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে যতক্ষণ না মেয়েটা সত্যি সত্যি ভয় পাওয়ার মতো কিছু করছে ততক্ষণ আমি একাই সব সামলাতে পারব।

পরেরদিন মেয়েটা কাঁটায় কাঁটায় ছ'টার সময় চলে এল। আগেই ঠিক করে রেখেছিলাম আজ আর অফিসের ক্যান্টিনে বসব না। আমরা একটা রেস্তোরাঁয় বসলাম। আজও মেয়েটাকে মাথা খারাপ করে দেওয়ার মতো লাগছে। দু'জনের জন্য দু'কাপ কফির অর্ডার দিয়ে বললাম, 'এবার বলুন আমার সম্বন্ধে আপনি কী জানেন?"

মেয়েটা হাসল, 'আপনার সম্বন্ধে আমি সবই জানি অঞ্জন। আপনি এমনিতে ভিতু টাইপের। কিন্তু লেজে পা পড়লে সাংঘাতিক।'

বেয়ারা কফি দিয়ে গেল। কফিতে চুমুক দিয়ে বললাম, 'তাই নাকি! সাংঘাতিক কী দেখলেন আমার মধ্যে?'

'দুজন মানুষকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করার পরেও বলবেন আপনি সাংঘাতিক নন!'

অজান্তেই কেঁপে উঠলাম। কফি চলকে পড়ল শার্টে। মেয়েটা স্থিরদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ঠোঁটের কোণে লেগে থাকা হাসিটা বুকে কাঁপন ধরিয়ে দেয়। কিন্তু আমাকে স্বাভাবিক থাকতে হবে। বললাম, 'মিথ্যে কথা! আপনি যে ঘটনার কথা বলছেন তাতে আমার কোনও লিংক পুলিশ খুঁজে পায়নি। কারণ আমি তখন কৃষ্ণনগরে ছিলাম। আমার মামার বাড়িতে।'

মেয়েটা হাতে ধরে থাকা ট্যাবলেটটা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'আপনি কৃষ্ণনগরে ছিলেন, তাই না? দেখুন তো এই ছবিটা চিনতে পারেন কিনা?'

দেখলাম ছবিটা। কৃষ্ণনগর থেকে শিয়ালদায় আসার ট্রেনের টিকিটের ছবি। তারিখ দশবছর আগের সেই বিশেষ দিনের। টাইম—হ্যাঁ, তাও মিলে যাচ্ছে।

কিন্তু টিকিটটা তো আমি পুড়িয়ে ফেলেছিলাম। মেয়েটা ছবি পেল কোথা থেকে? এসি রেস্তোরাঁর মধ্যেও আমার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালটা মুছলাম। বেশ বুঝতে পারছি চেষ্টা করেও আমি স্বাভাবিক থাকতে পারছি না। একটা ভয় ক্রমশ পেয়ে বসছে আমাকে। তবুও, যেন কিছুই হয়নি এমনি ভঙ্গিতে বললাম, 'আপনি একটা পুরনো টিকিট দেখিয়ে প্রমাণ করতে চাইছেন আমি খুনি? সরি, আপনাকে দেখে কিন্তু এতটা বোকা বলে মনে হয় না। ওই টিকিটে যে আমিই কৃষ্ণনগর থেকে শিয়ালদায় ট্র্যাভেল করেছি সেটা প্রমাণ করতে পারবেন?'

মেয়েটা ধীরেসুস্থে কফি শেষ করল। ব্যাগ থেকে ছোট আয়না বের করে দেখল ঠোঁটে কফি লেগে আছে কিনা তারপর বলল, 'না, তা পারব না। তার দরকারও নেই। আমার কাছে এমন কিছু আছে যা দিয়ে প্রমাণ করা যায় খুনটা আপনিই করেছিলেন। তবে সেটা কী জানতে হলে আমার সব কথা ধৈর্য ধরে শুনতে হবে।'

'কী শুনব বলুন তো? ওই ট্রেনের টিকিটের মতো আবার নিশ্চয়ই কোনও আলটপকা গল্প ফাঁদবেন। তবুও...শুনব। কিন্তু তার আগে বলুন আপনি কে? পুলিশ না ব্ল্যাকমেইলার?'

'রিল্যাক্স অঞ্জন! আমি পুলিশও নই, ব্ল্যাকমেইলারও নই। আই জাস্ট ওয়ান্ট টু নো দা ট্রুথ।'

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। মেয়েটা তা হলে পুলিশ নয়। ব্ল্যাকমেইলারও নয়। শুধু সত্যিটা জানতে চায় মাই ফুট! তিন মাস ধরে খবরের কাগজের রিপোর্ট চেটেপুটে খেয়েছে সকলে। রুদ্র, সঙ্ঘমিত্রা আর আমি একই কলেজে পড়তাম। খুব কাছের বন্ধু বলতে যা বোঝায়—আমরা তাই ছিলাম। সবাই মজা করে বলত ত্রিভুজ। যদিও রুদ্র আর সঙ্ঘমিত্রার সম্পর্কটা বন্ধুত্ব দিয়ে শুরু হলেও পরে আর তা থাকেনি। ওরা প্রেমে পড়েছিল। বেশ মাখো মাখো প্রেম। ঘটনার আগের দিন বড়োমামার হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়ার খবর পেয়ে আমি কৃষ্ণনগর চলে গিয়েছিলাম। ওইদিন তো বটেই, পরের দিনও আমার কেটেছে বড়োমামাকে নিয়ে অজস্র টানাপড়েনে। সুতরাং রুদ্র আর সঙ্ঘমিত্রার ব্যাপারে আমি কিছুই জানতাম না পরে পুলিশের কাছে সব শুনেছি। ঘটনার দিন ওরা ইভিনিং শোয়ে সিনেমা দেখতে গিয়েছিল। সেদিন কলকাতায় সকাল থেকে প্রচণ্ড বৃষ্টি। রাস্তায় একহাঁটু জল। শো শেষ হবার পর সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে ওরা বাইকে বাড়ি ফিরছিল। সবাই জানে রুদ্র খুব রেকলেস বাইকার। কলকাতার ব্যস্ততম রাস্তাতেও রুদ্রকে আমি প্রচণ্ড স্পিডে বাইক চালাতে দেখেছি। এই উদ্দাম গতি পছন্দ করত সঙ্ঘমিত্রা। পিছনের সিটে বসে গভীর আশ্লেষে জড়িয়ে ধরত রুদ্রকে। আমার খুব ভয় করত। অনেকবার বারণ করেছি কিন্তু রুদ্র শোনেনি। শেষে বিরক্ত হয়ে ওর বাইকে চড়াই ছেড়ে

With Best
Compliments from :-

A
Well
Wisher

(KN3)

দিয়েছিলাম। সেদিনও বাইকে গতির ঝড় তুলেছিল রুদ্র। কিন্তু পিছল রাস্তায় সামলাতে পারেনি। চাকা স্কিড করার ফলে বাইক উলটে যায়। রাস্তার পাশে একটা বাড়ির দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে থেঁতলে যায় ওদের মাথা। দুজনেই স্পট ডেড। —এই তো গল্প। এর মধ্যে এমন কোনও সত্যই থাকতে পারে না যার সন্ধান পুলিশ পায়নি। তাই বেশ আত্মবিশ্বাসী হয়ে বললাম, 'সত্যিটা জানতে চান, জানুন না। আমাকে মিছিমিছি এর মধ্যে জড়াচ্ছেন কেন?'

'আপনার মুখোশটা না খুললে সত্যিটা কোনওদিনই জানা যাবে না। তাই বাধ্য হয়েই আপনাকে জড়াতে হচ্ছে।'

বেশ বিরক্তি লাগছিল। প্রমাণ ছাড়া কাউকে খুনি বলা মারাত্মক অপরাধ। তার ওপর এই বিশ্রী অপমান। বললাম, 'শুনুন, আমি মুখোশটুখোশ পরে নেই বুঝলেন। আমার বাড়িতে আদালতের রায়ের কপি আছে। তাতে স্পষ্ট লেখা আছে, আমি নির্দোষ। আপনাকে আমি আর দশ মিনিট সময় দিচ্ছি। তার মধ্যে যা বলার বলে কেটে পড়ুন।'

মেয়েটার গায়ে বোধহয় গণ্ডারের চামড়া। কোনও হেলদোলই হল না। দিব্যি হেসে বলল, 'এবার তা হলে শুরু করা যাক, কেমন?—ঘটনাটা একটা ত্রিকোণ প্রেমের পরিণতি। সবাই জানত রুদ্র আর সঙ্ঘমিত্রা একে অপরকে ভালোবাসে। আসলে আপনি আর রুদ্র দু'জনেই সঙ্ঘমিত্রাকে ভালোবেসেছিলেন। কিন্তু সঙ্ঘমিত্রা ভালোবেসেছিল রুদ্রকে। আপনি যেদিন কথাটা জানতে পারলেন সেদিন হতাশায় ভেঙে পড়েছিলেন। এমনকী, আত্মহত্যা করার ইচ্ছেও আপনার হয়েছিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আপনি বুঝতে পেরেছিলেন আত্মহত্যা করলে প্রতিশোধ নেওয়া হবে না। একমাত্র ওদের দুজনকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে পারলেই আপনার বুকের আগুন শান্ত হবে। তখনও পর্যন্ত এই ভাবনা, ভাবনাই। তার কোনও জোর নেই। কিন্তু যেদিন আপনি রুদ্রর একটা বই ফেরত দিতে গিয়ে ওদের দু'জনকে একসঙ্গে বিছানায় দেখলেন সেদিন ভাবনাটা সিদ্ধান্ত হয়ে গেল। তবে কাউকে মারতে চাইলেই তো আর মারা যায় না। সুযোগের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। শুরু হল আপনার অপেক্ষা। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো রুদ্র আর সঙ্ঘমিত্রা এত কাছের বন্ধু হয়েও আপনার মনের ভাব বিন্দুমাত্র বুঝতে পারেনি। আপনি ওদের বুঝতে দেনওনি। রুদ্র যথারীতি আপনাকে বিশ্বাস করে সব কথা বলত। সেদিনের সিনেমা যাওয়ার কথাও রুদ্র দু'দিন আগে আপনাকে বলেছিল। না, তখনও আপনি এর মধ্যে কোনও সুযোগ দেখেননি। এই সময় ভাগ্য আপনাকে সাহায্য করতে শুরু করল। বড়োমামা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আপনি ছুটে গেলেন কৃষ্ণনগরে। বিশেষ কিছু হয়নি। পেটের গণ্ডগোলে হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন। এই পর্যন্ত সবই ঠিক ছিল। কিন্তু পরের দিন সকালে আপনি যখন টিভিতে দেখলেন কলকাতা-সহ পুরো দক্ষিণবঙ্গ নিম্নচাপের কবলে পড়েছে, সকাল থেকেই কলকাতায় প্রচণ্ড বৃষ্টি নেমেছে এবং এই অবস্থা আরও দু'দিন ধরে চলবে—তখন আপনার মনে হল এটা সুযোগ হলেও হতে পারে। সুযোগ এলে কী করবেন তা তো আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলেন। তাই আপনি কৃষ্ণনগর থেকে ট্রেনে করে শিয়ালদায় এলেন। তারপার শো-টাইমের কিছুটা আগেই পৌঁছে গেলেন সিনেমা হলের কাছে। আপনার ভয় ছিল বৃষ্টি দেখে ওরা যদি প্রোগ্রাম ক্যানসেল করে! কিন্তু না, তা ওরা করেনি। রুদ্র বাইক পার্ক করে সঙ্ঘমিত্রার হাত ধরে চলে গেল থিয়েটারের ভেতর। আপনি তখন সামনের একটি পার্কে। গাছপালার আড়ালে। সেখান থেকে পার্কিং জোনটা স্পষ্ট দেখা যায়। এই সময় ভাগ্য আবার আপনার সহায় হল। রাস্তাঘাটে জল ক্রমশ বাড়তে থাকায় দুর্ঘটনা এড়াতে বিদ্যুৎ সংযোগ ছিন্ন করে দেওয়া হলো। চারপাশ ডুবে গেল ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে। থিয়েটারে জেনারেটর থাকায় শো বন্ধ হল না। অতঃপর শুরু হলো আপনার খেলা। আপনি নিঃশব্দে আড়াল থেকে বেরিয়ে মোবাইলের টর্চের আলোয় রুদ্রর বাইকের ব্রেকের তার কেটে দিলেন। সেদিন বাড়ি ফেরার সময় রুদ্র গতির ঝড় তুলেছিল ঠিকই কিন্তু ব্রেক না ধরায় সেই গতি সামলাতে পারেনি। ছিটকে পড়েছিল দু'জনেই। তারপর...তারপর তো আপনি সবই জানেন।'

আমি এতক্ষণ হাঁ করে শুনছিলাম। বিস্ময়ের মাত্রা বেড়ে গেলে বিস্মিত হওয়ার ক্ষমতা লোপ পায় বলে শুনেছি। আমার এখন সেই অবস্থা। মেয়েটা থামতেই বললাম, 'আপনার কল্পনাশক্তির প্রশংসা না করে পারা যায় না সত্যি, গল্পটা চমৎকার। কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন আছে। কলকাতা পুলিশকে আপনি কী ভাবেন, গাধা? এত কাণ্ড হয়ে গেল আর পুলিশ জানতে পারল না?

'পেরেছিল তো। কিন্তু আপনার ছোটো মেসো কলকাঠি নেড়ে তদন্তের অভিমুখটাই ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। যা ছিল খুনের কেস, হয়ে গেল অ্যাকসিডেন্ট কেস।'

বুকের গোপন কোনও কোটর থেকে বেরিয়ে ভয়টা গলার কাছে এসে আটকে গেল। এ সেই ভয় যা কেটে গেছে বলে একটু আগে আমার মনে হয়েছিল। কিন্তু আমার কাছে তো আদালতের রায়ের কপি আছে। তা ছাড়া, মেয়েটাও বলেছে ও পুলিশের লোক নয়। তা হলে আমার কীসের ভয়? মন শক্ত করে ভারিক্কি চালে বললাম, 'যা বলছেন প্রমাণ করতে পারবেন?'

'পারব', বলে মেয়েটা আবার ট্যাবলেটটা এগিয়ে দিল। ওটা হাতে নিয়ে

বুঝলাম আমার হাত কাঁপছে। বুকের ঢিব ঢিব শব্দ বোধহয় অনেকদূর পর্যন্ত শোনা যাবে। একটা ভিডিয়ো চালিয়ে দিয়েছে মেয়েটা। স্কিনে অন্ধকার। বৃষ্টির শব্দ। জল মাড়িয়ে কারোর হাঁটার আওয়াজ পেলাম। কয়েক সেকেন্ড পর এক ছায়ামূর্তির অবয়ব ফুটল স্ক্রিনে। কিন্তু তার মুখ দেখতে পাচ্ছি না। চারিদিকে দুর্ভেদ্য অন্ধকার। ছায়ামূর্তি পকেট থেকে মোবাইল বের করে টর্চ জ্বালল। এবার কিছুটা ফুটল স্ক্রিনে। কিন্তু তার মুখ দেখতে পাচ্ছি না। এবার কিছুটা স্পষ্ট হলো ছবিটা। জায়গাটা একটা পার্কিং জোন। অনেক গাড়ি আর বাইক দাঁড়িয়ে। লোকটার চেহারাও আগের থেকে সামান্য স্পষ্ট। কিছু দূর গিয়ে একটা বাইকের সামনে জানু পেতে বসল লোকটা। বাইকটা আমার চেনা। পকেট হাতড়ে একটা বেশ বড়ো কাঁচি বের করে লোকটা বাইকের ব্রেকের তার কেটে দিল। লোকটার মুখ এখনও দেখা যাচ্ছে না। হে ঈশ্বর যেন দেখা না যায়। তা হলে আমি বলতে পারব ওই লোকটা আমি নই। হঠাৎ গাড়ির হর্নের শব্দ শোনা গেল। তারপর হেডলাইটের আলো। লোকটা ঘাড় ঘুরিয়ে আলোর দিকে তাকাতেই....

ইচ্ছে করছিল ট্যাবলেটটা মাটিতে আছড়ে ভেঙে ফেলি। কিন্তু এই ভিডিয়োর নিশ্চয়ই আরও কপি আছে। ট্যাবলেট ফেরত দিয়ে বললাম, 'আমি আপনার একটা কথাও বিশ্বাস করি না। অন্য কারোর ছবি ডিলিট করে আপনি সেই জায়গায় আমার ছবি বসিয়ে দিয়েছেন। ফোটোশপের কারসাজিতে আজকাল অনেক কিছু হয়। জাল ভিডিয়ো দেখিয়ে ইনোসেন্ট লোককে ভয় দেখাতে আপনার লজ্জা করে না?'

'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন ভিডিওটা জাল? তা বেশ তো—ভিডিওটা জাল কিনা সেটা ফরেনসিক টেস্ট করালেই বোঝা যাবে। পাঠাব ফরেনসিক টেস্টের জন্য?"

আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল, 'প্লিজ না। ফরেনসিকে পাঠালে পুলিশ জানতে পারবেই। প্লিজ পুলিশকে জানাবেন না।'

'অর্থাৎ আপনি মেনে নিচ্ছেন ভিডিয়োটা জাল নয়, তাই না?' বলে মেয়েটা জিভ দিয়ে চুক চুক শব্দ করল। তারপর বলল, 'আপনাদের পুলিশের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই অঞ্জন। এমনকী, আপনার দেশ ইন্ডিয়া এবং প্ল্যানেট পৃথিবীর সঙ্গেও আমার কোনও সম্পর্ক নেই। আমার পরিচয় যদি শোনেন তা হলে পুলিশের ভয় আপনার আর থাকবে না।'

মেয়েটা পাগল নাকি!—'ইন্ডিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক নেই সেটা না হয় বুঝলাম। কিন্তু পৃথিবীর সঙ্গেও সম্পর্ক নেই—এর মানে কী?'

'অর্পিতা সোম আমার আর্থ-নেম। পৃথিবীতে কিছুদিন থাকার জন্য একটা নাম আর পদবি প্রয়োজন, সেই জন্য এই আর্থ-নেম। আমার আসল নাম প্রোহা। আমি ফিফথ গ্যালাক্সির কোবারজাইন প্ল্যানেটের বাসিন্দা। কোবারজাইনের ইংরিজি তর্জমা করলে মানেটা হবে গডস হোম বা ঈশ্বরের ঘর। আওয়ার এনার্জি কামস ফ্রম দা ট্রুথ ওনলি। সেইজন্য, আমরা কখনও মিথ্যে বলি না বা মিথ্যাচার করি না। আমাদের চিফ বলেন, আ সিঙ্গল লাই ক্যান ডেসট্রয় আওয়ার লাইভস অ্যান্ড প্ল্যানেট—কী, অবাক হচ্ছেন তো? পুরোটা শুনলে আপনার বিস্ময়ের কোনও সীমা থাকবে না।' মেয়েটা থামল কী যেন ভাবল কিছুক্ষণ। তারপর আবার শুরু করল, 'হ্যাঁ অঞ্জন, আমরা মানুষ নই। আমাদের প্রায় পুরো শরীরটাই রোবটের। শুধু ব্রেন আর হার্ট আপনাদের মতো। আমরা মানুষের থেকে অনেক উন্নত। আমাদের একুশটা সুপার কম্পিউটার আছে। যার নাম ইউনিভার্সাল মাইন্ড। মহাবিশ্বের কোটি কোটি গ্যালাক্সির যে কোনও প্রান্তে কোনও অন্যায় কোনও মিথ্যাচার ঘটলেই তা ইউনিভার্সাল মাইন্ডে ধরা পড়ে। রুদ্র আর সঙ্ঘমিত্রাকে ঘুন করার অপরাধ আপনাদের পুলিশ বা আদালতের চোখে না পড়লেও ইউনিভার্সাল মাইন্ডের ক্যামেরা কোনও ভুল করেনি। ইয়োর গেম ইজ আপ অঞ্জন। নাউ বি প্রিপেয়ার্ড ফর দা পানিশমেন্ট।'

অন্য সময়ে হলে শাস্তির কথায় নিশ্চয়ই ভয় পেতাম। কিন্তু একটা বুজরুকের কথায় ভয় পাবার কী আছে! মেয়েটা হয় পাগল ন তো বুজরুক। ঠাট্টার ভঙ্গিতে বললাম, 'পানিশমেন্ট দেবেন? কী পানিশমেন্ট, শুনি?'

'যে পানিশমেন্ট দেব তা পৃথিবীর কোনও আদালত আপনাকে দিতে পারবে না। তার নাম কর্মফল। কর্মের সঙ্গে তার ফলের ইকুয়েশনটা আপনাদের দেশের প্রাচীন মুনিঋষিরা খুব ভালো বুঝেছিলেন। আমি আপনাকে সেই কর্মফল দেব।' মেয়েটা কবজি বাঁধা সুদৃশ্য ঘড়ির পাশের একটা বোতামে চাপ দিল। দেখলাম ডায়ালের কাচটা সরে গেল। টিক টিক শব্দ বন্ধ হয়ে ভোজবাজির মতো নিস্তব্ধ হলো চারপাশ। আর দুটি কাঁটার সংযোগবিন্দু থেকে নীল রঙের গ্যাসের একটা কুণ্ডলী বেরিয়ে এসে মিলিয়ে গেল আমার শরীরের মধ্যে আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সীমাহীন এক আতঙ্ক জাপটে ধরল আমাকে। চিৎকার করে বললাম, 'এসব আপনি কী করছেন? এটা কী গ্যাস? আমার এত ভয় করছে কেন?'

আজকের পর ভয় ছাড়া আপনার আর কোনও অনুভূতি থাকবে না।'

ভারী কাপটা ছুঁড়ে মারতে ইচ্ছে করছিল। মনে হচ্ছিল দুটো খুন করেছি, তিনটে করলেও কিছু যাবে আসবে না। কিন্তু কিছু করার আগেই রেস্তোরাঁর আলোগুলো দপদপ করতে করতে নিভে গেল। চারপাশে নিরেট অন্ধকার। চশমাটা টেবিলে খুলে রেখেছিলাম। অন্ধের মতো হাতড়াতে লাগলাম পরার

জন্য। কিন্তু আমার হাত লেগে চশমাটা মাটিতে পড়ে গেল। কাচ ভাঙার বিকট শব্দ শুনে মনে হলো সারা পৃথিবীর সব কাচ কেউ একসঙ্গে ভাঙছে। আর তারপরই অন্ধকারে ভেসে উঠল দুটো শরীর। রুদ্র আর সঙ্ঘমিত্রার শরীর। থ্যাঁতলানো মাথায় শুয়ে আছে দুজনে। ঘিলু বেরিয়ে এসেছে অনেকখানি। চোখদুটো ঝুলে পড়েছে নাকের কাছে। নাম-না-জানা কী একটা পোকা কিলবিল করছে চোখের মণিগুলো খুবলে খুবলে খাবে বলে। কর্দমাক্ত নোংরা জল জমেছে মুখের ভেতর। একটা সরু লিকলিকে ব্যাঙাচি তিড়িং করে লাফ দিয়ে বেরিয়ে গেল মুখের ভেতর থেকে। আমার বমি উঠে আসছে। মারাত্মক ভয় করছে। হায় ঈশ্বর এ আমি কী করলাম! যারা আমাকে বিশ্বাস করেছিল তাদের খুন করলাম! এই বীভৎস মৃত্যুর ছবিই কি এখন থেকে আমার চোখের সামনে বারবার ভেসে উঠবে? এই কি আমার কর্মফল?

কথা বলার শক্তি আমার ছিল না। তবুও কোনওরকমে হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম, 'প্লিজ এত নিষ্ঠুর হবেন না। আমি কথা দিচ্ছি, এখনই পুলিশের কাছে গিয়ে স্যারেন্ডার করব। আইন যে শাস্তি দেয় মাথা পেতে নেব। কিন্তু প্লিজ আপনি এই শাস্তি ফিরিয়ে নিন।'

কেউ সাড়া দিল না। অনেকবার মেয়েটার নাম ধরে ডাকলাম। কাকুতিমিনতি করলাম। কিন্তু কেউ টু শব্দ করল না। যেন আমার উলটোদিকের চেয়ারে কেউ নেই। কেউ ছিলও না। কিছুক্ষণ পর রেস্তোরাঁর আলোগুলো জ্বলে উঠল। লাল নীল সবুজ হলুদ সব আলো। দেখলাম সত্যিই আমার উলটোদিকের চেয়ারে কেউ নেই। মেয়েটা কখন চলে গেছে বুঝতে পারিনি।

বেয়ারা এসে একটা ফোল্ডার এগিয়ে দিয়ে বলল, 'স্যার আপনার বিল।'

বিল দেখে আমি অবাক। মাত্র একটা কফির বিল করেছে ম্যানেজার—'একটা কফির বিল কেন? আমি তো দুটো কফির অর্ডার করেছি।'

বেয়ারা একগাল হেসে বলল, 'না স্যার আপনি একটা কফিই অর্ডার করেছেন। দুটো করলে টেবিলে দুটো কাপ থাকত। দেখুন, একটা আছে। আমাদের কোনও ভুল হয়নি।

কফির দাম নিয়ে বেয়ারা চলে গেল। আমি হতভম্বের মতো বসে রইলাম। □

Kedia Fabrics

Kamal Kumar Kedia

Mfg. & Dealer of Fancy Sarees

160, Jamunalal Bazaz Street, 2nd Floor,

Kolkata-700 007 (s) 2272-5487

Mob : 9331105467

ORIENT MOVIETONE CORPORATION LIMITED

CIN : L92142WB1946PLC013138

A World-class (B+G+7 Storied) office building, in the heart of the central business district, on 27, Bentinck Street, Kolkata- 700 001

By

M K GROUP

Contact no. 033-32901999

www.mkpoint.in

Regd. office :

9A, Esplanade East, Kolkata - 700 069

Phone : 2210-8763, 2248-3613

Fax : 033-2243-0751

E-mail : info@mkgroupindia.biz

বঙ্গগৌরব মহারাজা শশাঙ্ক

গোপাল চক্রবর্তী

ভারতবর্ষ তথা বঙ্গদেশের ইতিহাসে পূর্বভারতে শশাঙ্কের উত্থান এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সমসাময়িক মুদ্রা, লিপি, বিদেশি পরিব্রাজকদের ভ্রমণবৃত্তান্ত এবং নির্ভরযোগ্য সাহিত্যগ্রন্থ থেকে শশাঙ্কের জীবনবৃত্তান্ত সম্পর্কে মূল্যবান তথ্যাদি পাওয়া যায়। সমসাময়িক কোনো কোনো সূত্রে শশাঙ্ক সোমদত্ত নামেও অভিহিত হয়েছেন। বঙ্গদেশীয় ঐতিহাসিকগণ শশাঙ্ককে বাঙালি হিসাবে পরিচিত করতে আগ্রহী। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর 'বাংলাদেশের ইতিহাস' গ্রন্থে শশাঙ্ককে 'বাঙালী রাজা' বলে উল্লেখ করেছেন। তবে প্রাচীন তথ্য প্রমাণের উপর ভিত্তি করে বলা যায় শশাঙ্ক সম্ভবত ওড়িশার অধিবাসী ছিলেন। তবে তিনি বাঙ্গলার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জয় করেন এবং বিজয়ের পর কর্ণসুবর্ণে রাজধানী স্থাপন করে ছিলেন।

শশাঙ্কের নামাঙ্গিত মুদ্রাসমূহ উত্তর ওড়িশা, গঙ্গাসাগরের তীরবর্তী এবং ভাগীরথীর মোহানা অঞ্চলে পাওয়া গেছে। এই সকল মুদ্রার একদিকে শিব ও বৃষের মূর্তি এবংঅন্য দিকে গজ-লক্ষ্মী মূর্তিও শ্রীশশাঙ্কের নাম খোদিত। মুদ্রাগুলি গুপ্তযুগের মুদ্রার অনুকরণে নির্মিত।

শশাঙ্কের রাজত্বকালে প্রচারিত তিনটি তাম্রশাসন মেদিনীপুর অঞ্চলে পাওয়া গেছে । এই তাম্রশাসন সমূহের বিবরণ থেকে মহারাজ শশাঙ্কের রাজনৈতিক জীবনের ক্রমপর্যায় সম্বন্ধে ধারণা করা যায়।

শশাঙ্কের প্রথম পরিচয় মহাসামন্ত রূপে। তবে কোন নৃপতির তিনি মহাসামন্ত ছিলেন তা নিঃসংশয়ে বলা কঠিন, তবে মনে হয় মহাসেনগুপ্ত বা পরবর্তী মালবাধিপতি দেবগুপ্ত তাঁর অধিরাজ ছিলেন। পুষ্যভুতিরাজ প্রভাকর বর্ধনের পুত্র রাজ্যবর্ধন কর্তৃক দেবগুপ্তের পরাজয়ের পর শশাঙ্ক দেবগুপ্তের দায়িত্ব ও কর্তব্যভার (মৌখরী-পুষ্যভূতি মৈত্রীবন্ধনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম) নিজের স্কন্ধে তুলে নিয়ে ছিলেন। এই ঘটনা থেকে মনে হয় শশাঙ্ক মগধ-মালবাধিপতি গুপ্তরাজাদেরই মহাসামন্ত ছিলেন। তবে এই তথ্য নিঃসংশয় যে, ৬০৬-৬০৭ খ্রিস্টাব্দের আগে কোনো সময়ে শশাঙ্ক গৌড়ের স্বাধীন নরপতি রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন এবং কর্ণসুবর্ণে (মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙ্গামাটির নিকট কানসোনা) নিজ রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন ।

শশাঙ্কের রাজত্বের অষ্টম বর্ষে উৎকীর্ণ মেদিনীপুর তাম্রশাসন অনুসারে তিনি দণ্ডভুক্তির অধিপতি শুভকীর্তির অধীনে একজন আঞ্চলিক প্রশাসক ছিলেন। তাঁর শাসনকেন্দ্র ছিল তবীর নামক স্থানে। রাজত্বের ১৯তম বর্ষে উৎকীর্ণ মেদিনীপুর তাম্রশাসনে শাশাঙ্ক দণ্ডভুক্তি ও উৎকল রাজ্যের অধিপতি শ্রীসামন্ত মহারাজা সোমদত্ত নামে উল্লিখিত হয়েছেন। এ থেকে ধারণা করা যায় রাজত্বের ৮ম ও ৯তম বর্ষে মধ্যবর্তী কোন এক সময়ে রাজা শশাঙ্ক দণ্ডভুক্তি ও উৎকলের রাজপদ লাভ করেছিলেন। ৬১৯ খ্রিস্টাব্দে উৎকীর্ণ গঞ্জাম তাম্রশাসনের সাক্ষ্যে দেখা যায় যে ওই সময়ে

কঙ্গোদের শাসনকর্তা শৈলবংশীয় মহারাজ মহা সামন্ত শ্রীমাধবরাজ শশাঙ্ককে অধিরাজরূপে স্বীকার করে নিয়েছেন। প্রাচীনকালে কঙ্গোদের ভৌগোলিক সীমানা সুনির্দিষ্টভাবে নিরূপণ করা সম্ভব না হলেও মোটামুটি বলা যায় যে চিল্কা হ্রদ পার্শ্বস্থ এলাকা এমনকী গঞ্জাম জেলার উত্তরাংশ কঙ্গোদ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং কঙ্গোদ রাজ্যের উপরও শশাঙ্কের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কঙ্গোদ, উৎকল ও দণ্ডভুক্তির শাসনকর্তা হলেও শশাঙ্ক তখনও পর্যন্ত সার্বভৌম ক্ষমতাসূচক কোনও পদবি গ্রহণ করেননি।

শশাঙ্কের এগরা তাম্রশাসনকে তাঁর রাজত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিলরূপে মনে করা যেতে পারে। এই তাম্রশাসনে তিনি স্বাধীন ও সার্বভৌমত্বসূচক পরম-দৈবত পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমমাহেশ্বর উপাধি গ্রহণ করেছেন এবং সোমদত্তের পরিবর্তে শ্রীশশাঙ্কদেব নাম উৎকীর্ণ করিয়েছেন এই তাম্রশাসনে। আলোচ্য তাম্রশাসনে জয়স্কন্ধাবার বা রাজধানীর উল্লেখ না থাকলেও মনে করা যায় যে মহারাজ শশাঙ্কের শাসনকেন্দ্র তবীরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কারণ তাম্রশাসনটি মেদিনীপুর অঞ্চলে পাওয়া গেছে।

রোহতাসগড় দুর্গ

উৎকল ও দণ্ডভুক্তির উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করার পর মহারাজ শশাঙ্ক আরও উত্তরদিকে রাজ্য সম্প্রসারণে উদ্যোগী হন। কালক্রমে তিনি বর্ধমান ভুক্তি ও ঔদম্বরিক বিষয় জয় করেন। সম্ভবত এই বিজয়ের পর তিনি রাঢ় অঞ্চলে অবস্থিত কর্ণসুবর্ণে রাজধানী স্থাপন করেন। স্মরণ থাকতে পারে যে কর্ণসুবর্ণ পূর্ববর্তী শাসক জয়নাগেরও রাজধানী ছিল। সম্ভবত, জয়নাগের শাসনের অবসানের অল্পকালের মধ্যেই ওই অঞ্চলে শশাঙ্কের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

সম্রাট হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্ট মহারাজ শশাঙ্ককে 'গৌড়াধিপতি' বলে উল্লেখ করেছেন। 'আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পে' উল্লেখ আছে পুণ্ড্রনগর শশাঙ্কের অধিকারভুক্ত ছিল। এইসব বিবরণ যদি সঠিক ধরা হয় তবে মনে করা যেতেই পারে যে শশাঙ্ক গঙ্গানদী অতিক্রম করে বরেন্দ্রর একটি বিস্তৃত অঞ্চল নিজ রাজ্যভুক্ত করেছিলেন। শশাঙ্ক কেন গৌড় কিংবা পুণ্ড্রনগরে রাজধানী স্থাপন করলেন না তা স্পষ্ট নয়। সম্ভবত গৌড়ের সিংহাসনে তিনি তাঁর অনুগত কোনো ব্যক্তিকে বসিয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ অঞ্চলে তিনি প্রভুত্ব স্থাপন করেছিলেন বলেই তাকে গৌড়াধিপতি অভিধায় ভূষিত করা হয়েছে।

দক্ষিণ বিহারের রোটাসগড়ে শশাঙ্কের নামাঙ্কিত একটি সিলমোহর যুক্ত লিপি পাওয়া গেছে। এই লিপিতে 'শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্কদেবস্য' এই কথাগুলি উল্লেখ থাকায় প্রমাণিত হয় যে ওই অঞ্চল তাঁর অধিকারভুক্ত ছিল।

এই সকল তথ্য প্রমাণ অনুসারে এই সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে যে, উত্তরে মালদহ থেকে দক্ষিণে গঞ্জাম ও পূর্বে ভাগীরথী করতোয়ার তীর থেকে পশ্চিমে শোননদের তীর পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগ মহারাজ শশাঙ্কের অধিকারভুক্ত ছিল। মহারাজ শশাঙ্কের রাজধানী একাধিকবার স্থানান্তরিত হয়েছিল। তাঁর রাজত্বের প্রথমদিকের তাম্রলিপি দুটি তবীর নামক স্থান থেকে পাওয়া গেছে। সম্ভবত তবীর দণ্ডভুক্তির শাসনকেন্দ্র ছিল। চৈনিক পরিব্রাজক য়ুয়ান চুয়াঙের মতে রক্তমৃত্তিকা নামক বিহারের নিকটে অবস্থিত কর্ণসুবর্ণ শশাঙ্কের রাজধানী ছিল। রক্তমৃত্তিকা বর্তমানে রাঙামাটি নামে পরিচিত। মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর শহরের আট কিলোমিটার

দক্ষিণে রাঙামাটি অবস্থিত। সম্প্রতি খননকার্যের ফলে রক্তমৃত্তিকা বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। মহারাজ শশাঙ্ক উত্তরদিকে ঔদম্বরিক বিষয় পর্যন্ত রাজ্য জয় করে ঔদম্বরিক বিষয়ের শাসনকেন্দ্র কর্ণসুবর্ণে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন।

প্রাচীন তন্ত্রসমূহে কর্ণসুবর্ণের উল্লেখ রয়েছে। গৌড় ও মগধের অধিকার নিয়ে মৌখরীদের সঙ্গে গুপ্তদের একটা সংগ্রাম কয়েক পুরুষ ধরে চলে আসছিল। দুই পুরুষ সংগ্রাম চলার পর বোধহয় মহাসেন গুপ্তের পিতা আপন শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নিজকন্যা মহাসেনগুপ্তাকে পুষ্যভুতিরাজ প্রভাকর বর্ধনের সঙ্গে বিবাহ দেন। এই মৈত্রীবন্ধনের কারণে কিছুদিন মৌখরী বিক্রম শান্ত ছিল। অবন্তী বর্মার পুত্র গ্রহবর্মা যখন মৌখরীবংশের রাজা তখন মালবের সিংহাসনে রাজা দেবগুপ্ত আসীন। পক্ষ প্রতিপক্ষের রূপ তখন বদলে গেছে। মগধ ইতিমধ্যে গুপ্তদের হস্তচ্যুত। মালবরাজ মহাসেন গুপ্তের দুইপুত্র কুমার ও মাধব প্রভাকর বর্ধনের প্রাসাদে আশ্রিত। মালবের অধিপতি তখন দেবগুপ্ত। দেবগুপ্তের মৈত্রীবন্ধন গৌড়াধিপতি শশাঙ্কের সঙ্গে। মঞ্জুশ্রী মূলকল্প গ্রন্থের মতে শশাঙ্ক ইতিমধ্যে বারাণসী পর্যন্ত তাঁর আধিপত্য বিস্তার করেছেন। অন্যদিকে গ্রহবর্মাও প্রভাকর বর্ধনের কন্যা রাজ্যবধর্ম এবং হর্ষবর্ধনের ভগ্নী রাজ্যশ্রীকে বিবাহ করে পুষ্যভূতি বংশের সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হন। বৃদ্ধ প্রভাকর বর্ধনের অসুস্থতা ও মৃত্যুর সুযোগে মালবরাজ দেবগুপ্ত মৌখরীরাজ গ্রহবর্মাকে আক্রমণ ও হত্যা করে রানি রাজ্যশ্রীকে কনৌজে কারারুদ্ধ করেন। বাণভট্টের গদ্যকাব্য 'হর্ষচরিত' অনুসারে মনে হয় প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যু এবং গ্রহবর্মার মৃত্যু একই দিনে হয়েছিল। তারপর দেবগুপ্ত যখন স্থানেশ্বরের দিকে অগ্রসরমান, মিত্র শশাঙ্কও তখন দেবগুপ্তের সহায়তার জন্য কনৌজের দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু শশাঙ্ক দেবগুপ্তের সৈন্যদের সঙ্গে মিলিত হবার আগেই নব রাজ্যাভিষিক্ত রাজ্যবর্ধন দেবগুপ্তকে আক্রমণ, পরাজিত ও নিহত করেন। তারপর ভগ্নী রাজ্যশ্রীকে উদ্ধারের জন্য কনৌজের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথে শশাঙ্ক রাজ্যবর্ধনকে পরাজিত ও নিহত করেন। বাণভট্ট ও চৈনিক পর্যটক য়ুয়ান্ চুয়াঙ বলছেন শশাঙ্ক রাজ্যবর্ধনকে বিশ্বাসঘাতকতা করে হত্যা করেছিলেন। অন্যদিকে হর্ষবর্ধনের লিপির সাক্ষ্য এই যে রাজ্যবর্ধন সম্ভবত কোনো প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে তাঁব শত্রু শিবিরে গিয়েছিলেন এবং সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। মঞ্জুশ্রীকল্পের গ্রন্থকারের মতে রাজ্যবর্ধন নগ্নজাতির কোনো রাজআততায়ী কর্তৃক নিহত হয়েছিলেন। বাণভট্ট এবং য়ুয়ান চুয়ান দুজনেই শশাঙ্কের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন, তাছাড়া দুজনেই রাজ্যবর্ধনের ভ্রাতা হর্ষবর্ধনের অনুগৃহীত ছিলেন। অতএব তাঁদের সাক্ষ্য কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য তা বলা কঠিন। বাণভট্ট রচিত হর্ষচরিতের টীকাকারগণ ঘটনাটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন যে রাজ্যবর্ধনের বিশ্বাস জন্মানোর জন্য শশাঙ্ক তাঁর সঙ্গে স্বীয় কন্যার বিবাহ দিয়ে মৈত্রীবন্ধন দৃঢ়তর করার প্রস্তাব করেন এবং এইভাবে

রাজ্যবর্ধনকে প্রলুব্ধ করে স্বগৃহে আনয়ন করেন। রাজ্যবর্ধন যখন আহারে প্রবৃত্ত তখন অনুচরবর্গের সঙ্গে তাঁকে হত্যা করা হয়। য়ুয়ান চুয়ানের ভ্রমণ বৃত্তান্তের একস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে যে শশাঙ্কের মন্ত্রীবর্গ রাজ্যবর্ধনকে এক সভায় আমন্ত্রণ করে এনে তাঁকে হত্যা করেন। ভ্রমণ বৃত্তান্তের অপর এক স্থানে য়ুয়ান চুয়ান রাজ্যবর্ধনের এইরূপ পরিনতির জন্য তাঁর মন্ত্রীদের দায়ী করে লিখেছেন যে রাজ্যবর্ধনের মন্ত্রীগণের দোষেই তিনি শত্রুহস্তে নিহত হয়েছিলেন। এই বিবরণের ভিত্তিতে বলা যায় যে রাজ্যবর্ধনের অনুচরদের মধ্যে কয়েকজন বিশ্বাসঘাতক ছিলেন। এসব কথা যদি সত্য হয় তা হলে বলতে হবে যে বিশ্বাসঘাতকতা করে রাজ্যবর্ধনকে হত্যা করা শশাঙ্কের চরিত্রে দু রপনেয় কলঙ্ক লেপন করেছে। উৎকলাধিপতি শুভকীর্তির মৃত্যুর সঙ্গে যদি তিনি জড়িত থাকেন তবে বলতে হয় যে ষড়যন্ত্রমূলক রাজ হত্যায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর শশাঙ্ক আর স্থানেশ্বরের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন বলে মনে হয় না। কারণ মৌখরী রাজবংশের

রক্তমৃত্তিকা বিহারের ধ্বংসাবশেষ

পরাজয়ের আর কিছু বাকি ছিল না। হর্ষবর্ধন রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েই তৎক্ষণাৎ সসৈন্যে গৌড়রাজ শশাঙ্কের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। বাণভট্টের মতে রাজ্যবর্ধনের হত্যার সংবাদ শুনে হর্ষবর্ধন শপথ করেছিলেন যে যদি নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে তিনি পৃথিবী গৌড়শূন্য করতে না পারেন তবে অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন দেবেন। অতঃপর বিশাল বাহিনী নিয়ে গৌড়াধিপতি শশাঙ্কের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। পথে কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও মৈত্রীবন্ধন সংবাদবাহক ভণ্ডীর মুখে রাজ্যবর্ধন হত্যার বিস্তৃততর বিবরণ ও বিন্ধ্যপর্বতে রাজ্যশ্রীর পলায়ন বৃত্তান্তপ্রাপ্তি, সসৈন্যে ভণ্ডীকে গৌড়রাজ শশাঙ্কের বিরুদ্ধে অভিযানে পাঠিয়ে হর্ষবর্ধনের ভগ্নী রাজ্যশ্রীর উদ্ধারে গমন, অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতি দেবার পূর্বে রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার এবং পরে গঙ্গাতীরে ভণ্ডীপরিচালিত সেনাদলের সঙ্গে পুনর্মিলন। এইসব কাহিনি বাণভট্টের 'হর্ষচরিতে' বর্ণিত হয়েছে।

আর্যমঞ্জুশ্রী মুলকল্পে হর্ষবর্ধনের সঙ্গে শশাঙ্কের সংঘর্ষের উল্লেখ আছে। আর্যমঞ্জুশ্রীর বর্ণনায় তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থার প্রতিফলন ঘটেছে। তবে এই বর্ণনানুযায়ী হর্ষবর্ধন পুণ্ড্রনগরীর অভিমুখে অভিযান প্রেরণ করলেও তাঁর সঙ্গে শশাঙ্কের কোনো সংঘর্ষ হয়নি। হর্ষবর্ধনের সেনাবাহিনী পুন্ড্রনগরীতে পৌঁছায়নি। তবে কিছু সৈন্য কামরূপ বাহিনীতে যোগদান করেছিল।

চৈনিক পরিব্রাজকদের বিবরণে এই বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। য়ুয়ান চুয়ান হর্ষবর্ধন কর্তৃক শশাঙ্কের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের উল্লেখ করেননি, তবে হর্ষবর্ধন প্রচুর সেনা নিয়ে পূর্বসীমান্তে অবস্থান করেছিলেন। অপর একজন চৈনিক পরিব্রাজক সি উই কি-এর বিবরণে হর্ষবর্ধন কর্তৃক শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার উল্লেখ আছে কিন্তু উভয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের উল্লেখ নেই। শে কিয়া কোং লিখেছেন যে হর্ষবর্ধন এবং কামরূপ অধিপতি (ভাস্করবর্মন) সেই বিধর্মী রাজা শশাঙ্ক, তার সেনাপতি এবং অনুচরদের ধ্বংস করেন। এই বিষয়ে কো কিয়ার বিবরণই সিদ্ধান্তমূলক বলে মনে করা যেতে পারে। চৈনিক বিবরণকারীদের বর্ণনানুসারে হর্ষবর্ধনের মিত্র ভাস্করবর্মনের সঙ্গে এক যুদ্ধে শশাঙ্ক পরাজিত ও সম্ভবত নিহত হয়েছিলেন। তাঁর রাজধানী কর্ণসুবর্ণ

কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুক্‌মী) প্রাইভেট লিমিটেড

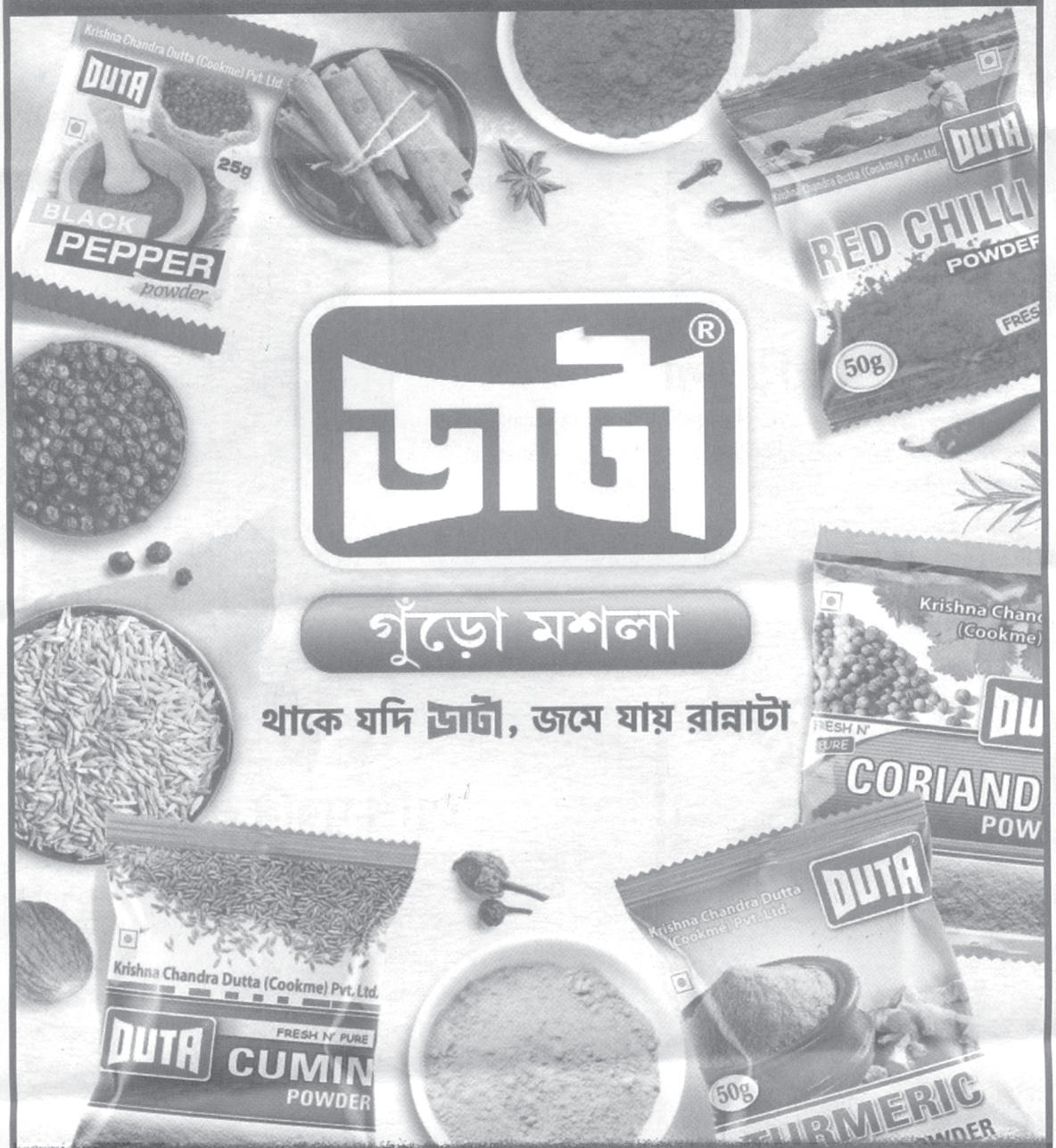

কেনার সময় অবশ্যই
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুক্‌মী) প্রাইভেট লিমিটেড
নাম দেখে তবেই কিনবেন

207 Maharshi Debendra Road, Kolkata 700007,
Phone: 033 2259 0863 / 1796 / 4112 / 5548
email: dutaspice@gmail.com, website: www.dutaspices.com
www.facebook.com/duta.rannaghar
www.youtube.com/c/duta rannagharbengalirecipe

সম্রাট শশাঙ্কের মুদ্রা

ভাস্করবর্মনের দ্বারা বিজয় ও অধিকৃত হলো।

হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্ট তাঁর রচিত 'হর্ষচরিতে' শশাঙ্কের চরিত্রের উপর নানাভাবে কালিমা লেপন করেছেন। বাণভট্ট শশাঙ্ককে গৌড়াধম, গৌড়ভুজঙ্গ ইত্যাদি নামে অভিহিত করেছেন। বাণভট্ট কর্তৃক এইরূপ উক্তি অস্বাভাবিক নয়, কারণ শশাঙ্ক রাজ্যবর্ধনের হত্যাকারী এবং হর্ষবর্ধনের শত্রুপক্ষীয় ছিলেন।

চৈনিকসূত্রে মহারাজ শশাঙ্ককে বৌদ্ধধর্ম বিদ্বেষীরূপে চিত্রিত করা হয়েছে। য়ুয়ান চুয়ানের মতে ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দের অল্পকাল পূর্বে শশাঙ্ক গয়ায় যে অশ্বত্থবৃক্ষের নীচে ভগবান বুদ্ধ বোধি লাভ করেছিলেন সেই বোধিবৃক্ষ ছেদন করেছিলেন এবং নিকটবর্তী মন্দির থেকে বুদ্ধমূর্তি অপসারণ করেছিলেন।

চৈনিক ভ্রমণ বৃত্তান্তে মহারাজ শশাঙ্ককে যেভাবে বৌদ্ধধর্ম বিদ্বেষী রূপে বর্ণনা করা হয় আদৌ তিনি সেইরূপ ছিলেন তা মনে করার কোনো কারণ নেই। চৈনিক ভ্রমণবৃত্তান্ত সমূহে কোথাও শশাঙ্ককে নিজ রাজ্যে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উপর নিপীড়ন চালানোর কথার উল্লেখ নেই। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর য়ুয়ান চুয়ান তাম্রলিপ্ত কর্ণসুবর্ণ পুণ্ড্রবর্ধন প্রভৃতি শশাঙ্কের অধীনস্থ রাজ্য সমূহে পরিভ্রমণ করেছিলেন। তিনি এই সমস্ত অঞ্চলে বহু বৌদ্ধবিহার এবং হাজার হাজার আবাসিক বৌদ্ধভিক্ষু দেখেছিলেন। শশাঙ্ক যদি নিজ রাজ্যে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের উপর নিপীড়ন চালাতেন তবে য়ুয়ান চুয়ান তা নিশ্চয়ই উল্লেখ করতেন। য়ুয়ান চুয়ান কর্ণসুবর্ণের নিকটে রক্তমৃত্তিকা (রাঙামাটি) বিহার এবং পুণ্ড্রনগরের নিকটবর্তী পো শি পো বিহারের (বসুবিহার) শিল্পসৌকর্য এবং আবাসিক ভিক্ষুদের ভরণপোষণ ব্যবস্থার ভুয়সী প্রশংসা করেছেন। মহারাজ শশাঙ্ক শৈবধর্মের অনুসারী ছিলেন। অপরদিকে সম্রাট হর্ষবর্ধন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হলেও শিবের ভক্ত ছিলেন। সুতরাং হর্ষবর্ধন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হওয়ার কারণে শশাঙ্ক তাঁর রাজ্যে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের উপর নির্যাতন করবেন এইরূপ সিদ্ধান্ত একেবারেই অমূলক। হয়তো শশাঙ্কের মগধ অভিযান কালে বৌদ্ধদের তীর্থস্থান বুদ্ধগয়ার কিছু ক্ষতি হতে পারে তবে তা শশাঙ্কের নির্দেশেই হয়েছে তা নিশ্চিত করে বলা যায় না।

শশাঙ্কের সিলমোহর

৬৩০–৩৮ খ্রিস্টাব্দের কিছু পূর্বে শশাঙ্কের মৃত্যু হতে পারে। কারণ ওই সময় য়ুয়ান চুয়ান মগধ ভ্রমণে এসে শুনলেন কিছুদিন আগেই শশাঙ্ক বুদ্ধগয়ার বোধিদ্রুম কেটে ফেলেছেন এবং স্থানীয় মূর্তিটি নিকটস্থ এক মন্দিরে সরিয়ে রেখেছেন। এই পাপেই নাকি কুষ্ঠজাতীয় কোনও ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে অল্পদিনের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। মঞ্জুশ্রীমূলকল্প গ্রন্থেও এই

গল্পের পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। কিন্তু এই গল্প আসলে কতটা বিশ্বাসযোগ্য তা বলা কঠিন।

শশাঙ্ক কীর্তিমান নরপতি ছিলেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কামরূপরাজ ভাস্করবর্মা এবং হর্ষবর্ধনের সম্মিলিত শত্রুতা সত্ত্বেও মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত শশাঙ্ক যে সমগ্র গৌড়দেশ মগধ-বুদ্ধগয়া অঞ্চল এবং উৎকল ও কঙ্গোদ দেশের অধিপতি ছিলেন, তার প্রমাণ বিদ্যমান। কঙ্গোদে শৈলোদ্ভব বংশীয় অধিপতি মহারাজ মহাসামন্ত দ্বিতীয় শ্রীমাধবরাজের (৬১৯ খ্রিঃ) একটি লিপিতে মাধবরাজ শশাঙ্ককে তাঁর অধিরাজ বলে উল্লেখ করেছিলেন। অধুনা আবিষ্কৃত মেদিনীপুর (প্রাচীন নাম মিধুনপুর) লিপি দুটিতে শশাঙ্ক অধিরাজ বলে উল্লিখিত হয়েছেন। এই লিপি দুটির সাক্ষ্যে প্রমাণিত হয় দণ্ডভুক্তি দেশ শশাঙ্কের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং উৎকল দেশ দণ্ডভুক্তি বিভাগের অধীন ছিল।

মহারাজ শশাঙ্ক 'জাতীয় নায়ক' অথবা 'জাতীয় বীর' কিনা এবিষয়ে হয়তো দ্বিমত থাকতে পারে। তবে তিনি যে অজ্ঞাত কুলশীল মহাসামন্তরূপে জীবন আরম্ভ করে তদানীন্তন উত্তর-ভারতের সর্বোত্তম রাজ্যগুলির সমবেত শক্তির (কনৌজ-স্থানীশ্বর-কামরূপ মৈত্রী) বিরুদ্ধে সার্থক সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে শেষপর্যন্ত স্বতন্ত্র স্বাধীন নরপতিরূপে সুবিস্তৃত ভূভাগের অধীশ্বর হয়েছিলেন, এ তথ্যই ঐতিহাসিকদের প্রশংসিত বিস্ময় উদ্রেকের পক্ষে যথেষ্ট। পুরুষ পরম্পরা বিলম্বিত কনৌজ-গৌড়-মগধ সংগ্রাম তাঁরই শৌর্য ও বীর্যে নতুন রূপ লাভ করেছিল। সকলোত্তর পথনাথ হর্ষবর্ধনকে যদি কেউ সার্থক প্রতিরোধ প্রদান করে থাকেন তবে গৌড়াধীপ শশাঙ্ক এবং চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীই তা করেছিলেন। উত্তর ভারতের আধিপত্য নিয়ে পালরাজ ধর্মপাল-দেবপাল প্রভৃতির আমলে গৌড় কনৌজের সে সুদীর্ঘ সংগ্রাম পরবর্তী কালের বাঙ্গলার রাষ্ট্রীয় ইতিহাসকে উজ্জ্বল ও গৌরবান্বিত করেছে, তার প্রথম সূচনা শশাঙ্কই করেছিলেন এবং তিনিই সর্বপ্রথম বঙ্গদেশকে উত্তর ভারতের রাষ্ট্রীয় রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ করালেন। বাণভট্ট, য়ুয়ান চুয়ান, মঞ্জুশ্রীমূলকল্পের গ্রন্থকার যদি শশাঙ্কের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে থাকেন তার মূলে ছিল ঈর্ষা ও হিংসা এমন মনে করা অসঙ্গত নয়।

বঙ্গাব্দের সূচনা শশাঙ্ক করেছিলেন এমন একটি মত প্রচলিত আছে। শশাঙ্কের প্রথম সিংহাসনে আরোহণের দিন স্মরণীয় করে রাখার জন্য একটি নতুন বছরের সূচনা হয়েছিল এই যুক্তি একেবারে অবান্তর নয়। আকবরের ফসলি সনের বহুল চর্চায় এই অধ্যায়টি চাপা পড়ে গিয়েছিল।

মহারাজ শশাঙ্ক ছিলেন বহুগুণের ধারক। মেদিনীপুর তাম্রশাসন কারের বর্ণনানুসারে 'সেই পরম গুণবান সামন্ত মহারাজ শ্রী সোমদত্ত উৎকল দেশের সহিত সংযুক্ত দণ্ডভুক্তি প্রদেশ শাসন করিয়াছেন। সোমদত্তের সাধুতার সংস্পর্শে কলির পাপহুংকার বিদূরিত হইয়াছে। সত্য, শৌর্য, অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণতা, রূপ এবং বিদ্যা প্রভৃতি পাঁচটি গুণ পৃথক পৃথক ভাবে যুধিষ্ঠিরাধি পঞ্চপাণ্ডবে অবস্থিত, কিন্তু সোমদত্তের মধ্যে সেই পঞ্চগুণের একত্র সমাবেশ দেখা যায়। তাম্রশাসনে বর্ণনার অতিরঞ্জিত অবশ্যই আছে কিন্তু ব্যক্তিগত গুণাবলি যে শশাঙ্কের প্রশাসনিক কৃতিত্বের ভিত্তি রচনা করেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।'

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১। হর্ষচরিত—বানভট্ট
২। বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ)—রমেশচন্দ্র মজুমদার
৩। বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)—নীহার রঞ্জন রায়
৪। বাংলার ইতিহাস—সুনীতি ভূষণ কানুনগো
৫। গৌড় রাজমালা—রমাপ্রসাদ চন্দ

With Best Compliments From -

W L

Willowood Chemicals Private Limited

নাথুরামের বিচার
এক অন্তহীন কোর্টরুম ড্রামা

সুজিত রায়

১৪ নভেম্বর, ১৯৪৯। রাত ৮টা।

জেলার অর্জুন দাস এলেন নাথুরাম গডসের কনডেমড সেলে। হালকা হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে গম্ভীর নাথুরামকে জিজ্ঞেস করলেন— ''বলুন, আপনার জন্য কী করতে পারি?

নাথুরাম শান্ত সমাহিত দৃষ্টিতে তাকালেন অর্জুন দাসের মুখের দিকে। তারপর গম্ভীর স্বরেই বললেন ধীরে ধীরে, ''শ্রীমানজী, ফাঁসির মঞ্চ নিয়ে আমি ভাবছিই না। তবে ঝুলায় ঝুলে পড়ার আগে আমার এক কাপ কফি চাই-ই চাই। বলে হা... হা... হা... করে অট্টহাসিতে ফেলে পড়লেন নাথুরাম। অর্জুন দাসের ঠোঁটে তখন হাসির রেখা নেই বিন্দুমাত্র। নীরবে চোখের জল মুছে বেরিয়ে গেলেন কনডেমড সেল থেকে।

কয়েক ঘণ্টা আগেই এসেছিলেন ঘনিষ্ঠজনেরা শেষ বারের মতো দুই ফাঁসির আসামির সঙ্গে দেখা করতে। গান্ধী হত্যার অপরাধে দণ্ডিত নাথুরাম গডসে আর নারায়ণ আপ্তে। একজন আত্মীয় নাথুরামকে জিজ্ঞেস করলেন—

''প্রথমে দেহভস্ম হরিদ্বারের গঙ্গা কিংবা প্রয়াগের ত্রিবেণী সঙ্গমে অথবা নাসিকে গোদাবরীতে বিসর্জন দেওয়ার কথা। কিন্তু তুমি সিন্ধু নদকে বেছে নিলে কেন?

নাথুরাম হেসে উঠলেন। রীতিমতো রসিকতার সুরে বললেন—

''আরে বুঝলেন না। বলেছি, কারণ সিন্ধু নদ এখনও অপবিত্র হয়ে ওঠেনি।'' এতক্ষণে হাসির হুল্লোড় উঠল কারাগারের কক্ষে। সকলেই বুঝলেন, দেশ বিভাজনের পরিপ্রেক্ষিতে সিন্ধু নদ তখন পাকিস্তানে। আর পাক সরকার কিছুতেই সেই নদে গান্ধীজীর চিতাভস্ম বিসর্জনের অনুমতি দেয়নি।

চোখের জলে ভেজা আত্মীয়দের মুখে হাসি ফুটিয়ে আধঘণ্টা বাদেই নাথুরাম আর নারায়ণ ফিরে গেলেন তাঁদের সেলে। অপেক্ষা করছিলেন বিষ্ণু কারকারে, গোপাল গডসে আর মদনলাল পাওয়া। সকলে একসঙ্গে বসলেন গীতা পাঠ করতে। সময় অল্প। তাই শেষবারের মত শ্রীকৃষ্ণের সেই অমর বাণীকে পাথেয় করে নেওয়া। চারজনে একসঙ্গে পাঠ করছেন—

'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।।'

আত্মস্থ করছেন নাথুরাম। 'মানুষ যেমন জীর্ণ পুরনো বস্তুগুলি ত্যাগ করে অন্য নতুন বস্ত্র গ্রহণ করে। সেইরূপ জীবাত্মা পুরনো শরীর ত্যাগ করে অন্য নতুন শরীর গ্রহণ করে।'

কনডেমড সেলের এক দেওয়াল থেকে আর এক দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে—

'নৈনং ছিদন্তি শস্ত্রানি নৈনং দহতি পারকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ।
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থানুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।।'

শব্দে শব্দে ছন্দে ছন্দে নিজেকে মিলিয়ে দিচ্ছেন নাথুরাম। এই আত্মাকে কোনো অস্ত্র ছেদন করতে পারে না। এই আত্মা অদাহ্য। এই আত্মা অক্লেদ্য। আকাশ একে নিজের মধ্যে সমাহিত করতে পারে না। এই আত্মা অশোষ্য, সর্বব্যাপক, অচল, স্থির এবং সনাতন।

রাত দশটা বাজল। জেলখানার বারান্দায় তখন শুধুই প্রহরীর ভারী বুটের শব্দ। জীবন্ত পৃথিবীর বুকে শেষবারের মতো ঘুমোতে টানটান হয়ে সিমেন্টের চাতালে শুয়ে পড়লেন নাথুরাম। নারায়ণ আপ্তেও।

ভোরের আলো তখনও ফোটেনি। নাথুরামের সেলে এসে হাজির বিষ্ণু, গোপাল আর মদনলাল। স্নান সেরে গীতাপাঠ। স্নিগ্ধ শরীর স্নিগ্ধ মনে ফাঁসিমঞ্চে রওনা হবার জন্য প্রস্তুতি শুরু করলেন নাথুরাম। সেলে হাজির ভাই গোপাল গডসে বললেন—''দাদা, তোমার দাড়িটা বেশ বড়ো হয়েছে। কামাবে না?'' নাথুরাম হা হা করে হেসে উঠলেন। নিজের দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন—''তোর কি মনে হয়, আমি কোনো পার্টিতে যাব বলে তৈরি হচ্ছি?''

কিছুক্ষণ বাদেই ওয়ার্ডার নাথুরামের জন্য কফি আর অন্যদের জন্য চা নিয়ে এলেন। অজুন দাসও এসেছেন দেখা করতে। নাথুরাম রোজের মতো হাসলেন। অর্জুন দাস এদিন আর হাসতে পারলেন না। জামার হাতায় আড়াল করলেন দুচোখের ভেজা পাতা। নাথুরাম হাসিমুখে বললেন—''শ্রীমানজী, আমার শেষ ইচ্ছা আপনি পূরণ করলেন এক কাপ কফি খাইয়ে। অনেক ধন্যবাদ।'' অর্জুন দাস আর নিজেকে লুকোতে পারলেন না। তাঁর দুচোখ বেয়ে নেমে এল অঝোর অশ্রুধারা।

একটু পরে.....

স্বাস্থ্য পরীক্ষা হলো। নাথুরামের শেষ উইলও সই হয়ে গেল। ঘড়িতে তখন ঠিক সকাল সাড়ে পাঁচটা।

আম্বালা জেলে হাজির হলেন জেলাশাসক নরোত্তম সেহগল। তাঁর উপস্থিতিতেই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে নাথুরাম আর নারায়ণকে। প্রকাশ্য দিবালোকে জনসমক্ষে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে গুলি করে হত্যার অপরাধে।

দুজনকেই পরিয়ে দেওয়া হলো কালো পোশাক। দুজনেই হাতে নিলেন ভগবদ্গীতা, অখণ্ড ভারতের মানচিত্র এবং ভগোয়া ধ্বজ বা কমলা রঙের পতাকা।

এবার যাত্রা শুরু। জীবন থেকে মরণের পথে। কিংবা কাল থেকে মহাকালের পথে। অন্ত থেকে অনন্তের পথে। জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে চলার দিন শেষ। ভোরের দেদীপ্যমান ধারায় শেষ পদধূলি দুই হত্যাকারীর। অথবা দুই শহিদের। নারায়ণ বললেন, নাথুরামকে—''প্রভাত সূর্য কত উজ্জ্বল দেখ পণ্ডিত।'' নাথুরাম উত্তর দিলেন, ''এ যেন স্বর্গীয় শোভা। স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যভূমে আমাদের এখনকার অবস্থানের ওপর ঝরে পড়ছে আমাদের মাতৃভূমির আশীর্বাদ।'' দুই হাত জোড় করে মাতৃভূমিকে প্রণাম করলেন তাঁরা।

আর তার পরেই....

তারপরেই বজ্রনির্ঘোষ কণ্ঠে উন্মুক্ত নীলাকাশের দিকে উন্মিলীত চক্ষে নাথুরাম গর্জে উঠলেন—''অখণ্ড ভারত অমর রহে। বন্দে মাতরম্।''

জেলের প্রাচীরবন্দি সবুজভূমি, মৃদুমন্দ বাতাস কম্পিত হয়ে উঠল। সেলের মধ্যে বন্দিরাও তখন একযোগে গর্জে উঠলেন—''অখণ্ড ভারত অমর রহে। বন্দে মাতরম্।''

গলা মেলাচ্ছেন নারায়ণ আপ্তেও। দুজনেই এগিয়ে চলেছেন শেষক্ষণের দিকে দৃপ্ত ভঙ্গীতে, পায়ে পা মিলিয়ে। ফাঁসির মঞ্চ যত নিকটবর্তী হচ্ছে, ততই দৃপ্ত হচ্ছে তাঁদের কণ্ঠস্বর। আকাশে বাতাসে মহাকাশে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে 'ওম্ ধ্বনির মন্ত্রে মাতৃবন্দনা –

'নমস্তে সদা বৎসলে মাতৃভূমে
ত্বয়া হিন্দুভূমে সুখং বর্ধিতোঽহম্।

মহামঙ্গলে পুণ্যভূমে ত্বদর্থে
পতত্বেষ কায়ো নমস্তে নমস্তে।।
বন্দে মাতরম্।'

হে মাতৃভূমি, তোমায় চিরকালের মতো প্রণাম করি। আমায় সুখের আবহাওয়ায় মানুষ করেছ তুমি হে হিন্দুদিগের ভূমি— তোমার এই ভূমি সবচেয়ে বেশি পবিত্র। তোমার জন্য আমার জীবন উৎসর্গ করছি, তোমায় প্রণাম, তোমায় প্রণাম।

ফাঁসিমঞ্চে ফাঁসিকাঠের উজ্জ্বল উপস্থিতি। দুটি ফাঁসিকাঠ থেকে ঝুলে পড়া রজ্জু থেকে ঠিকরে পড়ছে সকালের সূর্যকিরণ। আর অন্যদিকে, মাতৃবন্দনার সুরে যেন জেগে উঠছেন সিন্ধুতীরের সেইসব প্রাচীন জ্ঞানবৃদ্ধ ঋষিরা যাঁদের ছোয়ায় একদা পবিত্র হয়েছিল অখণ্ড ভারতভূমি। তাঁরাও যেন সচকিত হয়ে যাত্রার ধুনি জ্বালাচ্ছেন, মন্ত্রোচ্চারণ করছেন—''নমস্তে সদা বৎসলে মাতৃভূমে...।''

ফাঁসির মঞ্চে উঠলেন নাথুরাম। পিছনে নারায়ণ। পড়ে শোনালো হলো তাঁদের অপরাধের বিবরণ।

কিন্তু ওসবে মন নেই নাথুরামের। ফাঁসুড়ের কালো কাপড়ের টুপিতে মুখ ঢাকা পড়ার আগে নাথুরাম আরও একবার তাকালেন অর্জুন দাসের দিকে। স্মিত হেসে বললেন—''শ্রীমানজী, কফির জন্য আরও একবার ধন্যবাদ।''

দুজনের হাতই পিছমোড়া করে বাঁধা। শক্ত গিঁট দু'পায়ের বুড়ো আঙুলে একটি পাটের দড়িতে। দুজনের মস্তকই উন্নত।

ঘড়িতে ঠিক সকাল ৮টা।

জেলাশাসকের নির্দেশ পাওয়া মাত্র ফাঁক হয়ে গেল দুই মরণ পথযাত্রীর পদতল। দড়ির ফাঁস চেপে বসল গলায়, ঘাড়ে আর নিমেষে কুয়োর গভীরে ঝুলে পড়ল 'ঝুলা।'

আচমকাই ঝোড়ো হাওয়ায় মাথা ঝাঁকালো সদ্যফোটা ফুলের গাছগুলি। পাখিরা কলরব করে উঠল একসঙ্গে। নিঃশব্দে মন্ত্রধ্বনির মতো পদচারণা করে ফিরে এল সেই ' ওম্' ধ্বনি যা মহাবিশ্বের মঙ্গলধ্বনি। যেন সব ধ্বনি একত্রিত হয়ে গলা মিলিয়েছে প্রতিবাদে, প্রশংসায়। যেন সবাই মিলে গাইছে—

আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ....

লালকেল্লার গর্ভ থেকে

২৭ মে ১৯৪৮।

লালাকেল্লার অন্ধকূপের মতো নিঃসঙ্গ সেল ছেড়ে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী পরিবেষ্টিত হয়ে বেরিয়ে এলেন নাথুরাম। উন্নত মস্তক, যেন তাঁর শরীরী ভাষায় প্রতিধ্বনিত হচ্ছে—''আমি বীর— চির উন্নত মম শির।'' নাথুরাম চলেছেন আদালতের পথে যেখানে তাঁর বিচার হবে জাতির জনককে, কংগ্রেসের মহানায়ক মহাত্মা গান্ধীকে খুন করার অপরাধের।

লালকেল্লার ভিতরেই তৈরি হয়েছে আদালত। পরিমাপ ১০০ ফুট x ২৩ ফুট। লালকেল্লার মজবুত চওড়া দেওয়ালের বাইরে কাঁটাতারের বেড়া। আর তিনশোরও বেশি সশস্ত্র পুলিশের ঘেরাটোপ। জজ সাহেব বসবেন একটি উঁচু প্লাটফর্মের ওপর। তার মুখোমুখি বসার ব্যবস্থা বাদী ও বিবাদী পক্ষের আইনজীবীদের। ডানদিকে দুটি কাঠগড়া। একটি অভিযুক্তদের জন্য। অনেকখানি জায়গা জুড়ে। অন্যটি ছোট সাক্ষীদের জন্য। দর্শকাসনে আড়াইশো লোকের বসার ব্যবস্থা। ব্যবস্থা রয়েছে মাইক্রোফোনেরও।

নাথুরামের পরনে সাদা শার্ট আর সাদা পাজামা। চোখে মুখে বিবর্ণতার লেশমাত্র নেই। অন্যান্য অভিযুক্তরাও হাজির। ওরা ষড়যন্ত্রকারী। তাঁদের মধ্যেই হাজির বিনায়ক দামোদর সাভারকর। হিন্দু মহাসভার কর্মকর্তা।

প্রথম দিনের শুনানি শুরু হলো। তবে তা সীমাবদ্ধ রইল শুধুমাত্র সরকার পক্ষের প্রধান আইনজীবী সি কে দপ্তরির পেশ করা অপরাধীদের পরিচয় ও তাঁদের অপরাধের বিবরণের মধ্যেই। তারপর পরপর দুদিন ৩ জুন এবং ৪ জুন আদালত বসলেও প্রাথমিক প্রক্রিয়ার মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ রইল। বোমা ফাটল ২১ জুন যেদিন বিচারক আদলতে পৌঁছেই ঘোষণা করলেন—''গান্ধী হত্যার অন্যতম ষড়যন্ত্রকারী অভিযুক্ত রামচন্দ্র বড়গে রাজসাক্ষী হতে চেয়ে আদালতের অনুমতি প্রার্থনা করেছে। আদালত তাঁর আবেদনে সম্মতি দিয়েছে। অতএব এই মুহূর্ত থেকে শ্রীবড়গে অভিযুক্ত হিসেবে বিবেচিত হবেন না। তিনি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যপ্রমাণ হাজির করবেন। তাই তিনি আর অভিযুক্তদের কাঠগড়ায় বসবেন না। তাঁর বসার আসন নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তাঁকে কাঠগড়া থেকে নামিয়ে আনা হোক।''

বড়গে নেমে আসছেন। দেখছেন নাথুরাম, দেখছেন সাভারকরও তাঁর চশমার লেন্সের মধ্য দিয়ে। দেখছেন, অবিশ্বাসের একটি দীর্ঘ ছায়া অতিক্রম করে গেল তাঁকে। বিশ্বাসঘাতকতার ছোবল—সে বড়ো যন্ত্রণার। আর এখান থেকেই শুরু হয়েছিল গান্ধীহত্যা মামলার একটা নতুন পর্যায় যে পর্যায়টিকে 'ষড়যন্ত্র তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা' শিরোনামে পরিচিত করা যেতে পারে।

২২ জুন ১৯৪৮।

অভিযুক্তদের মধ্যে একমাত্র নাথুরামই স্বীকার করলেন দৃপ্তকণ্ঠে—''আমি স্বীকার করছি, আমিই মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করেছি।'' বাকিরা সকলেই নিজেদের নির্দোষ বলে ঘোষণা করলেন এবং সমস্ত ষড়যন্ত্রের অভিযোগও অস্বীকার করলেন।

এতৎসত্ত্বেও সি কে দপ্তরি তাঁর লক্ষ্য থেকে সরলেন না। শ্রীদপ্তরি শুরু করলেন তাঁর দীর্ঘ বক্তব্য যা পূর্ণ ছিল মহাত্মা গান্ধীর প্রশংসাধ্বনিতে আর অভিযুক্তদের জঘন্য চক্রান্ত ও হত্যার বিরুদ্ধে গলগল করে নির্গমিত বিষবাষ্পে।

—''মহামান্য আদালত, আমি আশা করি, আমায় নতুন করে ব্যাখ্যা বা পরিচয় দিতে হবে না যে গত ৩০ জানুয়ারি ১৯৪৮ তারিখে যাঁকে নৃশংসভাবে গুলি করে খুন করা হয়েছে সেই মহাত্মা

গান্ধী শুধু ভারতবর্ষেরই একজন নেতা ছিলেন না। তিনি ছিলেন গোটা বিশ্বের বরেণ্য এক রাষ্ট্রনেতা। তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছেন অহিংসার বাণী প্রচার এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব স্থাপনের স্বার্থেই। অথচ অঘটন হলো, অহিংস নীতির জন্যই তাঁকে হিংসার বলি হতে হলো। এই হত্যার ঘটনা ঘটেছে দিনের আলোয় লোকচক্ষুর সামনে। বহু মানুষ নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করেছেন এই চরম হত্যার ঘটনা। তাঁরা সকলেই দেখেছেন, নাথুরাম রিভলবার থেকে গুলি করেছেন গান্ধীজীর বুক লক্ষ্য করে। একবার নয়, একাধিকবার। তাই এই খুনের উদ্দেশ্য বিচার করাটা অত্যন্ত জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ। এই হত্যার সঙ্গে জড়িত ছিলেন আরও সাতজন, ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে, তাদেরও বিচার দরকার।.... কিন্তু আমি যে কথা বলতে চাই, তা হল নাথুরামের মনোভাব সম্পর্কে আমার ব্যাখ্যা। নাথুরামের মনোভাবটাই হলো চরম ও তীব্র শত্রুভাবাপন্ন। বৈরিতা ও দ্বন্দ্বই হলো তাঁর চরিত্রের প্রধান উপাদান। এর প্রমাণ তাঁর প্রবন্ধগুলি যা তিনি তাঁর সম্পাদিত পত্রিকায় প্রকাশ করে এসেছেন দীর্ঘকাল ধরে। আসলে নাথুরাম হিংসার পূজারি। সেই হিসেবে তাঁর চরিত্রের অভিমুখ সব সময়েই গান্ধীবিরোধী। কারণ অহিংসাবাদই ছিল গান্ধীর আদর্শ। ফলত নাথুরাম বিশ্বাস করতেন প্রত্যাঘাতের রাজনীতিতে। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত ওই প্রত্যাঘাতের মানসিকতা তাঁকে অসুস্থ করে তুলেছিল। তিনি এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন যে, গান্ধীজীকে হত্যা করা ছাড়া অন্য কোনো পথের সন্ধান তিনি পাননি। কিন্তু বিশ্বের মানুষ কী করে ভুলবে যে কোটি কোটি মানুষ গান্ধীজীর অহিংসার বাণীকে গ্রহণ করেছে। সম্মান জানিয়েছে। সহমর্মিতা জানিয়েছে। যদি নাথুরাম সত্যিই তাঁর মানসিক ভারসাম্য না হারাতেন, তাহলে তিনিও অনুধাবন করতে পারতেন যে, একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ মানুষকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিলেও তাঁর আদর্শকে হত্যা করা যায় না।"

ঠিক একইভাবে সি কে দপ্তরি অভিযোগের তির হেনেছিলেন বীর সাভারকরের দিকে। বিনায়ক দামোদর সাভারকরকে একটি চিন্তাধারার শরিক এবং হিন্দু মহাসভার সভাপতি হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিয়ে শ্রীদপ্তরি আক্রমণ হানলেন।

''সাভারকর কোনো সময়েই মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি অহিংস অথবা নরম আচরণ বরদাস্ত করেন না। যেমন করেন না মামলার মূল দুই অভিযুক্ত নাথুরাম ও নারায়ণ। রোথাইয়ের দাদার অঞ্চলের বাসিন্দা শ্রী সাভারকরের সঙ্গে এই দুই অভিযুক্তের ছিল অতি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। আমি যদি এই যোগাযোগকে এইভাবে বর্ণনা করি যে, আসলে সাভারকর হলেন নাথুরাম ও নারায়ণের গুরু, তাহলেও অতিরঞ্জন হবে না। সম্পর্কটি এতখানিই ঘনিষ্ঠ যে নাথুরাম গডসে ও নারায়ণ আপ্তের প্রকাশিত সংপাদপত্রটিও ছিল সাভারকরের আশীর্বাদধন্য। তাঁর দেওয়া আর্থিক সাহায্য নিয়েই প্রকাশিত হয়েছিল পত্রিকাটি এমনকী সংবাদপত্রটির প্রথম পৃষ্ঠায় অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে সাভারকরের ছবিও ছাপা হতো।

''সুতরাং অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেওয়া যেতে পারে, হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির ক্ষেত্রে দাদারস্থিত সাভারকরের বাড়িটি ছিল ওই বিশেষ রাজনীতির কেন্দ্রস্থল। নাথুরাম ও নারায়ণেরও তাই ওই বাড়িতে নিয়মিত যাতায়াত ছিল। এমনকী আমরা এমন প্রমাণও আদালতে পেশ করব যে, ২০ জানুয়ারি ১৯৪৮ বিড়লা হাউসে গান্ধীজীর প্রার্থনাসভায় বিস্ফোরণের কিছুদিন আগেও এরা দুজন সাভারকরের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। আমাদের কাছে এমন প্রমাণও রয়েছে যা দিয়ে আমরা প্রমাণ করে ছাড়ব যে সাভারকর শুধু গান্ধীহত্যার ষড়যন্ত্রের কথা আগেভাগে জানতেনই না, তাঁর সাহচর্য ও অনুমোদন ছাড়া এ ঘটনা ঘটানো অভিযুক্তদের পক্ষে সম্ভবই ছিল না।"

ষড়যন্ত্র তত্ত্বের চিত্রনাট্যাবলী

গান্ধীহত্যা মামলার শুনানির প্রথম পর্যায়ে সরকারি কৌসুলির এই আক্রমণাত্মক কৌশলই বুঝিয়ে দিয়েছিল আসল উদ্দেশ্য। কী সেই আসল উদ্দেশ্য?

আসল উদ্দেশ্য ছিল একটা ষড়যন্ত্র তত্ত্ব বা Conspiracy Theory প্রতিষ্ঠা করা এমনভাবে যাতে প্রমাণ করা যায়, প্রত্যক্ষভাবে জড়িত খুনি বা খুনিরা এবং ষড়ন্ত্রকারী কয়েকজন বাইরে থেকে যায়, কিছু মানুষ যারা মুখোশ পরে ষড়যন্ত্রটা চালিয়েই যায়। কিন্তু ধরা পড়ে না।

ঠিক এইভাবেই গান্ধীহত্যার পরবর্তীকালেও লালবাহাদুর শাস্ত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর পর ষড়যন্ত্রতত্ত্ব খাড়া করা হয়েছিল রাশিয়ার গোয়েন্দা বিভাগ কেজিবি-র বিরুদ্ধে। কিন্তু ধোপে টেকেনি। তদন্ত হয়নি সরকারি অনাগ্রহে কিন্তু ঘটনা পরম্পরা বুঝিয়ে দিয়েছিল—ষড়যন্ত্রটা ছিল রাজনৈতিক এবং সবটাই ভারতীয় দেশি ষড়যন্ত্র যার শিকার হয়েছিলেন ভারতের ভালোমানুষ প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী।

আরেক ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পরও ষড়যন্ত্রতত্ত্বের শরিক করা হয়েছিল মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগ সিআইএ-কে। তখন ভারতীয় মস্তিষ্ক থেকে উদ্ভূত এই তত্ত্বের বিরোধিতা করে মার্কিন হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভের সদস্য ডুগ বিড়য়টার (Doug Bereuter) এটাকে 'আজগুবি তত্ত্ব ও উদ্ভব যৌক্তিকতা' শিরোনামে নামাঙ্কিত করে বলেছিলেন—''ভারতীয়রা মনে করেন, সিআইএ রাজীব গান্ধীকে হত্যা করেছিল, কারণ তিনি খুব কঠোর মানসিকতার নেতা ছিলেন। কারণ, তাঁরই হাত ধরে ভারত সুপার পাওয়ার হয়ে ওঠার পথে পা বাড়াচ্ছিল এবং তাঁর ভূমিকা আন্তর্জাতিক মঞ্চে আমেরিকার কাছে চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠছিল।"

ভারতীয়দের এই তত্ত্বকে নস্যাৎ করে দিয়ে বিড়ায়টার বলেছিলেন, ''এরকম হাস্যকর ও দায়িত্বজ্ঞানহীন দোষারোপের

আদালতে অন্যান্যদের সঙ্গে নাথুরাম।

জবাব দিতে গেলে ঠিক কথা থেকে শুরু করতে হবে তা কেউই সম্ভবত বলতে পারবেন না। কিন্তু যেহেতু এই বিবৃতি কেউ নাকচ করেননি, তাই ধরে নিতে হবে, বিবৃতিগুলির বিশ্বাসযোগ্যতা আছে। সুতরাং এই দোষারোপের জবাব দেওয়া দরকার। আমার মতে, এইসব ষড়যন্ত্রতত্ত্বের অভিযোগ সবটাই ভারতীয়দের মনগড়া এবং বিকৃত মানসিকতার প্রকাশ। এই পাগলামির চিকিৎসা প্রয়োজন।"

পরে দেখা গিয়েছিল—রাজীব গান্ধীকে হত্যা করেছিল শ্রীলঙ্কার সন্ত্রাসবাদী রাজনৈতিক সংগঠন এলটিটিই (LTTE) এবং এই সংগঠনকে প্রত্যক্ষভাবে মদত দিয়েছিলেন কিছু দক্ষিণী কংগ্রেস নেতা ও নেত্রী। সেইসঙ্গে এক কৌশলী চাল চেলেছিল সিবিআই, যার ফলে শেষমেশ ২৪ দিনে অভিযুক্তের অপরাধ প্রমাণিত হলেও এবং ফাঁসির নির্দেশ দেওয়া হলেও একজন অপরাধীও চূড়ান্ত শাস্তি পায়নি।

গান্ধীহত্যার ক্ষেত্রে মূল অপরাধীরা প্রত্যেকেই শাস্তি পেয়েছিলেন। নাথুরাম ও নারায়ণের ফাঁসি হয়েছিল। বাকি ষড়যন্ত্রকারীদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছিল। কিন্তু ষড়যন্ত্র তত্ত্বের মূল কথা হলো, প্রকাশ্য ষড়যন্ত্র যা ধরা পড়ছে তার পিছনেও থাকে একটি ষড়যন্ত্র যা মূল ঘটনার চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। গান্ধীহত্যার ক্ষেত্রেও ছিল এমনই একটি রাজনৈতিক চালিকাশক্তি যাদের মামলার প্রথম পর্যায়ে সরকারপক্ষ সামনাসামনি আনতেই চায়নি।

যদিও শেষ পর্যন্ত সেসব নাটকই উত্থাপিত হয়েছে। মানুষ অনেক তথ্য জেনেছে কিন্তু সরকার ওইসব ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই নেয়নি।

চিত্রনাট্য ঃ এক

৩০ জানুয়ারি বিকেল পাঁচটা বেজে পাঁচ মিনিটে নাথুরাম গুলি করলেন গান্ধীজীকে। তারপরে নাথুরাম গডসে নিজেই পুলিশের হাতে ধরা দিলেন। তিনি পুলিশের কাছে স্বীকার করলেন, তিনি নিজেই এই খুনের পরিকল্পনা করেছিলেন এবং এর পিছনে কোনও বিস্তারিত ষড়যন্ত্র পরিকল্পনা বা পরিকল্পবাদের ভূমিকা ছিল না। কিন্তু নাথুরাম বললে কী হবে? বাকি চিত্রনাট্য তো রচনা হবে আসল ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে। প্রকৃতপক্ষে সেই সময় পর্যন্ত ষড়যন্ত্র তত্ত্ব বা কনস্পিরেসি থিয়োরি শব্দটা ভারতবর্ষে তেমনভাবে পরিচিত ছিল না। গান্ধীহত্যা ঘটে যাবার পর যখন গান্ধীহত্যা মামলা শুরু হলো, তখনই বোঝা গিয়েছিল চোখে দেখা সাদা ঘটনার পিছনেও থাকে আরও একটা সত্য যা নির্দেশিত বা ডিকটেটেড। আর সেই সত্যটা হলো—মহাত্মা গান্ধীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হওয়ার আগেই পুলিশ ষড়যন্ত্রের গভীরে পৌঁছে ১২ জানুয়ারি থেকে ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত কীভাবে নাথুরাম ও তার সাকরেদরা গান্ধীজীকে খুন করার বিস্তারিত ছক সাজিয়েছিল তার সন্ধান পুলিশ পেয়ে গেল। আর পুলিশই বলল, ষড়যন্ত্রের জাল ছিল বোথাট, আমেদাবাদ, গোয়ালিয়র, পুনে ও দিল্লি-সহ এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল। অথচ পুলিশ একটা প্রশ্নের জবাব দিল না কিছুতেই, আজও তা নিরুত্তর যে পুলিশ যদি এতই করিৎকর্মা ছিল তো গান্ধীহত্যার ষড়যন্ত্রের খবরটা আগেভাগে পেল না কেন? গান্ধী তো হেঁজিপেঁজি একটা সাধারণ মানুষ ছিলেন না। তাঁকে হত্যার হাত থেকে বাঁচানো গেল না কেন?

পরদিন ৩১ জানুয়ারি থেকেই ধরপাকড় শুরু হয়ে গেল।

প্রিভেনটিভ ডিটেনশন আইনে দেশজুড়ে আটক করা হলো কয়েক হাজার মানুষকে। তার মধ্যেই ছিলেন, নাথুরামের ভাই গোপাল গডসে, অস্ত্র ব্যবসায়ী রামচন্দ্র বড়গে, তাঁর সহকারী শঙ্কর কিস্তাইয়া, নারায়ণ আপ্তে, বিষ্ণু কারকারে। মদনলাল পাওয়া আগেই ধরা পড়েছিলেন। ২০ জানুয়ারি যেদিন বিড়লা হাউসে বোমা ফাটানোর দায়ে তাঁকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল। গ্রেপ্তার হলেন গোয়ালিয়ারের ডাঃ সদাশিব পারচুরেও। মদনলাল পাওয়ার গ্রেপ্তারিটা ছিল পুলিশের হাতে মাছ ধরার টোপের মতো। যদিও মদনলাল বারবার বলেছিলেন, তিনি বোমা ফাটিয়েছিলেন গান্ধীজীর মুসলমান তোষণের প্রতিবাদ হিসেবে এবং মুসলমানদের হাতে তাঁর পরিবারের সকলের নৃশংস হত্যার প্রতিশোধ তুলতে। কিন্তু না, পুলিশ তাঁকে বাধ্য করেছিল একথা বলতে যে একটা বড়ো ষড়যন্ত্র হয়েছিল এবং সে ছিল সেই ষড়যন্ত্রের একজন সৈনিক।

এই চিত্রনাট্যটি রচনার মূল দায়িত্ব নিয়েছিলেন বোম্বাইয়ের তৎকালীন কর্তাভজা নিষ্কর্মা ডেপুটি পুলিশ কমিশনার জামশেদ নাগরভালা। মূল নির্দেশক..... পাঠক, চমকে উঠবেন না। মূল নির্দেশিক ছিলেন মোরারজি দেশাই। গান্ধীটুপি পড়া এবং শিবাম্বু পানে অভ্যস্ত এক কংগ্রেস নেতা এবং তৎকালীন মহারাষ্ট্র সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি দায়ী কীভাবে?

চিত্রনাট্য ঃ দুই

ডঃ জগদীশ চন্দ্র জৈন। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএ এবং বোম্বাই বিশ্ববিদ্যলয়ের পি এইচ ডি। তিনি ছিলেন বোম্বাইয়ের রামনারায়ণ রুইয়া কলেজের হিন্দি ভাষার অধ্যাপক। তিনিও ছিলেন গান্ধীভক্ত এবং 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি জেলেও গিয়েছিলেন। তিনি কয়েকটি বই লিখেছিলেন এবং নিজেই সেগুলি প্রকাশ করে এজেন্টের মাধ্যমে বিক্রি করতেন। এরকমই একজন এজেন্ট ছিলেন মদনলাল পাওয়া।

আদালতে দাঁড়িয়ে ডঃ জৈন জানিয়ে দিলেন, এই মদনলাল পাওয়া মুসলমানদের নৃশংসতার বলি এক পাঞ্জাবি পরিবারের একমাত্র জীবিত সদস্য। সে তখন বেকার এবং নানাভাবে জীবন যাপনের চেষ্টা করছে। এক শিখ উদ্বাস্তুর মাধ্যমে মদনলাল তাঁর

With Best Compliments From :

Dr. Sawar Dhanania

Master in Mech. Engineering (Gold Medalist) Jadavpur University, Kolkata

PhD IIT, Kharagpur, W. B.

Chairman

Rubber Board, Ministry of Commerce & Industry

Govt. of India

Email : sdhanania@gmail.com

Mob. : 9331741971

কাছে এসেছিলেন এবং তাঁর বই কমিশন ভিত্তিতে বিক্রি করে দেবেন বলে কিছু বই নিয়ে যায়। বিক্রিবাটা চলছিল। এরকম সময়েই একদিন মদনলাল তাঁর সঙ্গে তাঁর জীবনের নানা ঘটনা গল্পচ্ছলে বলার সময় বলে ফেলে, সে এবং তার পরিচিত দু'চারজন বিভিন্ন জায়গা থেকে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করছে। তাঁদের লক্ষ্য ছিল কিছু কংগ্রেস নেতাকে হত্যা করা।

এরপর আদালতে ডঃ জৈন যা বলেছিলেন তা হলো ঃ .....আমি মদনলালের কথায় বাধা দিইনি। .... কারণ আমি জানতে চাইছিলাম দুটো তথ্য। প্রথমত, তারা কোন কোন নেতাকে টার্গেট করছে তাদের নাম জানা এবং হত্যাকারী দলটির নাম জানা। ... অনেক ঝুলোঝুলি করার পর সে বলে ফেলল—তাদের প্রথম লক্ষ্য মহাত্মা গান্ধীকে খুন করা। কারণ তাঁর জন্যই দেশভাগ হয়েছে। তাঁর জন্য লক্ষ লক্ষ হিন্দু উদ্বাস্তু হয়েছে। ... মদনলালের কথায় আমার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। আমি তাকে বললাম, তুমি কী করতে যাচ্ছ, তুমি জান না। এরকম মূর্খামি করো না কিছুতেই। কিন্তু মদনলাল ভাবলেশহীন।"

দ্বিতীয়বার আবার একবার ডঃ জৈন তার সঙ্গে কথা বলেছিলেন এবং তিনি চেষ্টা করেছিলেন—সব কথা অন্যতম গান্ধীবাদী নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণকে জানাতে। কিন্তু বিস্তারিত বলার সুযোগ তিনি পাননি। ২০ জানুয়ারি বিড়লা হাউসে বিস্ফোরণের পর তিনি বাধ্য হয়েই অনেক চেষ্টা করে মহারাষ্ট্রের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বি জি খের এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোরারজি দেশাইয়ের সঙ্গে দেখা করে গান্ধীহত্যার ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে যা তিনি শুনেছেন সবটা জানান। কিন্তু সব জানার পর দেশাই কী করেছিলেন—তিনি গান্ধীকে হত্যার প্রস্তাবিত ষড়যন্ত্রের দায়ে হিন্দু মহাসভার সভাপতি বিনায়ক দামোদর সাভারকর বা বীর সাভারকরকে কীভাবে ফাঁসানো যায় সে চেষ্টায় উঠেপড়ে লেগেছিলেন। তাঁর নির্দেশেই সাভারকরের বাড়ির চারপাশে বসেছিল কড়া পুলিশি নজরদারি। তাঁর নির্দেশেই তাঁর বাড়িতে রেইড হয়েছে নথিপত্রের সন্ধানে এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছিল গান্ধীহত্যার পরে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, আসল হত্যাকারী এবং যদি ষড়যন্ত্র হয়েই থাকত তার প্রধান নায়ক নাথুরাম গডসে এবং নারায়ণ আপ্তের নামই জানার চেষ্টা করেননি মোরারজী দেশাই বা তাঁর বশংবদ পুলিশকর্তা জামশেদ নাগরওয়ালা। আদালতে দাঁড়িয়ে জগদীশ জৈন যা বলেছিলেন তা সম্পূর্ণ সত্য ছিল না, কারণ তিনি অনেক কিছুই বলতে পারেননি। দেশাইয়ের ভয়ে তিনি শাসিয়ে রেখেছিলেন, বাড়াবাড়ি করলে গান্ধীহত্যা মামলায় তাঁকেও ফাঁসিয়ে দেবেন তিনি।

তাহলে আসল ঘটনাটা কী?

ডঃ জৈন গান্ধীহত্যার ষড়যন্ত্রের কথা বলতে প্রথমে দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী বি জি খেরের সঙ্গে। কিন্তু তিনি তাঁকে কথা বলার সুযোগই দেননি। তাঁকে দেশাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে বলে বেরিয়ে যান। এরপর ওইদিনই তিনি দেশাইয়ের সঙ্গে দেখা করেন এবং বলেন সমস্ত ঘটনা। দেশাই এরপর জামশেদ নাগরওয়ালাকে ষড়যন্ত্রের কথা বলেন। সেই সঙ্গে বলেন একটি কথা যা ডঃ জৈন কখনই বলেননি যে এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন বীর সাভারকর। ডঃ জৈনই একথা জানিয়েছেন।

চিত্রনাট্য ঃ তিন

জামশেদ নাগরওয়ালা এবার পাখির চোখ করে নিলেন বীর সাভারকরকেই। কিন্তু কাজের কাজ কিছু করে ওঠার আগেই ২০ জানুয়ারি গান্ধীজীকে হত্যার প্রথম চেষ্টাটি ঘটে যায়। দিল্লি পুলিশের প্রধান টিজি সঞ্জিবী দুই পুলিশ অফিসারকে বোম্বাই পাঠালেন নাগরওয়ালার সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে খোঁজখবর নিতে। কারণ ততক্ষণে মদনলালের কাছ থেকে পুলিশ বেশ কিছু বিবৃতি পেয়েছে। কিন্তু নাগরওয়ালা সেসব বিবৃতিকে পাত্তাই দিলেন না। তিনি ওই দুই অফিসারকে বলে দিলেন—''যা করার করছি। আপনারা হোটেলে গিয়ে ইউনিফর্ম ছেড়ে বিশ্রাম নিন।" এরপরে নাগরওয়ালা নিভৃতে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে হুইস্কির বোতল খুলে বসলেন চিত্রনাট্য সাজাতে। সেটা কীরকম? তিনি ধরে নিলেন বোমা বিস্ফোরণের পিছনে ছিল গান্ধীজীকে অপহরণের ছক আর সেই ষড়যন্ত্রে যুক্ত ছিল অন্তত ৪০০ জন যাদের সর্দার হলো ২০ জন। উদ্দেশ্য ছিল, মোটা অর্থের বন্দিপণ আদায় করা। হত্যার ষড়যন্ত্র! ফুৎকারেই উড়িয়ে দিলেন নাগরওয়ালা। তিনি তখন ঠিক করছেন, বীর সাভারকরকে কীভাবে জেলে ভরা যায়। কারণ সেটা করতে পারলেই মোরারজি দেশাই খুশি হয়ে যাবেন আর সেটাই তাঁর প্রধান লক্ষ্য—মোরারজি দেশাইকে খুশি করা।

কিন্তু এরপর ঘটনা যা ঘটল তা মারাত্মক। ৩০ জানুয়ারি গান্ধীজী খুন হলেন। আর সেদিনই সন্ধ্যায় দিল্লিতে শ্রী সঞ্জিবীর টেবিলে পৌঁছল নাগরওয়ালার সেই নেশাগ্রস্ত মস্তিষ্ক-উদ্ভূত গান্ধী অপহরণের ষড়যন্ত্র রিপোর্ট। একেই বোধহয় বলে নেমেসিস।

গান্ধীহত্যার খবর বোম্বাই শহরে এসে পৌঁছতেই ডঃ জৈনের মুখ লাল হয়ে উঠল। তিনি একরকম জোর করেই দেখা করলেন মোরারজি দেশাইয়ের সঙ্গে। প্রশ্ন করলেন— ''আপনাকে তো সব জানিয়ে গেলাম। খুনটা আটাকাতে পারলেন না?" মোরারজি রেগে গেলেন—''আমার মুখের ওপর এখন প্রশ্ন করার সাহস হয় কী করে আপনার? আপনি জানেন না, আমি কে?"

ডঃ জৈনও ছেড়ে দেবার পাত্র নন। তিনিও জবাব দিলেন—''জানি জানি, আপনি একজন নিষ্কর্মা অপদার্থ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।"

মোরারজি রেগে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। চীৎকার করে উঠলেন—''আপনি এখনই যদি চুপচাপ বেরিয়ে না যান, আমি আপনাকেও গান্ধীহত্যার ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িয়ে দেব।" —''তাই নাকি? করে দেখুন। টের পাবেন। আমি গোটা বিশ্বকে জানিয়ে দেব, গান্ধীহত্যার জন্য দায়ী আপনি।" বলে গটগট করে বেরিয়ে

গেলেন ডঃ জৈন।

চিত্রনাট্য ঃ চার

চিত্রনাট্যের নতুন ফর্মা রচনার কাজ শুরু হলো গান্ধীহত্যার অন্যতম ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে ধৃত অস্ত্র ব্যবসায়ী পুনে নিবাসী রামচন্দ্র দিগম্বর বড়গে। মোরারজী দেশাইয়ের নির্দেশেই জামশেদ নাগরওয়ালা বাদগেকে প্রস্তাব দিলেন, দিগম্বর যদি তাঁর কথামতো বিবৃতি দিতে রাজি হন, তাহলে বাদগের ওপর নির্যাতন হবে না, শাস্তিও হবে না। ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ তারিখে নাগরওয়ালা জেলে দিগম্বরের সঙ্গে দেখা করলেন। বললেন—''তোমার সব শাস্তি মুকুব হয়ে যাবে, যদি তুমি বল, গান্ধীহত্যার সমস্ত ষড়যন্ত্রের মাস্টারমাইন্ড হলেন বিনায়ক দামোদর সাভারকর।'' বাদগে প্রথমে রাজি হননি। শেষ পর্যন্ত নাগেরওয়ালা তাকে রাজি হতে বাধ্য করায়। খুশিতে ডগমগ নাগারওয়ালা তার রাজনৈতিক প্রভু মোরারজি দেশাইকে জানিয়ে এলেন—''স্যার রাঘববোয়াল শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ছে।'' ওইদিনই গ্রেপ্তার হলেন সাভারকর। দায় গান্ধীহত্যার ষড়যন্ত্র।

চিত্রনাট্য ঃ পাঁচ

১৭ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮। নাগরওয়ালা ডঃ জৈনের বাড়ির কড়া নাড়লেন। ভয় দেখিয়ে তাঁর কাছ থেকেও আদায় করলেন বিবৃতি—ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিলেন বীর সাভারকর এবং তিনিই নাথুরামকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন—গান্ধীহত্যার কাজে সফল হও এবং বিজয়ী হয়ে ফিরে এসো।

ডঃ জৈন প্রথমে একথা বলতে চাননি। কিন্তু নাগরওয়ালা বলেছিলেন—তাহলে তখনই তাঁকে তিনি গ্রেপ্তার করবেন গান্ধী হত্যার দায়ে। দেশাই সাহেবের সেরকমই নির্দেশ। বৃদ্ধ জৈনের কোথাও উপায় ছিল না।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাভারকরকে জেলবন্দি করা সম্ভব হয়নি মোরারজি দেশাইয়ের পক্ষে। কারণ ডঃ জৈন বিবেকের দংশনে জ্বলছিলেন। তাই শেষ পর্যন্ত তিনি আদালতকে জানিয়েছিলেন, সাভারকরের নাম বলতে বাধ্য করেছিলেন জামশেদ নাগরওয়ালা। আদালতও জানিয়েছিল, ডঃ জৈনের বিবৃতি সত্য ছাড়া অন্য কিছুই মনে হয়নি, কারণ তিনি যা বলেছেন সবই খুব সহজ, সরল ও স্পষ্ট।

কিন্তু পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন দেশাই পাঁকাল মাছের মতো। বলেছিলেন—''I had made Prof. Jain thrice in all between the period from 21st January 1948, till I put him in contact with Mr. Nagarwala the first interview had taken place in the secretarial and the last two interviews at my residence. I do not know how many interviews Prof. Jain had with Mr. Nagarwala after he had been put in contact with him. The second interview with Prof. Jain was on 24th January 1948, and the third one was on or aliant 3rd February 1948 or 4th February 1948. When Prof. Jain offered to help openly the only thing I did was to put him in touch with Mr. Nagarwala. I did not find out the antecedent of Prof. Jain. I asked Mr. Nagarwala to find out if the story given by Prof. Jain was true. I made a statement to the police.

রামচন্দ্র দিগম্বর বাদগে রাজসাক্ষী হয়ে বেঁচে গিয়ে আজীবন ছিলেন পুলিশি প্রহরায়। আদালতে তিনি সাভারকরকে দোষী বানিয়ে ছিলেন ঠিকই বাধ্য হয়ে কিন্তু তাতে সাভারকরের ক্ষতি কিছু হয়নি। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—গান্ধী হত্যার মামলা মিটে যাওয়ার পর বাদগে লেখক সাংবাদিক মনোহর মালগাঁওকারকে বলেছিলেন—''আদালতে যা বলেছিলাম, সবটাই বানানো। পুলিশের চাপে পুলিশের সাজানো কথাই বলতে হয়েছিল। আমি পুলিশকে বলেছিলাম সাভারকরকে আমি দেবতার মতো ভক্তি করি। ওকথা আমি বলতে পারব না। কিন্তু আমার কিছু করার ছিল না।

চিত্রনাট্য ঃ ছয়

গান্ধীহত্যার তিনদিন পর ৩ ফেব্রুয়ারি গ্রেপ্তার হলেন গোয়ালিয়রের হিন্দু মহাসভার প্রধান কর্মকর্তা ডাঃ দত্তাত্রেয় সদাশিব পরচুরে। চিকিৎসক হিসেবে সুনামের অধিকারী ডাঃ পরচুরের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, গান্ধী হত্যায় ব্যবহৃত পিস্তলটি তিনি নাথুরামের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। আর সেই অভিযোগে তাঁকে বন্দি করে রাখা হয়েছিল গোয়ালিয়র দুর্গের এক ঘন অন্ধকার কারাকক্ষে যেটির কাছেই একই রকম একটি কারাকক্ষে আওরঙ্গজেব তাঁর ভাই মুরাদকে বন্দি করে রেখে নির্মম যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করেছিলেন।

কিন্তু কীভাবে জানা গেল যে পরচুরেই ওই পিস্তলটার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন? এখানেও নাগরওয়ালা খেলেছিলেন সেই খেলা। নিজের মনমতো একটা চিত্রনাট্য খাড়া করা এবং সেটি প্রমাণ করার জন্য খেলার চালগুলোকে সাজিয়ে ফেলা। চিত্রনাট্যটা এরকম ঃ ২৭ জানুয়ারি নাথুরাম আর নারায়ণ গোয়ালিয়রে গিয়ে ডাঃ পরচুরেকে বললেন, একটা পিস্তল চাই, কারণ তারা গান্ধীজীকে হত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পরদিন ২৮ জানুয়ারি সন্ধ্যায় নাথুরাম পেয়ে গেলেন ৯ মি.মি. ব্যারো সেমি. অটোমেটিক পিস্তল। পিস্তলের নম্বর ৬০৩৮২৪। যিনি সেটা বয়ে আনলেন তাঁর নাম গঙ্গাধর দণ্ডবতে। ইতালিতে তৈরি পিস্তলটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহার করেছিল মুসোলিনীর সেনাবাহিনীর কোনো এক সৈনিক। যুদ্ধজয়ের স্মৃতি হিসেবে পিস্তলটি ভারতে এনেছিলেন গোয়ালিয়র ইনফ্যানট্রির ফোর্থ ডিভিশনের লেফটেন্যান্ট কর্নেল ভি ভি যোগী। পিস্তলটি থাকার কথা ছিল সেনাবাহিনীর গোয়ালিয়র লাইট ইনফ্যানট্রির মিউজিয়ামে। কিন্তু ৭০ বছর পরে জানা যায়, দণ্ডবতে পিস্তলটি পেয়েছিলেন জনৈক জগদীশ প্রসাদ গোয়েলের কাছে। পুলিশের চাপে ডাঃ পরচুরে স্বীকারোক্তি গ্রহণকারী প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বি আর অটলের লেখা একটি বয়ানে দস্তখত করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে বয়ানে লেখা হয়েছিল, ডাঃ পরচুরে বন্দুকটি

গান্ধীজীকে গুলি করার প্রাক্কমুহূর্তে নাথুরাম।

সরবরাহ করেছিলেন। আর পুলিশও তার ভিত্তিতে ডাঃ পরচুরের বিরুদ্ধে চার্জশিটে ডাঃ পরচুরে এবং আরও তিনজনের নাম নথিভক্তি করে—গঙ্গাধর দণ্ডবতে, গঙ্গাধর জাঠাও ও সূর্যদেও শর্মা। দশ-বারোটি কার্তুজসহ পিস্তলটি নাথুরাম কিনেছিলেন নগদ ৫০০ টাকায় যদিও ২০০ টাকা পরে দেবেন এই শর্তে।

কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপারটা হলো, পুলিশ ডাঃ পরচুরেকে গ্রেপ্তার করলেও গঙ্গাধর দণ্ডবতে, গঙ্গাধর জাঠাও, সূর্যদেও শর্মা ও জগদীশপ্রসাদ গোয়েল নামক চার ব্যক্তির একজনকেও খুঁজে পেল না। পিস্তলটির মালিকানা নিয়ে তাই ধন্দটা থেকেই গিয়েছিল। এমনকী গান্ধীহত্যার তদন্তে গঠিত জে এল কাপুর কমিশনও ওই পিস্তলটির মালিকানা নির্ধারণ করতে পারেনি।

ডাঃ পরচুরেকে অবশ্য সাভারকরের মতোই মুক্তি দিয়েছিল আদালত। কারণ ডাঃ পরচুরেকে দিয়ে যে মিথ্যা বিবৃতিতে সই করিয়েছিলেন বি আর অটল সেটা প্রমাণ করতে পেরেছিলেন ডাঃ পরচুরে। তিনি আদালতে বিবৃতি দিয়েছিলেন—"১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮। দুর্গের কারাগারে আমার কাছে এলেন কয়েকজন পুলিশ অফিসার-সহ মেজর ছত্রে এবং একজন ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁরা কীসব লেখা ৬টি কাগজ বের করলেন। আমাকে বলা হলো, সই করার জন্য। কিন্তু তাঁরা একবারও পড়ে শোনালেন না কাগজগুলিতে কী লেখা আছে। এরপ একটা বাদামি রঙের কাগজে আমাদের দিয়ে সই করানো হলো। আমি বুঝতেই পারলাম না, আমি নিজেই আমার মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞায় সই করে দিলাম কিনা। পরে দেখলাম ওটা আমার স্বীকারোক্তি বলে বানানো কাগজটির প্রথম পাতা।"

এরপর ডাঃ পরচুরে ও অন্যান্য অভিযুক্তদের আইনজীবীরা সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত নিলেন, তাঁরা উক্ত আদালতকে জানাবেন যে—"The First class Magistrate Shri Atal should have unceremoniously obtained the doctors signeture on the sheets of papers already written on, and later Purjwre himself in court by sayins it was his conferssion, admits of no proper explanation. Atal had no knowledge of the rules played by the accused persons in the Gwalior phase of the conspiracy therefore, he could not have composed the confession by himself."

সেই সময় আদালতে একটি হাস্যকর ঘটনাও ঘটে যায় এ প্রসঙ্গে। নারায়ণ আপ্তে তাঁর একটি বিবৃতিতে একদিন বলেছিলেন—"এটা খুবই অবাস্তব চিন্তা যে একটি পিস্তল সংগ্রহের জন্য আমাদের গোয়ালিয়র যেতে হয়েছিল। এবং তাও বোম্বাই ও দিল্লি হয়ে। সবচেয়ে হাস্যকর ব্যাপার হলো, পুলিশকর্তা নাগরওয়ালা আমার সঙ্গে লকআপে দেখা করে বলেছিলেন যে,

তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতেন পারছেন না, একটা পিস্তলের জন্য আমরা কেন গোয়ালিয়র ছুটে গিয়েছিলাম।''

গোটা আদালতেই সেদিন হাসির ঝড় বয়ে গিয়েছিল। নাগরওয়ালার মুখরক্ষারও কোনো উপায় ছিল না। স্বভাবতই উচ্চ আদালত ডাঃ পরচুরের বিবৃতিকে মান্যতা দিয়ে মন্তব্য করেছিলেন— ''Coercion was used to extract his (Dr. Parchure's) initial confeesion and that there was enough doubt about the exact nature of interaction with Godse and Apte to warrant an acquittal of all charges.''

চিত্রনাট্য ঃ সাত

''Vinayak Damadar Savarkar is declared NOT GUILTY ..... NOT GUILTY....NOT GUILTY... The prosecution case against Vinayak D. Savarkar appeared to rest just on the evidence of the approver (Digambar R. Badge) and the approver alone. The charges levied against Savarkar did not hold any ground.''

''বিনায়ক দামোদর সাভারকারকে নির্দোষ....নির্দোষ....নির্দোষ বলে ঘোষণা করা হচ্ছে। সাভারকরের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি দায়ের করা হয়েছিল শুধুমাত্র রাজসাক্ষীর (দিগম্বর বড়গে) সাক্ষ্যের ওপর এবং একমাত্র সাক্ষ্য ছিল তাঁরই। তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলি আদৌ হালে পানি পায়নি।''

লালকেল্লার বিশেষ আদালতে বিচারক আত্মাচরণ যখন কেটে কেটে সাভারকরের মুক্তির রায় ঘোষণা করছেন এবং যখন সেই অমোঘ বিচারের বাণী লালকেল্লার দেওয়াল থেকে দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হতে হতে ছড়িয়ে পড়ছে গোটা ভারতবর্ষে, তখন মোরারজীদেশাই আর প্রভুভক্ত পুলিশকর্তা জামশেদ নাগরওয়ালা কোথায় মুখ লুকিয়েছিলেন তা জানা যায়নি। কিন্তু নিঃসন্দেহে দুজনেই তখন নিজের নিজের গালে হাত বোলাচ্ছিলেন আর মর্মে মর্মে অনুভব করছিলেন মিথ্যা বলার শাস্তি হিসেবে অলক্ষ্য থেকে চপেটাঘাতের জোর হতে পারে কতটা।

গান্ধীজীকে ষড়যন্ত্রের থেকে মুক্ত করা নয়। মোরারজি দেশাইয়ের মূল লক্ষ্য ছিল বিনায়ক দামোদর সাভারকরকে ফাঁসিতে ঝোলানো। সেটা করতে চেয়েছিলেন একটি কারণেই, সাভারকরের বুদ্ধিমত্তা, তাঁর রাজনৈতিক চেতনা, তাঁর রাজনৈতিক স্ট্রাটেজি সব কিছুর কাছেই বারে বারে হার মানতে হচ্ছিল মহারাষ্ট্র কংগ্রেসকে। একদিকে সেই হারের বদলা নেওয়া, অন্যদিকে জওহরলাল ও গান্ধীজীকে তুষ্ট করার লক্ষ্যে বহু বছর ধরেই তিনি পাখির চোখ করে আক্রমণ হানার সুযোগ করছিলেন বীর সাভারকরকে। কোনদিনই সেই সুযোগ হাতে আসেনি। গান্ধীহত্যার পর সেই সুযোগকে একশো শতাংশ কাজে লাগাতে চাইলেন মোরারজি। তাঁরই নির্দেশে ডঃ জগদীশ প্রসাদ জৈনকে চাপ দিয়ে বলানো হয়েছিল—গান্ধীহত্যার ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সাভারকর এবং তাঁরই নির্দেশে নাগরওয়ালা সাভারকরের বাড়ি তছনছ করে ১৪৩টি ফাইল যার মধ্যে ছিল ১০,০০০ চিঠিপত্র। এর মধ্যে নাথুরামের চিঠি ছিল ৭৪টি, নারায়ণ আপ্তের ২৭টি, ডাঃ পরচুরে ৭টি। বাকি চিঠিগুলি ছিল লর্ড লিনলিথগো, মাস্টার তারা সিংহ, মহম্মদ আলি জিন্না, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, তেজবাহাদুর সপ্রু, মানবেন্দ্রনাথ রায়, এমনকী চিয়াং কাইশেক ও স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসেরও। এতকিছু উদ্ধারের পর মাত্র ২৬টি চিঠি বিচার প্রক্রিয়ার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল যেগুলি ছিল নাথুরাম ও নারায়ণ আপ্তের লেখা। মোরারজি , নাগরওয়ালা তথা সরকারের বক্তব্য ছিল ঃ ''The evidence established that there seven persons (Nathuram Godse, Narayan Apte, Bishnu Karkari, Gopal Godse, Madanlal Pawah, Digambar Ramchandra Badge, Dr. Sadashiv Parchure) were known to one another for a considerable time; that more or less, they held similar political views, that they collected gun cotton-slabs, hand granades and pistols; that they raised a fairly large sum of money and that they suddenly set out for Delhi on or about the same day. From this chain of circumstances the conclusion that must emerge inevitably is that they were acting in pursuance of a settled plan.'' সেইসঙ্গে বলা হয়েছিল এদের সকলেরই কাছে সাভারকর ছিলেন সম্মাননীয় গুরু যিনি হিন্দুত্ব রক্ষায় সদা সচেষ্ট। এইসব গালগল্পকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছিলেন সাভারকর আদালতে। তিনি স্পষ্টতই জানিয়েছিলেন—''I never alutted the commission of any of the offences mentioned in the charge-sheet nor had I any knowledge of any such criminal design.''

তারপরেও পুলিশ সাভারকরকে আর্থার রোড জেলে নিয়ে গিয়ে আর এক প্রস্থ নাটক করেছিল। সেখানে বন্দি নাথুরাম-সহ বাকি সব অভিযুক্তর সঙ্গে মধ্যমণি করে সাভারকরকে বসিয়ে একটা ছবি তুলে পুলিশ প্রমাণ করতে চেয়েছিল, সাভারকরই এই চক্রান্তের স্রষ্টা। পরের দিন খবরের কাগজগুলিতে ফলাও করে ছাপাও হয়েছিল সেই ছবি। কিন্তু জগদীশ প্রসাদ জৈনের সাক্ষ্যে এবং শঙ্কর কিস্তৈয়ার সাক্ষ্য এসব প্রচেষ্টায় জল ঢেলে দিয়েছিল।

শঙ্কর কিস্তৈয়া ছিলেন অস্ত্র ব্যবসায়ী রাজসাক্ষী দিগম্বর রামচন্দ্র বড়গের কর্মচারী। নিতান্ত সাদামাটা বছর ২২ বছরের তরুণ দরিদ্র ছেলেটিই গান্ধীহত্যা মামলায় একটা নজির স্থাপন করে দিয়েছিল আদালতে সারাসরি তার মালিক এবং রাজসাক্ষী বড়গেকে চ্যালেঞ্জ করে যে, বড়গে যা যা বলছেন সব মিথ্যা। প্রয়োজনে আদালতেই আমার প্রশ্ন করার সুযোগ দেওয়া হোক। আদালত তাকে সুযোগ দিয়েছিল। এটাই সম্ভবত ছিল প্রথম একটি নজির যেখানে একজন আসামি একজন রাজসাক্ষীকে চ্যালেঞ্জ করে প্রশ্নবাণ ছুঁড়ে দিয়েছিল একের পর এক এবং তাতেই ঘায়েল হয়ে যান রাজসাক্ষী। শঙ্কর কিস্তৈয়াও মুক্তি পান সাভারকরের সঙ্গেই। কিন্তু ভারতীয় রাজনীতিতে এরপরেই ঘটে গিয়েছিল একটি বিস্ময়কর ঘটনা।

মুক্তি পাওয়ার পর শঙ্কর কিস্তৈয়া নিখোঁজ হয়ে যান। নিখোঁজ নাকি গুম, খুন? কিছুই জানা যায়নি কোনোদিন। যেমনভাবে গঙ্গাধর দণ্ডবতে, গঙ্গাধর জাঠাও ও সূর্যদেব শর্মাকেও কোনোদিন খুঁজে পাওয়া যায়নি যাঁরা নাকি যুক্ত ছিলেন গান্ধীহত্যার জন্য পিস্তলটি সংগ্রহ করার কাজে।

সবাই ভোলে, ভবি ভোলে না

সাভারকারের মুক্তির রায়ের প্রেক্ষাপট হিসেবে বিচারক আত্মাচরণ লিখেছেন—"Even if the visit to his house by Nathuram as stated by Budge in his statement was true, it cannot be assumed that it was a meet to discuss the murder of Gandhi... The statement of Badge quoting Narayan Apte saying 'Savarkar had given him blessings for the murder of Gandhi, could not be proved and it may have been said by Apte in his personal Capacity."

অতএব মোরারজি দেশাই আর পুলিশ কর্তা নাগরওয়ালার মুখে চুনকালি মাখিয়ে লালকেল্লার অন্দরমহল থেকে বেরিয়ে এলেন সিংহের মতো বিক্রমশালী জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদ স্বাতন্ত্র্য বীর সাভারকর। লালকেল্লার মূল প্রবেশপথের সামনে তখন হাজার হাজার মানুষ। পতপত করে উড়ছে হিন্দু মহাসভা আর হিন্দু রাষ্ট্রসেনার পতাকা। মুহুর্মুহু গর্জে উঠছে স্লোগান— 'সাভারকার যুগ যুগ জিও', 'সাভারকর অমর রহে' , 'বন্দে মাতরম্'। সাভারকরকে মাটিতে পা রাখতে হলো না। হাজার মানুষ কাঁধ পেতে দিলেন তাঁর পায়ের কাছে। জনতার উল্লাসে মুক্তির আবহে ভেসে গেলে স্বতন্ত্র্য বীর।

কিন্তু এই যে কথা আছে না—ভবি ভোলবার নয়। সবাই ভোলে। জওহরলাল ভোলে না। মুক্তি? দেখাচ্ছি মুক্তি! আমার মুখে ঝামা ঘষা!

অতএব দিল্লির জেলাশাসকের নির্দেশ এল—সাভারকর তিনমাস দিল্লি ও পাঞ্জাবে ঢুকতে পারবেন না। অপরাধ? সরকার শঙ্কিত। তাঁর জন্য পাঞ্জাবের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে। বিতর্কে গিয়ে লাভ নেই। মেনে নিয়েছিলেন বীর সাভারকর। ডাঃ সদাশিব পরচুড়েকেও তিন বছর গোয়ালিয়রে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। এবং তাঁর জীবনে আর কখনও তিনি রাজনীতির আঙিনায় পা রাখতে পারেননি। উদ্দেশ্য ছিল একটাই—তাঁর মতো সুযোগ্য সংগঠককে নির্বাসনে পাঠিয়ে গোয়ালিয়র থেকে হিন্দু মহাসভাকে বিনষ্ট করে দেওয়া। সেটা সম্ভব হয়নি। কিন্তু পরচুড়ে নির্বাক হয়েই থেকেছিলেন। পরে পার্কিনসন্স রোগে আক্রান্ত হয়ে ১৯৮৫ সালে তিনি গোয়ালিয়রেই মারা যান।

সাভারকরও চুপচাপই ছিলেন। কিন্তু তবুও ১৯৫০ সালে নেহরুর নির্দেশে তিনি ফের গ্রেপ্তার হলেন। অভিযোগ তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খানের ভারত ভ্রমণের বিরোধিতা করেছেন। দু'চার দিনেই মুক্তি পেলেন। কিন্তু এবার এল পারিবারিক আঘাত। ১৯৬৩ সালে তাঁর স্ত্রী যমুনাবাই মারা গেলেন। একা হয়ে গেলেন বীর সাভারকর। ১৯৬১ সালের ১ ফেব্রুয়ারি থেকে তিনি 'আত্মঅর্পণ' করলেন। জল পান ছাড়া, খাওয়াদাওয়া, ওষুধপত্র সব ত্যাগ করলেন। ১৯৬৬ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি ৮৩ বছর বয়সে শেষনিশ্বাস ত্যাগের আগে লিখে গেলেন—'এটা আমার আত্মহত্যা নয়। আত্মঅর্পণ। ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সমর্পণ করা। জীবনের লক্ষ্য যখন শেষ হয়ে গেছে, সামাজিক সেবাকর্মের ক্ষমতাও আর নেই, তখন শুধুশুধু মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা না করে স্বেচ্ছায় জীবনদান করাই শ্রেয়।

নেহরু আনন্দিতই হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত চরম শত্রুটা গেল। তবু তাঁর রাগ কমল না। কংগ্রেস নেতৃত্ব কর্মী ও নেতাদের ওপর হুলিয়া জারি করল—কেউ সাভারকরের স্মরণসভায় অংশ নেবেন না। কারণ বোধহয় একটাই—এত চেষ্টা করেও সাভাররকরকে ফাঁসিতে ঝোলানো গেল না।

মধুরেণ সমাপয়েৎ

গান্ধীহত্যা বিচারপর্বের অনেকটা অংশ জুড়েই রয়েছে নানা ঘটনার ঘনঘটা। নাটকের মতোই টানটান উত্তেজনা। কী হয় কী হয়! এত উত্তেজনার পরও কিন্তু অনেক ঘটনা ঘটেছিল। শুধু দুঃখজনক নয়। বিস্ময়করও। সেসব ঘটনা আপাতত থাক। তবে এত উত্তেজনার পর একটু মিষ্টিমুখ যে না হলেই নয়।

নাথুরামের ভাইঝি অসিলতা। বিয়ের বয়স হয়েছিল। কিন্তু নাথুরামের ভাইঝি এবং গোপাল গডসের মেয়েকে বিয়ে করবে এমন বীরপুরুষ মিলবে কোথায়? মিলেছিল---সেই বীর সাভারকরের পরিবার থেকেই। সাভারকরের ভাইপো অশোক সাভারকরের সঙ্গে একদিন মহাধুমধাম করে বিয়ে গেল অসিলতার। তাঁর নতুন নামকরণ হলো হিমানী অশোক সাভারকর, যিনি পরবর্তীকালে হিন্দু মহাসভার সভানেত্রী হয়েছিলেন আর পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছিলেন সাভারকর প্রতিষ্ঠিত র‍্যাডিক্যাল হিন্দু সংগঠন 'অভিনব ভারত'-এর।

মধুরেণ সমাপয়েৎ হলো কি না।

অনুপ্রেরণা সূত্র ঃ—

নাথুরামের বিচার একটি অপ্রকাশিত দলিল ঃ সুজিত রায় (দে পাবলিকেশনস)

নাথুরাম গডসে বলছি ঃ সুজিত রায় (দে পাবলিকেশনস)

গান্ধীহত্যার ষড়যন্ত্র ও নেপথ্য নায়কেরা ঃ সুজিত রায় (দে পাবলিকেশনস)

তোমার প্রধানমন্ত্রী মৃত ঃ সুজিত রায় (দে পাবলিকেশনস)

রাজীব হত্যা ও নেপথ্যের রাজনীতি ঃ সুজিত রায় (দে পাবলিকেশনস)

অপারেশন ইন্দিরা হত্যা—একটি অপ্রকাশিত ষড়যন্ত্র কাহিনী ঃ সুজিত রায় (দে পাবলিকেশনস)

অথ ত্রিলিঙ্গ কথা

প্রবাল

মহিষ বলল, ‘‘উড্ডীন, এদিকে যেরকম একটা আংটা রয়েছে, ওদিকেও সেরকম আরেকটা থাকার কথা।’’

পোড়ার কাঠ ও ভাঙা পাথরের ছড়াছড়ি চারিদিকে। সুবিশাল এই অগ্নিমন্দিরের ধ্বংসাবশেষের মাঝে কোনো কিছুই খুঁজে বার করা সহজ নয়। কিন্তু উড্ডীন জানে, মহিষাসুর ‘না’ শব্দটা শুনতে অভ্যস্ত নয়। তাছাড়া, মহিষ যখন বলছে, তখন আংটা নিশ্চয়ই রয়েছে। মহিষ কখনো ভুল বলতে পারে না। মাঝে মাঝে মনে হয়, মহিষ কি সত্যিই রক্তমাংসের মনুসন্তান, নাকি সে আদতে অসুর প্রেরিত এক অতিমানব?

দানবগোষ্ঠীর প্রথম বিজয়ের রাত এটা। আগামী পৃথিবী মনে রাখবে এই রাতটাকে। যে বিজয় আজ শুরু হলো ভারতবর্ষের সুদূর উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের সীমান্ত নগরীতে, আগামী বছরগুলোতে সেই বিজয় ছড়িয়ে পড়বে সমগ্র ভারতবর্ষে। দানবগোষ্ঠীর পদানত হবে প্রতিটি প্রকৃতি-উপাসক। বড়ো শুভদিন আজ। উৎসবের

দিন।

আজ রাতে, যখন দানবরা উৎসবে মত্ত, যখন তারা সুশাসন নগরীর অগ্নিউপাসকদের ঘরে ঘরে লুঠপাঠ চালাচ্ছে পৈশাচিক উল্লাসের নেশায়, জোর করে অঙ্কশায়িনী করছে তাদের ঘরের সুন্দরী নারীদের, তখন সবরকম ভোগস্পৃহা থেকে নির্লিপ্ত হয়ে মশাল হাতে মহিষ কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে অগ্নিমন্দিরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে। এই না হলে অসুনিষ্ঠা? শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে উড্ডীনের।

ময়লা কাঠ পাথর সরিয়ে মেঝের প্রতিটি অংশ, প্রতিটি খাঁজ খুঁজতে খুঁজতে শেষমেশ উড্ডীন খুঁজে পেল। পাথরের মেঝেতে একটা তামার আংটা গাঁথা রয়েছে।

''পেয়েছ?'' বলল মহিষ, ''ভালো। আমি এক থেকে তিন গুনব। তিন বলামাত্র আংটা ধরে টান মারবে। শরীরের সব শক্তি দিয়ে। ঠিক আছে?''

''ঠিক আছে মহামহিম,'' কপালের ঘাম মুছে আংটাটাকে গায়ের জোরে আঁকড়ে ধরল উড্ডীন।

''এক-দুই-তিন—হেঁইও!''

''হেঁইও!''

'খুট' শব্দ করে আলগা একটা পাথর মেঝে থেকে উঁচুতে উঠে এল খানিকটা। গোটা মেঝেটাই যেন নড়ে উঠল তার সঙ্গে। তারপর ঘড়ঘড় শব্দ করে মেঝে ফাঁক হয়ে গেল, দুটো পাথর সরে গেল দুপাশে। উঁকি দিয়ে দেখল উড্ডীন, ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে গেছে নীচে। হাতের মশাল উঁচিয়ে ধরে মহিষ দ্রুতপায়ে নেমে গেল সেই গহ্বরে, পেছনে স্খলিত পদক্ষেপে উড্ডীন।

গভীর কুয়ো, নেমে গেছে অনেক নীচু অব্দি। কুয়োর গায়ে ঘোরানো সিঁড়ি। কিছুদূর নামার পর কুয়োর তল পাওয়া গেল। সেখান থেকে শুরু হয়েছে সুড়ঙ্গের জাল, এদিক ওদিক সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। সুড়ঙ্গের দেওয়াল অজানা এক স্ফটিকে নির্মিত। সে পাথর কয়লার মতো কালো, হীরের মতো পলকাটা আর কঠিন। মনে মনে কী যেন ভাবল মহিষ, তারপর বামদিকের একটা পথ ধরল। একটু ঢালু সুড়ঙ্গটা, বোঝা যায় সুড়ঙ্গের গন্তব্য মাটির আরও গভীরে।

বেশ কিছুক্ষণ পথ চলার পর সেই সুড়ঙ্গ শেষ হলো বিশাল এক গর্ভগৃহে। এদিক থেকে ওদিক পরিষ্কার দেখা যায় না, এত বড়ো সেই ঘর!

মশালের আলোয় দেখল উড্ডীন, সামনে বেলেপাথরের তৈরি উঁচু বেদী। সেই বেদীর ওপর একটা স্বচ্ছ স্ফটিকের ত্রিভুজ, প্রায় দু'মানুষ উঁচু। ত্রিভুজের চারপাশে ভাসমান ন'টি স্বপ্রভ কন্দুক, সবার রং আলাদা। সেগুলো নিরালম্ব অবস্থায় ভেসে এদিক থেকে ওদিকে যাচ্ছে। ঠিক যেন একদল মহাজাগতিক বস্তু, মহাশূন্যে ভাসছে। কী করে ভেসে আছে, কোনো অবলম্বন ছাড়া? মশালের আলো সেই বস্তুগুলোর ওপর পড়ে ঘূর্ণায়মান এক অপার্থিব রঙের ছটা সৃষ্টি করেছে গর্ভগৃহের দেওয়ালে।

কালো স্ফটিকের দেওয়ালে সারি সারি ধাতুনির্মিত পাত লাগানো আছে। সেই পাত ভর্তি বিচিত্র সব চিহ্ন। পরিচিত কোনো লিপির সঙ্গে তার মিল নেই। দেয়ালে খোদাই করা সারি সারি তাক। সেই তাকে থরে থরে সাজানো রয়েছে বই। লক্ষ লক্ষ বই! শিহরিত হয়ে উঠল উড্ডীন। না জানি কত না অজানা জ্ঞান সঞ্চিত আছে এই সব বইয়ের দুই মলাটের মাঝখানে। ব্রহ্মাণ্ডের কত না রহস্য জানা যাবে, যদি কেউ ধৈর্য ধরে এই বইগুলোর পাঠোদ্ধার করতে পারে!

মহিষ হাঁটু গেড়ে বসল বেদীর সামনে। অবাক হলো উড্ডীন। অসুস্তম্ভ ছাড়া আর কোনো বিগ্রহের সামনে মাথা নত করে না মহিষাসুর। ওই স্ফটিক-ত্রিভুজের কী এমন মাহাত্ম্য যে তার সামনে মাথা নোয়াচ্ছে মহিষ? ভুল ভাঙল একটু পরে। মাথা নুইয়ে বেদীর নীচে কী যেন খুঁজছে।

কিছুক্ষণ পরে খুঁজে পেল। বিশেষ এক স্থানে হাতের তেলোর আলতো চাপে বেদীর নীচের এক গুপ্ত দরজা খুলে গেল। হাত বাড়িয়ে তার ভেতর থেকে কী যেন টেনে বার করল মহিষ। বাঁশের নলের মতো কিছু। মুখ শক্ত করে আটকানো, কাপড় ও গালা দিয়ে। গালা ভেঙে ভেতর থেকে বেরল তালপাতার তৈরি একটা পুঁথি। মাত্র কয়েকটা পাতা রয়েছে তাতে। অদ্ভুত সে পাতাগুলো। চকচকে, অনমনীয়। যেন কোনো স্বচ্ছ রসায়নের প্রলেপ রয়েছে তালপাতার ওপর। ততোধিক অদ্ভুত সেই পুঁথির লেখা। যেন লেখা নয়, সারবন্দি কিছু ছবি আঁকা রয়েছে। মেঝের ওপর থেবড়ে বসে পড়ল মহিষ, মশালের এলোমেলো আলোয় অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে সেই পুঁথি পড়তে লাগল। পড়া যখন শেষ হলো, উড্ডীন দেখল, উৎসাহে জ্বলজ্বল করছে মহিষের মুখ।

''কী এটা?'' জিজ্ঞেস করল উড্ডীন।

''বলছি,'' উত্তর দিল মহিষ, ''দানবদের মধ্যে তুমি জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ, তার ওপর সেই ছোটোবেলা থেকেই তুমি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তোমার বিশ্বাসযোগ্যতা ও আনুগত্য প্রশ্নাতীত। তাই শুধু তুমিই জানবে এর কথা, আর কেউ নয়। তবু বলে রাখি, আজ যে কথাগুলো তোমাকে বলতে চলেছি, সেটা যেন আর কেউ জানতে না পারে। যদি তুমি কোনোদিন আর কাউকে এ কথা বলো, জেনে রেখো, নিশ্চিত তোমার মাথায় বজ্রপাত হবে। পৃথিবীর যে প্রান্তেই তুমি লুকোও না কেন, তোমাকে খুঁজে নিয়ে এসে অসুস্তম্ভের সামনে বলি দেব।''

''প্রাণ থাকতে কাউকে বলব না,'' কাঁপা কাঁপা গলায় জোর দিয়ে বলল উড্ডীন, ''সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। কিন্তু আগে বলুন, এই চিহ্নগুলো কী?''

''প্রলয়ের পূর্বে লেখা হয়েছিল এই পুঁথি,'' বলল মহিষ, ''এই যে হরফ দেখছ, এটা প্রলয়ের পূর্বের ভাষা। এখন যেমন প্রতিটি ধ্বনির জন্য একটি হরফ ব্যবহার করা হয়, সেই যুগে প্রতিটি শব্দের জন্য একটি হরফ ব্যবহার হতো। যেমন, আমার নাম। আজ যদি আমার নাম তুমি লেখ, তাহলে যেই ধ্বনিগুলোর সমষ্টি আমার নাম, অর্থাৎ ম-হ-ই-ষ, সেই ধ্বনিগুলো পরপর লিখবে। আগের যুগে কিন্তু এমনটা ছিল না। সে যুগে ছোট্ট করে একটা মহিষের সাংকেতিক ছবি এঁকে দেওয়া হতো। এই পদ্ধতির দুটো সমস্যা ছিল। প্রথমত, কোনো সভ্যতার শব্দকোষে যদি হাজারখানেক শব্দ থেকে থাকে, তবে সেই ভাষায় লেখা শিখতে গেলে হাজারখানেক সাংকেতিক ছবি শিখতে হতো। দ্বিতীয়ত, অচেনা কোনো শব্দ লেখার কোনো উপায় ছিল না। তাই পরবর্তীকালে ধ্বনিনির্ভর হরফ তৈরি হলো, যা আমরা আজ ব্যবহার করি।''

''আপনি প্রলয়ের পূর্বের সেই সাংকেতিক ছবি পড়তে পারেন?'' শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে এল উড্ডীনের।

''আগে পারতাম না,'' বলল মহিষ, ''ব্রহ্মার বরদানে এই ভাষা পড়তে শিখেছি। ব্রহ্মাসম্প্রদায়ের একজন পুরাতত্ত্ববিদের কাছেই জানতে পারি এই পুঁথির কথা। ভবিষ্যতে দেশজুড়ে অসুর প্রভুত্ব তৈরি করতে আমাদের প্রধান সহায় হবে এই পুঁথি।''

''কেন?'' প্রশ্ন উড্ডীনের, ''কী এমন আছে এই পুঁথিতে?''

''বলছি,'' হাতের মশালটা পাশে নামিয়ে রেখে বলল মহিষ, ''আগে বলো, লিঙ্গপূজা সম্বন্ধে তুমি কী জানো?''

''লিঙ্গপূজা?'' মুখ বিকৃত করে উঠল উড্ডীন, ''নোংরা ব্যাপার, বলতেও ঘৃণা হয়। লিঙ্গ মানে পুরুষ বা নারীর জননাঙ্গ। নির্বোধ প্রকৃতিপূজকরা জননাঙ্গকে ভক্তি করে। পাথর দিয়ে পুরুষ ও নারীর জননাঙ্গ বানিয়ে তার আরাধনা করে। সেটাকেই ওরা লিঙ্গপূজা বলে। যত্তোসব লজ্জাজনক ঘৃণ্য অন্ধবিশ্বাস!''

''এমনটাই আমরা প্রচার করে থাকি,'' হেসে বলল মহিষ, ''যাতে লোকে লিঙ্গপূজা ছেড়ে অসুস্তম্ভের সামনে মাথা নত করে। কিন্তু সত্যিটা কী, সেটা অন্তত তোমার মতো জ্ঞানী লোকেদের জেনে রাখা উচিত। প্রথমত, জননাঙ্গকে ঘৃণা করার কোনো কারণ নেই। জনন প্রকৃতির এক অনন্য সৃষ্টি, যার মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য বজায় থাকে, প্রকৃতির চক্র চলতে থাকে। এর মধ্যে তো আমি পরমপ্রভুর করুণাই দেখতে পাই।

দ্বিতীয়ত, লিঙ্গ শুধুমাত্র জননাঙ্গর প্রতিরূপ নয়। রাতের আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখো কখনো? প্রতিটি তারাজগৎ দেখতে লিঙ্গের মতো। কেন জানো? লিঙ্গরূপই হলো সরলতম আকৃতি। তাই অনাদি অনন্তর প্রথম ও অন্তিম আকৃতিও লিঙ্গের মতো। লিঙ্গের মূল রূপটি খেয়াল করো। একটি ডিম্বাকার দ্বিমাত্রিক পট্ট থেকে একটি ত্রিমাত্রিক অর্ধডিম্বাকার আকৃতি বেরিয়ে এসেছে। ওই ডিম্বাকার দ্বিমাত্রিক পট্ট হলো চেতনার প্রতিভূ, যার বাস অন্য মাত্রায়। সেটা থেকে বেরিয়ে আসা ত্রিমাত্রিক অর্ধডিম্বাকার আকৃতিটি হলো বস্তুনির্মিত ব্রহ্মাণ্ডের প্রতীক, যার বাস আমাদের মাত্রায়, যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। পট্টপূর্ণ ডিম্বাকৃতি, কারণ চেতনা হলো সম্পূর্ণ। তার ওপরের লিঙ্গ হলো অর্ধডিম্বাকৃতি, কারণ বস্তু-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি কখনো সম্পূর্ণ হয় না। যে ক্ষণে সেই সৃষ্টি সম্পূর্ণ হবে, সেদিন জগতের বিলয় হবে। লিঙ্গের আকৃতি অপরোক্ষানুভূতির দ্বার, পরাজগতের সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র। প্রচার আমরা যাই করি না কেন, আসল সত্যটা জেনে রাখা প্রয়োজন।''

''আমাকে ক্ষমা করবেন,'' বলল উড্ডীন, ''অসু-উপাসনায় সমর্পিত আমার প্রাণ। আজ নতুন করে লিঙ্গপট্টে ভক্তি অর্পণ করতে পারব না। কিন্তু আজ এসব কথা আসছে কেন? আমরা তো নতুন করে লিঙ্গপূজার পরম্পরা পুনরুদ্ধার করতে চাইছি না। চাইছি কি?''

''সেটা নির্ভর করছে কয়েকটা ব্যাপারের ওপর। কিন্তু আগে বলি, এই প্রসঙ্গ এল কেন।

কখনো খেয়াল করেছ কি, কোনো কোনো জায়গায় গেলে হঠাৎ করেই মন বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে? মনে হয়, পুরো পৃথিবীটাই আমার শত্রু? কোথাও গেলে অকারণেই ভীষণ কান্না পায়? আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে জাগে? এর বিপরীতে, এমন অনেক জায়গা আছে, যেখানে গেলে আচমকাই মন সম্পূর্ণরূপে শান্ত সমাহিত হয়ে যায়। অহেতুক খুশিতে ভরে ওঠে মন। প্রকৃতিপূজকরা বলে, এ হলো স্থানমাহাত্ম্য। কথাটা খুব একটা ভুল নয়। পাহাড়-নদী- মাটি-গাছপালা, সবার মধ্যেই রয়েছে এক অদ্ভুত ক্ষমতা। মানুষের মনের ভাবকে সঞ্চিত করে রাখতে পারে এরা। বিশেষ করে পাথরের রয়েছে এই শক্তি অপরিসীম। কোনো পাহাড়ে যদি যোগী ঋষিদের যাতায়াত থেকে থাকে হাজার হাজার বছর ধরে, সেই পাহাড় যোগী ঋষিদের আধ্যাত্মিক শক্তিকে সঞ্চিত করে রেখে দেয়। এরকম জায়গায় গেলে অকারণেই মন সচ্চিদানন্দ স্বরূপ হয়ে ওঠে।

প্রলয়ের পূর্বের ঋষিরা অনুধাবন করেছিলেন, বিশেষ বিশেষ গড়নের বা উপাদানের তৈরি পাথরের রয়েছে বিশেষ বিশেষ ভাবকে আত্মীকরণের ক্ষমতা। সেই জন্য বিশেষ বিশেষ পাহাড় ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব ফেলে মানুষের মনের ওপর। এই উপলব্ধি থেকেই জন্ম নিল ভিন্ন ভিন্ন উপাদান দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন লিঙ্গ তৈরির প্রযুক্তি। তৈরি হলো বিশেষ বিশেষ জ্ঞানান্বেষণের সহায়ক বিশেষ বিশেষ লিঙ্গ। আধ্যাত্মিক ভাব আত্মীকৃত করার জন্য যে লিঙ্গ, শিল্প বা রাজনীতির জন্য সে ততটা সহায় হয় না। শিল্পীর ভাব সমাহিত করার জন্য যে লিঙ্গ, সে আবার কিন্তু যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার পরিবেশ তৈরির জন্য উপযোগী নয়। এমনকী, শুধুমাত্র মানসিক শক্তিতেই সীমিত নয় এই বিজ্ঞান। পৃথিবীর

তড়িৎচুম্বকীয় ক্ষেত্র থেকে শক্তি আহরণ করে সেই শক্তিকে জমা করতে পারে বিশেষ দ্রব্যের তৈরি বিশেষ গড়নের লিঙ্গ। সেই শক্তিকে ব্যবহার করে রাতেও দিনের আলো তৈরি করা যায়।"

"এসব সত্যি কথা?" উড্ডীনের সন্দেহ হলো, "শুনে মনে হচ্ছে, এ সবই প্রকৃতিপূজকদের বানানো গল্পকথা!"

"গল্প নয়," দৃঢ়স্বরে বলল মহিষ, "আমি দীর্ঘদিন ধরে এই নিয়ে খোঁজখবর করে আসছি। এ সবই সত্যি। দুঃখের বিষয়, লিঙ্গনির্মাণের সেই বিদ্যা বিলুপ্ত হয়ে গেছে প্রলয়ের সঙ্গে।"

"বিলুপ্ত? এই পুঁথিতে সেই বিদ্যার বিষয়ে কিছু নেই?" হতাশ গলায় বলল উড্ডীন, "তাহলে এই পুঁথি দিয়ে আমাদের কী লাভ হবে?"

"তুমি বড্ড অধৈর্য!" বিরক্ত হলো মহিষ, "লিঙ্গনির্মাণের বিদ্যা বিলুপ্ত হলেও সেযুগে নির্মিত বহু লিঙ্গ আজও ছড়িয়ে আছে দেশ জুড়ে। এই পুঁথিতে সেরকম তিনটি লিঙ্গের সম্ভাব্য হদিশ আছে। অগ্নিলিঙ্গ–বিশুদ্ধ পারদের তৈরি, সাদা রঙের। আস্থানলিঙ্গ–উল্কা থেকে সংগৃহীত আজানা এক পদার্থের তৈরি, কালো রঙের। আরেকটি হলো পরালিঙ্গ – হীরের তৈরি। এর মধ্যে আস্থানলিঙ্গটি আমাদের কাজের জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন।"

Kasat Marbles

19, R. N. Mukherjee Road
2nd. Floor, Kolkata - 700 001

Ph. No. Office : 2248-9947

Deals in : Marble, Granites Tiles, Ceramic Tiles, Stone etc.

Authorised Dealer of

KAJARIA CERAMICKS LTD.
'NAVEEN' brand tiles
REGENCY CERAMICES LTD.
BELLS CERAMICES LTD.
ORIENT TILES

Showroom :
32A, Tollygunge Circular Rd. kolkata - 53
Show Room - 24004154 / 24002858

Godown :
3, Tarpan Ghat Road. Kolkata - 53
(Mahabirtala, B. L. Saha Road)
Godown : 2403-4014

"কীভাবে?" প্রশ্ন করল উড্ডীন।

"অসুবাদ খুবই সাধারণ এক মতবাদ। অজ্ঞানী ধর্মভীরু লোকেদের ওপর খুব ভালো কাজ করে। কিন্তু যেই না লোকে লেখাপড়া শেখে, প্রশ্ন করতে শুরু করে, অমনি ভেঙে পড়ে অসুবাদের প্রতি নিষ্ঠা। নিজের হাতে বছরের পর বছর ধরে তিলে তিলে আমি অসুবাদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছি জম্বুদ্বীপের কোণায় কোণায়। বছর ঘুরতেই দেখেছি, সে আস্থা ভেঙে পড়েছে। একটা বিরাট জনগোষ্ঠীকে কীভাবে চিরতরে অন্ধ ধর্মভীরু করে তোলা যায়? সেই কাজটাই করে এই আস্থানলিঙ্গ।"

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল উড্ডীন। তারপর বলল, "কোথায় আছে সেই আস্থানলিঙ্গ?"

"এই পুঁথিতে পরিষ্কার লেখা আছে সেই জায়গার সন্ধান, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি," বলল মহিষ, "তোমাকেই দায়িত্ব দিচ্ছি, সেই জায়গাটা খুঁজে বার করো। জম্বুদ্বীপের পশ্চিমপ্রান্তে, অর্বুদ পর্বতের ওপারে এক বৃহৎ লবণ-সমুদ্র রয়েছে। তার নীচে প্রলয়-পূর্ববর্তী এক মন্দিরের গর্ভগৃহে সঞ্চিত রয়েছে সেই তিনটি লিঙ্গ। তুমি আজই সেখানকার উদ্দেশে রওনা দাও।"

"কিন্তু এখানকার কী হবে?" বলল উড্ডীন, "এই মন্দিরের? এই গ্রন্থাগারের, এই স্ফটিকের ত্রিভুজের? এই এত লক্ষ পুঁথি..."

"যেটা প্রয়োজন ছিল, সেটা পেয়ে গিয়েছি," বলল মহিষ, "বাকি আর সব কিছুই মূল্যহীন। না, মূল্যহীন নয়, এসব হলো বিপজ্জনক। এইসব বই পড়লে অসুরদের মনে জিজ্ঞাসা জাগবে, বদখেয়ালের জন্ম হবে। এসব আজই পুড়িয়ে ফেল!"

বিস্ময়ে স্থাণু হয়ে গেল উড্ডীন

এত জ্ঞান যে মানুষটার, সে হেলায় বলছে, লক্ষ লক্ষ বই পুড়িয়ে ফেলতে? এ কোন অদ্ভুত বৈপরীত্য! খুব মনঃকষ্ট হল। কী আছে ওই বইগুলোতে, সেটা কোনোদিনই জানা হবে না। স্বচ্ছ স্ফটিকের চারপাশে ভাসমান গোলকগুলোর রহস্য কী, সেটাও জানা হবে না আর কখনো।

কে জানে, সেটাই হয়তো অসু-র ইচ্ছা! বড্ড মাথা ধরেছে!

উড্ডীন ওপরে ওঠার সিঁড়ি ধরল।

জয়-পরাজয়। সম্মান-অসম্মান। এই দুইয়ের মধ্যে ফারাক মাত্র এক লহমার। মাত্র একটি সিদ্ধান্তের।

জাগ্রস পর্বতের চূড়ায় লাঞ্ছিত অগ্নিমন্দিরের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে পাষাণবৎ বসে ছিল মহিষাসুর। গত এক দশক ধরে তিলে তিলে গড়ে তোলা পরিকল্পনা সাফল্যের স্বাদ পেয়েছে গত রাতে। সে স্বাদ তো অতিশয় মধুর হওয়ার কথা ছিল। তাহলে আজ মুখের স্বাদ এত তিক্ত, এত কটু কষায় কেন? জয় কেন

মাঝেমাঝে পরাজয়ের মতো বেদনাদায়ক হয়ে ওঠে? সম্মান কেন হয়ে ওঠে অসম্মানের চেয়েও বড়ো বোঝা? কেন এমন হয়?

বাতাসে ধোঁয়ার গন্ধ। মৃতদেহের গন্ধ। নোংরা রক্তের গন্ধ।

গলগল করে ধোঁয়া বেরোচ্ছে মন্দিরের গর্ভগৃহ থেকে। সারারাত আগুন জ্বলেছে সেখানে। লক্ষ লক্ষ পুস্তকের বহ্নুৎসব হয়েছে সারা রাত ধরে। আরো কত রাত সে আগুন জ্বলবে, কে জানে! দগ্ধ রুধিরাক্ত সুদীর্ঘ এক নিশার অবসানে সূর্যদেব সবেমাত্র আবির্ভূত হয়েছেন পূর্বদিগন্তে। সেদিকে যতদূর চোখ যায়, তরঙ্গের পর তরঙ্গ নগাধিরাজ হিমালয়ের সমাধিস্থ পর্বতশ্রেণী। ওরই মধ্যে কোনো একটির কোলে লুক্কায়িত আছে ভূস্বর্গ কশ্যপ-মীর। এই সবকিছুর শুরু তো সেখানেই। এই অসম্মান, এই অপমান। গত রজনীর এই বিজয়ের অঙ্কুরও বপন হয়েছিল ওই উপত্যকাতেই। বহুকাল আগে।

বাবা। আজ যদি তুমি বেঁচে থাকতে, তবে দেখতে পেতে, তোমার ছেলে কত বড়ো হয়েছে। যে ভূস্বর্গ থেকে একদিন মাথা নীচু করে কাকার হাত ধরে তুমি চলে এসেছিল, আজ সেই ভূস্বর্গ তোমার ছেলের নাগাল থেকে বেশি দূরে নেই। মাতামহী দনুর দুই সন্তান রম্ভ ও করম্ভকে অবহেলা করার শাস্তি পাবে দৈত্যরা। খুব শিগগিরই পাবে। দিগ্‌বিজয়ী সেনাবাহিনীর পদতলে যেদিন পিষ্ট হবে কশ্যপমুনির গুরুকুল, বাবার আত্মা সেদিন শান্তি পাবে।

'ঠাস' করে একটা শব্দ হলো। তাকিয়ে দেখল, সাদা সাদা কীসব যেন পড়েছে মাটিতে। কী ওগুলো? পাখির ডিম? হ্যাঁ, তিন-চারখানা ডিম। পাহাড়ের খাঁজে কোনো পাখির বাসা থেকে পড়ে গেছে বোধহয়। কী করে পড়ল? ইশ! একটা ডিমের খোলা ভেঙে হলদে-সাদা থকথকে তরল বেরিয়ে আসছে। থিরথির করে কাঁপছে সেই তরল, যেন জীবন্ত। বাতাসে একটা তীক্ষ্ণ গা-গুলোনো গন্ধ। হুশ করে একটা পাখি উড়ে এল। এসে ঠিক ওখানেই বসল। লম্বা ঠোঁট বাড়িয়ে চোঁ করে শুষে নিলো সেই তরলটা। তারপরেই চঞ্চুর উপর্যুপরি নির্দয় আঘাতে ফাটিয়ে ফেললো বাকি ডিমগুলোকে। একি! একটা ডিমের মধ্যে থেকে মাথা বার করেছে ছোট্ট একটা পাখি! রোগা রোগা মাথা, ন্যাড়া গলা। অসহায় চোখদুটো বোঁজা। মাত্র কয়েক মুহূর্ত। চঞ্চুর আরেকটা আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল সদ্যোজাত সেই প্রাণ। চিৎকার করারও অবকাশ পেল না। হত্যালীলা শেষ করে পরিতৃপ্তির সঙ্গে ঠোঁট চাটতে চাটতে উড়ে গেল নোংরা কুৎসিত পাখিটা। মাটিতে শুধু পড়ে রইলো একরাশ ভাঙা ডিমের খোলা।

ভীষণ গা গুলিয়ে উঠল। পেট চেপে হড়হড় করে বমি করে ফেলল মহিষ।

শীতল মৃদু বাতাস বইছে। উদীয়মান ভানুর একটি রশ্মি হাত বাড়িয়েছে ভগ্ন মন্দিরের অগ্নিকুণ্ডের দিকে। ধ্বংসস্তূপের আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে অক্ষয়শিখা, ধরিত্রীর বুকে এক টুকরো সূর্যের মতো তার জ্যোতি রাত্রিব্যাপী অত্যাচারের পরেও সমান অমলিন। বহুযুগ পূর্বে দেখা এক টুকরো দৃশ্য স্মৃতির মেঘ সরিয়ে মানসপটে ভেসে উঠল। কানে ভেসে এল গম্ভীর স্বরে মন্ত্রোচ্চারণের শব্দ। অগ্নিমন্ত্র। বুক ঠেলে একদলা কান্না উঠে এল। ডুকরে কেঁদে উঠল বিশ্বত্রাস দানব।

সেদিন বাবাকে অগ্নিপ্রবেশ থেকে রক্ষা করেছিলেন অগ্নি-প্রমুখ। সম্বলহীন অসহায় শোকবিধ্বস্ত মানুষটাকে বুকের আড়াল দিয়ে আগলেছিলেন। আমাকে ছোটবেলায় কোলেপিঠে করে বড়ো করেছিলেন তিনি। সেই ঋণ গতরাতে সুদে-আসলে চুকিয়ে দিয়েছি আমি। অগ্নি-প্রমুখকে সবংশে হত্যা করে। অগ্নিদেব, আমাকে ক্ষমা করো। আমার শ্রেষ্ঠত্বর পথ তোমার অগ্নি-সমাজের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দিয়েই গেছে। কী করে সে পথ এড়িয়ে যাবো আমি? অকৃতজ্ঞ নরাধম আমি। কিন্তু কী করব, এ যুদ্ধে তো আমাকে জিততেই হতো। এই যুদ্ধে, এর পরের প্রতিটি যুদ্ধে। প্রতিটি অপমানের বদলা নিতে হবে। প্রমাণ করে দিতে হবে, দানবরা দৈত্যদের থেকে কোনো অংশে কম নয়।

বাবা, তুমিও আমাকে ক্ষমা করো। তুমি তো জানতে, সবকিছু একসঙ্গে পাওয়া সম্ভব নয়। কিছু পেতে গেলে কিছু তো ছাড়তেই হয়। কৃতজ্ঞতা ও সাফল্য, এর মধ্যে সাফল্যকেই বেছে নিলাম আমি।

আমি। রম্ভর পুত্র, কশ্যপমুনির পৌত্র, দানব মহিষাসুর।

অনেক বছর পার হয়ে গেছে তারপর।

গ্রামে কি দাঙ্গা লেগেছে?

বাৎসরিক সূর্যপূজা উপলক্ষ্যে গুরুকুল থেকে বাড়িতে ফিরছিল মাতঙ্গী। গ্রামে ঢোকার মুখেই বিরাট একটা ভিড় দেখতে পেয়ে থমকে গেছিল। সবচেয়ে বড়ো পাথুরে জলাশয়ের বাঁকে যে ময়দানটা আছে, সেখানে লোকে লোকারণ্য। অনেক চেনা লোক দেখতে পেল মাতঙ্গী। এরা সব এই গ্রামেরই লোক। চাষি, মজুর। ছোটবেলার সহপাঠী

সংশপ্তককে দেখতে পেয়ে ডাক দিল মাতঙ্গী।

''কী হয়েছে রে?''

এদিক-ওদিক তাকিয়ে সংশপ্তক বলল,

''এখানে নয়। এখানে বলাটা ঠিক হবে না।''

ময়দানের শেষে মরানদীর খাত। নদীর পাড় অনেকটা উঁচু, তারই ধার ধরে ঘন কাঁটাঝোপের জঙ্গল। সেই দিকেই দেখিয়ে বলল সংশপ্তক—

''এদিকে আয়, এখানে কেউ দেখতে পাবে না।''

নদীর উঁচু পাড়ের আড়ালে, ঝোপের পেছনে লুকিয়ে বসল দু'জনে। মাতঙ্গী বলল,

''কী হয়েছে বল তো? এত ভিড়...''

''রাজা বলেছে,'' নীচুস্বরে বলল সংশপ্তক, ''এ বছর মকর সংক্রান্তির সূর্যপুজোর মিছিল বার করতে দেবে না। সূর্যকুন্ডে প্রদীপ ভাসাতে দেবে না, ফুল ভাসাতে দেবে না। সব বন্ধ। লোকে খুব খেপে আছে।''

''কেন?'' মাতঙ্গীর চোয়াল শক্ত হয়ে এল, ''যুগ যুগ ধরে চলে আসা পরম্পরা, রাজা তো এভাবে বন্ধ করে দিতে পারে না।''

''এ রাজ্যে আমাদের অবস্থা সত্যিই খুব খারাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে,'' মাথা নেড়ে বলল সংশপ্তক, ''মহিষাসুর সুশাসন নগরী দখল করে দেশের সীমানায় ঘাঁটি গেড়ে বসল, এ দেশের একটা রাজাও তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়নি। অর্বুদ পর্বতের সূর্যমন্দির ধ্বংস করল অসুররা। মন্দিরের সোনার চূড়া ভেঙে নিয়ে গেল নিজেদের রাজ্যে। রাজা তার বিরুদ্ধেও যুদ্ধযাত্রা করলেন না। বললেন, এটাই নাকি ভাগ্যের বিধান। এখন ওঁর সবচেয়ে বড়ো পরামর্শদাতা হয়েছে সেই অসুর উড্ডীন। লোকটার গতিবিধি খুব সন্দেহজনক। লোকজন নিয়ে নুন-সমুদ্রে দিনরাত কী যেন খুঁজে বেড়ায়। ব্যাটা ধুরন্ধর, রাজাকে ঘুষ দিয়ে এক্কেবারে হাত করে ফেলেছে।''

''কিন্তু এই বাৎসরিক সূর্যপুজো তো যুগ যুগ ধরে চলে আসছে,'' বলল মাতঙ্গী, ''আমাদের সবচেয়ে বড়ো উৎসব এটা। বিনা কারণে রাজা কী করে এটাকে বন্ধ করে দিলেন?''

''কারণ তো রয়েছে,'' দুঃখের হাসি হেসে বলল সংশপ্তক, ''কারণ নয়, অজুহাত। মিছিল করে সূর্যকুণ্ডে গেলে নাকি গ্রামের শান্তিভঙ্গ হবে। দাঙ্গা হবে। আসল ব্যাপার হলো, ইদানীং আমাদের গ্রামের অসুররা বড্ড মারমুখী হয়ে উঠেছে। কথায় কথায় ঝগড়া মারপিট, মাঝেমাঝেই রাতের অন্ধকারে সূর্যকুণ্ডের জলে নোংরা রক্ত ফেলে দিয়ে যায়। প্রকাশ্যে গলাবাজি করে বলে, আমরা নাকি কুসংস্কারাচ্ছন্ন। অসুরদের পাড়ায় রাতে জলসা বসে। তাতে ওদের ধর্মগুরুরা এসে আমাদের সূর্য-উপাসনা সম্বন্ধে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। তাতে সমবেত লোকেরা সবাই সায় দেয়। ভাবতে পারিস?''

''এসব দেখেশুনে একটা গল্প মনে পড়ে গেল,'' দুঃখের হাসি হেসে বলল মাতঙ্গী।

''কীগল্প?'' কৌতূহলী হলো সংশপ্তক। এই পরিস্থিতির মানানসই গল্প?

''জানিস তো,'' বলল মাতঙ্গী, ''ব্যাং হলো শীতল রক্তের প্রাণী। পরিবেশের তাপমাত্রা বাড়লে ব্যাংকে রীতিমতো কষ্ট করে নিজের শরীরটাকে ঠাণ্ডা রাখতে হয়। একদিন কী হলো, একটা লোক কানা-উঁচু জলভরা পাত্রে একটা ব্যাংকে ছেড়ে দিল। ব্যাংটা ভাবল, ভালোই তো আছি, আরেকটু থাকি এরকম। দুষ্টু লোকটা এবার সেই পাত্রের জলকে খুব ধীরে ধীরে গরম করতে থাকল। গরমে নিজেকে ঠাণ্ডা রাখতে ব্যাং বেশ খানিকটা শক্তি খরচ করে ফেলল, ক্লান্ত হয়ে পড়ল। একবার ভাবল, লাফিয়ে পালাই। তারপর ভাবল, আরেকটু দেখি না, জলটা এমন আর কী গরম, মানিয়ে তো নিয়েছি। ধীরে ধীরে জলের তাপমাত্র আর বাড়ল। ব্যাঙটা আবার ভাবল, পালাই। তারপরেই ভাবল, আরেকটু দেখি, আপাততঃ শরীটাকে ঠান্ডা করি। এমনি করে জলের তাপমাত্রা যত বাড়ল, ব্যাঙ ততই শরীরকে ঠান্ডা রাখতে গিয়ে আরও শক্তি খরচ করে ফেলল। শেষমেশ জল ফুটতে থাকল। ব্যাং তখন এতটাই ক্লান্ত, যে পালিয়ে আত্মরক্ষা করার ক্ষমতা আর নেই। ফুটন্ত জলে সেদ্ধ হয়ে মারা পড়ল বেচারা ব্যাং!''

''বুঝলাম কী বলতে চাইছিস,'' হেসে বলল সংশপ্তক, ''মানিয়ে তো নিয়েছি, আরেকটু মানিয়ে নিই, এই চক্করে পড়ে আমরা চোরাবালিতে তলিয়ে যাচ্ছি। ঠিক কথা। এত আগ্রাসন মেনে নেওয়া ঠিক হয়নি। কিন্তু আগে এমনটা ছিল না রে। এখন যত দিন যাচ্ছে, গ্রামের অসুরগুলো এক এক করে সবাই ভীষণ গোঁড়া হয়ে যাচ্ছে। ওদের ধর্মগুরুরা যা বলছে, সবকিছুকেই বিনা প্রশ্নে মহাজাগতিক সত্য বলে মেনে নিচ্ছে। দেখেশুনে মনে হয়, লোকগুলোকে কেউ সম্মোহন করছে। কিন্তু সেটাই-বা কী করে হয়?''

''সে সম্ভাবনাটাকে বাদ দিচ্ছিস কেন?'' বলল মাতঙ্গী, ''ভেবে দেখ, যে লোকগুলো আগে নিরীহ ছিল, এখন হঠাৎ বাড়াবাড়ি শুরু করেছে, তাদের মধ্যে কোনো একটা মিল নিশ্চয়ই আছে।''

''মিল? কীরকম মিলের কথা বলছিস?'' চিন্তায় পড়ে গেল সংশপ্তক, ''অর্থনৈতিক মিল? সামাজিক অবস্থার মিল? সেরকম কিছু তো...''

''না, সেরকম মিল নয়,'' মাথা নেড়ে বলল মাতঙ্গী, ''ধর, এই লোকগুলোর জীবনে কি সাম্প্রতিককালে কোনো সংকট, কোনো বড় পরিবর্তন এসেছে? কিংবা এরা কি কারোর সঙ্গে দেখা করেছিল? কোথাও বেড়াতে গিয়েছিল?''

''ভালো কথা মনে করিয়েছিস,'' সংশপ্তকের চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল, ''অসুরদের একটা তীর্থস্থান আছে, জানিস তো? মধ্যভারতে মহিষাসুরের গ্রাম যেখানে আছে, সেখানটায়। ইদানীং আমাদের গ্রাম থেকে সেখানে যাওয়ার হিড়িক পড়েছে। যাতায়াত, থাকা, খাওয়ার যাবতীয় খরচ যোগাচ্ছে উড্ডীন। আর হ্যাঁ, দেখেছি, ওখান থেকে ফিরে এসেই লোকগুলো কেমন যেন অন্যরকম ব্যবহার শুরু করে। কেমন যেন দূরের মানুষ হয়ে যায়। সর্বক্ষণ মাথায় মোষের খুলির মুকুট পরা শুরু করে। আমাদের সঙ্গে খাওয়াদাওয়া, মেলামেশা বন্ধ করে দেয়।''

''তার মানে,'' ভ্রূ কুঁচকে বলল মাতঙ্গী, ''ওই জায়গাটার কোনো একটা রহস্য আছে। কেউ ওখানে লোকগুলোর মগজ ধোলাই করছে।''

''এ কি আদৌ সম্ভব?'' অবাক হয়ে বলল সংশপ্তক, ''মগজ ধোলাই?''

''সেটা ওখানে না গেলে বোঝা যাবে না,'' বলল মাতঙ্গী।

''কে যাবে সেখানে?'' সংশপ্তকের স্বরে দ্বিধা।

''আমি যাব,'' দৃঢ় গলায় বলল মাতঙ্গী।

''আমিও যাব তোর সঙ্গে,'' বলল সংশপ্তক।

''না,'' বলল মাতঙ্গী, ''আমি একাই যাব। তোকে অন্য একটা কাজ দিচ্ছি।''

''কী কাজ?'' প্রশ্ন করল সংশপ্তক।

''এটা তো মানবি, ব্যাঙের মতো বসে বসে সেদ্ধ হওয়ার থেকে একবার লড়ে মরা ভালো? এতকালের পরম্পরা আমাদের বাৎসরিক সূর্যপূজা, রাজা সেটা জোর করে বন্ধ করে দেবে, এ হতে দেওয়া যায় না। গ্রামের লোকজনদের জড়ো করে আমরা এর প্রতিবাদ করব। তোর বিষ্ণুর দলবলকেও খবর দে। আগামীকাল ভোরবেলা রাজার আদেশ অমান্য করেই আমরা এ বছরের সূর্যপূজা করব। পুজো শেষ হলেই আমি রওনা হব। তারপর কী হবে, জানি না। হয়তো অনেক দমনপীড়ন নেমে আসবে গ্রামবাসীদের ওপর। সেটা তোকে সামলাতে হবে।''

''তোর যেটা ঠিক মনে হয়,'' দুঃখের সুরে বলল সংশপ্তক, ''তুই সবসময় সেটাই করিস। আমার কোনো কথাই শুনিস না। শত্রুর খাস এলাকার মধ্যে তুই একলা যাবি, আমি সেটা কীভাবে মেনে নিই?''

''আমাকে নিয়ে চিন্তা করিস না,'' সংশপ্তকের কাঁধে হাত রেখে বলল মাতঙ্গী, ''আমি ঠিক থাকব।''

কেন কে জানে, হঠাৎ করেই শরীর অবশ হয়ে এল সংশপ্তকের। গলা দিয়ে স্বর বেরল না।

পরদিন সূর্য ওঠার আগেই গ্রামশুদ্ধ সব সূর্য-উপাসক দল বেঁধে বের হলো মকর সংক্রান্তির বাৎসরিক উৎসব পালন করতে। হাতে প্রদীপ, ফুল, ফল ও নানান অর্ঘ্য। গান গাইতে গাইতে সবাই পৌঁছল সূর্যকুণ্ডের সামনে। সূর্যদেবের নামে তুমুল জয়ধ্বনির সঙ্গে বাৎসরিক পূজা সাঙ্গ হলো। উৎসবের শেষে সবাই জড়ো হল সূর্যকুণ্ড সংলগ্ন মাঠে। একে অপরকে প্রসাদ খাইয়ে দিল, মাথায় তিলক পরিয়ে দিল।

দূর প্রান্তরে ধুলোর ঝড়, সঙ্গে গোঁ গোঁ শব্দ। যেন একঝাঁক ভীমরুল ছাড়া পেয়ে এদিকেই আসছে। আতঙ্কে চিৎকার করে কেঁদে উঠল বাচ্চারা। দেখতে দেখতে কালো রক্তস্রোতের বন্যার মতো মহিষ-বাহিনী এসে পড়ল। হুড়োহুড়ি পড়ে গেল গ্রামবাসীদের মধ্যে। ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ল মাতঙ্গী। যখন মাথা তুলল, দেখল গ্রামের লোকজন যেখানে জড়ো হয়েছিল, একরাশ থ্যাঁতলানো মাংস তালগোল পাকিয়ে পড়ে আছে সেখানে। যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে কেউ কেউ, বাকিরা নিথর প্রাণহীন দেহে রূপান্তরিত হয়েছে। যারা এদিক ওদিক ছিটকে পড়ে বা পালিয়ে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল, তারা দেখল, মহিষবাহিনী ফিরে আসছে আরেক দফা গণহত্যা করতে। ঘৃণায় সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল মাতঙ্গীর। নিরীহ গ্রামবাসীদের জব্দ করতে এত আয়োজন?

সবার আগে যে মোষটা দৌড়ে আসছিল, হাতের দড়িটা তার দিকে ছুঁড়ে দিল মাতঙ্গী। নিমেষে সে দড়ি ফাঁস হয়ে কণ্ঠরোধ করল মোষের। দড়ির হ্যাঁচকা টানে মাতঙ্গী লাফিয়ে গিয়ে পড়ল মোষের পিঠে। কোমর থেকে একটানে বার করে আনল ওর চিরসঙ্গী বেঁটে তরোয়ালটা। এক কোপে মুণ্ডহীন হলো মোষের আরোহী।

দলপতিকে প্রাণ হারাতে দেখে থমকে দাঁড়াল মহিষবাহিনী। গ্রামবাসীরা সশস্ত্র প্রতিরোধ করবে, এমনটা দুঃস্বপ্নেও ভাবেনি ওরা। সেই মুহূর্তেই সমবেত শঙ্খের শব্দে চমকে উঠল শত্রুরা। ওদের ভাববার সময় না দিয়ে সঙ্গীসাথী নিয়ে সংশপ্তক ঝাঁপিয়ে পড়ল মহিষবাহিনীর ওপর। ল্যাজ গুটিয়ে পালাল অসুররা।

তলোয়ার কোষবদ্ধ করে দড়ির ফাঁস কোমরে জড়ালো মাতঙ্গী। আহত একজনকে কোলে তুলে নিতে যাচ্ছিল, সংশপ্তক এসে বাধা দিল।

''তুই যা তাড়াতাড়ি'', বলল সংশপ্তক, ''আমরা এদিকটা দেখছি। খুব শিগগিরই দলবল নিয়ে অসুরগুলো আবার ফিরে আসবে। তখন গ্রাম থেকে বেরনো মুশকিল হবে। সময় থাকতে এখনই পালা। যা, শিগগির!''

দু'দিন দু'রাত পর আরাবল্লীর অন্য পারে পৌঁছল মাতঙ্গী। পাহাড় থেকে নামতে নামতে দেখল, সামনে লম্বা লম্বা গাছ, তার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে ধু ধু তেপান্তরের মাঠ, গোরু ভেড়া ছাগল চরছে। মাঠের পরে দূরে দেখা যাচ্ছে শস্যখেত, যেদিকে দু'চোখ যায় শুধু তার শ্যামল সরসতা। ফাঁকে ফাঁকে নীল জলাশয়। মাঝে উঁকি দিচ্ছে ছোট্ট একটা গ্রাম। গ্রামের শেষে নদী, তার ওপারে জঙ্গল। দিগন্তের কাছে একসারি নীল পাহাড়, জঙ্গলে এসে মিশেছে।

আরাবল্লীর ওদিকে ছিল মরুভূমি, কিন্তু এদিকে এরকম একটা গাছগাছালি ভরা জায়গা, কী করে এমনটা হয়? মাতঙ্গীর মনে পড়ল, গুরুকুলেও এই সম্বন্ধে একটা পুঁথি পড়েছিল। সমুদ্র, নদী বা জলাশয় থেকে যখন জলভরা মেঘ আসে, সেটা

কোনো পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে। সেই কারণেই পাহাড়ের এক ঢালে সবুজ খেত ও বৃষ্টি, তো অন্য ঢালে মরুভূমি। জলভরা মেঘ যদি পাহাড় ডিঙোতে না পারে, তবে অন্যদিকে বৃষ্টি হবে কী করে? আরাবল্লী তার বুক দিয়ে আগলে রেখেছে মধ্যভারতের শস্যশ্যামল ভূভাগকে, থর মরুভূমির বালির ঝড় থেকে। যাবতীয় রুক্ষতা নিজে শুষে নিয়ে ত্রাণ করেছে ভারতভূমিকে। মা আরাবল্লীকে প্রণাম করে মাতঙ্গী এগোল গন্তব্যের অভিমুখে।

গ্রামে এক গৃহস্থের বাড়িতে একদণ্ড বিশ্রাম নিয়ে নদীর দিকে হাঁটা দিল মাতঙ্গী। নদীর ধারে বুড়ো বটগাছ, তার নীচে এক অঘোরী সাধক ধ্যান করছে। সাধককে দূর থেকে প্রণাম করে নদীতে পা বাড়লো। পাহাড়ি নদী, তার ওপর এখন শীতকাল। হাঁটুজল মাত্র, হেঁটেই পার হওয়া গেল। ওপারে পৌঁছনোর কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘন জঙ্গলের এলাকা শুরু হলো। তার সঙ্গেই রাতের আঁধার নামল। পচা পাতায় ঢেকে আছে পায়ে চলা পথ। নাম-না-জানা কত না গাছ এঁকেবেঁকে আকাশের দিকে মাথা তুলে দেওয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যেন বলছে মাতঙ্গীকে, আর এগিয়ো না! আকাশ ঘন কালচে-নীল। মেঘ জমেছে। কানে ভেসে আসছে জঙ্গলের ছোটখাট নানান শব্দ। একটা হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডা বাতাস মাঝে মাঝে চমকে দিয়ে যাচ্ছে। সে বাতাসে পচা পাতার গন্ধ। পথ যেন আর ফুরায় না।

হঠাৎ করেই বৃষ্টি শুরু হলো। সঙ্গে বিদ্যুৎচমক, ঝোড়ো বাতাস। চলার গতি বাড়িয়ে দিল মাতঙ্গী। কিছুক্ষণ পরে বজ্রপাত থেমে গেল, কিন্তু বৃষ্টির যেন দ্বিগুণ হয়ে ফিরে এল। নাঃ, এই অবস্থায় অচেনা জঙ্গলে পথ চলা নিরাপদ নয়। জুতসই একটা গাছ দেখে তার উঁচু ডালে আশ্রয় নিল মাতঙ্গী। দড়ি দিয়ে নিজেকে গাছের ডালের সঙ্গে বাঁধল, পাছে ঘুমের ঘোরে পিছলে পড়ে যায়।

ভিজে জামাকাপড়, ঠাণ্ডা বাতাস। ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে নিজের অজান্তেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। সে ঘুম ভাঙল শেষরাতে, বৃষ্টি তখন থেমে গেছে। পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে আকাশে। দূরে দিগন্তের কাছে আগুনের আভা দেখা যাচ্ছে। আলো হয়ে আছে পূর্বদিগন্ত। ভোর হচ্ছে কি? না, সূর্যের আলো নয়। মনে হচ্ছে, ওখানে আগুন লেগেছে। এত বৃষ্টি হলো, তারপর তো দাবানল লাগতে পারে না। তাহলে ওটা কি মানুষের তৈরি আলো? ওখানে কি কোনো জনপদ রয়েছে?

এই জঙ্গলের মধ্যে জনপদ? কখনো তো শোনেনি এর কথা! তাহলে কি ওটাই মহিষাসুরের সেই গ্রাম?

সকালবেলা আবার হাঁটা শুরু করল মাতঙ্গী। দুপুর নাগাদ পথে পড়ল একটা জলাশয়। পাড় ধরে জংলী কুলের গাছ। অনেক কুল পড়ে আছে গাছের তলাতেও। কুল ও জল খেয়ে গাছের তলায় শুয়ে একটু বিশ্রাম নিল, তারপর আবার হাঁটা শুরু করল।

এখান থেকে জঙ্গল চড়াই উঠতে শুরু করেছে। দেখল, মাটির রং এখানে অন্যরকম। এক টুকরো পাথর হাতে তুলে নিয়ে দেখল, আগ্নেয় পাথর। সম্ভবত মধ্যভারতের এই গোটা মালভূমিটাই আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফসল, লাভা জমাট বেঁধে তৈরি। এরকম ঘন বনে রাত্রি খুব তাড়াতাড়ি নামে। অন্ধকার নামার সঙ্গেই মুখর হয়ে উঠল জঙ্গল। ঝিঁঝিপোকার ঝিঁঝি, তরক্ষুর নোংরা হাসি। ফলখেকো বাদুড়ের গাছ ছেড়ে উড়ে যাওয়ার ঝটপট। তার সঙ্গে একটা অন্য শব্দ মিশে আছে। প্রকৃতির স্বাভাবিক শব্দ সেটা নয়। মনুষ্য জগতের শব্দ। বাঁ হাতের মুঠিতে তরোয়ালের বাঁট শক্ত করে আঁকড়ে ধরে পায়ের গতি আরও বাড়িয়ে দিল মাতঙ্গী। মাঝরাতের আগেই পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে গেল।

ওপারের দৃশ্য স্তম্ভিত করে দিল মাতঙ্গীকে।

চারিদিক জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়ে ঘেরা এক উপত্যকা। এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড় প্রতিটি গিরিবর্ত্ম আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে পাথরের ইটের তৈরি প্রাচীর। ভারী দরজা ও কড়া প্রহরা প্রতিটি প্রাচীরে। উপত্যকার বাইরে থেকে খরস্রোতা এক পাহাড়ি নদীর জলধারা পাহাড়ের ফাটলের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করেছে উপত্যকায়। পাথরের ইটের নালা ও পোড়ামাটির নলের সমন্বয়ে সৃষ্ট এক জাল সেই পয়স্বিনীকে ছড়িয়ে দিয়েছে গ্রামের সর্বত্র।

রাতের আঁধার দিন হয়ে আছে হাজার হাজার মশালের আলোয়।

উপত্যকার ধার ধরে তাঁবুর সারি। তার ঠিক মাঝখানে মণ্ডলাকৃতি এক ভূমি। সীমানা ধরে পাথরের চাঁই রাখা আছে, সম্ভবত সেই ভূমিকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করার জন্য। ভূমির ঠিক মাঝখানে পাথরের বেদী। সেই বেদীর ওপর বিরাজ করছে কালো পাথরের তৈরি একটি লিঙ্গ। লম্বায় দু'মানুষ উঁচু। যে পাথরের বেদীর ওপর লিঙ্গ বিরাজমান, সম্ভবত সে বেদী মনুষ্যনির্মিত নয়। আগ্নেয় লাভা মাটি ভেদ করে বেরিয়ে এসেছিল কোনো এক কালে, সেই লাভা জমে বেদীর মতো আকৃতি নিয়েছে। হাজারে হাজারে মানুষ জমায়েত হয়েছে সেখানে। পরনে তীর্থযাত্রীদের উপযোগী অঙ্গবস্ত্র, মাথায় মহিষ-করোটির শিরস্ত্রাণ। সবাই উচ্চস্বরে কী এক দুর্বোধ্য মন্ত্র আবৃত্তি করতে করতে প্রদক্ষিণ করে চলেছে লিঙ্গের চারপাশে। দূর থেকে মনে হচ্ছে, যেন একটা প্রকাণ্ড অজগর সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে পিষে মারছে তার শিকারকে। নিরন্তর, নিরন্তর।

গা শিরশির করে উঠল, ভয়ে কেঁপে উঠল মাতঙ্গী। গুরুকুলে ওর প্রিয় বিষয়গুলোর মধ্যে একটা ছিল, মনের ওপর বিভিন্ন শব্দের প্রভাব। সেই আহরিত বিদ্যা বলে দিল মাতঙ্গীকে,

অত্যন্ত অশুভ এ মন্ত্র! মানব মনের যাবতীয় কদর্যতাকে জাগিয়ে তোলে এ মন্ত্র! কিন্তু কেন কে জানে, এক অমোঘ আকর্ষণ অনুভব করল মাতঙ্গী। মনে হলো, ন্যায়-অন্যায়, শুভ-অশুভ যা কিছু এতদিন শিখে এসেছে, সব ভুল। লোভ, সর্বগ্রাসী লোভ। ওকে চুম্বকের মতো টানতে লাগল সেই লিঙ্গ, সেই মন্ত্রের অনুরণনের মধ্যে আত্মসমর্পণ করতে। সম্মোহন, সর্বগ্রাসী সম্মোহন।

আরও কিছুক্ষণ ওই অবস্থায় থাকলে কী হতো, বলা যায় না। চমক ভাঙল ঠাণ্ডা ধাতব খোঁচায়। মাতঙ্গী দেখল, মাথায় মহিষ-করোটি, পাঁচজন পাহারাদার অসুর সৈন্য ঘিরে ফেলেছে তাকে। কানের কাছে শিসের মতো তীক্ষ্ণ একটা শব্দ হলো, অন্ধকারে বিদ্যুৎরেখার মতো একটা তারোয়াল নেমে এল ওর ঘাড় লক্ষ্য করে। লাফিয়ে একপাশে সরে গিয়ে আত্মরক্ষা করল মাতঙ্গী। কোমর থেকে দড়ি খুলে ছুঁড়ে দিল আততায়ীর পা লক্ষ্য করে। সেই দড়ি পায়ে জড়িয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ল ওর আক্রমণকারী, পাহাড় থেকে সটান গড়িয়ে গেল নীচে। সেই সুযোগে মাতঙ্গী কোমর থেকে তলোয়ার বার করে আমূল বসিয়ে দিলে আরেকজন প্রহরীর বুকে।

মাথার পেছনে একটা আঘাত। আঁধার ঘনিয়ে এল চোখে।

জ্ঞান ফিরল, তখন ওর হাতদুটো পিছমোড়া করে বাঁধা। কোমরে দড়ি। একজন প্রহরী ওকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। দুজন প্রহরী খোলা তরোয়াল হাতে দুপাশে হাঁটছে। তাদের পেছন পেছন চলেছে আরও জনকুড়ি সৈন্য।

এত প্রহরী এই এলাকায় কেন? কেন এত সতর্কতা? বিরাট একটা কিছু ঘটছে ওখানে। পাহাড়প্রমাণ ষড়যন্ত্র। দেশসুদ্ধ লোকের মগজ ধোলাইয়ের ষড়যন্ত্র হচ্ছে। এটাকে থামানোর ব্যবস্থা করতে হবে কাউকে। কিন্তু বাইরের কেউ এসব জানতে না পারলে কে কী ব্যবস্থা নেবে? কী হবে এখন? নিজের প্রাণের চিন্তা নেই। কিন্তু যে ভাবেই হোক, এখানকার খবর বাইরে পৌঁছে দিতে হবে! কিন্তু কী করে? না, যে করেই হোক, মুক্ত হতে হবে।

ইচ্ছে করেই আচমকা হোঁচট খেল মাতঙ্গী, এক পাক ঘুরে চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। ওর সঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সেই পাহারাদার, যে ওর কোমরের দড়িটা ধরে টানছিল। লোকটা মাটিতে পড়ার আগেই লোকটার কণ্ঠায় মাতঙ্গী আঘাত হানল পা দিয়ে। ''অঁক!'' শব্দের সঙ্গে লোকটার কণ্ঠার হাড় ভেঙে গেল। টান মেরে নিজের বাঁধন ছিঁড়ে ফেলল মাতঙ্গী।

পাশের লোকদুটো দৌড়ে এল। একজনের পেটে কষে লাথি মারল মাতঙ্গী, অন্যজনের গলা আঁকড়ে ধরে এক লাফ মারল পাহাড়ের ঢাল বেয়ে। ওদের পেছনে যে আরও কুড়িজন সৈন্য ছিল, তারা হইহই করে দৌড়ে এল। তন্নতন্ন করে খুঁজল সর্বত্র, কিন্তু কোথাও খুঁজে পেল না মাতঙ্গীকে। কিংবা সেই অন্য পাহারাদারটাকে। প্রায় এক দণ্ড ধরে খোঁজাখুঁজি করার পর সৈন্যরা পাহাড়ের অন্য ঢালে খুঁজতে গেল।

কী হলো মাতঙ্গীর? কোথায় অদৃশ্য হলো ও?

গড়িয়ে নামতে নামতে একরাশ পচা পাতার সমুদ্রের মধ্যে ডুব দিল মাতঙ্গী। সেই মুহূর্তেই, যে লোকটার গলা ও আঁকড়ে ধরে ছিল, তার মুখ দিয়ে বোবা একটা অস্ফুট আর্তনাদ বেরিয়ে এল। হাতে আঠালো চ্যাটচ্যাটে ভাব। রক্তের গন্ধ। অন্ধকারে হাতড়ে ও অনুভব করল, লোকটার পিঠে একটা চিমটে আমূল বিঁধে আছে।

লোকটাকে কে মারল? ভূত? চিমটে দিয়ে মারল? ছুরি নয়, তরোয়াল নয়, চিমটে? চিমটের মুখ খুব ধারালো হয়। ঠিক যেন দু'মুখ ওয়ালা ছুরি!

অনেকক্ষণ পর, যখন অনুসন্ধানরত সেপাই-সান্ত্রীদের হাঁকডাক মিলিয়ে গেছে জঙ্গলের নৈঃশব্দে, পাতা ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল মাতঙ্গী। ঠিক সেই মুহূর্তে অন্ধকারের গর্ভ থেকে প্রেতের মতোই ওর সামনে আবির্ভূত হলো প্রেতকল্প এক অঘোরী সাধক। মাথায় জটা, দাড়িগোঁফ। পরনে কৌপীন, ছাই মাখা শরীর, হাতে ত্রিশূল। সেই অঘোরী বাবা, যাকে নদীর পাড়ে দেখেছিল ও।

''কোথাকার মেয়ে তুই?'' বলল সেই সাধক, ''এখানে কী করছিস?''

সব কথা খুলে বলল মাতঙ্গী। শুনে হতাশায় মাথা নাড়ল সাধক।

''গ্রামে ফিরে যাস না। ওদিককার পরিস্থিতি খুব খারাপ। তোকে আর তোর বন্ধুদের মহিষাসুরের লোকেরা গোরুখোঁজা খুজছে। কয়েকজনকে তো খুঁজে পেয়েও গেছে। তাদের সবার গর্দান গেছে।''

''আমি এখন কী করব?'' কান্না দলা পাকিয়ে উঠল মাতঙ্গীর গলার মধ্যে।

''এই এলাকাটা আর তোর জন্য নিরাপদ নয়। এখান থেকে যত দূর সম্ভব চলে যা।''

''কিন্তু কোথায় যাব?''

''পূবদিকে যা। ব্রঙ্গায় এখনো অসুররা ঢুকতে পারেনি। সেখানে একবার আশ্রয় নিতে পারলে আর চিন্তা নেই।''

''ব্রঙ্গার পথ কোনদিকে, সেটা আমাকে দেখিয়ে দিতে পারেন?''

''নিশ্চয়ই পারি,'' হেসে বলল সাধক, ''আয়, আমার পেছন পেছন আয়। শুধু রাস্তা দেখানো নয়, তোকে আমি মালব রাজ্যের সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দেব। পথে যেতে যেতে বেশ কয়েকটা গুপ্তবিদ্যা তোকে শিখিয়ে দেব আমি। পরে কাজে লাগবে তোর।''

মৃত প্রহরীর শরীর থেকে চিমটেটা টেনে বার করে নিল

সাধক, তারপর পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নীচের দিকে হাঁটতে শুরু করল ওরা দু'জন। গন্তব্য পূর্বদিকে, মহিষাসুরের গ্রামের উলটোদিকে।

''আমার গ্রামে কী ঘটছে,'' হাঁটতে হাঁটতে প্রশ্ন করল মাতঙ্গী, ''সেটা আপনি জানলেন কী করে?''

''আমরা সব জানি,'' মুচকি হেসে বলল সাধক, ''এটাও জানি, ওই সামনে একটা লোকের লাশ পড়ে আছে। লোকটার বুকে তোর বেঁটে তরোয়ালটা এখনো বিঁধে আছে। যা, ওটা বার করে নে। ভবিষ্যতে তোর অনেক কাজে লাগবে ওটা।''

পদ্মাসনে বসে ছিল সংশপ্তক।

ইচ্ছে ছিল ধ্যান করার। কিন্তু আজ বারবার মনঃসংযোগ বিঘ্নিত হচ্ছে। চোখ বুজলেই বারবার ভেসে আসছে চেনা মুখগুলোর মিছিল। তাদের অনেকেই আজ আর নেই ওর চারপাশে। কেউ মারা গেছে, কেউ পালিয়ে গেছে গ্রাম ছেড়ে। মাতঙ্গী কোথায় গেল, কে জানে? মাত্র ক'বছরে জীবনটা কতখানি বদলে গেল!

চাঁদের আলোয় ধপধপ করছে সাদা মরুভূমি। যতদূর চোখ যায়, জনমানবের চিহ্ন নেই। যদিও সংশপ্তক জানে, সেটা ঠিক নয়। ওই মরুপ্রান্তরের কোনো এক গহ্বরে ঘাঁটি গেড়ে সমগ্র পশ্চিম ভারত শাসন করছে অসুররা। করাচপা ও লোথাল, পশ্চিমের দুটি প্রধান সমুদ্রবন্দরই এখন ওদের নিয়ন্ত্রণে। ইচ্ছে করে, সমূলে ওদের উৎপাটিত করতে। কিন্তু সামর্থ্য নেই। এই সময়গুলোতে নিজের হাত কামড়াতে ইচ্ছে করে সংশপ্তকের।

দূরে উত্তর দিগন্তের কাছে অন্ধকারের আবরণ ছিঁড়ে আবির্ভূত হলো একসারি উটের দল। আরোহীদের মাথায় মোষের মুকুট। সঙ্গে চলেছে চারটে উটে টানা একটা গাড়ি। সেই গাড়িতে করে একটা সিন্দুক বয়ে নিয়ে চলেছে ওরা। মাটিতে শুয়ে রইল সংশপ্তক, যাতে অসুররা ওকে দেখতে না পায়। উটের দল দক্ষিণ দিগন্তে মিশে যাওয়ার পর ও উঠে বসল।

ঘাঁটিতে যাচ্ছে না। ঘাঁটি থেকে অন্য কোথাও যাচ্ছে। দক্ষিণদিকে যাচ্ছে, তার মানে বোধহয় লোথাল বন্দরে যাচ্ছে। সিন্দুকে করে কী নিয়ে যাচ্ছে? রত্ন? কিন্তু রত্ন তো পাচার হয় জাহাজে করে, করাচপা বন্দর হয়ে। আজ হঠাৎ লোথাল হয়ে কেন? এতগুলো পাহারাদার, সঙ্গে মাত্র একটা সিন্দুক রত্ন কেন?

সাদা মরুপ্রান্তরের রং হঠাৎ করেই ঘোলাটে হয়ে উঠল। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল সংশপ্তক, চাঁদের সামনে অনেক মেঘ জড়ো হয়েছে।

এরপরের একটা ঘটনা ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিল। কপিলমুনির গুরুকুলের ছাত্রী দুর্গার নেতৃত্বে ব্রঙ্গার জনগণ দানবদের পরাজিত করল। মহিষাসুর অপরাজেয়, এই ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হল। দুর্গা আশা করেছিল, দেশের মানুষ এবার মহিষকে ত্যাগ করবে। কিন্তু শোনা গেল, দলে দলে ধর্মান্ধ অসুর পরাজিত মহিষের সেনাবাহিনীতে যোগ দিচ্ছে। তারা নাকি খুব শীঘ্রই ব্রঙ্গা আক্রমণ করবে। সেই নিয়েই আজ মন্ত্রণাসভা বসেছে ব্রঙ্গারাজের গুপ্তকক্ষে।

''ব্যাপারটা সত্যি,'' বলল ভুবনেশ্বরী, ''মধ্যভারতের মালভূমিতে পাহাড় আর জঙ্গলে ঘেরা মহিষের যে গ্রাম, সেখানে কিছু একটা আছে, যেটা মানুষের মনের ওপর অশুভ প্রভাব ফেলতে সমর্থ। মহিষ এখন আর সেখানে থাকে না, কিন্তু সেই গ্রাম এখন দানবদের কাছে এক তীর্থ। দল বেঁধে তারা যায় সেখানে। আমি অনেক লোকের কাছেই শুনেছি, সেখান থেকে ফিরে এসে লোকজনের মতিগতি সম্পূর্ণরূপে বদলে গেছে। মাতঙ্গী ওখানে গিয়েছিল। সেখানে মহিষের গ্রামে ও যা দেখেছে, তার ভিত্তিতে ধরে নেওয়া যায়, ওই কৃষ্ণবর্ণ লিঙ্গ আর ওই মন্ত্রই সব সমস্যার মূল।''

''এমতবস্থায় কী কী বিকল্প আছে আমাদের কাছে?'' বলল দুর্গা।

''ব্রঙ্গার গুপ্তচররা তীর্থযাত্রীর ছদ্মবেশে গ্রামে ঢুকে বিস্ফোটক ব্যবহার করে লিঙ্গটাকে ধ্বংস করে দিতে পারে,'' বলল ব্রঙ্গার গুপ্তচর-প্রধান বিরূপাক্ষ।

''না না,'' মাথা নেড়ে বলল রুদ্র, ''লিঙ্গ নির্মাণের বিদ্যা অবলুপ্ত হয়ে গেছে। বহুদিন ধরে সেই বিদ্যা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছে শিবসংগঠন। ভারতভূমির যেখানেই লিঙ্গর মতো গড়নের কোনো পাথর আমরা পাই, জোগাড় করে এনে তার গুণাগুণ অনুসন্ধান করি আমরা। সেখানে এইরকম একটা শক্তিশালী লিঙ্গ রয়েছে হাতের কাছেই, আর সেটাকে আমরা

ধ্বংস করে ফেলব? অসম্ভব! শিবপ্রমথদের কাছে তাহলে আমি মুখ দেখাব কীভাবে? ইতিহাসের কাছেই-বা আমরা মুখ দেখাব কীভাবে? ধ্বংস নয়, ওটাকে চুরি করতে হবে।"

"আমাকে ক্ষমা করবেন," বলল বিরুপাক্ষ, "জানেন তো, আস্থানলিঙ্গর উচ্চতা দু'মানুষ সমান। ধাতুনির্মিত, নিরেট। মহিষের গ্রামে কীরকম দুর্ভেদ্য প্রতিরক্ষা রয়েছে, সেটা তো মাতঙ্গীর কাছে শুনলেন। তার ওপর দিনরাত সেই লিঙ্গ ঘিরে প্রদক্ষিণ করে অসুররা। কেল্লার মতো সুরক্ষিত এক গ্রাম ভর্তি ধর্মান্ধ অসুরদের মধ্যে থেকে তাদের উপাসনার বস্তুকে চুরি করে নিয়ে আসতে হবে। এ তো আত্মহত্যার শামিল। জেনেশুনে আমার গুপ্তচরদের আমি মৃত্যুমুখে ঠেলে দিই কী করে?"

"ওটার কারণে বিরাট ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে," বলল দুর্গা, "যতদিন ওটা রয়েছে, ততদিন অসুরদের সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করা সম্ভব নাও হতে পারে। সেই ক্ষতির তুলনায় একটা লিঙ্গ ধ্বংসের ক্ষতি নগণ্য।"

"যে লিঙ্গ মানব মনে গোঁড়ামির জন্ম দেয়," বলল মাতঙ্গী, "সেই লিঙ্গ তো ক্ষতিকারক। সেটাকে টিকিয়ে রেখে মানবসভ্যতার কী উপকার হবে?"

"যেকোনো ওষুধের অপব্যবহার ক্ষতিকর," বলল রুদ্র মহাদেব, "সেটা ওষুধের দোষ নয়, দোষ ব্যবহারকারীর। আস্থানলিঙ্গ মানবমনে আস্থার জন্ম দেয়। আস্থা কি খারাপ? জীবনের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে বহু মানুষ আত্মহননের পথ বেছে নেয়। অনেকে আবার বৈরাগী হয়ে ঘুরে বেড়ায় শ্মশানে শ্মশানে। ওই আস্থানলিঙ্গ পেলে আমি এমন বহু মানুষকে সুস্থ জীবনে ফেরাতে পারব।"

"ঠিক আছে," রুদ্রকে বলল দুর্গা, "আমরা যে কোনো সাহায্য করতে রাজি, কিন্তু তোমার ওপরেই দায়িত্ব রইল, আস্থানলিঙ্গ চুরি করে আনার ব্যবস্থা করো। এক পক্ষকাল সময় দিলাম। তার আগে যদি সে কাজ সমাধা হয়, ভালো। কিন্তু তার মধ্যে যদি সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়, তাহলে অন্য পথ বেছে নেব আমরা।"

এক পক্ষকাল পরে আবার মন্ত্রণাসভা বসল।

"আমি হার মানছি," বলল রুদ্র, "এত লোকের মাঝখান থেকে আস্থানলিঙ্গকে চুরি করে আনা সম্ভব নয়। পরপর তিনবার গুপ্ত অভিযান চালিয়েছি সেখানে। আমি নিজে গিয়েছি, তীর্থযাত্রীর ছদ্মবেশে। না, অসম্ভব। মহিষাসুর নিরুদ্দেশ, কিন্তু তার গ্রামের প্রতিরক্ষা এখনো অটুট রয়েছে। এখনো সেখানে তীর্থযাত্রীদের আনাগোনায় ভাটার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে, মহিষের গ্রাম থেকে আস্থানলিঙ্গ নিয়ে আসার একটাই পথ রয়েছে। সেনাদল নিয়ে গিয়ে সরাসরি আক্রমণ করতে হবে। কিন্তু সেটা কী করে করি? মহিষ যদি ওই গ্রামে আত্মগোপন করত, তাহলে আক্রমণ করার একটা যুক্তি থাকত। এখন যদি সেই গ্রাম আক্রমণ করি, তাহলে দেশসুদ্ধ মানুষ ছিছিক্কার করবে। কোনো ধর্মের তীর্থস্থলে আক্রমণ করে নিরীহ তীর্থযাত্রীদের গণহত্যা ঘটানো? না, সেটা সম্ভব নয়। তা সে ওরা অসুর হোক, আর যাই হোক।"

"ঠিক এই কারণেই," মাথা নেড়ে বলল দুর্গা, "মহিষ নিজের গ্রামে না গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে সুদূর দক্ষিণে। তার মানে ভেবে দেখো, মহিষ নিজের প্রাণের থেকেও মূল্যবান মনে করে ওই আস্থানলিঙ্গকে।"

"তাহলে তো আর একটাই উপায় রয়েছে," বলল মাতঙ্গী, "বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আস্থানলিঙ্গকে ধ্বংস করে দেওয়া।"

"সম্পূর্ণ ধ্বংস না করে আস্থানলিঙ্গর গুণকে কি কোনভাবে নষ্ট করে দেওয়া যায়?" বলল দুর্গা, রুদ্রর অসহায় অবস্থা দেখে দুঃখ হলো ওর।

"তাতে আখেরে কী লাভ হবে?" বলল মাতঙ্গী।

"ঠিক কথা," বলল ভুবনেশ্বরী, "আমার তো মনে হয়, এসব ঝামেলার মধ্যে না গিয়ে সরাসরি বিস্ফোটক প্রয়োগে আস্থানলিঙ্গকে রেণু রেণু করে দেওয়াই শ্রেয়।"

"যদি ধ্বংস না করে শুধুমাত্র ওর ক্ষমতাকে নষ্ট করে দেওয়া যায়," বলল দুর্গা, "তাহলে ভবিষ্যতে কোনো এক সময় সেই লিঙ্গ উদ্ধার করে তার গঠন থেকে কিছু শেখা অসম্ভব হবে না। সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে ফেললে সেই সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হবে।"

"কিন্তু সেটা করতে গিয়েও তো সেই আক্রমণই করতে হবে," বলল রুদ্র, "তাই নয় কি?"

"আহা, তা কেন বাছা," যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল ধূমাবতী, "যদি একটা ঢিলেই সবকটা পাখি মারা যায়?"

"তার মানে?" বলল দুর্গা, "কোন পাখি? বুঝিয়ে বলো।"

"লিঙ্গের প্রভাব নষ্ট করতে হবে," বলল ধূমাবতী, "সেটা করতে হবে এমনভাবে, যাতে তীর্থযাত্রীদের গণহত্যা না হয়। অথচ লিঙ্গটাকে বিস্ফোটক দিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেললে চলবে না, আস্ত রাখতে হবে। তোদের এইসব আপাত বিরোধী আবদার পূরণ করা কিন্তু মোটেও অসম্ভব নয়।"

"অসম্ভব নয়?" অবাক হলো দুর্গা, "তাহলে বলো, কী

করতে চাও।”

“উল্কার ধাতু যখন,” বলল ধূমাবতী, “তার মানে সে ধাতুর চৌম্বকীয় গুণ রয়েছে। সেটাই তার মূলভূত ধর্ম। সেই স্থূল ধর্ম নষ্ট হয়ে গেলে লিঙ্গের সব সূক্ষ্ম ধর্ম নষ্ট হয়ে যাবে, এটাই আমার বিশ্বাস।”

“ঠিক যেমন করে স্থূলশরীরের ধর্ম বিনষ্ট হলে সূক্ষ্মশরীর ব্রহ্মাণ্ডে বিলীন হয়, ” বলল দুর্গা, “তাই তো? মন্দ বলোনি। তাহলে এখন প্রশ্ন হলো, সেই ধাতুর চৌম্বকীয় গুণ নষ্ট করবে কী করে?”

“কোনো চুম্বককে যদি দ্রুত উত্তপ্ত করে তোলা যায়,” বলল মাতঙ্গী, “তাহলে তার চুম্বকীয় গুণ নষ্ট হয়ে যায়। এটা আমি পড়েছি। কিন্তু এর একটা বিপদের দিক রয়েছে। উত্তাপের প্রভাবে ধাতুর কেলাসের গঠন পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। তখন কিন্তু সেই লিঙ্গের গঠন থেকে আর কিছুই শেখা যাবে না।”

“ঠিক বলেছ বাছা,” টিয়াপাখির মতো বাঁকা নাকটা নেড়ে মুচকি হাসি হেসে বলল ধুমাবতী, “সে সবই আমি ভেবে দেখেছি। সেটা আটকানোর উপায় হলো, গরম করার পরমুহূর্তেই ঠাণ্ডা করে ফেলতে হবে ধাতুটাকে।”

“অত্তবড় একটা জিনিস,” বলল ভুবনেশ্বরী, “সেটাকে প্রচণ্ড গরম করবে, পরমুহূর্তেই আবার ঠাণ্ডা করে ফেলবে, কিন্তু এসব করবে কীভাবে? মাতঙ্গী কি বলেছিল

মনে আছে তো? অসুররা সর্বক্ষণ প্রদক্ষিণ করে সেই জিনিসটাকে। নজরের আড়ালে কিছুতেই যেতে দেয় না। সবার সামনে ঠাণ্ডা গরম এতসব করবে কীকরে?"

"কেন?" ভীষণ অবাক হয়ে বলল ধুমাবতী, "ওই গ্রামটার সম্বন্ধে যেসব খবর মাতঙ্গী দিয়েছিল, সেটা কি খেয়াল করোনি বাছা?"

"কোন কথাটার কথা বলছ তুমি?" বলল দুর্গা।

"কেন, মাতঙ্গী বলেনি?" মাথা ঝাঁকিয়ে খ্যানখ্যানে গলার স্বরটাকে ততোধিক খ্যানখ্যান করে বলে উঠল ধূমাবতী, "গ্রামের মাটি আগ্নেয় পাথরে গড়া, আর গ্রামের পাশ দিয়ে নদী বয়ে গেছে? তার থেকে কিছু বোঝোনি বাছা? বিষ্ণু কীভাবে স্বর্গভূমিকে মহিষাসুরের হাত থেকে রক্ষা করেছিল, সেটা তো শুনেছ নিশ্চয়ই?"

"তার সঙ্গে আস্থানলিঙ্গর কী সম্পর্ক, বুড়িমা?" বলল কালী।

"চোপ রও!" রেগে উঠল ধূমাবতী, "কতবার বলেছি আমাকে বুড়ি বলবি না! বিজ্ঞানের রহস্য তোরা বুঝিস না, সেটা কী আমার দোষ? তাই ওসব ছাড়। যখন তোরা কিছু করা মনস্থ করবি আমাকে বলিস, কী করতে হবে সেসব ছবির মতো বুঝিয়ে দেবো।"

ঘন জঙ্গলের মধ্যে ছোট্ট একটা ভাঙাচোরা কুঁড়েঘর। খিলান থেকে দরজা, সবই দড়িদড়া দিয়ে বাঁধা। দেখে মনে হয়, মাত্র একটা ফুঁ দিলেই কাঠামো শুদ্ধু বাড়িটা ভেঙে পড়বে। সেই বাড়ির সামনে এসে ঘোড়া থেকে নামল ওরা তিনজন। তারা, ধূমাবতী, ভুবনেশ্বরী। ঠিক তখনি টিপটিপ করে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টির জল ঝরে পড়ল আকাশ থেকে। প্যাচপ্যাচে গরম। বাতাস স্থির। আকাশের মুখ ভার।

ধূমাবতীর পোষা দাঁড়কাকটা এতক্ষণ স্থির অচঞ্চলভাবে বসে ছিল ধূমাবতীর কাঁধে। এবার সেটাকে হাতে তুলে নিল ধূমাবতী। দু'হাতের তেলোর মাঝে ধরে চুমো খেল, কানে কানে কী যেন বলল ফিসফিস করে। তারপর উড়িয়ে দিল আকাশে।

কুঁড়েঘরের দরজায় গুনে গুনে তিনবার ধাক্কা দিল ভুবনেশ্বরী। তারপর বলল, "ওঁ নমো নারায়ণায়!"

দরজা খুলে গেল। তালঢ্যাঙ্গা একটা লোক দরজা খুলল। গায়ের রং আবলুস কাঠের মতো চকচকে কালো। কপালে চন্দন দিয়ে ঊর্ধ্বপুণ্ড্র আঁকা, গলায় তুলসীর মালা। পরনে ঘননীল কাপড়, হাতে বর্শা। হাত তুলে নমস্কার করে ঘোড়াগুলোকে লোকটার হাতে তুলে দিল ভুবনেশ্বরী। তারপর বাড়ির ভেতর ঢুকল ওরা তিনজন। ঘোড়াগুলোকে বেড়ার গায়ে বেঁধে লোকটা পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল বাড়ির পেছনদিকে। সেখানে জঙ্গলের জটাজালের নীচে প্রচ্ছন্ন থেকে বয়ে যাচ্ছে শীর্ণ এক তটিনী। সরু একটা ছিপনৌকা বাঁধা আছে ঘাটে। ওরা তিনজন নৌকায় চড়ে বসতে লোকটাও উঠে পড়ল। লগির ঠেলায় নৌকা গিয়ে পড়ল নদীর মাঝখানে, স্রোতের মধ্যে। তরতর করে বয়ে চলল পশ্চিমদিকে।

এতক্ষণ পর্যন্ত একটা কথাও বলেনি লোকটা। এবার মুখ দিয়ে একটা দুর্বোধ্য শব্দ করে ভুবনেশ্বরীর হাতে তুলে দিল একটা কাপড়ের পুঁটুলি। ঘন বনের চাঁদোয়ার নীচে অন্ধকার, কিছুই স্পষ্ট করে দেখা যায় না। প্রায় চোখের কাছে তুলে পুঁটুলির ভেতরটা দেখল ভুবনেশ্বরী। মোষের করোটির তৈরি তিনটে শিরস্ত্রাণ রয়েছে সেখানে।

প্রায় একদণ্ড পরে পশ্চিম দিগন্তে দেখা দিল উঁচু পাঁচিলের মতো এক পাহাড়। জঙ্গল সেখানে পাতলা হয়ে এসেছে। দু'একটা কুঁড়েঘর দেখা যাচ্ছে পাড়ের কাছে। ইশারা করল লোকটা, ওরা তিনজন চাদর ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়ল নৌকার খোলের ওপর। নৌকা দ্রুত এগিয়ে চলল পাহাড়ের দিকে।

বাঁক ঘুরতেই নদীর রূপ গেল বদলে। দু'পাড়ে এমন খাড়াই পাহাড়ের দেওয়াল ক্রমশ আকাশের দিকে উঠেছে। তারই মাঝখান দিয়ে জলপথ, অন্ধকার সুড়ঙ্গের বিবরে প্রবেশ করেছে। সেই সুড়ঙ্গের মুখে এসে নৌকা থামাল লোকটা। নোঙ্গর ফেলে স্থির হলো নৌকা। লোকটা খোলের মধ্যে থেকে তিনটে লম্বাটে কাঠের তক্তা বার করে এগিয়ে দিল ভুবনেশ্বরীর দিকে। তারপর একটা মাছধরা ছিপ বের করে উলটোদিকে ফিরে জলে ছিপ ফেলে বসল।

একটা কাঠের তক্তা হাতে তুলে নিল ভুবনেশ্বরী। পালিশ করা চকচকে গা, সামনের দিকটা ছুঁচলো। ওপরের পিঠ সমতল, নীচের পিঠ নৌকার কাঠামোর মতো। গায়ের চাদর কোমরে জড়িয়ে ভুবনেশ্বরী কাঠের তক্তাটা ছুঁড়ে দিল জলে। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। ওর পেছন পেছন লাফ দিল ধুমাবতী ও তারা। তিনটে কাঠের তক্তায় ভেসে ওরা প্রবেশ করল অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে।

সুড়ঙ্গের মুখটা খুব ছোট, সাবধানে এক এক করে পার হলো। তারপরেই সুড়ঙ্গটা একটু চওড়া হলো, তবু মাথার ওপর চার-পাঁচ হাতের বেশি জায়গা নেই। ঘনিয়ে এল নিকষকালো নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, নিজের হাত-পা পর্যন্ত দেখা যায় না। ছাদ থেকে লাঠির মতো কী সব জানি ঝুলছে। ধীরে ধীরে সুড়ঙ্গ

প্রশস্ত হচ্ছে, জলের গতি বাড়ছে। শেষে খ্যাপা মোষের মতো ছুটে চলল। কলকল ছাপিয়ে শোনা গেল গুনগুন করে গানের শব্দ। গান? কান্না? না, দুর্বোধ্য ভাষায় কী যেন মন্ত্র পড়ছে ধূমবতী! হঠাৎ সুড়ঙ্গের প্রান্তে এক চিলতে আলোর ঝলক দেখা দিল। প্রাণপণে যে যার তক্তা আঁকড়ে ধরল। একরাশ জলের পাকসাট ঘূর্ণির মধ্যে সুড়ঙ্গ শেষ হলো। জলের ধাক্কায় শরীরের হাড়গুলো যেন গুঁড়ো হয়ে গেল। তার সঙ্গেই উৎকট একটা দুর্গন্ধে গা গুলিয়ে উঠল।

আঁধারের ঘোমটা সরিয়ে সুড়ঙ্গের উলটোদিকে দেখা দিল অদ্ভুত এক জগৎ। আকাশ পাণ্ডুর করা বিবর্ণ মেঘের নীচে লাল আগ্নেয় পাথরে গড়া এক উপত্যকা। রক্তিম সে পাথরের ওপর বাদামি রঙের শিরা উপশিরার অজস্র জাল ছড়িয়ে আছে। জায়গায় জায়গায় পাথরের স্তূপ ও খিলানের মধ্যে গর্ত করে তৈরি হয়েছে বাসস্থান। বেশ কিছু কুঁড়েঘরও রয়েছে, এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে। উপত্যকার একদিকে সারি সারি তাঁবু। অন্যদিক থেকে বিশ্রী সেই গন্ধটা ভেসে আসছে। অনেক মোষ বাঁধা আছে সেখানে। মোষেদের রঙে জায়গাটার রং সম্পূর্ণ কালো হয়ে আছে। স্থানে স্থানে প্রতিহারী দাঁড়িয়ে আছে বর্শা হাতে। উপত্যকার মাঝখানে পাথরের বড়ো বড়ো টুকরো দিয়ে ঘেরা এক ময়দান। তার ঠিক মধ্যিখানে জনসমুদ্র, উঁচু এক কালো পাথরের চারপাশে প্রদক্ষিণ করে চলছে অবিরাম অবিরল। উচ্চৈঃস্বরে অসুমন্ত্র আবৃত্তি করে চলেছে সবাই।

অজানা কোন এক ভয়ে শিউরে উঠল ভুবনেশ্বরী।

উপত্যকার অন্ধকার হঠাৎ করেই নিবিড় হয়ে এল। চটচটে গরম ভেদ করে এক গমক ফুরফুরে হাওয়া বয়ে গেল। কালো মেঘ উপত্যকার মাথায় চাঁদোয়ার মতো আড়াল সৃষ্টি করেছে।

তারা ওর ঝোলা থেকে একটা স্ফটিকের শিশি বার করে সবাইকে এক ঢোঁক খেতে বলল। এই ফাঁকে কাঠের পাটাতনগুলোকে দ্রুত সুড়ঙ্গের খাঁজে লুকিয়ে ফেলল ভুবনেশ্বরী। শিশির তরল মুখ পড়তেই মুখ বিকৃত করে বলে উঠল ধূমাবতী, ''একে তো সারারাত ঘোড়ায় চড়ে গায়ে ব্যথা, তার ওপর জলে ভিজে একশা হয়ে আছি। তার মধ্যে এ কী বিষ খাওয়ালি! তেতো! ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত বিষ হয়ে গেল!''

''এ ওষুধ আমাদের মাথা ঠিক রাখবে,'' বলল তারা, ''না হলে ওই লিঙ্গের চারপাশে সাতটা পাক শেষ হতে না হতে আমরা মনেপ্রাণে অসুর হয়ে যেতাম। বুঝলে?''

ততক্ষণে পিঠের ঝোলা থেকে তিনটে মহিষ-করোটির শিরস্ত্রাণ বের করে ফেলেছে ভুবনেশ্বরী। দ্রুত সেগুলো মাথায় পরে ফেলল ওরা। তারপর চাদরে শরীর ও মুখ ঢেকে প্রতিহারীদের নজর এড়িয়ে গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে গেল পাথরে ঘেরা প্রদক্ষিণ ক্ষেত্রের দিকে। যোগ দিল প্রদক্ষিণরত ভিড়ের মধ্যে।

''হে মহামায়া!'' আর্তনাদের সাথে টাল সামলে নিল ধূমাবতী। আশেপাশের তীর্থযাত্রীরা অবাক হয়ে তাকাল ওদের দিকে।

''তুমি তো ডোবাবে দেখছি,'' ফিসফিস করে বলল তারা, ''এখানে মহামায়া নয়, অসু-র নাম নিতে হবে, মনে রেখ।''

''চুপ কর,'' ফিসফিস করে বলল ধূমাবতী, ''কী বিষ খাওয়ালি, সেই থেকে মাথা ঘুরছে!''

''ওটা ওষুধের পার্শ্বক্রিয়া,'' বলল ধূমাবতী, ''মাথা ঘোরাবে, চোখে ঝাপসা দেখবে। শরীরের অনুভূতিগুলো বোদা হয়ে থাকবে। এ ছাড়া অসুমন্ত্রের প্রভাবমুক্ত থাকার আর কোনো উপায় নেই।''

দাঁত কিড়মিড় করে ধূমবাতী কী যেন বলল, শোনা গেল না।

গা শিরশির করে উঠল ভুবনেশ্বরীর। বড়ো অশুভ অনুভূতি এই জায়গাটায়। যেন বহুযুগের বহু অনাচার, বহু পাপাচারের স্মৃতি শুষে নিয়ে বিষাক্ত হয়ে গেছে গোটা উপত্যকাটাই। ইন্দ্রিয়গুলো কোনো এক আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় অতিমাত্রায় সজাগ হয়ে উঠেছে। দম আটকে আসা ক্লান্তিকর সে অনুভূতি। আস্থানলিঙ্গের কথা অনেক শুনেছে ভুবনেশ্বরী। চর্মচক্ষে এই প্রথম দেখল, প্রদক্ষিণ করতে করতে। পৃথিবীর কোনো শরীরী বস্তুর সঙ্গে সাদৃশ্য নেই অপার্থিব এই লিঙ্গের। কালোপাথর তো প্রথম দেখছে না ও। চকচকে কালোপাথরে আলো ঠিকরোয়। এই কালোপাথরটা অন্যরকম। এ যেন সব আলো, সব বোধবুদ্ধি ক্রমাগত শুষে নিচ্ছে। যেন এক কৃষ্ণগহ্বর। অদ্ভুত এক নেশা আছে পাথরটার সান্নিধ্যে। ঘোর লেগে যায়। কাঁধে ধূমাবতীর মৃদু ধাক্কায় চেতনা ফিরল।

''পাথরটার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকলেই চলবে? ওটা নয়, বেদীটার দিকে ভালো করে দ্যাখ। ওই যে বাদামি রঙের শিরাগুলো দেখছিস, ওই বরাবর ফাটলের খাঁজে খাঁজে বিস্ফোরকের পুঁটুলিগুলো ঢুকিয়ে দে। ওপর দিকে নয়, নীচের দিকে।''

প্রদক্ষিণ করতে করতে ভক্তরা মাঝেমাঝেই হুমড়ি খেয়ে পড়ছে বেদীর ওপর, মাথা ঠেকাচ্ছে লিঙ্গের গায়ে। কেউ কেউ ডুকরে কেঁদে উঠছে। তাদের মতোই মাঝেমাঝে বেদীর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে লাগল ওরা। সবার অলক্ষ্যে বিস্ফোরকের পুঁটুলি গুঁজে দিল চিহ্নিত জায়গাগুলোতে।

''অনেক হয়েছে'' ফিসফিস করে বলল ধূমাবতী, ''এবার ওদিকে চল, জলের ব্যবস্থা করতে হবে। তারপর আগুন লাগাব।''

''চলো,'' বলল ভুবনেশ্বরী, ''তারা, তুমি ওদিকটায় গিয়ে তৈরি থাকো। বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পেলেই মোষগুলোর দড়ি খুলে দেবে। সাবধানে যাবে, কেউ যেন দেখতে না পায়।''

পাথরে ঘেরা প্রদক্ষিণ স্থল থেকে একটু দূরে উঁচু একটা ঢালু

জমি রয়েছে, তার ওপর পাথরের ইঁটের তৈরি নালা দিয়ে বয়ে গেছে জলধারা। প্রদক্ষিণের ফাঁকে ফাঁকে সেখান থেকে জল খাচ্ছে অনেকেই। ধূমাবতী সেখানে গিয়ে চোখেমুখে ভালো করে জলের ঝাপটা দিল। সেটা করতে গিয়ে আশেপাশের জলপানরত তীর্থযাত্রীদের চোখের আড়ালে বিস্ফোরকের পুঁটুলি গুঁজে দিল পাথরের ইঁটের ফাঁকে ফাঁকে।

আকাশের দিকে তাকাল ধূমাবতী। কালো মেঘ অনেক নীচে নেমে এসেছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বৃষ্টি নামবে। যা করার, তার আগেই করতে হবে। মনে মনে একটা হিসেব কষে নিল ধূমাবতী। এখান থেকে আবার ফিরে যেতে হবে প্রদক্ষিণের জায়গায়। বেদীর চারপাশে মাটিতে বিস্ফোটকের গুঁড়ো ছড়ানো আছে। ফিরে গিয়ে সেটায় আগুন দিতে হবে। বিস্ফোরণ হতেই চারিদিকে হইচই পড়ে যাবে। সেই সুযোগ নিয়ে এদিকে দৌড়ে আসতে হবে। ভূস্তরের গভীরত্ব ও বিস্ফোটকের পরিমাণ অনুযায়ী আনুমানিক চল্লিশ পল সময় পর ভূগর্ভ থেকে লাভা বেরিয়ে আসবে। আরও দশ পল সময় লাগবে সে লাভার প্রভাব লিঙ্গের ওপর পড়তে। তার ঠিক পরেই নালার পাথরে বিস্ফোরণ ঘটাতে হবে।

ঝোলার মধ্যে থেকে চকমকি পাথর দুটো বার করে আনল ধূমাবতী।

ভুবনেশ্বরী হঠাৎ খেয়াল করল, একজোড়া চোখ ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

নালার উলটোদিকে দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘদেহী এক বৃদ্ধ। পেটানো ঋজু স্বাস্থ্য, একফোঁটা মেদ নেই সেখানে। লম্বা সোনালি চুলে পাক ধরেছে। লম্বা সাদা দাড়ি, সেই সাদায় সোনালি আভা। চোখের মণির রং গলানো সোনার মতো। বৃদ্ধের মুখে তপঃক্লিষ্ট শান্তির সঙ্গে মিশে আছে অজানা এক উগ্রতা। চোখাচোখি হতে ইশারায় মাথা নাড়ল বৃদ্ধ। ভয়ে আপাদমস্তক ঠাণ্ডা হয়ে এল ভুবনেশ্বরীর। লোকটা কি ওকে চিনতে পেরেছে? বুঝতে পেরে গেছে, ওদের উদ্দেশ্যের কথা?

একটা হইচই শুরু হয়েছে পাথরে ঘেরা প্রদক্ষিণ ক্ষেত্রের মধ্যিখানে। প্রদক্ষিণ থেমে গেছে, লোকজন এখন ভিড় করে জমা হয়েছে বেদীর চারপাশে। কয়েকজন প্রহরী দৌড়েছে সেদিকে। তাদেরই মধ্যে একজন ভিড়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল। হাতে তার বিস্ফোটকের পুঁটুলি। প্রহরী চিৎকার করে বলল, ''অন্তর্ঘাত! কেউ যেন পালাতে না পারে!''

প্রমাদ গুনল ভুবনেশ্বরী। হায় হায়! ধরা পড়ে গেল ওরা? এত গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ, ব্যর্থ হয়ে গেল? ঠিক এই সময় দেখল, সোনালি চুল সেই বৃদ্ধ উঁচু একটা পাথরের ঢিপির ওপর উঠে দাঁড়িয়েছে। কোথায় যেন তীব্রস্বরে শঙ্খ বেজে উঠল। সবাইকে সচকিত করে মাথার মহিষ-মুকুটটাকে খুলে সশব্দে মাটিতে আছড়ে ভেঙে ফেলল বৃদ্ধ। চিৎকার করে বলল, ''অসুর ভাই-বোনেরা! অনেক পাপ করেছ, আর নয়। সময় এসেছে, এবার সত্যপথে যোগ দাও। অসুর পথে যোগ দাও, বিষ্ণুর পথে যোগ দাও। আজ আমি তোমাদেরকে পাপী মহিষের সম্মোহন থেকে মুক্ত করতে এসেছি?''

পরমুহূর্তেই কান ফাটানো শব্দের সঙ্গে আস্থানলিঙ্গের বেদী কেঁপে উঠল। কেঁপে উঠল গোটা উপত্যাকাটাই। ধোঁয়া ও কটু গন্ধের সঙ্গে একরাশ টকটকে লাল লাভা উৎক্ষিপ্ত হলো আকাশের দিকে। হকচকিয়ে গেল ভুবনেশ্বরী। হচ্ছেটা কী?

ইতিমধ্যে তীর্থযাত্রীদের মধ্যে ঠেলাঠেলি শুরু হয়ে গেছে। প্রাণভয়ে সবাই পালাতে চাইছে, সবাই দৌড়চ্ছে গিরিকন্দরের দরজার দিকে। পথে কে ধাক্কা খেল, কে পায়ের তলায় পিষে গেল, কারোর সেদিকে খেয়াল নেই। আড়চোখে ধূমাবতী দেখল, গলগল করে ধোঁয়া উদ্‌গীরণ করতে করতে পাথরের ফাটলের মধ্যে টগবগ করে লাভা ফুটছে, আস্থানলিঙ্গ ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে তার মধ্যে।

চকমকি ঠুকল ধূমাবতী। এবার পাথরের নালায় বিস্ফোরণ হলো। খ্যাপা ষাঁড়ের মতো জলের তরঙ্গ ছুটল চতুর্দিকে। ঠিক সেই সময় দেখা গেল, উলটোদিক থেকে তারা প্রাণপণে দৌড়ে আসছে, পেছনে পেছন দৌড়ে আসছে মোষের পাল।

গিরিকন্দরের দরজার সামনে প্রচুর লোকের মেলা। সবাই ঠেলাঠেলি করছে, কেউ বেরোতে পারছে না। কান্না, হুংকার, আর্তনাদ সব মিলে চরম হট্টগোল। নেতৃত্বহীন উপত্যকা জুড়ে শুধু বিশৃঙ্খলা। দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছে লোকে। পায়ের তলায় পিষে মরছে অগণিত অসুভক্ত। সেই হট্টগোলের মধ্যেই আকাশ থেকে মুষলধারে বৃষ্টি এল নেমে।

মুখে আঙ্গুল পুরে শিস দিল ধূমাবতী। মেঘের আড়াল থেকে নেমে এল ওর পোষা দাঁড়কাক। তার মুখ থেকে ঝুলছে রেশমের একগাছি দড়ি। ভুবনেশ্বরী লাফ দিয়ে সেই দড়ি ধরে ফেলল। ভুবনেশ্বরীর কোমর ধরে ঝুলে পড়ল ধূমাবতী। দুজনকে উড়িয়ে নিয়ে দাঁড়কাক পৌঁছে গেল তারার কাছে। এক লাফ দিয়ে তারা ধরে ফেলল ভুবনেশ্বরীর পায়ের গোছ। স্বর্ণকেশ বৃদ্ধের চোখের সামনে দিয়ে তিনজনকে নিয়ে দাঁড়কাক উড়ে গেল, কালো মেঘের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। তিনটি মেয়েকে একটা রেশমের দড়িতে নিলম্বিত করে উড়ছে একটা দাঁড়কাক? এ কোন বিষ্ণুমায়া? মনে মনে বলল সোনালি চুল সেই বৃদ্ধ।

মেঘের ওপারে দেখা দিল মহাপক্ষী গরুড়ের অবয়ব। তার পিঠে আসীন হরি। রেশমের রজ্জু দাঁড়কাকের ঠোঁটে থাকলেও তার ভার বহন করছে গরুড়। দড়ির অপরভাগ বাঁধা আছে গরুড়ের পায়ে। তারা, ভুবনেশ্বরী ও ধুমাবতীকে নিয়ে গরুড় উড়ে গেল অনেক দূরে।

''সোনালি চুল ওই বৃদ্ধ ... কে ও?'' সাবধানে গরুড়ের

পিঠে আসীন হয়ে বলল ভুবনেশ্বরী, ''আমাদের পরিকল্পনার মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ে সব ওলট-পালট করে দিল লোকটা!''

কোনো উত্তর দিল না হরি।

''লোকটা বলল–অসুর পথ বিষ্ণুর পথ!'' বিভ্রান্ত ভুবনেশ্বরী আবার প্রশ্ন করল, ''এর মানেটা কী?''

এবারও কোনো উত্তর দিল না হরি। একটা সন্দেহ হলো ভুবনেশ্বরীর।

''ওপর থেকে তুমি নিশ্চয়ই লোকটাকে দেখেছ। তাই না? তুমি কি চেন লোকটাকে? সত্যি করে বলো!''

''সত্যি নিশ্চয়ই বলব, আমি মিথ্যে বলি না,'' বলল হরি, ''হ্যাঁ, আমি দেখেছি লোকটাকে। খুব চেনা চেনা ঠেকল লোকটাকে। বহুকাল আগে আর একটা লোককে আমি দেখেছিলাম বিন্ধ্যাচলে, বিষ্ণুর আলয়ে। এই লোকটার সঙ্গে তার প্রচুর মিল।''

''কে সে?'' প্রশ্ন ভুবনেশ্বরীর।

''সে হলো দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর ছেলে অসুর প্রহ্লাদ,'' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল হরি, ''নৃসিংহদেবের পরম ভক্ত!''

''দানবদের ধ্বংস করতে দৈত্যরা এল?'' সুদীর্ঘ একটা শ্বাস নিয়ে বলল ভুবনেশ্বরী। কণ্ঠে অবিশ্বাস।

''আপনার ফরমায়েশ মতো উপাসনাগৃহ নির্মাণের কাজও শেষ হয়েছে,'' খুশিতে হাত কচলাতে কচলাতে বলল ময়, ''এবার বলুন, কীরকম অসুস্তম্ভ স্থাপনা হবে সেখানে।''

''অসুস্তম্ভ নয়,'' মাথা নেড়ে বলল মহিষ, ''স্থাপন করবে এটা।''

মহিষের আদেশে দু'জন সেনানী নিয়ে এল শালকাঠের তৈরি কারুকার্যখচিত বৃহৎ এক পেটিকা। কুড়িজন অসুর-সেনানী যক্ষের ধনের মতো আগলে সেটাকে নিয়ে এসেছে, সুদূর সেই দ্বারবতী থেকে। পেটিকা খুলতে চমকে উঠল ময়। সেখানে তুলোর নরম গদির ওপর শুয়ে আছে হীরকের তৈরি একটি লিঙ্গ। সম্পূর্ণ একখণ্ড হীরের তৈরি, কোথাও কোনো জোড় নেই। লিঙ্গ, যেমনটি প্রকৃতি- উপাসকদের মন্দিরে দেখা যায়। ঘৃণায় গুলিয়ে উঠল ময়দানবের শরীর। অসু-উপাসকদের একচ্ছত্র সম্রাটের একি বিকৃতি। মনের ভাবে মুখে প্রকাশ করতে সাহস করল না। পাছে গর্দান যায়!

পরালিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হলো ত্রিস্তরীয় মহাবলাচল দুর্গের কেন্দ্রে। সেই দুর্গে অধিষ্ঠান করে মহিষাসুর নতুন করে দানবসাম্রাজ্য বিস্তার শুরু করল।

প্রথমে ব্রঙ্গায়, তারপর মধ্যভারতের মালভূমির যুদ্ধে দুর্গার হাতে পরাজিত হয়ে মহিষ পালিয়ে গেল সুদূর দাক্ষিণাত্যে। সেখানে লোকচক্ষুর আড়ালে নিজের অবশিষ্ট শক্তি সংহত করে নতুন করে জোট বাঁধল দানবরা। মহিষের নির্দেশে দানব-স্থপতি ময়দানব লেগে পড়ল মহীশূর দুর্গ নির্মাণ করতে, মহাবলাচল পর্বতের চূড়ায়। সহস্র শ্রমিক কাজে যোগ দিল। পাথর কাটা, পাথর বয়ে নিয়ে আসা। ধাতু ঢালাই করে ধাতব পাত তৈরি করা। শোরগোলে ভরে উঠল পাহাড়ি জঙ্গল। দেখতে দেখতে প্রতিটি গিরিবর্ত্মে মাথা তুলল উঁচু পাঁচিল। প্রতিটি গিরিসঙ্কটে গড়ে উঠল সৈন্যদের লুকিয়ে থেকে যুদ্ধ করবার উপযুক্ত সুরক্ষিত কক্ষ। যেন কোন মন্ত্রবলে মহাবলাচল পর্বত রূপান্তরিত হলো ত্রিস্তরীয় এক অভেদ্য দুর্গে। পরিদর্শনের পর সন্তুষ্ট হলো মহিষ।

''ভালো কাজ হয়েছে,'' ময়দানবের পিঠ চাপড়ে বলল মহিষ, ''পুরস্কার পাবে!''

মধ্যরাত। পাথরের দেওয়ালে স্থানে স্থানে কুলুঙ্গিতে প্রদীপ জ্বলছে। আলো-আঁধারের পুনরাবৃত্তি আলোছায়ার ডোরাকাটা চাদর বিছিয়েছে ঘর জুড়ে। বিশাল এই ভূগর্ভস্থ কক্ষে বাইরে থেকে আলোবাতাস প্রবেশের পথ নেই। তবু টাটকা বাতাস বইছে মৃদুমন্দ। কীভাবে, তা ব্রঙ্গার স্থপতিরাই জানেন।

ব্রঙ্গার রাজপ্রাসাদে গোপন মন্ত্রণাকক্ষে বৈঠক বসেছে। দুর্গার সঙ্গে রয়েছে কালী, মাতঙ্গী, ধূমাবতী ও ভুবনেশ্বরী। রয়েছে দেবরাজ ইন্দ্র, সঙ্গে পবন। রয়েছে হরি ও রুদ্র। আর রয়েছে ব্রঙ্গারাজ দিব্যবল ও ব্রঙ্গার গুপ্তচর প্রধান বিরুপাক্ষ।

''এতগুলো বছর পার হয়ে গেল, তবু মহিষ আজও অধরা!'' বলছিল ক্ষুব্ধ দুর্গা, ''দু-দু'বার অমরা মহিষকে যুদ্ধে হারিয়েছি। তার গ্রাম ধ্বংস হয়েছে, অসুরদের ধর্মান্ধতার কেন্দ্র আস্থানলিঙ্গ ধ্বংস হয়েছে। অথচ আজ মহিষাসুর আগের থেকেও অনেক বেশি শক্তিশালী। কোথায় ভুল হচ্ছে আমাদের?''

''নতুন করে লোকজনদের ধর্মান্ধ হয়ে ওঠা নিশ্চয়ই বন্ধ

হয়েছে,” বলল হরি, “কিন্তু তার জায়গা নিয়েছে ভাড়াটে সৈন্যরা। দু’ হাতে টাকা ছড়িয়ে মহিষ এদেশের যুবকদের আস্থা কিনে নিচ্ছে। এ ছাড়াও রক্তবীজদের সমস্যা তো রয়েই গেছে। তাদের অন্ধবিশ্বাস আজও আমরা ভাঙতে পারিনি।”

“ভেবেছিলাম,” বলল মাতঙ্গী, “ব্রঙ্গার রাজকোষ হাতছাড়া হলে আর্থিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়বে মহিষ। সৈন্যদের বেতন দেয়ার টাকাও থাকবে না। সেটা কিন্তু হয়নি। অন্য কোনো সূত্র থেকে টাকা পাচ্ছে মহিষ।”

“একটা সূত্র তো আমরা সবাই জানি,” বলল দিব্যবল, “উত্তরাপথের অধিকাংশ রাজাই এখনো প্রকাশ্যে কী গোপনে মহিষকে সম্রাটের প্রাপ্য কর দিয়ে চলেছে।”

“শুধু সেটাই মহিষের শক্তির উৎস নয়,” বলল ভুবনেশ্বরী, “আমার কাছে খবর আছে, জম্বুদ্বীপের পশ্চিম সীমান্তে সাগরের উপকূলে কোথাও মহিষ এক বিশাল রত্নখনির সন্ধান পেয়েছে। প্রচুর পরিমাণে বৈদূর্যমণি, গোমেদ ও নীলকান্তমণি পাওয়া যাচ্ছে সেখানে।”

“পশ্চিম সাগরের উপকূলে?” মাতঙ্গীর স্বরে আশঙ্কার আভাস, “সীমান্তের ঠিক কোন জায়গাটায়?”

“সঠিকভাবে জানি না,” বলল ভুবনেশ্বরী, “তবে দ্বারবতী নামটা বারবার শোনা যাচ্ছে।”

“দ্বারবতী?” ভ্রূ কুঞ্চিত হল দুর্গার, “মানে, প্রলয়ের পূর্বের সেই ভূভাগ?”

“তাই তো মনে হচ্ছে,” বলল ভুবনেশ্বরী।

“মাতঙ্গী,” বলল দুর্গা, “তোমার গ্রাম তো দ্বারবতীর ধারেকাছেই কোথাও, তাই না?”

চোয়াল শক্ত, দৃষ্টি ভূমিতে নিবদ্ধ। উত্তরে কিছু বলল না, অন্যমনস্ক মাতঙ্গী।

সূর্য নেই, চাঁদ নেই, নিশ্চিদ্র সে অন্ধকার আকাশে কোনো তারাও নেই। অনন্ত শূন্যতা। কিছুই জঙ্গম নয়, জীবিত নয়। বন্ধ্যা আদিম ব্রহ্মাণ্ড, মৃত্যুর মতো শীতল।

মাটি নেই পায়ের তলায়, শুধু আকাশ আর আকাশ। উড়ে চলেছে নিশ্চিদ্র অন্ধকার ঠেলে। কত না দিন মাস বছর ধরে উড়ছে, এখনো পৌঁছতে পারেনি গন্তব্যে। গন্তব্য কোনটা, সেটাই তো জানা নেই! নীচে তাকাতে ভয় করে। সেখানে ধু ধু করছে অন্ধকার, অন্তহীন। এই অন্ধকারের কি কোনো শেষ নেই? পাখিটা কি অন্ধ হয়ে গেছে? নাকি এটা মনের অন্ধকার? অন্ধ মন? কোথা থেকে উড়েছিল, কোথায় ছিল ওর বাসা? সেই বাসায় ফিরে যাওয়ার পথটাও হারিয়ে গেছে। শরীর শ্রান্ত, মন অসাড়। দম আটকে আসছে। খুব তেষ্টা পাচ্ছে। ভয় করছে, যদি না আর উড়তে পারে? যদি পড়ে যায় ওই অতল অন্ধকারের গর্ভে?

ঘুম ভেঙ্গে গেল মাতঙ্গীর। সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে।

বাইরে এখনো রাত। ঢিকির ঢিকির শব্দ করতে করতে উটের গাড়ি চলেছে আরাবল্লী পর্বতমালার গিরিপথ বেয়ে। গাড়ির খোলের মধ্যে, ওর ঠিক পাশে শুয়ে আছে বগলামুখী। অঘোরে ঘুমোচ্ছে। এবড়োখেবড়ো পথ, গাড়ির চাকা পাথরের ওপর পড়লেই গাড়ি লাফিয়ে ওঠে। যে উটটা গাড়ি টেনে নিয়ে চলেছে, তার কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই তাতে। ভ্রূক্ষেপ নেই বগলামুখীরও, নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে।

“হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ!” গলা ঝেড়ে হুংকার দিয়ে উঠল উটটা। মাথাটা ঝন্‌ঝন্ করে উঠল। নাঃ, ঘুম যখন ভেঙে গেছে, তখন আর শুয়ে থেকে লাভ নেই। বিছানা ছেড়ে উঠে বসল মাতঙ্গী। অবিন্যস্ত চুলগুলোকে বেঁধে পাশ থেকে খাটো তরবারি শুদ্ধু কোমরবন্ধটা হাতে তুলে নিল। তারপর গাড়ির খোলের ঢাকনা খুলে উঁকি দিল বাইরে। মরুভূমির ঠাণ্ডা বাতাসে রাতশেষের শিশিরের গন্ধ। পূর্বের আকাশের রং আর কালো নেই, সেখানে ঘন নীলের ছোঁয়া। ভোর হতে আর বেশি দেরি নেই। খোল থেকে এসে বেরিয়ে চালকের পাশে বসল মাতঙ্গী।

“মা,” পাশে রাখা কম্বলটা মাতঙ্গীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল উটের গাড়ির চালক, “ঠাণ্ডা আছে। এটা গায়ে জড়িয়ে নে।”

গাড়ি এগিয়ে চলেছে গিরিপথ বেয়ে। একটু একটু করে আলো ফুটছে। এ পথের প্রতিটি বাঁক, প্রতিটি উঁচু-নীচু ওর চেনা। তবু তাদের আজ অজানা অস্পষ্ট ঠেকছে। এ যেন মাতৃগর্ভের আলো-আঁধারি। বাস্তব, স্মৃতি, কল্পনা সব মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। ঝাপসা কুয়াশার জাল মনের মধ্যে। মাথা ঘুরছে।

পথের বাঁক ঘুরতে মাতঙ্গী দেখল, সূর্যদেব উঁকি দিচ্ছেন দিগন্তের কাছে। কালো আকাশের পূবের অংশ এখন মায়াময় কমলা রঙে মাখামাখি। পরতের পর পরত মেঘ সেখানে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের গায়ে ধীরে ধীরে লাগছে সোনালি রঙের আভা।

প্রায় একদণ্ড পথ চলার পথ গিরিপথ ফুরিয়ে এল। সামনে ভেসে উঠল আদিগন্ত এক মরু উপত্যকা।

এ যেন অচিন কোন এক গ্রহের ঊষর প্রান্তর। মুহুর্মুহু আগুন বর্ষানো নির্মেঘ অচেনা আকাশ। ঝলসানো সে নীল

গগনে পাক খাচ্ছে একলা একটা চিল। ভোকাট্টা ঘুড়ির মতো গোঁত্তা খাচ্ছে বারবার। পাখিটা কি অন্ধ হয়ে গেছে? যেদিকে দু'চোখ চায় শুধু মরুভূমি। জায়গায় জায়গায় পাহাড়প্রমাণ বালির স্তূপ, অতলস্পর্শী গহ্বর। পাথুরে লাল মাটি, গাছগুলো সেখানে রুক্ষ কাঁটাঝোপের রূপ নিয়েছে। সে কাঁটাঝোপ কিন্তু ছোটোখাটো নিরীহ নয়, অনেক জায়গায় তারা মরুভূমির ওপরটাকেই বেমালুম ঢেকে ফেলেছে। শীর্ণ এক জলধারা এঁকে বেঁকে অনেক বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে বয়ে চলেছে পশ্চিমে সিন্ধুসমুদ্রের দিকে। মাঝে মাঝে তার ধারে পড়ছে পাথুরে জলাশয়, খেজুর গাছ। খেজুরের কাণ্ড দিয়ে বানানো বেড়া। এখানে ওখানে মাথা উঁচিয়ে দেখা দিচ্ছে নলের মতো আকৃতির কুঁড়েঘর, মাথায় তাদের খেজুরপাতার গোল টুপি।

''খুড়ো, এখানেই গাড়ি থামাও!'' বলল মাতঙ্গী।

''এখানে কেন মা?'' বলল চালক, ''বাড়ি পর্যন্ত ছেড়ে দিই?''

''না খুড়ো,'' মাথা নেড়ে বলল মাতঙ্গী, ''এখান থেকে হেঁটে যাব আমরা।''

''বগলামুখী, ওঠো!'' গাড়ির খোলের মধ্যে মুখ বাড়িয়ে বলল মাতঙ্গী। কোনো সাড়াশব্দ নেই। মেয়েটা ঘুমোতে পারেও বটে!

''ওঠো!'' বগলামুখীর কাঁধ ধরে নাড়া দিল মাতঙ্গী, ''আমরা এসে গেছি!''

''হুঁ উঁ উঁউঁ উঁ উঁ উঁ???'' ধড়মড় করে উঠে বসল বগলামুখী।

''উঠে পড়ো,'' বলল মাতঙ্গী, ''আমরা পৌঁছে গেছি।''

গাড়ি থেকে নামল ওরা দু'জনে। নামানো হলো দু'জনের দুটো পোঁটলা, আর একটা বিরাট বড়ো চামড়ার থলি। আকারে লম্বাটে।

''সাবধান,'' চামড়ার থলিটা নামানোর সময় বলল মাতঙ্গী, ''ভেতরে ভঙ্গুর জিনিস আছে।''

''ভঙ্গুর?'' অবাক হলো বগলামুখী, ''পোড়ামাটির বাসনপত্র নাকি? কারোর জন্য উপহার এনেছ?''

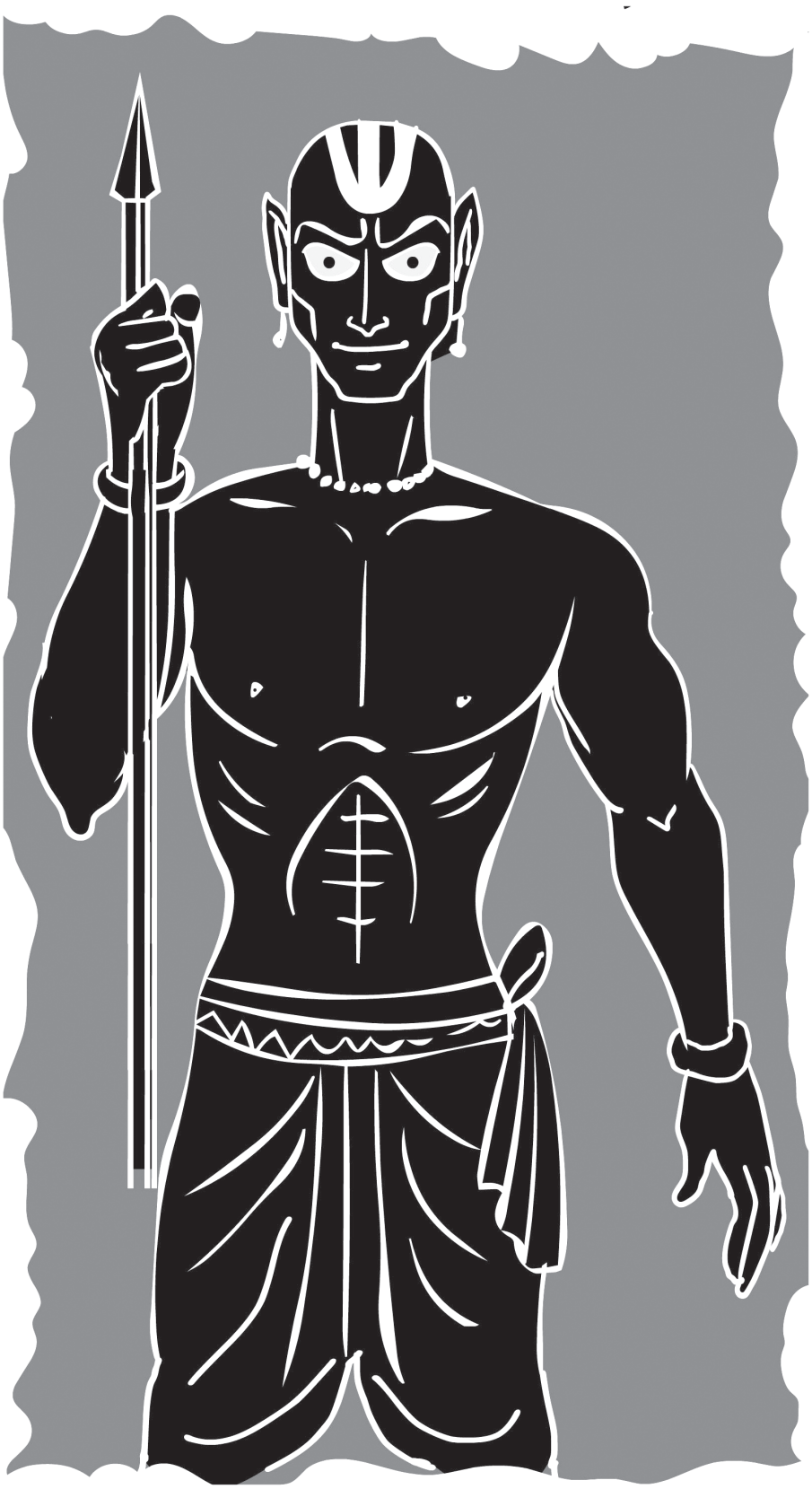

''পরে বলব,'' বলল মাতঙ্গী, ''এখানে একটু দাঁড়াও, আমি একটা কাজ সেরে আসছি।''

বগলামুখীকে অবাক করে মাতঙ্গী দৌড় দিল গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া শীর্ণ সেই জলধারার দিকে। অঞ্জলি ভরে জল নিয়ে মাথায় ছেটাল। দৌড়ে ফিরে এল। চাদর দিয়ে নিজেদের মুখ ভালো করে ঢেকে নিল দু'জনে। পোঁটলাদুটো বগলামুখী ঘাড়ে নিল, চামড়ার থলি নিল মাতঙ্গী। তারপর গ্রামের দিকে পা বাড়াল।

পাথরের চাঁই, বালির ঢিপি, কাঁটাগাছের ঝোপ। তারই মধ্যে দিয়ে চলে গেছে গ্রামের পথ। চেনা রাস্তাগুলো আজ কেমন অন্যরকম ঠেকছে। আজন্ম পরিচিত জায়গাগুলোর কিছুই চিনতে পারছে না। দম আটকে আসছে। চোখ জ্বালা করছে। মনে হচ্ছে, ও যেন অজস্র কিলবিলে সুড়ঙ্গপথের জাল পেরিয়ে হেঁটে চলেছে। হুড়মুড় করে ভেসে আসছে অসংখ্য স্মৃতির মিছিল। মুখের মিছিল। জগৎ জুড়ে রং-বেরঙের ঝাপসা আলোর ছায়াচিত্র তাথৈ তাথৈ নাচছে। বাঁ হাতের পিঠ দিয়ে চোখের জল মুছল মাতঙ্গী। তারপর মোড় ঘুরে দক্ষিণ বরাবর রাস্তাটা ধরল। পথে লোকজন বিশেষ নেই। দু'একজন যাও-বা বেরিয়েছে, ওদের দেখেও যেন খেয়াল করল না। তবু বারবর চমকে উঠছে মাতঙ্গী। একবার তো বগলামুখীর হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল একটা কাঁটাঝোপের পেছনে, লুকিয়ে থাকল, যতক্ষণ না পথচারী লোকগুলো দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়।

এর বাড়ির উঠোন, তার বাড়ির বেড়া টপকে, ঝোপঝাড় ডিঙিয়ে ওরা শেষমেশ পৌঁছল গ্রামের প্রান্তে। সেখানে একটা বাড়ির সামনে এসে থমকে দাঁড়াল মাতঙ্গী। বেড়ার ওপারে কুঁড়েঘর। দেওয়ালের সাদা রং মলিন হয়ে এসেছে, তার ওপর আঁকা রঙিন আল্পনাগুলো ঝাপসা হয়ে প্রায় দেখাই যায় না। উঠোনে একটা উট বাঁধা আছে। মাতঙ্গীকে দেখে উটটা গলা দিয়ে ঘড়ঘড় আওয়াজ করে উঠল।

''কে এসেছে রে?'' নারীকণ্ঠের ডাক শোনা গেল কুটিরের ভেতর থেকে।

''মা!'' ডুকরে কেঁদে উঠল মাতঙ্গী, ''আমি!''

দরজা খুলে বেরিয়ে এল এক বৃদ্ধা। লাঠিতে ভর দিয়ে ঠুকঠুক করতে করতে এগিয়ে এল। মাতঙ্গী ততক্ষণে বেড়া টপকে এগিয়ে গেছে কুটিরের দিকে। বৃদ্ধাকে জাপটে ধরে হুহু করে কেঁদে ফেলল মাতঙ্গী। ইতিমধ্যে উটটা খুঁটি উপরে চলে এসেছে, মাতঙ্গীর কাঁধে মুখ ঘষতে ঘষতে বিচিত্র স্বরে গোঙাচ্ছে।

''পোড়ারমুখী, কোথায় ছিলি এতকাল?'' কান্না ভেজা গলায় বলল বুড়ি, ''আর এতকাল যখন বেঁচে থাকতে পারলি, তখন মরতে এই সর্বনেশে মুলুকে কেন ফিরে এলি মা? ওরা তো তোকে আজও খুঁজে বেড়াচ্ছে! খোঁজ পেলেই তোর গর্দান নেবে!''

''সব বলব মা,'' চোখ মুছতে মুছতে বলল মাতঙ্গী, ''আগে ঘরের ভেতর চলো। আর একটা কথা বলো। সংশপ্তক কি এখনো বেঁচে আছে?''

''আছে বেঁচে,'' বলল মাতঙ্গীর মা, ''তবে কতকাল থাকবে, জানি না। গ্রামে থাকার তো উপায় নেই। ওরই মতো গ্রামের আর সব উড়নচণ্ডী ছেলেদের নিয়ে ডাকাতের দল বানিয়েছে, লুকিয়ে ঘুরে বেড়ায় এখানে সেখানে। পাহাড়ে, নুনের সমুদ্রে। মাঝেমধ্যে শুনতে পাই, আচমকা আক্রমণ করে অসুরদের মেরে ফেলেছে, অসুরদের ধনসম্পদ লুঠ করেছে। অলপ্পেয়ে ব্যাটা অসুর উড্ডীন তো ওর মাথার দাম ঘোষণা করেছে। হাতে পেলেই গর্দান নেবে!''

''ওকে খবর পাঠিয়েছি,'' বলল মাতঙ্গী, ''জানি না সে খবর ওর কাছে পৌঁছেছে কি না। যদি ও খবর পায়, সন্ধ্যেবেলা এখানে আসবে। তুমি খিড়কির দরজাটা খুলে রেখো।''

রাত্রি নামতেই গ্রাম ছেড়ে বেড়িয়ে পড়েছিল ওরা। মাতঙ্গী ও বগলামুখী, সাথে সংশপ্তক, ভানু ও অর্ক। ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু মা জোর করে ওদের ভরপেট খাইয়ে দিয়েছিল। ঘি মাখানো মোটা রুটি, উটের দুধের ঘন ক্ষীর। অর্ক ও ভানু একটা ঠেলাগাড়ি টেনে নিয়ে চলছে। গ্রামের সীমানা পার হতে সংশপ্তকের দলের দু'জন যোদ্ধা যোগ দিল ওদের সঙ্গে। সংশপ্তকের মতোই তাদেরও লম্বা চুলদাড়ির জটা, শরীর ভস্মাচ্ছাদিত।

তারার আলোয় দূরে চিকচিক করছে শীর্ণ সেই জলধারা, মরুভূমির বুক চিরে এগিয়ে চলেছে পশ্চিম দিগন্তের পানে। গ্রাম থেকে বেরিয়ে সবাই সেদিকেই এগোল। জলধারার তীরে পৌঁছে তার জল মাথায় দিল, তারপর তার পাড় বরাবর যাত্রা শুরু করল।

''এই নালার জলের ওপর তোমাদের বিশেষ ভালোবাসা আছে দেখছি,'' বলল বগলামুখী, ''এত ভক্তিভরে এর জল মাথায় ছেটাচ্ছ, যেন গঙ্গাজল!''

''এটা নালা নয়,'' আহত স্বরে বলল মাতঙ্গী, ''এ হলো সরস্বতী নদী। যে নদীর তীরে বেদমন্ত্র লেখা হয়েছিল, এ হলো সেই পুণ্যতোয়া।''

''সরস্বতী!'' অবাক হলো বগলামুখী, ''তার এই অবস্থা?''

''মহাকাল বড়ো নিষ্ঠুর,'' বলল মাতঙ্গী, ''আজ যে স্রোতস্বিনী, কাল সে নালা। কে বলতে পারে, হয়তো আগামী ক'হাজার বছরে বিলুপ্তই হয়ে যাবে এই নদী। তখন লোকে বলবে, এসব গল্পকথা, সরস্বতী নামের কোনো নদীর অস্তিত্বই ছিল না কোনো কালে!''

অন্ধকার মরুভূমি। চাঁদ এখনো ওঠেনি। তারাদের আলোয় পথ দেখা যায় অস্পষ্টভাবে, কিন্তু আশেপাশের কিছুই দেখা যায় না। আগে আগে পথ দেখিয়ে চলেছে সংশপ্তক, সঙ্গে মাতঙ্গী। তার পেছনে বাকিরা।

''সাবধানে পা ফেলিস,'' বলল সংশপ্তক, ''এখানে সম্প্রতি বেশ কয়েকটা নতুন চোরাবালি তৈরি হয়েছে।''

''গত ক'বছরে গ্রামটা অনেকটাই বদলে গেছে,'' বলল মাতঙ্গী, ''কেমন যেন রংহীন, ছন্নছাড়া হয়ে গেছে। এই সংক্রান্তির সময় গ্রামটা কত সুন্দর করে সাজানো হতো। এখন তো দেখছি কিছুই হয় না।''

''তুইও তো অনেক বদলে গেছিস,'' বলল সংশপ্তক, ''কী ব্যক্তিত্ব, চেনাই যায় না আর।''

''বদলেছিস তো তুইও,'' ঠাট্টার ছলে বলল মাতঙ্গী, ''তোরা সবাই তো আগে বিষ্ণুভক্ত ছিলি। কপালে ঊর্ধ্বপুণ্ড্র ছেড়ে ত্রিপুণ্ড্র আঁকা শুরু করলি কবে থেকে? তুই জানিস না, এজন্য তোর সঙ্গে যোগাযোগ করতে কত অসুবিধে হয়েছে। বিষ্ণুর স্থানীয় সংগঠকরা তো তোর কোনো খবরই রাখে না আজকাল।''

''আমি আজও বিষ্ণুপন্থায় বিশ্বাসী,'' বলল সংশপ্তক, ''কিন্তু বিষ্ণুপন্থা হলো সুস্থ সমাজের জন্য। যেখানে ন্যায়বিচারের আশা নেই, যেখানে প্রতিদিন অত্যাচারীর আক্রমণের ভয়ে ধুঁকে ধুঁকে বেঁচে থাকতে হয়, সেখানে বিষ্ণুর মনুষ্যনির্মাণ আর সংগঠনের মহৎ আদর্শ ধুয়ে কি আমি জল খাব? তার চেয়ে এই ভালো। নিয়ম-শৃঙ্খলার বালাই নেই। গাঁজা খাই, তাতে খিদে মরে যায়, মনের মধ্যেকার যন্ত্রণাগুলো অবশ হয়ে যায়। চুলদাড়ি কাটার বালাই নেই, ছাই মেখে ঘুরে বেড়াই, আমাদের দেখে অসুররাও ভয় পায়।''

নিঃস্তব্ধ প্রান্তরে হাওয়ার শোঁ শোঁ শব্দ। শীর্ণ জলধারা আরও শীর্ণ, আরও সঙ্কুচিত হয়েও ধুঁকতে ধুঁকতে চলেছে সঙ্গে। কথা হয়তো আরও এগোতো, কিন্তু ওদের থামিয়ে দিতেই যেন আকাশ আলো করে বিরাট একটা চাঁদ উঠল আকাশে। তার সঙ্গেই সামনের বিস্তীর্ণ প্রান্ত আলোয় ঝলমল করে উঠল। বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল বগলামুখী। ময়লা হলুদ পাহাড়ি মরুভূমি পড়ে আছে পেছনে। সামনে পাহাড় বা ঝোপঝাড়ের চিহ্নমাত্র নেই। ফকফকে সাদা এ কোন অপার্থিব স্থান? দিগন্ত থেকে দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তর সম্পূর্ণ সমতল। এ যেন এক প্রাগৈতিহাসিক অজানা উপত্যকা, বাইরের পৃথিবী থেকে একেবারে বিযুক্ত, একেবারে অনন্য। যতদূর চোখ যায় শুধু সাদা রং! জ্যোৎস্নার আলো সেই সাদা মাটিতে প্রতিফলিত হয়ে হিরের বিভ্রম সৃষ্টি করেছে। চাঁদের মতোই শুভ্র উজ্বল, যেন চাঁদ নেমে এসেছে মাটিতে। ধপধপে সাদা সে অচিন ভূভাগ চন্দ্রাহত জ্যোৎস্নার আলোয় ঝলমল করছে। সাদা বরফ? বরফে ঢাকা উপত্যকা? এই উষ্ণ অঞ্চলে? হাঁটু গেড়ে সেই মাটি হাতে তুলে শুঁকল বগলামুখী, জিভে ঠেকাল।

''নুন!'' উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল, ''এটা তো নুন! এত্তবড় সমতল জমি– নুনের তৈরি!''

''এই নুনের সমুদ্রের নীচেই চাপা পড়ে আছে,'' ঘাড় পেছনে ঘুরিয়ে বগলামুখীকে বলল মাতঙ্গী, ''প্রলয়-পূর্ববর্তী সেই জগৎখ্যাত কিংবদন্তী নগরী দ্বারবতী। ভারতবর্ষের প্রবেশদ্বার দ্বারবতী।''

''বুঝলাম না,'' বলল বগলামুখী, ''প্রলয়? কোন প্রলয়? ভালো করে বুঝিয়ে বলো।''

পিছিয়ে এল মাতঙ্গী। বগলামুখীর পাশে পাশে হাঁটতে লাগল।

''আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর আগের কথা,'' বলল মাতঙ্গী, ''পৃথিবী তখন অনেক ঠাণ্ডা ছিল। সমুদ্রে জলের পরিমাণ ছিল কম। উপকূল ছিল অনেকটা দূরে। তারপর কোথা থেকে কী হয়ে গেল, আচমকা এক সৌরঝড়ের প্রভাবে এক ধাক্কায় পৃথিবীর তাপমান গেল বেড়ে। বরফ গলে সমুদ্রের জল বেড়ে এল সর্বব্যাপী এক বন্যা। বহুদিন পরে, সে বন্যার খ্যাপামো যখন কমল, দেখা গেল পৃথিবী জুড়ে মানবসভ্যতা ধ্বংসের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে। সে যুগে অধিকাংশ বর্ধিষ্ণু শহরই ছিল উপকূল জুড়ে, সেই সব শহর জলের তলায় নিমজ্জিত হয়েছে। সুন্দভূমির স্থানে পড়ে আছে খণ্ড বিক্ষিপ্ত কিছু দ্বীপ, কিছু উপদ্বীপ। দক্ষিণের সঙ্গমভূমি নেই, অবশিষ্ট রয়ে গেছে শুধু কন্যাতীর্থর সঙ্কীর্ণ ভূভাগ ও তার নীচে একফোঁটা অশ্রুবিন্দুর মতো লঙ্কাদ্বীপ। ব্রঙ্গার দক্ষিণভাগ পরিণত হয়েছে জলবেষ্টিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের সমাহারে। আর এই এখানে সৃষ্টি হয়েছে বিশাল এই সাদা মরুভূমি। বছরের ছ'মাস সমুদ্রের নীচে থাকে ভূভাগ। বাকি ছ'মাস সমুদ্র পিছিয়ে যায়, তার নীচ থেকে বেরিয়ে আসে লবণ-সমুদ্র। এরই নীচে জায়গায় জায়গায় দেখা মেলে প্রলয়-পূর্ববর্তী উন্নত সেই সভ্যতার নিদর্শন। দালানবাড়ি, প্রাসাদ।''

''আর সেরকমই একটা প্রাসাদের মধ্যে ঘাঁটি গেড়েছে অসুররা?'' বলল বগলামুখী।

''ঠিক তাই,'' বলল মাতঙ্গী, ''এখানকার বাড়িগুলো মাটির ওপরে নয়, মাটির তলায়। যে সিঁড়ি বেয়ে আগে লোকে নীচের তলা থেকে ওপর তলা হয়ে ছাতে উঠত, এখন লোকে ছাদ

থেকে সেই সিঁড়ি বেয়ে নেমে ওপর তলা হয়ে নীচের তলায় যায়। অদ্ভুত, তাই না?"

সংশপ্তক সবার আগে আগে চলছিল, হাত তুলে থমকে দাঁড়াল। ইশারা বুঝতে পেরে নিমেষে সবাই সটান শুয়ে পড়ল, মাটির সঙ্গে মিশে। একটু আগেই যে এখানে সাতজন মানুষ ছিল, দেখে বোঝার উপায় রইল না আর।

কিছুক্ষণ পর দেখা গেল, সারি বেঁধে দশটা উট চলেছে। আরোহীদের মাথায় মোষের করোটির মুকুটের বাহার এত দূর থেকেও দেখা যাচ্ছে। প্রায় দমবন্ধ করে শুয়ে রইল ওরা। নিজেদের হৃদপিণ্ডের শব্দও কানে বাজছে ঢিপ ঢিপ করে। বগলামুখীর মুখ চেপে ধরে রইল মাতঙ্গী, পাছে মেয়েটা কথা বলে ফেলে। উটের সারি দিগন্তের ওপারে মিলিয়ে যেতেই উঠে বসল সবাই।

''অসুরদের ঘাঁটির কাছেই এসে পড়েছি আমরা,'' বলল সংশপ্তক, ''উত্তরদিকে এক ক্রোশ...''

''উটে চড়ে ওই অসুরগুলো বুঝি ওদের ঘাঁটিতেই যাচ্ছিল?'' সংশপ্তককে থামিয়ে দিয়ে প্রশ্ন বগলামুখীর।

''সম্ভবত। প্রায় কুড়িটা রত্নখনি আছে এই এলাকায়। সেখান থেকে রত্ন আহরণ করে প্রতি পূর্ণিমায় ওরা জড়ো করে ওদের ঘাঁটিতে। সারা বছর জড়ো হয়। কাটাই, পালিশ হয়। তারপর একবারে সেইসব রত্ন জাহাজে তোলা হয়।''

''আগামীকাল মকর সংক্রান্তি,'' বলল মাতঙ্গী, ''তার মানে, আর দু'একদিনের মধ্যেই সমুদ্র এগিয়ে আসবে।''

''হ্যাঁ,'' বলল সংশপ্তক, ''তখন ওদের ঘাঁটিও জলে ডুবে যাবে।''

''তার আগেই নিশ্চয়ই,'' বলল বগলামুখী, ''সব ধনরত্ন সরিয়ে ফেলবে এখান থেকে। তাহলে এখন আমাদের... ওরে মা রে!''

চমকে আর্তনাদ করে লাফিয়ে উঠল বগলামুখী। চোখের নিমেষে কোমর থেকে তরোয়াল খুলে এক কোপ বসাল মাতঙ্গী। সেই কোপ বগলামুখীর কোল ঘেঁষে পড়ল গিয়ে মাটিতে। ছিটকে উঠল দলা দলা নুন, ছড়িয়ে পড়ল রক্ত। বগলামুখী দেখল, ওর পাশে পড়ে আছে হাতখানেক লম্বা একটা সাপের ধড়।

''ব্রঙ্গার মেয়ে তুমি,'' ধমক দিয়ে বলল মাতঙ্গী, ''ঘাড়ের ওপর একটা সাপ এসে পড়ল, টের পেলে না?''

''আ-আ-আমি জানতাম না, এখানে সাপ আছে!'' আমতা আমতা করে বলল বগলামুকী।

''আছে? আছে মানে?'' রেগে বলল মাতঙ্গী, ''এই মরুভূমিতে গিজগিজ করছে সাপ।''

''শুধু সাপ?'' উৎসাহের সঙ্গে বলল অর্ক, ''এই সাদা মাটির নীচে গর্ত করে বাস করে অসংখ্য বিষাক্ত বিছে।''

''কুমিরের কথা ভুলে যাচ্ছিস,'' গলার সোনার তৈরি সূর্যমালাটা দু'আঙুলে চেপে ধরে গম্ভীর মুখে বলল ভানু, ''ছোট ছোট কুমির। চোখে দেখা যায় না, কিন্তু কুচ করে পায়ের মাংস কেটে নিয়ে পালিয়ে যায়।''

''সিংহও আছে,'' বলল অর্ক।

''আর আছে গাধা,'' বলল ভানু।

''নেকড়ে?'' মনে করিয়ে দিল অর্ক।

''হ্যাঁ হ্যাঁ,'' বলল ভানু, ''নেকড়ে, হরিণ। তাছাড়া, ...''

''হয়েছে, হয়েছে,'' মুখ বেজার করে বলল বগলামুখী, ''অনেক হয়েছে। কথা দিচ্ছি, এখন থেকে সাবধানে থাকব। তা, যে কথা হচ্ছিল...''

''হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম,'' বলল সংশপ্তক, ''খনি থেকে রত্ন এসে জমা হয় ঘাঁটিতে। ছ'মাস ধরে জমা হয়, কাটাই পালিশ হয়। তারপর সব এক সঙ্গে পাচার হয় করাচপা বন্দরে। সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়ে দেশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা অসুরদের ঘাঁটিগুলোতে। প্রতি বছর মকর সংক্রান্তির আগের রাতে একটা জাহাজ আসে এই সমুদ্রে। ছোট ছোট নৌকো করে সব ধনরত্ন নিয়ে গিয়ে তোলা হয় সেই জাহাজে। এই এলাকার প্রতিটি নেতৃস্থানীয় অসুর তখন সেই কাজে হাত লাগায়। দামি রত্ন, তাই অত্যন্ত বিশ্বাসী অসুররাই শুধু এ কাজের আমন্ত্রণ পায়। হিসেবমতো সেই জাহাজ আজ রাতেই আসছে।''

''তার মানে,'' বলল বগলামুখী, ''আজ রাতেই এলাকার সব ধেড়ে অসুর এখানে জড়ো হচ্ছে?''

''ঠিক তাই!'' বলল মাতঙ্গী, ''সেই জন্যই তো সংক্রান্তির সময় আমরা এখানে এসেছি। যদি আজ রাতে ঠিকঠাক কাজ হয়, এক ঢিলে দুই পাখি মারা যাবে। আগামী এক বছরের জন্য মহিষের কোষাগার খালি থেকে যাবে, আর এই এলাকার সব পালের গোদা অসুর ব্যাটাকে একসাথে নিকেশ করা যাবে।''

''সঙ্গে ওদের ওই নেতা,'' বলল সংশপ্তক, ''অসুর উড্ডীন, ওটাও নিকেশ হবে! তোর আমার মতো অনেককে ঘরছাড়া করেছে ওই পিশাচটা।''

''শুধু উড্ডীনকে মেরেই দায়িত্ব শেষ হচ্ছে না তোর,'' বলল মাতঙ্গী, ''এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে তোকে। ছাই মেখে অনেকদিন জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছিস। এখন সে ছাই মুছে রাজতিলক পরতে হবে। সুদৃঢ় এক স্বাধীন রাজশক্তি নির্মাণ করতে হবে, আইনের শাসন ফিরিয়ে আনতে হবে এই অঞ্চলে। পারতেই হবে তোকে। যে সুস্থ সমাজ তুই পাসনি, অন্যদেরকে সেটা দিতে হবে তোকে।''

কোনো উত্তর দিল না সংশপ্তক।

''কতজন অসুর আছে সেখানে?'' প্রশ্ন বগলামুখীর।

''আন্দাজ পাঁচশো অসুর থাকবে ওদের মূল ঘাঁটিতে,'' বলল সংশপ্তক, ''এছাড়া জাহাজে আরও একশো যোদ্ধা থাকবে,

এমনটা আন্দাজ করা যায়। আর তাদের নিকেশ করতে যাচ্ছি আমরা মাত্র সাতজন!"

"দুশ্চিন্তা করিস না," হাত তুলে বলল মাতঙ্গী, "সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে।"

বাতাসের শোঁ শোঁ গর্জনে কান পাতা দায়। ক্ষীণা সরস্বতী নদী এই পর্যন্ত এসে মুখ লুকিয়েছে নুনের মরুপ্রান্তরে। সেখানে পৌঁছে থমকে দাঁড়াল মাতঙ্গী।

সাদা মাটি ছাপিয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠেছে দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত সাদা ফেননিভ এক সমুদ্র। সামনে, প্রায় একশো হাত দূরে। মাটিতে সমুদ্রে তফাত বিশেষ নেই। সমুদ্র অস্থির, মাটি স্থির তাই দিয়েই বোঝা যায় কোনটা মাটি ,কোনটা সমুদ্র। যেখানে মাটি শেষ হয়ে সমুদ্রের এলাকা শুরু হয়েছে, ঠিক সেখানে উঁচু একটা নুনের ঢিপি রয়েছে। না, ঠিক ঢিপি নয়, যেন অনেকগুলো নুনের বলয়। বড়ো থেকে ছোটো, একই কেন্দ্রকে ঘিরে রয়েছে। ইশারা করল সংশপ্তক। শত্রুপুরীর এলাকা এটা, সাবধানে থাকতে হবে।

"বগলামুখী," ঠেলাগাড়ি থেকে চামড়ার লম্বা বস্তাটা নামিয়ে রেখে ফিসফিস করে বলল মাতঙ্গী, "তোমরা ওদিকটা সামলাও, আমরা এদিকটা দেখছি। মনে রেখ, কাজ শেষ হলে আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট নয়। সোজা গ্রামে ফিরে যাবে।"

ঘাড় নেড়ে বগলামুখী ইশারা করল অর্ক ও ভানুকে। তারপর এমন একটা রাস্তা ধরল, যাতে নুনের ঢিপির এলাকা এড়িয়ে সমুদ্রের ধারে পৌঁছনো যায়। আগে বগলামুখী পেছন পেছন অর্ক ও ভানু ঠেলাগাড়ি টেনে নিয়ে চলল। সাবধানে, যাতে শব্দ না হয়। মাতঙ্গী, সংশপ্তক ও অন্যরা হাঁটা দিল ঢিপির দিকে।

কাছে পৌঁছে গেল, শুধু নুনের ঢিপি নয়। ওই নুনের স্তরের তলায় রয়েছে পাথরের তৈরি একটা কেল্লা। পাথরের তৈরি সমকেন্দ্রিক বৃত্তাকার প্রাচীর। প্রতিটি বাইরের প্রাচীরের তুলনায় ভেতরের প্রাচীরের উচ্চতা একটু করে কম। কেন্দ্রের প্রাচীর প্রায় মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। তার মাঝখানে গর্ত, আলোর আভা উঁকি দিচ্ছে সেই গহ্বর থেকে। প্রতিটি প্রাচীরের গায়েই যাতায়াতের জন্য দরজা রয়েছে। আশ্চর্য ব্যাপার হলো, কোনো দুটো দরজাই মুখোমুখি নয়। এ যেন পাথরের তৈরি বিরাট এক গোলকধাঁধা।

তুমুল শব্দ করে কাছেই কোথাও বাজ পড়ল।

"তোরা এখানে অপেক্ষা কর," ফিসফিস করে বলল মাতঙ্গী, "আমি ভেতরটা দেখে আসি। আমার এই থলিটা এখানে রেখে যাচ্ছি, সামলে রাখিস। খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আছে এতে। প্রাণ দিয়ে রক্ষা করবি এটাকে। কোনো অসুর যদি এদিকে আসে, তাকে নিঃশব্দে মেরে ফেলবি।"

"দাঁড়া," বলল সংশপ্তক, "ওখানে থিকথিক করছে অসুর। তোকে ওখানে একা যেতে দেব না।"

"তাহলে কি দল বেঁধে যাব?" শ্লেষের স্বরে বলল মাতঙ্গী, "সেই ভালো। সবাই মিলে ওখানে গিয়ে চড়ুইভাতি করা যাক। কেমন?"

"ঠাট্টা করছিস," বলল সংশপ্তক, "একলা যদি কাউকে যেতে হয়, তাহলে আমি যাব।"

"কেন রে?" রেগে উঠল মাতঙ্গী, "মেয়ে বলে কি আমাকে কম ভাবছিস? এই দ্যাখ তবে!"

কোমরে জড়ানো কালো চাদরটাকে গায়ে জড়িয়ে নিল মাতঙ্গী। তিন জোড়া অবাক চোখের সামনে মাতঙ্গীর অবয়বটা যেন কুয়াশার মতো গলে অন্ধকারে মিশে গেল।

"পারবি এটা করতে?" অন্ধকারের মধ্যে থেকেই মাতঙ্গীর গলা শোনা গেল।

"তু-তু-তুই অদৃশ্য হতে পারিস!" ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল সংশপ্তক।

"পারি," আচমকা সংশপ্তকের পেছন থেকে আবির্ভূত হলো মাতঙ্গী।

"তুই কি ভূত?" ভয়ে ভয়ে বলল সংশপ্তক, "না হলে আমার সামনে অদৃশ্য হলি, আর আমার পেছন থেকে বেরিয়ে এলি!"

"সহজ ব্যাপার," বলল মাতঙ্গী, "পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মিশে যাওয়া, আর যেখানে কেউ তোকে আশা করবে না, এমন জায়গায় থাকা। এই দুটো বিদ্যা আয়ত্ত হলেই অদৃশ্য হওয়া যায়। যাই হোক, আমি চললাম।"

কড়াক! চারদিক আলো করে খুব কাছেই কোথাও বাজ পড়ল। আবার! চমকে উঠল মাতঙ্গী, থমকে দাঁড়ালো। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল। বাজটা পড়ল কোথা থেকে? আকাশে তো বজ্রগর্ভ মেঘের দেখা নেই, বিনা মেঘে বজ্রপাত, এ কি ভুতুড়ে কাণ্ড?

কালো চাদরে শরীর মুড়ে অদৃশ্য হয়ে মাতঙ্গী এগিয়ে গেল কেল্লার দিকে। নিঃশব্দে একটার পর একটা প্রাচীর পার হয়ে শেষে পৌঁছল কেন্দ্রীয় প্রাচীরের অভ্যন্তরে। সেখান থেকে ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে গেছে মাটির অনেক নীচে, সুড়ঙ্গপথ ধরে। মশাল বা প্রদীপ নেই কোথাও, তবু পথ চিনতে অসুবিধা হয় না।

ভূগর্ভের গভীর থেকে উঠে আসা অপার্থিব এক দ্যুতির ছটায় আলোছায়া হিজিবিজি কাটছে সুড়ঙ্গের দেওয়াল জুড়ে। সেই আলো-আঁধারির ছদ্মবেশে মিশে মাতঙ্গী নেমে গেল সিঁড়ির ধাপ বেয়ে।

নীচের তলা থেকে ক্ষীণ মন্ত্রোচ্চারণের শব্দ ভেসে আসছে। মন্ত্রটা চেনা। অসুমন্ত্র। প্রথম তলায় নামার পর দেখল, সিঁড়ির দু'পাশে সারি দিয়ে সুড়ঙ্গ, তার দু'ধারে অনেকগুলো ঘর। একটা ঘরে উঁকি দিয়ে দেখল, মেঝের ওপর ডাঁই করে রাখা আছে নানান রত্ন। তাদের গায়ে আলো ঠিকরে ঘরের ছাদ ও দেওয়ালে রঙিন আলোর রোশনাই এঁকেছে। চারটে লোক মেঝের ওপর বসে সেসব রত্ন বস্তাবন্দি করছে। সেই দরজাটা থেকে সরে অন্য একটা ঘরে উঁকি দিয়ে দেখল, সে ঘরটা প্রায় খালি। মেঝের ওপর শুধু দু'চারটে রত্ন পড়ে আছে। লোকজন কেউ নেই সেই ঘরে। একটা রত্ন কুড়িয়ে নিল মাতঙ্গী। চোখের কাছে নিয়ে এসে দেখল। মনে হল বৈদূর্যমণি। আশেপাশের আরও কয়েকটা ঘরে উঁকি দিয়ে দেখল। বেশিরভাগই খালি। বোঝা যাচ্ছে, এ বছরের মতো রত্ন পাচার শেষ হয়ে এসেছে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে অপার্থিব সেই আলোটা আরও জোরালো হয়ে উঠল, মন্ত্রোচ্চারণের শব্দটাও স্পষ্ট হয়ে উঠল। আরও তিনটে তলা নামার পর সিঁড়ি শেষ হলো।

বিশাল অট্টালিকা। এত বিশাল, যে দু' তিন হাজার মানুষ অনায়াসে বসতি করতে পারে সেখানে। সারি সারি থাম, থামের পর দালান। দালানের পর সারবন্দি ঘর। আবার উঠোন, থাম, দালান। যেন গোলকধাঁধা। মেঝের ওপর নুনের পুরু আস্তরণ। তার ওপর ইতস্তত ছড়ানো পায়ের ছাপ। দেখা মিলল বৃহৎ এক সভাঘরের। গঠন অনেকটা শক্তিমন্দিরের চণ্ডীমণ্ডপের মতো। এত বড়ো ঘর, যে একদিক থেকে অন্যদিক দেখা যায় না ভালো করে। মাথার কাছে বিরাট এক জানালা, চাঁদের আলো এসে পড়েছে সেখান দিয়ে। প্রায় 'চার-পাঁচশো অসুর জড়ো হয়েছে সেখানে। সবাই সশস্ত্র। তাদের মধ্যে অনেককেই চিনতে পারল মাতঙ্গী। ওর গ্রামের লোক।

মসৃণ মেছে, মসৃণ ছাদ, মসৃণ দেওয়াল। সর্বত্র সারি সারি ছবি খোদাই করা। দেখে চিনতে পারল মাতঙ্গী। ছবি নয়, লিখিত ভাষা। প্রলয়ের পূর্বে জম্বুদ্বীপের অধিবাসীরা এরকম ছবির হরফেই লিখত। সভাগৃহের কেন্দ্রে উঁচু পাথরের বেদির ওপর প্রায় অর্ধ মানুষ উচ্চতার কী একটা যেন রাখা আছে। আকৃতিতে সেটা লিঙ্গের মতো। হলুদ রঙের এক অপার্থিব আলো বেরচ্ছে সেই লিঙ্গের ভেতর থেকে। দেওয়ালে পাথরের মধ্যে গাঁথা আছে রাশি রাশি বৈদূর্যমণি। সেগুলো থেকেও একইরকম আলো বেরোচ্ছে। আলোয় আলোয় দিন হয়ে আছে ভূগর্ভস্থ গুহার অভ্যন্তর। সমবেত অসুররা সেই বেদীর চারপাশে বসে আছে, উপাসনার ভঙ্গিতে। বেদীর সামনে পদ্মাসনে বসে একটা লোক উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্র আবৃত্তি করে চলেছে। লোকটাকে চিনতে পারল মাতঙ্গী। অসুর উড্ডীন, দানবদের বড়ো নেতা।

আগুন নয়, আকাশের বিদ্যুৎ নয়, তবু এত আলো! কোনো ইন্ধন জ্বলছে না, তবু আলো? অক্ষয় এ শক্তির উৎস কী? হঠাৎ কী মনে হলো, ওপরের কক্ষ থেকে পাওয়া সেই বৈদূর্যমণিটা কটিবন্ধ থেকে বার করল মাতঙ্গী। চমৎকৃত হয়ে দেখল, সেই মণিটি থেকেই আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

তার মানে, ওই লিঙ্গের সান্নিধ্যে এলে যে কোনো বৈদূর্যমণিই স্বয়ংপ্রভ হয়ে ওঠে। কিন্তু লিঙ্গের অভ্যন্তর থেকে আলোকশক্তি বৈদূর্যমণিতে পৌঁছচ্ছে কীভাবে? কোন মাধ্যমের সাহায্যে? শূন্যের মধ্যে দিয়ে? সেটা কীভাবে সম্ভব?

আসনে বসা অবস্থায় উড্ডীন হাতদুটো বাড়িয়ে দিল স্বয়ংপ্রভ লিঙ্গের দিকে। লিঙ্গের আলোয় আলোকিত হয়ে আছে ওর মুখ। দু'হাত দিয়ে লিঙ্গকে স্পর্শ করে উড্ডীন ধীরে ধীরে চোখ বুজল। কয়েক মুহূর্ত পরেই ক্ষণিকের জন্য লিঙ্গের আলো নিষ্প্রভ হয়ে গেল, তার সঙ্গেই আলোর একটা তীব্র রশ্মি লিঙ্গ থেকে বেরিয়ে ছাদের কাছের একটা জানালা দিয়ে নির্গত হলো। তার সঙ্গেই বাইরে কোথাও তীব্র শব্দের সঙ্গে বাজ পড়ল। চমকে উঠল মাতঙ্গী। বিনা মেঘে বজ্রপাতের রহস্য তাহলে পরিষ্কার হলো। কিন্তু এ কী ভয়ংকর অস্ত্র!

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল মাতঙ্গী। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল বারবার। শেষমেশ উড্ডীন উঠে দাঁড়ালো আসন থেকে। চোখমুখ জ্বলজ্বল করছে সাফল্যের আলোয়।

"পেরেছি! আমি পেরেছি!" উড্ডীন চেঁচিয়ে বলে উঠল, "মনের শক্তির সঙ্গে অগ্নিলিঙ্গর শক্তিকে আমি যুক্ত করতে পেরেছি! আগামী যুদ্ধে এই অস্ত্রই হয়ে উঠবে নির্ণায়ক। এক যোজন দূর থেকেও দুর্গার সেনার ওপর বজ্রপাত ঘটাতে পারব, ছারখার করে দেবো মহিষাসুরের সব শত্রুকে। হাতে গোনা অসুর-সৈন্য নিয়েই বিশ্ববিজয় করতে পারবে মহিষ!"

দেওয়ালের দিকে সরে এল মাতঙ্গী। না, বেশি কিছু ভাবার সময় নেই এখন। আজ রাতটাই আছে হাতে। আজ রাতেই যদি এই লিঙ্গ জাহাজে ওঠে? মহিষের কাছে পৌঁছয়? এইরকম ভয়ংকর একটা অস্ত্র যদি মহিষের হাতে পড়ে, তাহলে...সব শেষ! যা করার আজ রাতেই করতে হবে। তাছাড়া, পালের গোদা সব অসুর একজায়গায় জড়ো হয়েছে। দ্বারবতীকে মুক্ত করার এরকম সুযোগ আর আসবে না আগামী এক বছরে।

চমকে উঠে দাঁড়ালো উড্ডীন। বাতাসে একটা চাপা দুর্গন্ধ। বাসি এঁটোকাঁটার দুর্গন্ধ। নাক কুঁচকে আশেপাশে তাকিয়ে দেখল। কোথা থেকে আসছে এই গন্ধটা?

যেমন অদৃশ্যভাবে এসেছিল, তেমন করেই ফিরে গেল মাতঙ্গী। সেখানে, যেখানে সংশপ্তক ও তার বন্ধুরা প্রতীক্ষা

করছিল।

''তোর মতলবটা কী, সেটা এবার বলবি?'' বলল সংশপ্তক, ''আমরা কি কেল্লা আক্রমণ করতে যাচ্ছি?''

''নাঃ, মাথা নেড়ে বলল মাতঙ্গী, সেটা তো আত্মহত্যার শামিল হবে।''

''তাহলে?'' বলল সংশপ্তক।

''বলছি, দাঁড়া'' বলল মাতঙ্গী, ''তার আগে তুই বল, সমুদ্রের ঠিক পাশেই রয়েছে, তবু কেন অসুরদের ওই ভূগর্ভস্থ কেল্লা এখনো জলের তলায় ডুবে যায়নি?''

''শুনেছি কেল্লা আর সমুদ্রের মাঝখানে রয়েছে পুরু এক নুনের দেওয়াল,'' বলল সংশপ্তক, ''সেই দেওয়ালের জন্যই কেল্লায় জল ঢোকে না।''

''ঠিক বলেছিস,'' বলল মাতঙ্গী, ''এবার বল, কী করে ওই নুনের দেওয়াল ভেঙে ফেলা যায়?''

''জানি না,'' বলল সংশপ্তক, ''নুনের দেওয়ালে বিস্ফোটক প্রয়োগ করে?''

''কীভাবে সেটা করবি?'' ক্ষুব্ধস্বরে বলল মাতঙ্গী, ''সমুদ্রে ডুবুরি নামিয়ে নুনের দেয়াল খুঁজে বের করে তাতে বিস্ফোটক প্রয়োগ করবি? তারপর বিস্ফোরণ ঘটার আগেই নিরাপদ দূরত্বে পালিয়ে যাবি? সেটা কি সম্ভব? এই জন্যই তোকে বলতাম, আরেকটু মন দিয়ে লেখাপড়া কর। সব কিছু কি আর গায়ের জোরে করা যায়?''

''তাহলে তুই-ই বল,'' হতাশ গলায় বলল সংশপ্তক, ''কী করে করবি!''

''এই সাগরের জলে নুনের ভাগ অত্যন্ত বেশি,'' বলল মাতঙ্গী, ''আর বেশি নুন নেওয়ার ক্ষমতা এই জলের নেই। তাই নুনের দেওয়াল অটুট থাকে। এখন, কোনোভাবে যদি খানিকক্ষণের জন্য এই সাগরের জলে নুনের অনুপাত কমিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে জল হুড়মুড় করে নুনের দেওয়াল থেকে নুন শুষে নেবে। নুনের দেওয়ালে ফাটল ধরবে, জল ঢুকে পড়বে শত্রুপুরীতে।''

''তাহলে ব্যাপারটা হলো,'' মাথা চুলকে বলল সংশপ্তক, ''সাগরের জলে নুনের অনুপাত কমাতে হবে। কী করে করবি সেটা?''

''খুব সহজ কাজ,'' হেসে বলল মাতঙ্গী, ''সাগরের জলে হঠাৎ করে বেশ খানিকটা নদীর জল মেশাতে হবে।''

''আর সেটা বুঝি খুব সহজ কাজ?'' হাত উলটে বলল সংশপ্তক, ''এখানে নদী কোথায়?''

''কেন?'' খুব অবাক হয়ে বলল মাতঙ্গী, ''ওই যে সরস্বতী নদী, দেখতে পাচ্ছিস না?''

স্তম্ভিত সংশপ্তক কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, ''ও নদী তো মজে শুকিয়ে গেছে। সরু সুতোর মতো ধারা, তাও সমুদ্রে পৌঁছয় না। ওর জল দিয়ে সমুদ্রের জলে নুনের ঘনত্ব বদলে দিবি? পাগল হয়ে গেছিস নাকি?''

''সরস্বতী আসলে শুকোয়নি,'' মাথা নেড়ে বলল মাতঙ্গী, ''অন্তঃসলিলা হয়ে গেছে। মাটির ক'হাত নীচ দিয়ে এখনো বয়ে চলেছে সেই নদী। প্রথমে বালি, তার ওপর নুনের স্তর ঢেকে রেখেছে সেই ধারাকে। লম্বা একটা ছুরি দিয়ে যদি সেই স্তরে আঘাত করা যায়, তাহলে কিছুক্ষণের জন্য হলেও মাটির নীচের জল ফোয়ারার মতো বেরিয়ে আসবে। তাতেই আমাদের কার্যসিদ্ধি হবে।''

''মাটির মধ্যে লম্বা ছুরি দিয়ে আঘাত করবি?'' মাথা চুলকে বলল সংশপ্তক, ''কতটা লম্বা ছুরি? কোথায় পাবি সেরকম ছুরি? তুই কী বলছিস, কিছুই আমার মাথায় ঢুকছে না।''

''চিন্তা করিস না,'' আশ্বস্ত করল মাতঙ্গী, ''ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দে।''

''তুই যখন বলছিস,'' বলল সংশপ্তক, ''তখন নিশ্চয়ই ঠিকই বলছিস। কিন্তু পুরো ব্যাপারটাই আমার অবিশ্বাস্য লাগছে।''

''অবিশ্বাসের কোনো কারণ নেই,'' বলল মাতঙ্গী, ''মনে আছে, আগে এইখানে পনেরো হাত মতো গর্ত খুঁড়লেই জল বেরত? ছোটবেলায় এখানে আমরা চড়ুইভাতি করতে আসতাম, তখন আমি অনেকবার করে দেখেছি। কেন, তোর মনে নেই?''

চামড়ার থলি খুলে অনেকগুলো বাঁশের টুকরো বার করল মাতঙ্গী। সাধারণ বাঁশের টুকরোর থেকে ভারী, গায়ে অজানা কোনো রসায়নের প্রলেপ। দৈর্ঘ্যে তিন হাত মতো, প্রস্থে প্রত্যেকটাই আলাদা। সবচেয়ে সরু টুকরোটা আরেকটু বিশেষত্ব যুক্ত। টুকরোটার নীচে একটা ছুঁচল ধাতব টুপি পরানো আছে। টুকরোটা মাটিতে গেঁথে দিল মাতঙ্গী, ধাতব অংশটা প্রথম মাটির মধ্যে গেল। একটু চাপ দিতেই নুনের স্তর ভেদ করে সম্পূর্ণ বাঁশের টুকরোটা সোজা ঢুকে গেল মাটির মধ্যে, শুধু মাথাটা বেরিয়ে রইল। তার তুলনায় মোটা টুকরোটা এবার সেই মাথার ঠিক ওপরে রাখল। টুকরো দুটো একদম খাপে খাপে জুড়ে গেল। থলি থেকে একরাশ মোম-মাখানো নারকেল দড়ি বার করল মাতঙ্গী। জোড়ের মুখটা শক্ত করে বেঁধে ফেলল। তারপর চাপ দিয়ে দ্বিতীয় টুকরোটাকেও ঢুকিয়ে দিল মাটিতে এইভাবে একটার পর একটা টুকরো জুড়ে সেগুলোকে মাটির মধ্যে ঢুকিয়ে গেল মাতঙ্গী। সবকটা টুকরো ঢুকে যাওয়ার পর কপালের ঘাম মুছল মাতঙ্গী।

''লম্বা ছুরি মাটির মধ্যে কেমন করে ঢুকিয়ে দিলাম, দেখলি?'' বলল মাতঙ্গী, ''সবকটা মিলে নিশ্চিত জলের স্তরে পৌঁছে গেছে। এবার আসল কাজটা করতে হবে।''

''কোন কাজটা?'' হতভম্ব সংশপ্তক প্রশ্ন করল।

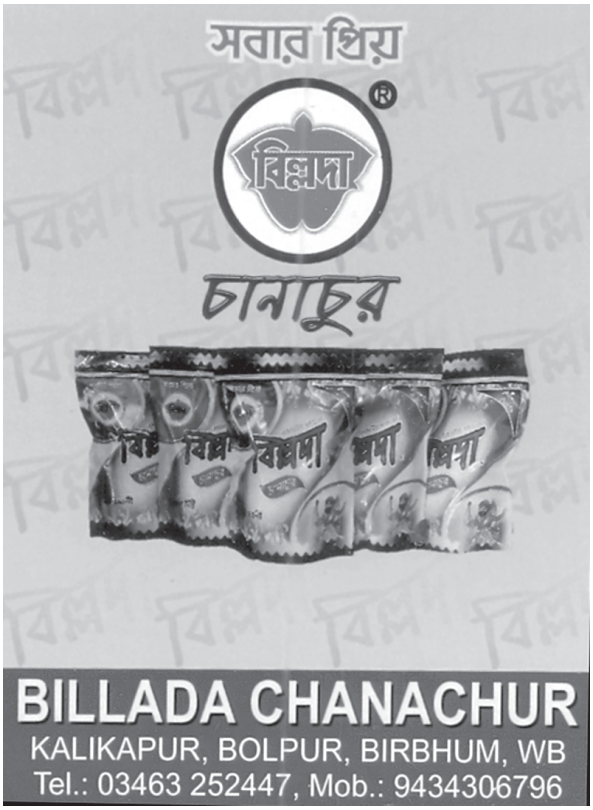

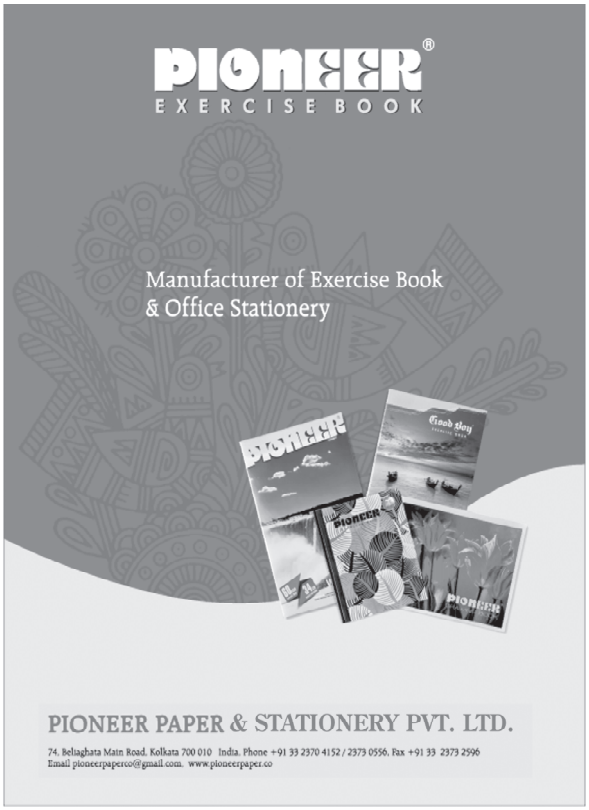

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

''আর কোনো কথা নয়,'' বলল মাতঙ্গী, ''তোর এবার পালা। পূর্বদিকে দৌড়তে থাক। এক ক্রোশ দূরে যে জায়গাটায় আমরা প্রথম থেমেছিলাম, সেখানে পৌঁছে তারপর থামবি। আর একটা কথা মনে রাখ। কোনো অসুর যেন এখান থেকে পালিয়ে গ্রামে পৌঁছতে না পারে। কাউকে পালাতে দেখলেই মেরে ফেলবি। বিরাট একটা দায়িত্ব দিলাম তোদের ওপর। আজ রাতে এখানে যা ঘটল, যা ঘটবে–তার সংবাদ যেন ঘুণাক্ষরেও মহিষের কানে না পৌঁছয়।''

''আর তুই?'' প্রশ্ন শঙ্কিত সংশপ্তকের।

''এখানে আগুন লাগিয়ে আমিও আসছি।''

''না,'' মাথা নেড়ে বলল সংশপ্তক, ''তোকে ছাড়া আমি যাব না।''

''যা বলছি,'' উষ্মার সাথে বলল মাতঙ্গী, ''না হলে এক থাপ্পড় লাগাব।''

হতাশার সঙ্গে মাথা নেড়ে সংশপ্তক ওর সঙ্গীদের ইশারা করল। তারপর লম্বা একটা নিঃশ্বাস নিয়ে দৌড় দিল সমুদ্রের উলটো দিকে। পেছন পেছন ওর সঙ্গী দু'জন। মাতঙ্গী দেখল, দূরে পূর্ব দিগন্তের কাছে আকাশের রং বদলাতে শুরু করেছে। রাত পোহাতে আর বেশি দেরি নেই। কাজটা তাড়াতাড়ি সারতে হবে।

সবচেয়ে ওপরের বাঁশের টুকরোটার মাথায় একটা ছিদ্র ছিল, মোম দিয়ে ঢাকা। কোমর থেকে ছুরি বার করে সেই মোমের আস্তরণ খুঁচিয়ে অনাবৃত করে ফেলল মাতঙ্গী। নারকেলের দড়ি ঢুকিয়ে দিল ছিদ্রপথে। চকমকি ঠুকে দড়িতে আগুন দিল। তারপর দৌড়ল নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে।

সামনেই কিছুটা দূরে একটা উঁচু জায়গা আছে। সেখান থেকে নিশ্চিন্তে সব কিছু পরিষ্কার দেখা যাবে।

মাস্তুলের ওপর চড়ে নজর রাখছিল ষড়জঙ্ঘ। অসুর ষড়জঙ্ঘ। এই জাহাজের পোতাধ্যক্ষ।

দানবরা নৌচালনায় পটু নয়। কিন্তু ষড়জঙ্ঘ তো অগে বরুণ উপাসক ছিল। জাহাজে জন্ম, জাহাজেই বেড়ে ওঠা। তাই অসুর হওয়ার পর এই চাকরিটা পেতে অসুবিধা হয়নি। আরামের চাকরি। করাচপা বা লোথাল, কখনো-বা মকর উপকূল, কখনো-বা আরও পশ্চিমে সুখধারা দ্বীপ। অসু ধর্মগুরুদের নিয়ে যাওয়া, নিয়ে আসা। ধর্মপ্রচারে সাহায্য করা। তার পরিবর্তে অঢেল আরাম। শারীরিক সুখের যাবতীয় সামগ্রীর জোগান রয়েছে নিরন্তর। শুধু বছরের এই সময়টাতেই একটু কাজের চাপ থাকে। সংক্রান্তির আগের রাতেই পৌঁছে যেতে হয় অপার্থিব এই লবণ-সমুদ্রের কিনারায়। নৌকা বোঝাই করে ধনরত্ন আসে। সেসব জমা করতে জাহাজে। তারপর যেতে হয় করাচপা বন্দরে। সেখানে রত্নর মূল্য নির্ধারণ হয়। বিলিব্যবস্থা ঠিক হয়। তারপর জম্বুদ্বীপের পশ্চিম উপকূল জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় সেসব রত্ন পৌঁছে দিতে হয়। পুরো ব্যাপারটার হিসেব রাখতে হয়। অসুর উড্ডীন হিসেবপত্রের ব্যাপারে ভীষণ কড়া। একটা রত্নও এদিক ওদিক হলে গর্দান চলে যেতে পারে। কিন্তু সব কাজ ঠিকঠাক সমাধা হলে পুরস্কার মেলে অঢেল। তারপর আর একটা বছর পায়ের ওপর পা তুলে আরাম করা।

একটার পর একটা নৌকা আসছে, চটের বস্তা ভর্তি করে রত্ন তোলা হচ্ছে জাহাজে। একটা নৌকা খালি হতেই আরেকটা নৌকা আসছে। এখন পর্যন্ত সব কাজ ঠিকঠাকই চলছে। ওই তো, শেষ দফার নৌকাগুলো আসছে এবার। মনে খুশি খুশি ভাব, এবারের মতো এই কাজটা মিটল, ভাবছিল ষড়জঙ্ঘ।

যাক, শেষ নৌকোগুলোও খালি হলো। আলোর সংকেত দেখিয়ে পাড়ে খবর পাঠাল ষড়জঙ্ঘ। এবার নোঙ্গর তোলা হবে। পাল খাটানো হবে। তারপর দুটো বিশাল পালের দাপটে অনুকূল বাতাসে ভর দিয়ে সোজা করাচপা বন্দর।

দপ করে একটা আগুন জ্বলে উঠল, খুব কাছেই। কী হলো? অবাক ষড়জঙ্ঘ দেখল, একটা পালে আগুন লেগেছে। সর্বনাশ! এখন কী করা যায়? কিছু ভাববার বা করবার আগেই আবার দপ করে আগুন জ্বলে উঠল, এবার অন্য পালে। এবারের ঘটনাটা ভালো করে দেখতে পেল ষড়জঙ্ঘ। পালের আগুনের উৎস ওই আকাশ! আকাশ থেকে আগুন ঝরে পড়ছে!

আগুন নেভাতে হবে! সবাইকে সতর্ক করতে হবে! হাত বাড়িয়ে মাস্তুল সংলগ্ন বড়ো ঘণ্টাটা বাজাতে গেল ষড়জঙ্ঘ। মেঘের আড়াল থেকে সাঁই করে একটা তির এসে কবজি থেকে হাতটা কেটে বাদ দিয়ে দিল। আতঙ্কে যন্ত্রণায় চিৎকার করতে গেল ষড়জঙ্ঘ। মুখ খোলা মাত্র একটা তির এসে জিভ ভেদ করে গলায় আটকে গেল। অসহ্য যন্ত্রণায় চোখ ঝাপসা হয়ে এল। অচেতন দেহটা নীচে পড়ার আগেই এক ঝাঁক তির এসে দেহটাকে মাস্তুলের কাঠের সঙ্গে গেঁথে দিল।

স্থানীয় সেনাপ্রধান কর্কটবাহুর তত্ত্বাবধানে অসুর সৈন্যরা রত্ন বোঝাই বস্তাগুলো জাহাজের খোলের মধ্যে গুছিয়ে রাখতে ব্যস্ত ছিল। আগুনের দাউদাউ শব্দে সচকিত হয়ে খোল থেকে বাইরে এসে দেখল, অনেক দেরি হয়ে গেছে। তীব্র আগুনে ছারখার হচ্ছে দুটো মাস্তুল, জাহাজের পাটাতন। ষড়জঙ্ঘ কোথাও নেই।

''দেখছিস কী!'' চিৎকার করে বলল কর্কটবাহু, ''বালতি করে জল তুলে আগুন নেভা! না হলে পুরো জাহাজটাই পুড়ে ছাই হয়ে ডুবে যাবে!''

বালতিতে হাত দেওয়ার আগেই একঝাঁক আগুন-তির ঝরে পড়ল আকাশ থেকে। তিরবিদ্ধ হয়ে শয্যা নিল অনেকে। অবাক কর্কটবাহু আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল। অন্ধকার আকাশের গর্ভ থেকে অনর্গল তির নির্গত হচ্ছে, ওদের দিকেই তাক করে। বাকি নাবিক ও সৈন্যরা প্রাণভয়ে যে যেদিকে পারল পালানোর চেষ্টা করল। যে শত্রুকে দেখতে পাওয়া যায় না, যে আকাশে লুকিয়ে থেকে যুদ্ধ করে, তার সঙ্গে লড়াই হবে কী করে? খোলা পাটাতনের ওপর লুকোনোরও তো কোনো আড়াল নেই। প্রাণ বাঁচাতে কর্কটবাহু ঝাঁপ দিল জলে। ওর দেখাদেখি আরো কয়েকজন ঝাঁপ দিল। দেখতে দেখতে প্রলয়ঙ্করী আগুন ছড়িয়ে পড়ল জাহাজ জুড়ে। যারা জলে ঝাঁপ দিয়েছিল, তাদের বিস্মিত চোখের সামনে রত্নবোঝাই জাহাজ জলের অতলে তলিয়ে গেল।

উড্ডীনকে খবর দিতে হবে! রত্নবোঝাই বস্তাগুলোকে জলের তলা থেকে উদ্ধার করতে হবে! উদ্বিগ্ন কর্কটবাহু ভাবল, যে করে হোক, পাড়ে পৌঁছতে হবে।

জাহাজের জ্বলন্ত ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে আছে অনেকটা জায়গা জুড়ে। সেইসব এড়িয়ে পাড়ের দিকে সাঁতার কাটতে শুরু করল কর্কটবাহু। হঠাৎ মনে হলো, কী একটা ছায়া ছায়া অবয়ব যেন পাক খাচ্ছে ওর চারপাশে। চাঁদনি রাতের ভুতুড়ে আলো-আঁধারে পরিষ্কার করে দেখা যায় না। গা ছমছম করে উঠল। সাঁতারের গতি বাড়িয়ে দিল কর্কটবাহু। ওই তো, একটু দূরেই দেখা যাচ্ছে সাদা পাড়। হঠাৎ একটা অতিকায় ছায়ামূর্তি হুমড়ি খেয়ে গায়ের ওপর এসে পড়ল। মনে হলো, যেন একটা মালবোঝাই শকট সোজা এসে ধাক্কা মেরেছে। ছিটকে কিছুদূর উড়ে গিয়ে পড়ল কর্কটবাহু। দ্রুত জলে ডুবে যাওয়ার মুহূর্তে অনুভব করল, ওর শরীরের কোমর থেকে নীচের অংশ উধাও।

চাঁদনি রাত গভীর সমুদ্রে সাঁতার কাটার পক্ষে মোটেই নিরাপদ নয়। জাহাজের আগুন ও আকাশের তিরবৃষ্টি থেকে যারা প্রাণ বাঁচিয়েছিল জলে ঝাঁপ দিয়ে, সাঁতরে পাড়ে পৌঁছনোর আগেই এক এক করে তারা সবাই হাঙরের ঝাঁকের পেটে গেল। সবাই।

''ওরে, এবার তোরা নামা আমাকে!'' আকাশ থেকে হেঁকে বলল বগলামুখী, দড়িতে তিনবার ঝাঁকুনি দিয়ে।

ভানু ও অর্ক দড়ি ধরে ছোট ছোট টান মেরে ধীরে ধীরে প্রকাণ্ড ঘুড়িটাকে নামিয়ে আনল মাটিতে। পা জমিতে ঠেকামাত্র কয়েকটা লাফ দিয়ে দৌড়তে শুরু করল বগলামুখী। দৌড়তে দৌড়তে কোমরবন্ধ থেকে ছুরি বার করল। যে দড়ি দিয়ে ঘুড়িটা বাঁধা হয়েছিল ওর কোমরের সঙ্গে, সেটা কেটে ফেলল। প্রবল

ঝাঁকুনি লাগল শরীরে। দমকা বাতাসে ঘুড়িটা উড়ে গেল সমুদ্রের দিকে। পাকসাট খেতে খেতে হারিয়ে গেল সাগরের গভীরে।

শারীরিক, মানসিক—দু'ভাবেই ক্লান্ত। জ্যোৎস্নাধোয়া সাদা মাটিতে ডিগবাজি খেয়ে চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ল বগলামুখী, একরাশ নুন ছিটিয়ে। সাগরের ঝোড়ো বাতাসে শূন্যে ঝুলন্ত অবস্থায় অন্ধকারে লক্ষ্য স্থির রেখে তির ছোঁড়া সহজ কথা নয়, এমনকী বগলামুখীর পক্ষেও।

''কতদিন ধরে তিলে তিলে বানিয়েছিলাম ঘুড়িটা,'' বেজার

মুখে বলল অর্ক, ‘‘সংক্রান্তির দিন ওড়াবো ভেবেছিলাম। দেখলি তো—যেমন বড়ো, তেমনি মজবুত। তার ওপর এই সময়কার হাওয়ার গতিবেগ, অভিমুখ—সব অধ্যয়ন করেছিলাম কতদিন ধরে। সে সব মাঠে মারা গেল। না, এবারও ঘুড়ি ওড়ানোর প্রতিযোগিতার পুরস্কার জেতা হলো না আমার।’’

‘‘এত কাণ্ড হয়ে গেল,’’ অবাক হলো ভানু, ‘‘তুই এখনো ঘুড়ি প্রতিযোগিতার কথা ভাবছিস? এ বছর ঘুড়ি প্রতিযোগিতা হবে কি না, সেটাই এখন সন্দেহ হচ্ছে। ওরে বাপরে, কী কাণ্ড! এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না!’’

এদিকের কাজ শেষ। মাতঙ্গীর নির্দেশমতো অর্ক ও ভানু জোর পায়ে হাঁটা দিল গ্রামের দিকে। চেষ্টা করেও বগলামুখী উঠতে পারল না। পাহাড়ের মতো গুরুভার শ্রান্তি শরীরের ওপর চেপে বসেছে। মনে হলো, আর একটু বিশ্রাম নিই, তারপরেই উঠে পড়ব। সত্যি কথা বলতে কী, প্রয়োজনের তুলনায় একটু বেশিই হম্বিতম্বি করে মাতঙ্গী। কয়েকটা পলের এদিক ওদিকে কী আর এমন ক্ষতি হবে?

পূর্বদিগন্তে সিঁদুরের ছোঁয়া লাগল এইমাত্র। ভোর হতে আর বেশি দেরি নেই। দূরে কোথাও একটা গুড়গুড় শব্দ হলো। মাটি থরথর করে কেঁপে উঠল। চমকে উঠে দাঁড়াল বগলামুখী। গা থেকে নুনের আস্তরণ ঝরে পড়ল মাটিতে।

নারকেলের দড়ি বেয়ে আগুন পৌঁছল বিস্ফোটক চূর্ণ ঠাসা বাঁশের খোলার মধ্যে। সেখানে আগুন পৌঁছতেই বিস্ফোরণ হলো। সেই বিস্ফোরণে তার নীচের বাঁশের টুকরোটার মাথার মোম গলে গেল। আগুন পৌঁছল দ্বিতীয় টুকরোতে। এইভাবে একটা একটা করে বাঁশের টুকরোয় বিস্ফোরণ হতে লাগল, বিস্ফোরণের প্রকোপ পৌঁছতে লাগল মাটির গভীর থেকে গভীরে। শেষের টুকরোতে আগুন পৌঁছনোর আগেই ধরাতল একটু কেঁপে উঠল। তারপরেই এক ধাক্কায় ফোয়ার মতো জল বেরিয়ে এল মাটির গর্ভ থেকে। গমকে গমকে বন্যার মতো ছড়িয়ে পড়ল, সবকিছু ধুয়ে নিয়ে গেল, মিশে গেল সমুদ্রে।

আবার মাটি কেঁপে উঠল। এবার বেশ জোরে।

হঠাৎ করেই সমুদ্র অনেকটা পিছিয়ে গেল। তারপর খ্যাপা ষাঁড়ের মতো এগিয়ে এল পাড়ের দিকে। উড়ে এল রাশি রাশি বালি, নুনের চাঙড়, পাথর। এক ধাক্কায় টুকরো টুকরো হয়ে ভেসে গেল শত্রুপুরীর প্রাচীরের সারি। প্রবল গতিতে সমুদ্রের জল ঢুকে পড়ল লবণ-উপত্যকার মধ্যে। ঠিক তখনই মাতঙ্গী শুনতে পেল আর্তনাদ।

বগলামুখী? ও এখনো এখানে কী করছে?

মাতঙ্গী দেখল, বগলামুখী প্রাণপণে দৌড়ে আসছে ওর দিকে। কিন্তু সমুদ্র ততোধিক বেগে ছুটে অসছে ওকে গ্রাস করতে।

বগলামুখীকে বাঁচাতে মাতঙ্গী ছুটল সাগরের উন্মত্ত স্রোতের দিকে। এক হাত দিয়ে কোমরে জড়ানো দড়িটা ছুঁড়ে দিল

বগলামুখীর দিকে, অন্য হাত দিয়ে মাটিতে গেঁথে দিল নিজের তরোয়াল। খপ করে দড়িটা ধরে ফেলল বগলামুখী। পরমুহূর্তেই কয়েক মণ সমুদ্রের জল আছড়ে পড়ল ওদের ওপর।

মাথার ওপর অনন্ত জলধি। ঘোলা জল, নোনা জল। মাথার ওপর প্রচণ্ড চাপ। সর্বশক্তি দিয়ে একহাতে তরোয়ালটা, অন্যহাতে দড়িটা ধরে রইল মাতঙ্গী। টান, প্রচণ্ড টান। মনে হলো, কোনো এক অদৃশ্য শক্তি হাতদুটোকে টেনে ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা করছে। দম বন্ধ হয়ে এল। চোখে আঁধার ঘনিয়ে এল।

জ্ঞান ফিরল ভাসমান অবস্থায়। হাতে দড়ির ফাঁস জড়ানো, সেই দড়ির অন্য প্রান্ত বগলামুখীর হাতে। সাঁতার কেটে শুধু নিজেকেই নয়, মাতঙ্গীকেও ভাসিয়ে রেখেছে ও। চারিদিকে অথৈ জল। ডাঙ্গার কোনো চিহ্ন নেই কোথাও।

সারা শরীরে অসহ্য ব্যথা। হাড়গুলো মনে হচ্ছে গুঁড়ো হয়ে গেছে। হতাশায় শ্রান্তিতে হাত পা ছড়িয়ে জলে ভেসে রইল মাতঙ্গী। মাথা ঝিমঝিম, চোখ ঝাপসা। ঠিক তখনই ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলে দিল, এখানে ওরা একলা নেই। ছায়া ছায়া কোনো একটা অবয়ব পাক খাচ্ছে ওদের চারপাশে। সেই পাকের বৃত্ত বড়ো থেকে ক্রমশ ছোটো হচ্ছে।

হাঙ্গর।

মাতঙ্গী দেখল, একজোড়া হিংস্র ক্রূর হিমশীতল চোখ ওর দিকে তাকিয়ে আছে। কোমরবন্ধে হাত দিল, চিরসঙ্গী বেঁটে তরোয়ালটা খুঁজে পেল না। ভীষণ জোরে একটা ধাক্কা, পায়ের কাছে চিনচিনে যন্ত্রণা। নীলচে-সবুজ জল লাল হয়ে গেল রক্তে। ওর শরীরটা টুপ করে ডুবে গেল জলে। সারি সারি ধারালো দাঁত, মূর্তিমান মৃত্যু হাঁ করে এগিয়ে আসছে। জলের নীচে চিৎকার করা যায় না। তীব্র আতঙ্কে বোধহয় চিৎকার করতেও লোকে ভুলে যায়। শরীর অবশ, নিজের অজান্তেই নিশ্চিত মৃত্যুর জন্য তৈরি হচ্ছিল ও।

কে যেন মাথার মধ্যে বলল, ''মাভৈঃ!''

এক ধাক্কায় হাঙ্গরটার আক্রমণ দিগভ্রষ্ট হলো। অবাক মাতঙ্গী দেখল, এক ঝাঁক শুশুক সেখানে হাজির হয়েছে। একটা শুশুক নাক দিয়ে ধাক্কা মেরে মাতঙ্গীকে ভাসিয়ে তুলল, বাকিরা ওদের ঘিরে একটা সুরক্ষা বলয় তৈরি করল। এতগুলো শুশুককে একসঙ্গে দেখে পিছিয়ে গেল হাঙ্গরটা। কিছুক্ষর চারপাশে পাক খেল। শুশুকদের সুরক্ষা বলয়ে ফাঁক পেল না। শেষমেশ পালিয়ে গেল।

মাথার মধ্যে আবার কে যেন বলে উঠল, ''আমাদের সঙ্গে এস।''

শুশুকের ঝাঁক দল বেঁধে মাতঙ্গী ও বগলামুখীকে ঠেলে নিয়ে চলল, পশ্চিমদিকে। গভীর সমুদ্রের দিকে।

অনন্ত গগনে নিরালম্ব অবস্থায় উড়ে চলা যতটা ভীতিপ্রদ, অসীম অর্ণবে শুধুমাত্র এই নশ্বর মানবদেহটাকে সম্বল করে ভেসে চলা বোধহয় তার চেয়েও বেশি ভীতিকর। সেই ভীতিও কিন্তু একটু একটু করে কেটে গেল।

জলের নীচের অবাক করা এক জগৎ ধরা দিল মাতঙ্গীর চোখে না জানি কোন সে কালের খিলান, থাম, কড়িবড়গা, প্রাসাদ–আস্ত একটা নগরী চিরঘুমে ঘুমিয়ে আছে জলতলের কয়েক হাত গভীরে। বিরাট সব যন্ত্রপাতি নিথর হয়ে পড়ে আছে, বালি ও শেওলার পুরু আস্তরণ পড়েছে তাদের ওপর। সমুদ্র ধীরে ধীরে গ্রাস করছে প্রলয়ের পূর্বের সভ্যতার সব নিদর্শনকে।

মন খারাপ হয়ে গেল মাতঙ্গীর। আগামী প্রজন্ম কি কখনো বিশ্বাস করবে, জম্বুদ্বীপের উপকূল জুড়ে এমন উন্নত একটা সভ্যতা ছিল, সাগর এগিয়ে এসে নির্বিশেষে গ্রাস করেছে যাকে?

আজকের যুগের বর্ধিষ্ণু নগরগুলোও তো উপকূল জুড়েই ছড়িয়ে রয়েছে। ভবিষ্যতে যদি সাগর আরো এগিয়ে আসে, তাহলে ভবিষ্যতের প্রজন্ম আমাদের সভ্যতার নিদর্শন হিসেবে কি খুঁজে পাবে? কয়েকটা গ্রাম, কিছু বনভূমি? তারা তো জানতেই পারবে না আমাদের দর্শন, প্রযুক্তি, বিজ্ঞানের উপলব্ধিগুলোর কথা!

শুশুকের ঝাঁক ফুর্তিতে সাঁতার কাটছে, অবলীলায় ঠেলে নিয়ে চলেছে বগলামুখী ও মাতঙ্গীকে। মাথার মধ্যে কে যেন বারবার বলছে, ভয় নেই, ভয় নেই। একটা কথা মনের মধ্যে ধাক্কা মারল মাতঙ্গীর। শশুকরা কি চিন্তার তরঙ্গে কথা বলতে পারে? শরীরের অনুপাতে ওদের মস্তিস্ক অনেকটা বড়। এই অনুপাতে ওরা মানুষকেও পেছনে ফেলে যায়। ওরা কি মানুষের চেয়েও সভ্য? সাগরের অতলে মানুষের চোখের আড়ালে কোন সে সভ্যতা ওরা গড়ে তুলেছে, কে জানে! এত বিরাট মস্তিষ্ক নিয়ে ওরা না জানি ব্রহ্মাণ্ডের কোনো রহস্য উদ্ঘাটন করে চলেছে প্রতিনিয়ত। আমরা তার কিছুই জানতে পারি না।

কোনো একটা পুঁথিতে পড়েছিল মাতঙ্গী, পৃথিবীর প্রায় সব প্রাচীন দেশেই শুশুক সংক্রান্ত স্বপ্ন নিয়ে নানান পুরাণ-গাথা

প্রচলিত আছে। এসব গাথার মধ্যে একটা মিল রয়েছে। সব গল্পেই বলছে, কোনো মানুষ সমুদ্রে বিপদে পড়ে, শুশুকের ঝাঁক এসে তাকে সেই বিপদ থেকে বাঁচায়। তার ঠিক পর থেকেই প্রতি রাতে সেই মানুষটা স্বপ্নে শুশুকদের দেখতে শুরু করে। স্বপ্নে দেখে, অনন্ত জলধির মধ্যে সে শুশুকের ঝাঁকের সঙ্গে খেলা করে বেড়াচ্ছে। শুশুকদের সঙ্গে কথা বলছে। মুখ নেড়ে কথা বলে না, কথাগুলো নাকি মনের মধ্যে ভেসে ওঠে। এরপর ধীরে ধীরে জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যায় মানুষটার। সুপ্ত শুভবুদ্ধি জেগে ওঠে। অতিবড়ো পাষণ্ডও হয়ে ওঠে দার্শনিক, সমাজসেবী।

ঝড়ের মতো বাতাস বইছে হুহু করে। এখানে জলটা বড্ড ঠাণ্ডা। খুব শীত করছে।

গুরুকুলে গুরুমশাইয়ের কাছে শুনেছিল মাতঙ্গী, একটা মজার ব্যাপার আছে শুশুকদের। ওদের মস্তিষ্কের দুটো দিক স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। মস্তিষ্কের এক দিক যখন ঘুমোচ্ছে, অন্য দিকটা কিন্তু তখন জেগে থেকে আশেপাশের ওপর নজর রাখছে, শারীরবৃত্তীয় কাজ করে চলেছে। তাই ওরা চাইলে সারাক্ষণই ঘুমোতে পারে। সম্ভবত সেটা ওরা করেও। যদি কোনো শুশুক একটা স্বপ্ন দেখে, তবে সেটা হবে এক সুদীর্ঘ, নিরবচ্ছিন্ন স্বপ্ন। জীবনব্যাপী, একটা কখনো না শেষ-হওয়া স্বপ্ন। শুশুকের জগৎ জলের জগৎ। অনন্ত, নিরাকার, নিরন্তর গতিশীলতার এক জগৎ। জলের নীচে সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের প্রভাব সীমিত, তাই সে জগৎ এক সময়হীন, ঝাপসা, স্বপ্নালু জগৎ। তার মানে, শুশুকরা সবসময়ই এক স্বচ্ছ, সজ্ঞান স্বপ্নের মধ্যে থাকে। যেন ওরা নিরবধি ধ্যানস্থ। শাশ্বত অনাদি অনন্ত এক যোগী, সম্পূর্ণ অনুভূতি দিয়ে যে ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে সদা যুক্ত।

দূরে সমুদ্রের জলে নীলাভ সবুজ রসায়নের স্বপ্রভ আস্তারণ। ঢেউয়ের ছন্দে সেই আলোকিত স্তর উঠছে, নামছে। এগোচ্ছে, পিছোচ্ছে। যেন লক্ষ লক্ষ নীলাভ সবুজ জোনাকি, প্রাণের আনন্দে হেসে খেলে বেড়াচ্ছে সাগরজুড়ে কত না রহস্য লুকিয়ে আছে ওই অতল জলের গর্ভে, তার কিছুই আমরা জানি না। যে শুশুকটা সবার আগে যাচ্ছিল, হঠাৎ সেটা খুব জোরে শিস দিয়ে উঠল। দেখাদেখি অন্য শুশুকগুলোও শিস দিয়ে উঠল। চাঞ্চল্য পড়ে গেল ওদের মধ্যে। কী হলো?

দেখতে দেখতে চোখের সামনে ভেসে উঠল বিশাল এক রণতরী। মাস্তুলে ব্রঙ্গার পতাকা গর্বের সঙ্গে উড়ছে। জাহাজের পাটাতনে দাঁড়িয়ে আছে উদ্বিগ্ন মুখে, ও কে? ভুবেশ্বরী? মাথাটা ঘুরিয়ে উঠল। বড্ড ঘুম পাচ্ছে। শরীর অবশ হয়ে আসছে। বড্ড শীত করছে।

শুশুকের ঝাঁক বিদায় জানিয়েছিল ওদের, এই কিছুক্ষণ আগে। স্নেহভরা দৃষ্টিতে জলের ওপর ওদের অপস্রিয়মাণ অবয়বগুলোর দিকে তাকিয়ে বহুক্ষণ হাত নেড়েছিল ভুবনেশ্বরী। যতক্ষণ ওদের দেখা যায়।

জাহাজের পাটাতনের ওপর ছড়িয়ে বসে গল্প করছিল ওরা তিনজন। ভুবনেশ্বরী, মাতঙ্গী ও বগলামুখী। বৈদ্য শুশ্রূষা করছিল মাতঙ্গী ও বগলামুখীর, বিশেষ করে মাতঙ্গীর। ক্ষতস্থানে পট্টি বাঁধার পর রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়েছে। কোহলযুক্ত ঔষধির প্রভাবে শরীরের কাঁপুনি থেমেছে।

''এবার একটা এসপার-ওসপার যুদ্ধ হবে,'' বলছিল ভুবনেশ্বরী, ''এই বর্ষার মধ্যেই নৌবহর নিয়ে মহিষের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাব আমরা, মহাবলাচলের দুর্গকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলব। দুর্গ থেকে বেরোনোর সুযোগ দেব না ওকে। কি, বুঝতে পারছ, কী বলছি?''

শুশুকদের কথা কিছুতেই ভুলতে পারছিল না মাতঙ্গী।

''একটা ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে থাকি আমরা,'' স্বগতোক্তির স্বরে বলছিল মাতঙ্গী, ''আমরা ভাবি, এই পৃথিবীতে শুধু আমরাই চেতনার অধিকারী। বাকি জীবজগৎ শুধুমাত্র জীবনধারণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতেই সদা ব্যস্ত। সহানুভূতি, পরোপকারের মতো বৃত্তি তাদের মধ্যে নেই। আমার সে ধারণা আজ সমূলে নড়ে গেছে।''

''এ ব্রহ্মাণ্ড চেতনাময়,'' বলল ভুবনেশ্বরী, ''যাকে আপাত জড় বলে মনে হয়, তার মধ্যেও সেই একই চেতনা, সত্তা আছে, যা আছে আমাদের মধ্যে। এটাই জগতের মুলভূত সত্য।''

''একটা রহস্যের কিনারা আজ করতেই হবে,'' মাথা নেড়ে বলল বগলামুখী, ''শুশুকের ঝাঁক ঠিক সময়মতো আমদের বাঁচাতে হাজির হলো কী করে? হাঙ্গরের মুখ থেকে আমাদের উদ্ধার করে ওরা তোমার কাছেই-বা পৌঁছে দিল কেন? সবচেয়ে বড়ো কথা, আমরা বিপদে পড়ব, এটা আগেভাগে জানতে পেরে ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় জাহাজ নিয়ে তুমি হাজির হলে কী করে?''

''জাহাজ নিয়ে হাজির হয়েছি,'' বলল ভুবনেশ্বরী, ''কারণ সাত তাড়াতাড়ি তোমার কাছে পৌঁছতে চাইছিলাম।''

''কেন?'' প্রশ্ন মাতঙ্গীর।

''ভেবেছিলাম তোমাকে বলব,'' হতাশ স্বরে বলল ভুবনেশ্বরী, ''অসুরদের ঘাঁটি জলের তলায় ডুবিয়ে দেওয়ার যে পরিকল্পনা তুমি করেছে, সেটা পরিবর্তন কর। কিন্তু এখন আর সেকথা ভেবে লাভ নেই।''

''পরিকল্পনা পরিবর্তন?'' খুব অবাক হলো মাতঙ্গী, ''কেন? একটু খোলসা করে বলবে?''

''অনেক কথা বলতে হবে তার জন্য,'' ভুবনেশ্বরী, ''সে সব এখনিই শুনবে?''

''এখনিই বলো,'' বলল মাতঙ্গী, ''বিশেষ কোনো কাজ তো নেই আমাদের।''

''মহিষাসুরের গ্রাম ধ্বংস হওয়ার সময়,'' বলল ভুবনেশ্বরী, ''সেখানকার অধিকাংশ বাসিন্দাই মারা গিয়েছিল। দু'একজন কিন্তু বেঁচে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে একজনের নাম মারীচ। সেই অসুর পালাতে পালাতে মধ্যভারত পার হয়ে পৌঁছয় বিদেহ রাজ্যে। ঘটনাচক্রে সেই সময় প্রাক্তন অসুগুরু আরক্ত বিদেহ ভ্রমণ করছিলেন। তাঁর সঙ্গে দেখা হয় মারীচের। বেশ কিছু অর্থের বিনিময়ে আরক্ত মারীচের কাছ থেকে সংগ্রহ করেন এই তালপাতার পুঁথি।''

ভুবনেশ্বরী ওর পোশাকের মধ্যে থেকে বাঁশের একটা নল বার করে এগিয়ে দিল মাতঙ্গীর দিকে। নলের উন্মুক্ত দিকটা কাপড়ের ছিপি দিয়ে আটকানো, কাপড়ের ওপর মোমের প্রলেপ। ছিপি খুলে ভেতরে আঙ্গুল ঢুকিয়ে মাতঙ্গী বের করে আনল একটা পাতলা পুঁথি। তালপাতার ওপর ছুরি দিয়ে খোদাই করে লেখা আছে কিছু। লেখা নয়, আঁকা। সারবন্দি ছবি আঁকা। মাতঙ্গী চিনতে পারল, এইরকম ছবি ও দেখেছে গত রাতে, অসুরদের পাতাল-ঘাঁটির দেওয়ালে।

''বাঁশের নলের মধ্যে বায়ুনিরুদ্ধ অবস্থায় ছিল,'' বলল ভুবনেশ্বরী, ''তাই পুঁথিটা নষ্ট হয়নি।''

''তালপাতার ওপর খোদাই করে লেখার এই পদ্ধতি খুবই প্রাচীন,'' পুঁথির পাতার ওপর সস্নেহে হাত বুলিয়ে বলল মাতঙ্গী, ''আজকাল অনেক দেশে কালি ব্যবহার করে লেখার প্রচলন হয়েছে। সেই পদ্ধতির সমস্যা হলো, খুব সহজেই একটু জায়গার কালি মুছে অন্য কিছু লিখে দেওয়া যায়। শুনেছি সেসব দেশের কোনো কোনো রাজা এই পদ্ধতিতে পুরোনো পুঁথির লেখা পরিবর্তন করে পূর্ববর্তী রাজাদের সব গৌরবগাথা নিজের নামে চালিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তালপাতার ওপর খোদাই করা পুঁথি বিকৃত করা খুব কঠিন, হয়তো-বা অসম্ভব। সে যাই হোক, কী লেখা আছে এই পুঁথিতে, যার জন্য তোমাকে এতদূর দৌড়ে আসতে হলো? ভাগ্যিস অসুরদের জাহাজ তোমাদের দেখতে পায়নি। দেখতে পেলে কী যে হতো, কে জানে।'

''এই পুঁথির ভাষা আজ আর খুব বেশি লোক জানে না,'' বলল ভুবনেশ্বরী, ''অনেক কষ্ট করে অনুবাদ করানো গেছে। পুঁথি থেকে জানা যাচ্ছে, একটা নয়—তিনটে লিঙ্গ রাখা ছিল, ওই দ্বারবতীর ঘাঁটিতেই। তার মধ্যে একটা হলো আস্থানলিঙ্গ, যেটার কথা আমরা জানি। মহিষ যেটাকে ওর গ্রামে নিয়ে গিয়েছিল। অন্য দুটো নিশ্চয়ই এখনো রয়েছে দ্বারবতীর পাতাল-ঘাঁটিতে।''

''কী রকম দেখতে এই দুটো লিঙ্গ,'' উত্তেজনায় আধশোয়া অবস্থা থেকে উঠে বসল মাতঙ্গী, ''সেটার কোনো বিবরণ আছে কি এই পুঁথিতে?''

''দুটোর মধ্যে একটা হলো অগ্নিলিঙ্গ,'' বলল ভুবনেশ্বরী, ''পীতাভ পাথরের তৈরি। পৃথিবীর তড়িৎচুম্বকীয় ক্ষেত্র থেকে নিরন্তর শক্তি আহরণ করতে পারে এই লিঙ্গ। শক্তি আহরণ করে স্বপ্রভ হয়ে ওঠে, নিশ্ছিদ্র অন্ধকার গুহাও আলোকিত হয়ে ওঠে এর মহিমায়। আরও আশ্চর্য কথা লেখা আছে এই পুঁথিতে। বলছে, বিশেষ ধরণের একরকম পাথর এই লিঙ্গের সান্নিধ্যে এলে স্বপ্রভ হয়ে ওঠে। ভেবে দেখো, মশালের প্রয়োজন নেই, প্রদীপের বালাই নেই, এই এক অগ্নিলিঙ্গ আর কয়েকটা ওই পাথর দিয়ে সারা শহরকে রাত্রে আলোকিত করে রাখা যায়। বিনা খরচে, চিরকালের জন্য। মহাজাগতিক শক্তিকে সঞ্চিত ও ব্যবহার করার বিদ্যা আছে ওর মধ্যে। দুর্গার ধারণা, মহিষ ওই অগ্নিলিঙ্গকে ব্যবহার করে বিধ্বংসী কোনো অস্ত্র নির্মাণ করার চেষ্টা চালাচ্ছে। তাই ওই লিঙ্গ উদ্ধার করতে চাইছিল দুর্গা।''

''আর অন্য লিঙ্গটা?'' প্রশ্ন মাতঙ্গীর।

''সেটার নাম পরালিঙ্গ,'' বলল ভুবনেশ্বরী, ''আস্ত একটা হীরকখণ্ডের তৈরি সে লিঙ্গ। তার সান্নিধ্যে নাকি মানুষের মধ্যে ইন্দ্রিয়াতীত শক্তি, অর্থাৎ পরাশক্তির জ্ঞান জাগ্রত হয়। কোনো গুরুর প্রয়োজন নেই, পুস্তকের প্রয়োজন নেই, হাতেকলমে অভ্যাসের দরকার নেই। এই লিঙ্গের সান্নিধ্যে নিয়মিত ধ্যান করলেই লিঙ্গ নাকি তার মধ্যে সঞ্চিত যাবতীয় পরাবিদ্যা একটু একটু করে ধ্যানরত শিষ্যকে দান করে দেয়।''

''অগ্নিলিঙ্গ এখন অতল জলের তলায়,'' মাথা নেড়ে বলল মাতঙ্গী, ''কিন্তু পরালিঙ্গ কোথায় রয়েছে, সেটা জানি না।'' এই বলে মাতঙ্গী গত রাতের অভিজ্ঞতা সব খুলে বলল ভুবনেশ্বরীকে।

''আশা করা যায়,'' সব শুনে বলল ভুবনেশ্বরী, ''অগ্নিলিঙ্গর সঙ্গে পরালিঙ্গেরও সলিলসমাধি হয়েছে। ও দুটো হাতে পেলে মানব কল্যাণে ব্যবহার করতে পারতাম। কিন্তু কী আর করা যাবে। যা হয়েছে, ভালোই হয়েছে। মহিষের হাতে থাকার পরিবর্তে ও দুটো ধ্বংস হওয়াই ভালো।''

''শুশুকের ঝাঁক কেন এরকম অদ্ভুত একটা কাণ্ড করল,'' ভুরু কুঁচকে বলল বগলামুখী, ''সেই রহস্যটা কিন্তু এখনো খোলসা হলো না।''

''এতেও কোনো রহস্য নেই,'' বলল ভুবনেশ্বরী।

''রহস্য নেই?'' অবাক হলো বগলামুখী, ''বলছ কী!''

''কেন?'' পালটা প্রশ্ন করল ভুবনেশ্বরী, ''শুশুকের পরিবর্তে একদল মানুষ যদি তোমাদের বাঁচাত, তাহলে কি অবাক হতে?''

''মানুষ আর শুশুক কি এক হলো?'' বলল বগলামুখী, ''সত্যি করে বলো তো, তুমি কি শুশুকদের সঙ্গে কথা বলতে পার?''

''আমি শুধু আমার মনটাকে খুলে রাখি,'' হেসে বলল ভুবনেশ্বরী, ''যাতে ওদের কথা শুনতে পাই, ওরাও আমার কথা শুনতে পায়। কৃতিত্ব আমার নয়, কৃতিত্ব ওদের।''

এও কি সম্ভব? বাক্যহারা হয়ে চুপ করে রইল বগলামুখী ও মাতঙ্গী, কোনো কথা বলতে পারল না।

''মানব-প্রজাতির জন্মলগ্ন থেকেই মানুষ ও শুশুকের মধ্যে এক আত্মীয়তার বন্ধন রয়েছে,'' ভুবনেশ্বরী আবার বলল, ''তার নিদর্শন দেখা যায় সব দেশেরই সাহিত্যে। কিন্তু না, অনেক কথা হলো, আর নয়। তোমাদের চোখ দেখেই মনে হচ্ছে, অনেক কষ্ট করে জেগে আছো। প্রচুর ধকল গেছে তোমাদের ওপর দিয়ে, গত ক'দিন ধরে। এবার তোমাদের একটু বিশ্রাম নিতে হবে।''

দিনমণির আলো মুছে গিয়ে এইমাত্র একরাশ তারকা উদিত হল ঘন নীল আকাশের পটভূমিকায়।

দীর্ঘ বিশ্রামের পর একটু আগে ঘুম থেকে উঠেছে মাতঙ্গী ও বগলামুখী। তীব্রবেগে জল কেটে জাহাজ এগিয়ে চলেছে দক্ষিণদিকে, ভারতভূমির পশ্চিম উপকূল ধরে। মনে হচ্ছে সঙ্গ দিতে তারাদের ঝাঁক একই গতিতে এগিয়ে চলেছে আকাশগঙ্গার ঢেউ সাঁতরে।

একটা কথা অনেকক্ষণ ধরেই মনের মধ্যে পাক খাচ্ছিল মাতঙ্গীর। ভাবল, প্রশ্নটা করেই ফেলা যাক।

''পুরাণে বলেছে,'' বলল মাতঙ্গী, ''প্রলয়ের সময় সপ্তঋষি আর মনুকে রক্ষা করেছিল মহাকায় ধীমান এক মৎস্য। সে ছিল বিষ্ণুর অবতার। সে কি শুশুক ছিল?''

''হতে পারে,'' বলল ভুবনেশ্বরী, ''শুধু যে মানুষের মধ্যেই বিষ্ণুশক্তির আবির্ভাব ঘটে, একনটা তো নয়। এমনকী আমার তো মনে হয়, এই পৃথিবীতে মানুষের উদ্ভবের আগেও সৃষ্টিকে রক্ষা করতে বিষ্ণুর জন্ম হয়েছে। কেন, মধুকৈটভের কথা শোন নি?''

''মধুকৈটভ?'' বলল বগলামুখী, ''সে তো ছিল এক রাক্ষস, তাই না?''

''রাক্ষস? মধুকৈটভ? কী বলছ তুমি?'' অবাক হয়ে ভুবনেশ্বরী তাকাল বগলামুখীর দিকে।

''তাহলে?'' আমতা আমতা করে বলল বগলামুখী, ''সবকিছু গুলিয়ে যাচ্ছে আমার। বুঝিয়ে বলো।''

''রাক্ষস শব্দটা এসেছে 'র' শব্দ থেকে,'' বলল মাতঙ্গী, ''রাক্ষস মানে হল, যে রক্ষা করে। এমনি এমনি নয়, অর্থের বিনিময়ে রক্ষা করে। সোজা কথায় রাক্ষস মানে হলো, ভাড়াটে সৈন্য। জম্বুদ্বীপে বহু উপজাতি রয়েছে, আবহমানকাল ধরে যাদের পেশা হলো যুদ্ধ করা। শুধু যোদ্ধা বা দেহরক্ষীর কাজ নয়, অর্থের বিনিময়ে এরা গুপ্তহত্যা, বিদ্রোহ দমন, সাধারণ মানুষের ওপর দমনপীড়ন সবকিছুই করে। তাই যখন অসুরদের আবির্ভাব হলো, অনেকেই ভেবেছিল, অসুররা এক শ্রেণীবিহীন সমাজ তৈরি করবে, যার মাধ্যমে এইসব রাক্ষস জনজাতির বিলোপ ঘটবে। ঋষি-ঋষিকারা লিখেছিলেন, 'হিরণ্যহস্ত অসুরঃ সুনীথঃ'। হে সোনালি হাতের অসুর, দয়ালু নেতা, আমাদের সহায় হও। রাক্ষসদের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করো। নিয়তির কী পরিহাস দেখো, আজ অসুররা রাক্ষসদের থেকে শতগুণে বেশি অনিষ্টকারী হয়ে উঠেছে।''

''এটাই জগতের নিয়তি,'' বলল ভুবনেশ্বরী, ''যে আশা করে, বৃষ্টি হলে অন্য কেউ তার মাথায় ছাতা ধরবে, বৃষ্টিতে ভেজাই তার একমাত্র ভবিতব্য।''

জাহাজের গতি কমতে শুরু করেছে। নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোনো বন্দরে থামবে এই অর্ণবপোত, ভাবল মাতঙ্গী।

''মধুকৈটভ যদি রাক্ষস না হয়,'' বলল বগলামুখী, ''তাহলে কে তারা? কেনই-বা তারা সৃষ্টি বিনাশ করতে উদ্যত হয়েছিল, যার জন্য বিষ্ণু তাদের হত্যা করেছিল?''

''তাহলে বলি শোনো,'' বলল মাতঙ্গী, ''সকালবেলা ভুবনেশ্বরী বলছিল, এ জগৎ চৈতন্যময়। মনে আছে তো? সেই অন্তর্নিহিত চৈতন্যের কারণেই তথাকথিত জড় সবসময় জীবনের দিকে ধাবিত হয়। জীব হয়ে উঠতে চায় ধীমান, আরও ধীমান। সরল থেকে জটিল, জটিলতর। এটাই ব্রহ্মাণ্ডের নিরন্তর চৈতন্যপ্রবাহের ধর্ম।

এই পৃথিবীতে প্রথম প্রাণ সৃষ্টি হয়েছিল জলে, এককোষী প্রাণী রূপে। সেখান থেকে প্রাণের বিকাশ দুটো ভিন্ন ধারা নিল। একদিকে এককোষী প্রাণীরা পরস্পর সংযুক্ত হয়ে বহুকোষী প্রাণীর রূপ নিল। জটিল থেকে জটিলতর প্রাণীর উদ্ভব হতে লাগল পৃথিবীতে। তাদের কেউ কেউ জল ছেড়ে ডাঙায় বাসা

বাঁধল। অন্যদিকে বহুকোষী প্রাণের বর্জ পদার্থ থেকে জন্ম নিল ভিন্ন ধারার একটা এককোষী প্রাণী। এরা উপলব্ধি করল, বহুকোষী প্রাণীদের মতো স্থায়ীভাবে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে বহুকোষী প্রাণীর রূপ নেবার কোনো প্রয়োজন নেই। সাগরের জলে বসবাসকারী এই এককোষী কীটাণু ছিল সমষ্টিগত বুদ্ধিমত্তার বৈশিষ্ট্যযুক্ত। ভেবে দেখো, মানুষের মস্তিস্ক কত উন্নত, কত জটিল—এমনটাই আমরা ভাবি। মানুষের সেই মস্তিস্ক কিন্তু আদতে লক্ষ কোটি এককোষী মস্তিষ্ককোষের সমষ্টি। কিন্তু এই সমষ্টি হলো স্থিতু, অনড়, অনমনীয়। চাইলেই আমরা আমাদের মস্তিষ্কে আরও কিছু মস্তিষ্ক-কোষ যোগ করে মস্তিষ্কের আয়তন বাড়াতে পারি না। ওরা সেটা করতে পারত, কারণ এইসব এককোষী প্রাণীরা সুযোগমতো যুক্ত হতে, বিযুক্ত হতে পারত।

এদের এই নমনীয়তা অগাধ সুযোগ এনে দিল এদের সামনে। এদের চিন্তাশক্তি হয়ে দাঁড়াল প্রায় অসীম। তার ওপর যেকোনো বহুকোষী প্রাণীর রূপ ধরতে শিখে গেল এরা। যে বহুকোষী প্রাণীই পৃথিবীর প্রধান প্রজাতি হয়ে উঠত, এইসব এককোষী জলকীটরা তাদের রূপ ধরে তাদেরকে ধ্বংস করে ফেলত। ধীরে ধীরে এদের প্রতিপত্তি ছড়িয়ে পড়ল সমগ্র পৃথিবী জুড়ে। সেই কল্পে সাগরে নাকি ঢেউ ওঠাও নাকি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সমগ্র জলভাগ একটা থকথকে শেওলার জলাভূমিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। পৃথিবীর সব বরফ গলে গিয়ে সম্পূর্ণ ভূভাগ ঢেকে গিয়েছিল থকথকে সেই জলায়। এককোষী জলকীটদের জীবন ছাড়া আর কোনো জীবনের উপযোগী ছিল না সেই পৃথিবী।

সেই পরিস্থিতিতে চৈতন্যের শক্তি রূপ নিল জলচর এক বুদ্ধিমান জীবের, যারা সুদীর্ঘ সংগ্রামের শেষে পরাস্ত করল জলকীটদের। অসংখ্য মৃত জলকীটদের দেহজাত পাহাড়প্রমাণ মেদ জমে আবার ডাঙা তৈরি হলো, পৃথিবীকে তাই বলে 'মেদিনী'। লোকে বলে, যুদ্ধে যেসব জলকীট প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল, তারা পৃথিবীর গহ্বরে পাতাল-সাগরে আশ্রয় নিয়েছিল। তারপর বহু কল্প কেটে গেছে, তাদের আর দেখা যায়নি। হয়তো তারা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিংবা হয়তো তারা এখনো আছে। হয়তো আমাদের আশেপাশেই আছে। সাধারণ শেওলার ছদ্মবেশে। অথবা অন্য যে কোনো ছদ্মবেশে।"

"সুন্দর গল্প," বলল বগলামুখী, "কিন্তু মধুকৈটভ? তাদের কী হলো?"

"বুঝতে পারলে না?" ভীষণ অবাক হয়ে বলল ভুবনেশ্বরী, "আরে, 'মধু' শব্দের অর্থ হলো জল বা তরলজাতীয় পদার্থ। 'কৈটভ' মানে হল কীট। 'মধুকৈটভ' মানে , জলের কীট। সেই সচেতন এককোষী জলকীট, যাদের কথা এতক্ষণ বললাম।"

"তা-তা-তা, তার মানে," স্তম্ভিত হয়ে বলল বগলামুখী, "ওই যেসব শেওলার স্তর ভেসে বেড়ায় সমুদ্রের বুকে, ওরাই বুঝি মধুকৈটভ?"

"হতে পারে," বলল ভুবনেশ্বরী, "অসম্ভব নয়।"

"বুঝলাম না," বলল বগলামুখী, "বিষ্ণু হলো সামাজিক সংগঠন। মনুষ্য সমাজের সংগঠন। তাহলে মানুষের যখন জন্মই হয়নি, তখন বিষ্ণুর আবির্ভাব কী করে হয়?"

"যা আছে অণ্ডে," হেসে বলল ভুবনেশ্বরী, "তাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে। প্রতিটি প্রাণী, প্রতিটি ধূলিকণার মধ্যে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের যে নিরন্তর লীলা চলছে, সেই একই লীলা চলছে আমাদের সমাজের মধ্যে। আবার, সেই একই লীলা চলছে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডেও। সমাজ কি শুধু আমাদের? এই সমগ্র সৃষ্টিই এক সমাজ!"

থম মেরে বসে রইল বগলামুখী। রহস্যের এতগুলো পাতা একসঙ্গে খুলে গেল আজ, যার খেই রাখতে অসুবিধে হচ্ছে এখন।

দূর থেকে ভোঁওওও শব্দ শোনা গেল। চঞ্চল হয়ে ভুবনেশ্বরী উঠে পড়ল আড্ডা থেকে।

"কী হলো," প্রশ্ন করল মাতঙ্গী, "ও কার শিঙ্গার শব্দ?"

"কালী," বলল ভুবনেশ্বরী, "এখানে ছোটো একটা বন্দর আছে, সেখান থেকে ও আমাদের জাহাজে উঠবে। সঙ্গে একশো চামুণ্ডা। যদি অবশ্য ওরা বেঁচে থাকে।"

পরিকল্পনা অনুসারে দুর্গার বাহিনী জড়ো হলো মহাবলাচল পাহাড়ের পাদদেশে। গরুড়ের সহায়তায় আকাশপথে দ্রুত এলাকার জরিপ করে ফেলল হরি। ফিরে এসে বলল, "দুর্গের তিনটি প্রাকারের প্রতিটির দরজা কষে বন্ধ করা রয়েছে। ভেতরে তিনটি স্তরের প্রতিটিতেই ভিন্ন ভিন্ন সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত হয়ে আছে। এছাড়া, পর্বতের পাদদেশে রয়েছে চতুর্থ একটি বাহিনী। সম্পূর্ণ পর্বতকে ঘিরে রেখেছে তারা।"

"এই চতুর্থ বাহিনীটাই সবচেয়ে চিন্তার ব্যাপার," বলল দুর্গা, "আমাদের পক্ষে যেমন দুর্গপ্রাকার অতিক্রম করা সময়সাধ্য, অসুরদের পক্ষেও কিন্তু দুর্গপ্রকারের কবাট খুলে পাহাড় থেকে সমতলে নেমে এসে আমাদের আক্রমণ করা সময়সাধ্য। সেরকম আক্রমণ করতে গেলে আমরা আগেই দেখে ফেলব, সতর্ক হবার সময় পাব। কিন্তু এই চতুর্থ বাহিনী

রয়েছে সমতলে। এরা যে কোনো সময় আমাদের ওপর গোপনে ঝটিকা আঘাত করতে পারে।”

“এছাড়া পেছন থেকে অন্তর্ঘাতের সম্ভাবনা তো আছেই!” বলল মাতঙ্গী, “আমাদের সামনে শত্রু, পেছনেও শত্রু। আমাদের রসদ সরবরাহের পথ কাবেরী নদীর মধ্যে দিয়ে, যার দু’ধারে ঘন জঙ্গল। তাই সরবরাহ পথের ওপর অন্তর্ঘাতের সম্ভাবনাও প্রবল।”

“সাবধানে থাকতে হবে আমাদের,” বলল হরি।

“চতুর্থ বাহিনীর সেনাপতি কে?” প্রশ্ন দুর্গার, “আমাদের সামনে বলি হিসেবে কাকে ছেড়ে দিয়ে দুর্গের ভেতরে লুকিয়েছে মহিষ?”

“কানাঘুষোয় বলছে,” বলল ভুবনেশ্বরী, “স্থানীয় নব্য-ধর্মান্তরিত অসুরদের নিয়ে হালে এক বাহিনী গঠন করেছে মহিষ। তার সেনাপতি নিযুক্ত হয়েছে দানব তাম্র। এটা অনুমান করা যায়, প্রতিরক্ষার প্রথম স্তর হিসেবে নিজের সেরা বাহিনীগুলোকে ব্যবহার করবে না মহিষ। ব্যবহার করবে নতুনদের। এখন, এখানে একটা সুযোগ রয়েছে। এই সেনাপতি তাম্র এককালে মহিষের ডানহাত ছিল। রক্তবীজ নামে অভিহিত হতো। কিন্তু আজকাল নাকি তার আর কাজে মন নেই। রক্তবীজদের মতো জামাকাপড় আর পরে না তাম্র। ওর সৈন্যরাও অভিজ্ঞ যোদ্ধা নয়। তাই...”

“আমার মনে হয়,” বলল কালী, “এই তাম্র লোকটাকে আমি চিনি। লোকটার আজকাল কাজে মন নেই, সেটা স্বাভাবিক। লোকটাকে আমি মেরে ফেলে তারপর আবার বাঁচিয়ে তুলেছিলাম, তারপর থেকেই ওর আর অসু-স্বর্গে বিশ্বাস নেই। তারপরেও কেন যে লোকটা এখানে এসে জুটেছে, কে জানে! হ্যাঁ, আমি একমত, এই ব্যাপারটা আমাদের একটা সুযোগ এনে দিয়েছে। কিন্তু সে সুযোগ কবে ফল দেবে, সেটা জানা নেই। আপাতত আমাদের সাবধান থাকতে হবে।”

সেদিনের মতো কাবেরী ও মহাবলাচলের মধ্যবর্তী সেই ঘন জঙ্গলে তাঁবু ফেলল দুর্গার বাহিনী। স্কন্ধাবারকে ঘিরে রাখল হস্তীযুথ। পরদিন ঊষালগ্নে সমগ্র বাহিনী পূর্বজদের উদ্দেশে স্মৃতিতর্পণ করল কাবেরীর জলে। শেষবিদায় চেয়ে নিল পূর্বজদের কাছ থেকে। তারপর সবাই সমবেত হলো স্কন্ধাবারে। মহীশূরকে চারিদিক থেকে অবরুদ্ধ করে যুদ্ধ ঘোষণা করল দুর্গা।

বর্ষাকাল শেষ হয়ে শরৎ হেমন্ত পেরিয়ে শীতকাল এল। বাতাসের শনশন শব্দে শুকনো পাতার ঘূর্ণি। পরিযায়ী পাখির দল মেঘমুলুকে গা এলিয়ে ভেসে চলেছে সাগরের অভিমুখে। হিমালয়ের কোলে আমার সেই ছোট্ট গ্রামটা নিশ্চয়ই ওদের পথে পড়েছিল, ভাবছিল দুর্গা। কতকাল হয়ে গেল, দেখিনি সেই গ্রামটাকে। দেখিনি মা-বাবাকে, গুরুমশাইকে।

শীতের সঙ্গেই ফিরতি মৌসুমি বায়ুর ধাক্কায় আবার নামল বর্ষা। দুর্গ ছেড়ে বেরোনোর নাম নেই মহিষের। আর কতকাল এভাবে খোলা আকাশের তলায় দিন কাটবে’? অস্থির হয়ে উঠল দুর্গার সেনাদল।

দুর্গার অজান্তেই একই মানসিক অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল ওর শত্রুপক্ষও।

অঝোর বর্ষণের রাত। হাড় কাঁপানো শীত। কিন্তু আগুন জ্বালানোর উপায় নেই। পাছে শত্রুপক্ষ দূর থেকে আগুন লক্ষ্য করে তির ছোঁড়ে। তার ওপর স্যাঁতস্যাঁতে এই মুলুকে এত পোকামাকড়! আগুন জ্বাললেই লক্ষ লক্ষ পোকামাকড় এসে হাজির হয়। কামড়ের চোটে অস্থির করে দেয়। নিজের গ্রাম ছেড়ে এত দূরে অচেনা এই জায়গায় খোলা মাঠে শত্রুর

Autoply Harness Industries

Commerce House (1st Floor, Room No. 3-A)

2, Ganesh Chandra Avenue

Kolkata - 700 013

Phone : 2213-2971, 2213-2907

Manufacturers of

Autoply® BRAND

Automobile Wiring Harness,

PVC Auto Cable, Battery Cable, PVC Tape,

Wiring Terminal

and Auto Electrical parts

চাঁদমারির নীচে দিনের পর দিন রাতের পর রাত কাটানো কেন? কী লাভ? কী হবে এই যুদ্ধ লড়ে! তাঁবুর মধ্যে কম্বল জড়িয়ে বসে বৃষ্টি দেখতে দেখতে এসব কথাই মনে মনে ভাবছিল দানব তাম্র। বহুকাল মহিষকে অসুর প্রতিভূজ্ঞানে ভক্তি করেছে তাম্র। এক সময় মহিষের কথায় বিনা বাক্যব্যয়ে আগুনে ঝাঁপ দিতে পারত ও। কিন্তু আজ? আজ সবকিছুই অর্থহীন মনে হচ্ছে।

''মহামহিম,'' তাঁবুর পর্দার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারল একজন সেনানী, ''রাত্রিকালীন প্রার্থনার সময় হয়ে এল যে। আপনি আসবেন না?''

''তুমি যাও,'' বেজার মুখে বলল তাম্র, ''শরীরটা ভালো নেই। আমি এই তাঁবুর মধ্যেই প্রার্থনা করে নেব।''

''কিন্তু মহামহিম,'' মাথা চুলকে বলল লোকটি, ''অসু বলেছেন, দিনে একটিবার সমবেত প্রার্থনায় যোগ দিতেই হবে। না হলে ধর্মচ্যুত হতে হয়। অসু রুষ্ট হবেন...''

''অসু বলেছেন?'' কটমট করে চোখ পাকিয়ে বলল তাম্র, ''যখন অসু এসব বলছিলেন, তখন কি তুমি অসুকে তামুক সেজে দিচ্ছিলে?''

''আজ্ঞে?'' অবাক হলো লোকটা।

''তুই বিদেয় হ এখন থেকে!'' হুংকার দিয়ে বলল তাম্র। ক্ষিপ্র পদক্ষেপে পালিয়ে গেল লোকটা।

এসব ন্যাকামো আর সহ্য হয় না। আদেখিলার ঘটি হলো, জল খেয়ে খেয়ে প্রাণ গেল! এই নব্য ধর্মান্তরিত অসুরগুলো সবকিছু নিয়েই বড্ড বাড়াবাড়ি করে, ভাবছিল তাম্র। হঠাৎ কী যেন গায়ে মুখে এসে পড়ল। কী এসব! সিঁদুরমাখা হাড়ের টুকরো! পাখির হাড়। শকুনের? আতঙ্কে হিম হয়ে গেল তাম্রর সারা শরীর। মুখ থেকে কালচে রক্তের ছিটে মুঝতে মুছতে মুছতে অনুভব করল, অন্ধকার তাঁবুর একপ্রান্তে একতাল জমাটবাঁধা অন্ধকার বসে আছে। কী ওটা? কোমরে বাঁধা তলোয়ারের বাঁটে হাত রাখাতেই গলার কাছে ধারালো ধাতুর ঠাণ্ডা ছোঁয়া অনুভব করল। ভয়ে হাত সরিয়ে নিল তাম্র।

''অনেকদিন পর দেখা হল তোর সঙ্গে,'' কানের কাছে ফিসফিস স্বর শুনতে পেল, ''শুনলাম তুই আবার সেনাপতি হয়েছিস। মহিষকে রক্ষা করতে দলবল নিয়ে এখানে শিকড় গেড়ে বসে আছিস। ভালো, ভালো। তা, এবার এসব করছিস কোন স্বর্গের আশায়?''

''মা! আপনি!'' চমকে উঠল তাম্র।

''হ্যাঁ, আমি। এখন বল, আরেকবার স্বর্গ ঘুরে আসতে চাস?''

''না মা, না!'' কঁকিয়ে কেঁদে উঠল তাম্র, ''আমি এখানে আসতে চাইনি মা! অনেককাল পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছি। একদিন মহিষের লোকেদের হাতে ধরা পড়ে গেলাম। ধর্মত্যাগের অপরাধে মেরে ফেলত আমাকে। বাধ্য হয়ে একঝুড়ি মিথ্যে কথা বানিয়ে বললাম। খুশি হয়ে মহিষ আমাকে সেনাপতি বানিয়ে দিল। সেনাপতি না ছাই। একদল আনকোরা আনাড়ির নেতা করে আমাকে বসিয়ে রেখেছে এখানে। নিজে নিরাপদে কেল্লার মধ্যে দরজায় খিল এঁটে বসে মজা দেখছে। আমরা ভয়ে মরছি, কবে তোমার চামুণ্ডারা আমাদের মুণ্ড কেটে মালা বানিয়ে পরবে। এ জীবনে আমার ঘেন্না ধরে গেছে মা। মেরে ফেলো আমাকে। এ ছাড়া আমার মুক্তি নেই।''

''আহারে বাছা,'' স্নেহার্দ্র স্বরে বলল ছায়ামূর্তি, ''বালাই ষাট, মারব কেন তোকে? মুক্তি চাস? তাহলে শোন, যেমন বলছি ঠিক তেমনটা করবি।''

তাম্রর কানে ফিসফিস করে কী যেন বলল কালী। তারপর যেমন করে অন্ধকারে মিশে শত্রুশিবিরে এসেছিল, তেমন করেই শত্রুশিবির থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেল।

সাররাত বৃষ্টি হলো মুষলধারে। থামল গিয়ে সেই ভোররাতে। কাকভোরে ছাউনির সীমান্ত পরিদর্শনে গিয়েছিল তারা। দৌড়োতে দৌড়োতে ফিরে এল।

''দুর্গা! কালী! মাতঙ্গী! ভুবনেশ্বরী!'' তারার গলার উত্তেজনা গোপন রইল না, ''তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এস!''

হাঁকডাক শুনে সবাই বেরিয়ে এল নিজের নিজের তাঁবু থেকে। ষোড়শী, ধূমাবতী, বগলামুখী, দুর্গা, কালী, মাতঙ্গী, ভুবনেশ্বরী সব্বাই।

''নদীর ওপার...'' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল তারা, ''ওপার... ওপার... খালি পড়ে আছে! মহিষের সৈন্যরা সব পালিয়েছে!''

''সে কী!'' চমকে উঠল ষোড়শী।

ভুবনেশ্বরী সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাল কালীর দিকে।

''গতকাল রাতে কালো চাদর মুড়ি দিয়ে বৃষ্টি মাথায় করে তুমি কোথায় গিয়েছিলে বলো তো?'' মুচকি হেসে ভুবনেশ্বরী বলল কালীকে, ''মহিষের সৈন্যদের ছাউনি ছেড়ে পালানোর সঙ্গে তোমার গতরাতের বেড়াতে যাওয়ার কি কোনো যোগাযোগ আছে?''

''তেমন বিরাট কিছু যোগাযোগ নয়,'' সলজ্জ হেসে বলল কালী।

''তার মানে?'' অবাক হয়ে বলল তারা, ''বিরাট কিছু যোগাযোগ নয় মানে কী? অল্প যোগাযোগ আছে?''

''দাঁড়াও, আমি বলছি ব্যাপারটা কী,'' বলল দুর্গা, ''তোমরা সবাই হাতমুখ ধুয়ে আমার তাঁবুতে এস। জলখাবার খেতে খেতে সব বলব।''

কিছুক্ষণের মধ্যেই সবাই জড়ো হলো দুর্গার তাঁবুতে। আজ সবাইকে নিজে হাতে পরিবেশন করে খাওয়াল দুর্গা। তারপর বলল,

''গত ক'বছর ধরে কয়েকটা ব্যাপার পাশাপাশি ঘটেছে।

তোমরা তো জানোই, অসুবাদ ও তার প্রতিশ্রুত মৃত্যু-পরবর্তী স্বর্গলোক সম্পর্কে বিশ্বাসে ঘাটতি দেখা দিয়েছে অসুরদের মধ্যে। এদের মধ্যে অনেকেই ধর্মত্যাগী হয়েছে। এইসব ধর্মত্যাগীরা অসুবাদের ওপর প্রতিশোধ নিতে উদ্‌গ্রীব ছিল। সেই প্রতিশোধের সুযোগ করে দিতে তাদের অনেককেই আমরা প্রশিক্ষণ দিয়ে মহিষের সেনাবাহিনীতে ফেরত পাঠিয়েছি। প্রকৃতি উপাসকদের মধ্যেও অনেকে প্রতিশোধ নিতে উদ্‌গ্রীব ছিল। তাদেরকেও নব্য-অসুর সাজিয়ে আমরা ভিড়িয়ে দিয়েছি অসুরদের দলে। এরা কে কোথায় আছে, তা আমরা ঠিক করে জানি না। জানা সম্ভব ছিল না। এদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করলে মহিষও জেনে ফেলত এদের পরিচয়। আমরা শুধু জানি, এরা সময়মতো আমাদের সাহায্য করবে।

গতকাল রাতে কালী গিয়েছিল তাম্রর সঙ্গে দেখা করতে। যুদ্ধ করার কোনা ইচ্ছে ছিল না তাম্রর। কালী ওকে বলেছিল, ও যেন ওর সেনাদলকে নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে বোঝায়, পরকালে অসু ওদের আরামের ব্যবস্থা করতে আসবে না। এই যুদ্ধে

ওদের কোনো লাভ নেই। কালীর কথামতো ঠিক তেমনটাই করেছিল তাম্র। এমনিতে হয়তো তাম্রর কথা মেনে নিয়ে তাঁবু গুটিয়ে বাড়ি ফিরে যেত না সেনাদল। কিন্তু এখানে আমাদের কয়েকটা বাড়তি সুবিধা ছিল। এক, অসুর সেনারা হাঁপিয়ে উঠেছিল। দুই, এই সেনাদলে একটা বড়ো সংখ্যায় আমাদের নিজেদের লোক ছিল ছদ্মবেশে। সুযোগ বুঝে এরা সবাই সমস্বরে বলে দেয়, তাম্রর কথাই ঠিক, তাম্রর কথাই যুক্তিসঙ্গত। বাহিনীর একটা বড়ো অংশকে দলত্যাগে উদ্যত দেখে সেনাদলের বাকি লোকেরাও হুজুগের বশে দলত্যাগ করেছে। ওদের একটা ভয় ছিল। যদি ওরা পালাতে শুরু করে, হয়তো আমরা পিছু ধাওয়া করে ওদের মেরে ফেলব। কালী তাম্রকে কথা দিয়েছিল, যদি ওরা রাত্রির মধ্যে এই এলাকা ছেড়ে চলে যায়, তাহলে আমরা ওদের কোনো ক্ষতি করব না। তাই এক রাতের মধ্যেই পুরো সাফ।"

তারা আনন্দে জড়িয়ে ধরল কালীকে। সবাই আনন্দে হইচই করে উঠল।

"অতঃ কিম্?" প্রশ্ন ভুবনেশ্বরীর।

"প্রথমত," বলল দুর্গা, "পর্বতের পাদদেশ কৌশলগতভাবে খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। ওটা খালি রাখলে চলবে না। আমাদের একাংশ যত শীঘ্র সম্ভব এগিয়ে গিয়ে সেই জায়গা দখল করবে। কিন্তু সেটা করতে হবে সাবধানে। পাহাড়ের ওপর বসে আছে শত্রুপক্ষ। ওরা যাতে আমাদের ওপর ক্ষেপণাস্ত্রের আক্রমণ না করতে পারে, সেটা দেখতে হবে। যথাসম্ভব জঙ্গলের ও পাহাড়ের আড়াল নিয়ে ব্যূহ সাজাতে হবে।"

"আর দ্বিতীয়ত?" ধৈর্য ধরতে কষ্ট হয় ভুবনেশ্বরীর।

"দ্বিতীয়ত," হেসে বলে দুর্গা, "চোরাগোপ্তা আক্রমণ শুরু করতে হবে। দুর্গের প্রতিরক্ষার ফাঁকফোকর খুঁজে বার করতে হবে। তারপর দরজা ভেঙে ঢুকে পড়তে হবে দুর্গের মধ্যে!"

এক এক করে দুর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের পতন হলো।

দ্বিতীয় স্তরের পতন হওয়ার সাথেই সূর্যদেব অস্ত গেলেন পাহাড়ের ঢালে। সন্ধ্যা নামল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের মাঝখানে ছিল ধাতুনির্মিত এক দরজা। বগলামুখীর বিস্ফোটক-বাণে চূর্ণ হলো সেটা। দুর্গের অন্তিম স্তরে প্রবেশ করল দুর্গা। সঙ্গে চামুণ্ডা ও প্রথম বাহিনীদ্বয়। তাদের এক হাতে উদ্যত আয়ুধ, অন্যহাতে জ্বলন্ত মশাল।

অন্ধকারে ডুবে আছে মহাবলাচল পর্বত আর তার চূড়ায় বিধ্বস্ত দুর্গের ধ্বংসস্তূপ। ইতস্তত ছড়িয়ে আছে বিরাট সব পাথরের টুকরো। ভাঙা দেওয়াল, হেলে পড়া স্তম্ভ। তার আড়াল থেকে দেখা দিল মহিষাসুর। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে মুখোমুখি দাঁড়াল দুর্গা ও মহিষাসুর। ওদের চারদিক থেকে ঘিরে দাঁড়াল চামুণ্ডার দলবল। দুর্গা অবাক হলো একাকী মহিষাসুরকে দেখে। হতাশ, কিংকর্তব্যবিমূঢ়। চোখের কোণে কালি, মুখে ক্লান্তির ছাপ। এই কি সেই বিশ্বত্রাস দানব? আজ একলা এসেছে নিজের ভবিতব্যের মুখোমুখি হতে? এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো, মহিষ বোধহয় আত্মসমর্পণ করবে। হা হা করে হেসে উঠল দুর্গা। ডেকে বলল,

"তোর জন্য আমার করুণা হচ্ছে। সারাজীবন তুই নারীদের অবজ্ঞা করেছিস, অশ্রদ্ধা করেছিস। তোর কী দুর্দৈব দ্যাখ, আজ তোর সামনে তোর কালান্তক যমরূপে উপস্থিত তোর চেয়ে শক্তিশালী এক নারী। কী করে বাঁচবি তুই আমার হাত থেকে? কী করবি এখন?"

"শত্রুকে হীনবল ভাবার মতো ভুল আর দুটি হয় না", বলল মহিষাসুর। হঠাৎই যেন অস্বাভাবিক রকমের শান্ত শোনাল ওর কণ্ঠস্বর। ডানহাত বাড়িয়ে দিল সামনের দিকে, যেন অদৃশ্য কোনো অবয়ব রয়েছে ওর সামনে, যাকে ও ধরার চেষ্টা করছে। হাতের মধ্যমায় জ্বলজ্বল করছে হীরের আংটি। অপার্থিব এক দ্যুতি বেরোচ্ছে সেই হীরকখণ্ড থেকে। চোখ ঝলসে যায় তার আলোকে। সেই আলোকে আলোকিত হয়ে উঠল ধ্বংসস্তূপ।

"সমবারি মায়া," বলল মহিষ, "সম্মোহন, অভিভাবান, মনোযোগ হরণ, যন্ত্রের ব্যবহার। এ সবই হলো বালক্রীড়া। আসল মায়া হলো পরাবিদ্যা। ভিন্ন কালের মাত্রা, সেও তো পরাবিদ্যারই আরেক প্রয়োগ। আজ সেই পরাবিদ্যাকে হাতিয়ার করেই আমি যুদ্ধে নামব তোমার সঙ্গে। গত ছ'মাস এই নির্বাসনে বসে আমি মায়া নিয়েই তো গবেষণা করে গেছি। জানতাম, একদিন না একদিন ব্রঙ্গাহৃদিদের মায়াজালের মুখোমুখি হতে হবে আমাকে। তিনটের মধ্যে দুটো লিঙ্গকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছ তুমি। কিন্তু সবচেয়ে শক্তিশালী লিঙ্গটাই তো রয়ে গেছে আমার কাছে। আর তার শক্তিতেই আজ আমি তোমার সারা জীবনের পরাবিদ্যার শিক্ষাকে মিথ্যে করে দেব।"

হঠাৎ করেই রাতের অন্ধকার আরও ঘন হয়ে উঠল। মহিষের চারপাশে আবির্ভূত হলো কুণ্ডলীকৃত কুঞ্চটিকার এক বলয়। তার অন্তরালে অন্তর্হিত হলো মহিষাসুর। কোথায় গেল মহিষ? চিঙ্কা বাতাসে নাক তুলে বারবার গন্ধ শুঁকলো। তারপর হতাশায় মাথা নেড়ে নিস্ফল গর্জন করে উঠল। নেই, কোথাও নেই। যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে সে।

"ভিন্ন সময়ের মাত্রা!"

"কী? কী বললে?" চমকে উঠে দুর্গা দেখল, মহিষ যে বিন্দুতে অন্তর্হিত হয়েছে, কালী দাঁড়িয়ে আছে ঠিক সেইখানে। হাতদুটো সামনে বাড়ানো, চোখ কপালে উঠে গেছে। দরদর করে ঘামছে, শরীর থরথর করে কাঁপছে।

"ভিন্ন কালের অন্তরালে লুকিয়েছে মহিষ!" বলল কালী। এই বলেই বিড়বিড় করে কীসব মন্ত্রোচ্চারণ শুরু করল। এলোমেলো পদক্ষেপে সম্মোহিতের মতো এগিয়ে এল ছিন্নমস্তা, নিজের বামহাত দিয়ে কালীর ডানহাত আঁকড়ে ধরল। ডানহাত দিয়ে নিজের বক্ষমূলে আঘাত করল। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরল, শরীর থেকে বেরিয়েই সেই রক্তস্রোত রূপ নিল শুভ্রবর্ণ এক আলোকচ্ছটার। একই মুহূর্তে কালীর অবয়ব ভাস্বর হলো কৃষ্ণবর্ণ এক শক্তিপুঞ্জে। সৃষ্টির শক্তি ও কালের শক্তি, দুই বিপরীতমুখী শক্তি মুখোমুখি সংঘর্ষ রূপ নিল ঘূর্ণিঝড়ের। দুর্গা লাফিয়ে চড়ে বসল চিঙ্কার পিঠে। চিঙ্কা ঝাঁপ দিল ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্র অভিমুখে।

বাহনসহ দুর্গা অদৃশ্য হল।

চোখ অন্ধ করা উপর্যুপরি আলো আর আঁধারের ঝলকানি। এক অনন্ত সুড়ঙ্গ জোড়া লতানো গাছের অভেদ্য জঙ্গল। কিলবিল করছে, যেন অজস্র শিরা উপশিরা। জীবন্ত, সচেতন। নিজেদের ইচ্ছেমতো বাড়ছে, কমছে! তার মধ্যে দিয়ে দৌড়ে চলল চিঙ্কা, অনন্তকাল ধরে।

দ্রুত বদলে গেল দৃশ্যপট। সুড়ঙ্গের দশদিকে এখন অগণিত রঙের মেলা, স্ফটিকে গড়া অজস্র জ্যামিতিক আকৃতি। আকৃতিগুলো ভাঙছে, জুড়ছে। নতুন আকৃতি, নতুন রঙের সৃষ্টি করছে। এ যেন এক ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী ঘূর্ণি, যার আদি নেই, অন্ত নেই। সম্পূর্ণ চেতনা পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে অতিজাগতিক এক সংগীতে। সে সংগীতের মূর্ছনা, তার অনুরণন, অশ্রুতপূর্ব, জাগতিক কোনো সংগীতের সঙ্গে তুলনা নেই তার।

হঠাৎ সে সংগীত ফিকে হয়ে এল, সব রং ঝাপসা হয়ে গেল অসীম অন্ধকারে। শরীরের সমস্ত রোমকূপ জুড়ে ভয়ের শিহরণ খেলে গেল দুর্গার। সুক্ষ্মশরীরের প্রতিটি তন্ত্রী কেঁপে উঠল অজানা আশঙ্কায়। দূরে আবছায়া একটা আলো দেখা দিল।

দুর্গা দেখল, অন্ধকারের বুক চিরে রক্তচক্ষু এক মহিষ শিং উঁচিয়ে তেড়ে আসছে ওর দিকে। কোমরবন্ধ থেকে খড়্গ খুলে তা দিয়ে সবলে আঘাত হানল দুর্গা। ঝন্‌ঝন্ করে উঠল হাত, ভোঁতা হয়ে গেল খড়্গ। বুদ্বুদের মতো মিলিয়ে গেল মহিষ। দুর্গা দেখল তার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে কঠিন পাথরের এক দেওয়াল।

এবড়োখেবড়ো পাথরের হাঁপ ধরা খাড়াই দেওয়াল, হাত বাড়িয়েছে পাথুরে আকাশের দিকে। পাথরের গা সরীসৃপের শরীরের মতো, আঁশ ভর্তি। আকাশে একাধিক সূর্য। নাকি ওরা কোনো ভাসমান স্বপ্রভ অতিকায় জীবদেহ? মুহুর্মুহু আগুন বর্ষানো ঝলসানো সেই আকাশে ঘুরপাক খাচ্ছে নিঃসঙ্গ একঝাঁক বিদেহী আত্মার সূক্ষ্মশরীর, ভোকাট্টা ঘুড়ির মতো গোঁত্তা খাচ্ছে বারবার। ডুকরে কাঁদছে, হা হা হা হা হা! দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত প্রাণহীন লাল মরুভূমি। জায়গায় জায়গায় পাহাড়প্রমাণ বালির স্তূপ আর আগ্নেয়গিরির শুকনো জ্বালামুখ। তারই একটার মধ্যে দাঁড়িয়ে দুর্গা। জ্বালামুখের মধ্যে দাঁড়িয়ে আকাশটা অচেনা লাগছে। যেন অথৈ কোনো অন্ধকূপে তলিয়ে যেতে যেতে চেনা পৃথিবীটাকে শেষবারের মতো দেখা।

দুর্গাকে সামলানোর সুযোগ না দিয়ে পরমুহূর্তেই জ্বালামুখের গহ্বর থেকে আবির্ভূত হলো অতিকায় খড়্গদন্তী এক প্রাগৈতিহাসিক ব্যাঘ্র। বজ্রমুষ্টি দিয়ে আঘাত হানল দুর্গা। অসহ্য যন্ত্রণায় বোবা হয়ে গেল শরীরটা। কোথায় বাঘ? দুর্গার মুষ্টিপ্রহার গিয়ে পড়েছে সামনের পাথরের দেওয়ালের ওপর। মাথা ঘুরিয়ে উঠল। টাল সামলাতে দেওয়ালটাকে আঁকড়ে ধরতে গেল। দেওয়ালের জায়গায় হাতে এল শুধু বাতাসের স্পর্শ। চরম আতঙ্কে দুর্গা দেখল, সামনে দেওয়াল নয়, আছে একটা বিশাল অন্ধকূপ। ভারসাম্য হারিয়ে সেই অন্ধকূপের মধ্যে ছিটকে পড়ল ও। আছড়ে পড়ল তার পাষাণ অতলে। কপাল ফেটে দরদর করে রক্ত বেরিয়ে এল। উঠে বসতে গিয়ে অনুভব করল, পায়ে অসহ্য যন্ত্রণা। হাড় ভেঙেছে বোধহয়। পরনের কাপড় ছিঁড়ে পায়ে পট্টি বাঁধল দুর্গা।

দৃশ্যপট বদলে গেছে। চারিদিকে এখন স্বপ্রভ সুড়ঙ্গের জাল। পাথুরে মাটি, ভিজে পিচ্ছিল, তিরতির করে কাঁপছে, যেন জীবন্ত। বটের আঠার মতো থকথকে অবয়বহীন কী এক জীবন্ত জিনিস, সর্বত্র গড়িয়ে বেড়াচ্ছে। কখনো সে সবুজ শেওলার রং ধরছে, কখনো সে বেদানার মতো রানিরঙা। ব্যাঙের ছাতার মতো কীসব যেন বেরিয়ে আসছে মাটি থেকে, আকাশ থেকে। মাথা দোলাচ্ছে অল্প অল্প। সরু সরু আঙুল তাদের, সে আঙুলের মাথাগুলো গোলকের মতো, মোটা। আকাশ নেই, আছে শুধু নানারঙের কুণ্ডলীকৃত মেঘের জটা। গোলকধাঁধার মাঝখানে দাঁড়িয়ে দুর্গা, একা। বড্ড কুয়াশা, কিছুই ঠিক করে দেখা যায় না। গলানো সোনার মতো আগুনের স্তম্ভ যেখান সেখান থেকে মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে, উঠে গেছে

আকাশে। নাকি আকাশ থেকে নেমে এসেছে মাটিতে? আশেপাশে শিমুল তুলোর মতো ভেসে বেড়াচ্ছে বিশাল সব পাথরের চাঁই, এখানে মাধ্যাকর্ষণ বলে কিছু নেই। ভেসে বেড়াচ্ছে আলোর ফুলকির মতো অসংখ্য এককোষী জীব। তারা নিজেরা নিজেদের সঙ্গে জুড়ে মুহুর্মুহু নতুন সব অবয়ব সৃষ্টি করছে, পরমুহূর্তেই বিযুক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র। কী এই মায়াজগৎ, যেখানে আটকে পড়েছি আমি? কী করে বেরবো এখান থেকে?

এ হলো স্থির সময়ের মাত্রা, এখানে অতীত ও ভবিষ্যৎ আলাদা নয়। এখানে মায়া ও বাস্তবে প্রভেদ নেই। এখানে ভবিষ্যৎ থেকে শক্তি সংগ্রহ করে বস্তু-প্রতিবস্তু যুগল সৃষ্টি করা যায় অতীতে। তাই এখানে চোখের নিমেষে পাহাড় তৈরি হয়। পরমুহূর্তেই বস্তু-প্রতিবস্তু বিলীন হয়ে অদৃশ্য হয় সেই পাহাড়, পড়ে থাকে শুধু শক্তি। ঋণ করা শক্তি ফিরে যায় অতীত থেকে ভবিষ্যতে।

আর্তনাদ করে জোরে কেঁপে উঠল মাটি। অন্ধকূপের ধরাতল ভেদ করে বেরিয়ে এল বিশালাকায় এক বন্যবরাহ। তীক্ষ্ণ দুই দাঁত দিয়ে আচম্বিতে আঘাত হানল দুর্গার ওপর। সব শক্তি দিয়ে দুর্গা চেপে ধরল দাঁতদুটোকে, বরাহর দেহটাকে ছুঁড়ে দিল অন্ধকূপের দেওয়ালের দিকে। পরমুহূর্তেই অন্তর্হিত হলো বরাহ, অন্ধকূপ। দুর্গা দেখল, খাড়াই এক পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছে ও। চারিদিকে অতলস্পর্শী খাদ। চূড়া থেকে নামার পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে ভয়ংকর এক সিংহ। কানফাটানো সিংহনাদে খানিকক্ষণের জন্য বোবা হয়ে গেল ইন্দ্রিয়গুলো। সিংহ লাফিয়ে পড়ল দুর্গার ওপর, দুর্গা পালটা ঝাঁপিয়ে পড়ল সিংহের ওপর। দু'হাত দিয়ে দুর্গা শক্ত করে আঁকড়ে ধরল সিংহের কেশররাশি, সিংহের পিঠের ওপর চড়ে বসে অসামান্য শক্তিতে সিংহটাকে পেড়ে ফেলল মাটিতে। প্রবল মল্লযুদ্ধ করতে করতে পাহাড়ের চূড়া থেকে গড়িয়ে পড়ল সিংহ, সঙ্গে দুর্গা। নীচে, অনেক নীচে।

আকাশ জুড়ে তারাবাতি, হাউই, নানান রকমের বাজি ফাটছে। অসহ্য যন্ত্রণা, যেন বিস্ফোরণে শরীর ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। দেহ বরফের মতো ঠাণ্ডা, দম আটকে আসছে। দুর্গা দেখল, আগুনে পোড়া ওর পরনের বস্ত্র, যেন আগুনের ব্যূহ পার হয়ে এসেছে ও। দেখল, মহাবলাচলের ত্রিস্তরীয় দুর্গের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে ও। সামনে দাঁড়িয়ে খড়্গচর্মধারী মহিষাসুর, আক্রমণে উদ্যত। প্রত্যাঘাতে ত্রিশূল ওঠাল দুর্গা। ত্রিশূলের ফলার মধ্যে খড়্গের প্রহার আটকে গেল। পরের মুহূর্তে ত্রিশূলের এক মোচড়ে মহিষাসুরের হাত থেকে খড়্গ ছিটকে পড়ল।

মনে হলো, এক দৈত্যাকার গণ্ডার এইমাত্র ধাক্কা মেরেছে। চেতনা জুড়ে শুধু যন্ত্রণার অনুভূতি। কোথায় মহিষাসুর? কোথায় মহাবলাচল পর্বত? দুর্গা দেখল, ঘন জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে ও। সামনে একপাল মত্ত হস্তী। সেই হস্তীযুথের দলপতি অতিকায় এক মদগর্বী চারদন্তী হস্তীরাজ, তার গণ্ডদেশ থেকে উগ্রগন্ধী তরল বেরিয়ে আসছে অবিরল। ক্রোধে মুহুর্মুহুঃ বৃংহণের সঙ্গে মাথা ঝাঁকাচ্ছে, মাটিতে পা ঘষছে। হস্তীরাজ আক্রমণ করতেই দুর্গা ত্রিশূল দিয়ে আঘাত হানল তার কপালের ঠিক মধ্যিখানে।

বিদ্যুৎচমক। বিরাট ঝাঁকুনি লাগল শরীরে। প্রলয়ঙ্কর এক তড়িৎপ্রবাহ দুর্গার শরীরের মধ্যে দিয়ে বয়ে গেল। দেখল, ঘন জঙ্গল নয় ও দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকার সুড়ঙ্গের গোলকধাঁধার মধ্যে। সামনে দাঁড়িয়ে আছে সশস্ত্র মহিষাসুর। চারিদিকে দাউদাউ আগুন জ্বলছে। আগুনের মধ্যে কিলবিল করছে অসংখ্য জীব। আগুনে গড়া জীব, তাদের মাথা যেন এক একটা আগুনের গোলা। হাত পা তো নয়, আগুনের লেলিহান শিখা। সেই অগুনে শত শত নর-নারীর বিদেহী ছায়া। তারা সবাই মিলে ঘুরে ঘুরে করতালি দিয়ে অট্টহাস্য করে নাচছে। দুয়ো দিচ্ছে দুর্গাকে। অসহায় বোধ করল দুর্গা। শুনল যেন

Durga Puja Festival Greetings
to
All Our Customers, Patrons
and Well Wishers.

MAZZA DENIM
Incense Sticks

Now you can capture the beauty of an experience light-up and unfold a thousand petals.

Shashi Industries
Bhabnagar - 364 001
Bangalore - 560 010

আকাশবাণী হচ্ছে, ''তোমার সহায় তোমার গুরু, আর তোমার শক্তিপীঠ। আমার গুরু, আমার শক্তিপীঠ সবই এক, আমার পরালিঙ্গ। গত ছ'মাস ধরে সে আমাকে অসীম যত্নের সঙ্গে পরাবিদ্যা শিখিয়েছে। আজ পরীক্ষা হয়ে যাক, কার পরাবিদ্যা অধিক শক্তিশালী।''

লেলিহান সেই নরকাগ্নির মধ্যে থেকে মুহুর্মুহু আবির্ভূত হতে লাগল মহিষ, নিত্যনতুন রূপ ধরে। বরাহ, সিংহ, হস্তী, মহিষ। আবার বরাহ, আবার হস্তী। যন্ত্রণা, অসহ্য যন্ত্রণা। শরীর জুড়ে, মন জুড়ে আছে শুধুই যন্ত্রণার অনুভূতি। চারদিক থেকে বারংবার আক্রমণ, প্রতিহত করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল দুর্গা। হতভম্ব একরাশ চিন্তার জটাজালে আবদ্ধ দুর্গা মাথার মধ্যে কিলবিল করছে একরাশ অশরীরী। সবকটা ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হয়ে বলে চলেছে–বিপদ! বিপদ! কিন্তু শরীর যে আর লড়তে পারছে না। লড়াই করেই-বা লাভ কী হবে? ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করে কে কবে জিতেছে? ক্লান্তি ছড়িয়ে পড়ছে সারা শরীর জুড়ে। অসংখ্য ক্ষতস্থান থেকে রক্তপাত হচ্ছে অবিরাম। মনঃসংযোগ করবার ক্ষমতাটাও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এ কী অদ্ভুত মায়াজাল!

''শত্রু হিসেবে তোমাকে আমি শ্রদ্ধা করি,'' বলল মহিষ, ''কিন্তু আজ তো তোমাকে আমার হাতে মরতেই হবে। সেটাই যে অসু-র বিধান। তাই মরার আগে তোমাকে বলি, আমার বিরুদ্ধে লড়ার চেষ্টা তোমার বৃথা। কেন জানো? শরীর ক্রিয়াশীল থাকে কম্পনের মাধ্যমে, সেটা তো জানো? কম্পনের মাত্রার রকমফের করে ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করা অসম্ভব নয়। ঠিক যেমন কুম্ভকার একই মাটির তাল দিয়ে ইচ্ছেমতো নানান আকৃতির পুতুল বানায়। এই বিদ্যা আমি আয়ত্ত করেছি মধুকৈটভের কাছ থেকে। না, শেষ হয়ে যায়নি, তারা এখনও রয়েছে। বিষ্ণুর ভয়ে লুকিয়ে থাকে পাতালের অন্ধকারে। দানবদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে তারা। কিন্তু মধুকৈটভের কাছে যেটা সহজ, আমাদের কাছে সেটা প্রায় অসম্ভব। আমাদের দেহকোষগুলো যে ঘন-সন্নিবিষ্ট! কুম্ভকার নিজেই যদি মাটির তৈরি হয়, সে কি মাটির তাল দিয়ে ইচ্ছেমতো পুতুল বানাতে পারে? এইখানেই আমার গুরু পরালিঙ্গ আমাকে জিতিয়ে দিয়েছে। আমার পরালিঙ্গ আমাকে শিখিয়েছে, কী করে চেতনাকে শরীর থেকে বিযুক্ত করে ভিন্ন মাত্রায় নিয়ে যেতে হয়। সেখান থেকে নিজের দেহকোষগুলোকে সহজেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারি আমি। ইচ্ছামতো রূপ পরিগ্রহ করা আজ আমার কাছে খুবই সহজ। আর যেহেতু আমি নিজেকে শরীর থেকে বিযুক্ত করতে পারি, তাই যতকাল পরালিঙ্গর আশীর্বাদ আছে আমার ওপর, আমার মরণ নেই।''

সুদীর্ঘ এক শ্বাস নিল দুর্গা। সুক্ষ্মশরীরের মায়া দিয়ে আমার অবচেতন মন, আমার ইন্দ্রিয়গুলোকে উত্তেজিত করে আমাকে শ্রান্ত করে ফেলবে ঠিক করেছে মহিষ। যাতে আমি ভুলভাল আক্রমণ করে ওর ফাঁদে পা দিই। কী করব এখন? স্থূলশরীর ত্যাগ করে সূক্ষ্মশরীর দিয়ে আক্রমণ করব? মহিষ বোধহয় তাই চায়। আমি স্থূলশরীর ত্যাগ করামাত্র ও আমার স্থূলশরীরটাকে ধ্বংস করে ফেলবে। চিরকালের মতো আমি আটকা পড়ব এই গোলকধাঁধায়।

দুর্গা অনুভব করল, হিরণ্যগর্ভ এক জ্যোতির্বলয় ঘিরে ধরেছে ওকে। সেই জ্যোতির্বলয়ের তাপে দুর্গার সারা শরীর কাঁপছে। ওর শরীরের প্রতিটি কোষ প্রণান্ত আর্তনাদ করছে, পরস্পরকে আঁকড়ে ধরেছে। কিন্তু জ্যোতির্বলয়ের তাপে দুর্গার শরীরের কোষগুলোর মধ্যেকার দূরত্ব ক্রমেই বাড়ছে। তাদের কম্পন বস্তুজগতের গ্রাহ্য সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এর পরে কী হবে, দুর্গা জানে। ওর শরীরটা রেণু রেণু হয়ে মিলিয়ে যাবে ব্রহ্মাণ্ডে। এই মুহূর্তে বাঁচার একটাই উপায়, স্থুলশরীরের মায়া ত্যাগ করে সূক্ষ্মশরীরকে রক্ষা করা। কিন্তু সেটাই মহিষ চায়, তাই না? ঝাপসা চোখে দেখতে পেল দুর্গা, ওর পাহাড়ে ঘেরা গ্রামটাকে। ওর জন্মভূমি। নদীর ধারে গ্রামের শ্মশান, সেখানে কার চিতা জ্বলছে? লেলিহান চিতার পাশে বসে আছে চিঙ্কা, দুই থাবার মাঝে মুখ, চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। মুখ তুলে দুর্গার দিকে তাকাল চিঙ্কা। ও কি কিছু বলতে চাইছে?

দূর থেকে ভেসে আসছে মহিষাসুরের হাঃ হাঃ অট্টহাসি। ইন্দ্রিয়গুলো আরও উত্তেজিত হয়ে উঠছে।

না, ইন্দ্রিয় নয়, ইন্দ্রিয়ের পরপারে যেতে হবে।

সুদীর্ঘ আরেকটা শ্বাস নিয়ে চোখ বুজল দুর্গা। কোমরবন্ধ থেকে টান মেরে বের করে আনল স্ফটিক-নির্মিত একটি পাত্র, মুখ তার কষে বন্ধ করা আছে কাঠের টুকরো দিয়ে। ছিপি খুলতেই বিশুদ্ধ সোমরসের তীব্র গন্ধে নাক জ্বলে গেল। একঢোঁক খেতেই শরীর জুড়ে বান ডাকল অতীন্দ্রিয় অনুভূতির। চারিদিকের এত উত্তেজনা, এত উসকানি, সব ঝাপসা হয়ে এল। আর এক ঢোঁক খেল দুর্গা। কানে এল মহিষাসুরের অট্টহাসি। সে অট্টহাস্য বড্ড ফিকে ঠেকল এখন।

আরেকটা গভীর শ্বাস নিল দুর্গা। তারপরেই, হঠাৎ করেই সবকিছু পরিষ্কার হয়ে দেখা দিল। চিঙ্কা কী বলতে চাইছে, সেটাও।

পালটা প্রমত্তের মতো অট্টহাসি হেসে উঠল দুর্গা। বলল, 'হেসে নে, যত পারিস হেসে নে। তোর অনাচারে অত্যাচারে প্রকৃতির ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়েছে। তাই প্রকৃতিমাতা স্বয়ং আজ তোকে শাসন করে প্রকৃতির ভারসাম্য ফিরিয়ে আনবেন। আমার সঙ্গে লড়বি? তো লড়! তুই অমর? তোর স্থুলশরীরের বিনাশ নেই? তা হবেও- বা। কিন্তু আজ আমি তোকে ছাড়ছি না। তোর সঙ্গে অনন্তকাল লড়ে যেতেও আমি রাজি।''

মহিষ দেখল, স্থির সমাহিত দাঁড়িয়ে দুর্গা, যেন কোনো

কিছুতেই ওর কিছু আসে যায় না। দুর্গার স্থৈর্য ভঙ্গ করতে একটার পর একটা পাথর ছুঁড়ে মারতে লাগল। নিমীলিত নেত্র দুর্গার একহাতে ভৃঙ্গার, অন্যহাতের খড়্গ। মুহুর্মুহু প্রহারে সেইসব পাথর চূর্ণবিচূর্ণ করতে লাগল। দিব্যালোকের ঝলকে আলোকিত হয়ে গেল অন্ধ সুড়ঙ্গ। আয়ুধকলা, মনোদূরসঞ্চালন ও সুক্ষ্মশরীর নিয়ন্ত্রণের একযোগে ব্যবহারে অদ্ভুত এক দ্বৈরথ শুরু হলো। দুর্গার স্থূলশরীর ও সূক্ষ্মশরীর যুগপৎ ক্রিয়াশীল হয়ে মুহুর্মুহু মহিষের প্রতিটি আক্রমণকে ব্যর্থ করতে লাগল। মানসিক শক্তির প্রয়োগে মহিষ রাশি রাশি অতিকায় প্রস্তরখণ্ড চতুর্দিক থেকে উড়িয়ে নিয়ে এসে দুর্গার ওপর বর্ষণ করতে লাগল। দুর্গা পালটা মানসিক শক্তির প্রয়োগে সেইসব প্রস্তরখণ্ডকে আকাশেই রেণু রেণু করে ভস্মীভূত করে দিল। প্রতিটি ব্যর্থ আক্রমণের সঙ্গে মহিষ আরও অধৈর্য, আরও মরিয়া হয়ে উঠল। দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে উপর্যুপরি আক্রমণ চালিয়ে গেল দুর্গার ওপর।

আরেক ঢোঁক সোমরস পান করে স্ফটিকের পাত্র ছুঁড়ে ফেলে দিল দুর্গা। চোখ বন্ধ, ইন্দ্রিয় সুপ্ত, অতীন্দ্রিয় অনুভূতি সর্বোচ্চ স্তরে সজাগ। অন্ধকার ভেদ করে আবির্ভূত হলো স্তূপের আকৃতির সেই হীরকখণ্ড। পরালিঙ্গ। অপার্থিব জ্যোতিতে ভাস্বর হয়ে আছে সেই স্বপ্রভ লিঙ্গ। দুর্গা দেখল না, অনুভব করল, মহিষের হাতের মধ্যমার হীরকখণ্ডেও একই জ্যোতি।

মহিষ দেখল, দুর্গার কপালের মধ্যিখানে দপ্ করে জ্বলে উঠল নীল আলোর এক স্ফুলিঙ্গ। দেখতে দেখতে সেই আলো ছড়িয়ে পড়ল দেহ জুড়ে। দুর্গা ওর ডানহাত দিয়ে চিঙ্কার কপাল স্পর্শ করল। পরমুহূর্তেই দুর্গার বাহনের শরীর থেকে অসংখ্য বাঘ আর সিংহ নির্গত হলো, চারিদিক থেকে তারা ঘিরে ধরল মহিষকে। মহিষ মুহুর্মুহু নানান রূপ পরিগ্রহ করতে লাগলো, প্রতিটি রূপকেই আক্রমণ করল দুর্গার বাহনের সূক্ষ্মশরীর। নাজেহাল মহিষ আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তি বিস্মৃত হলো। এরকমই এক মুহূর্তে দুর্গার ডানহাত থেকে সূক্ষ্মশরীর নির্মিত এক আলোকচ্ছটা নির্গত হয়ে নির্ভুল লক্ষ্যে আঘাত হানল মহিষাসুরের ডানহাতের মধ্যমায়। তেজঃপুঞ্জের বিস্ফোরণে ধুলো হয়ে গেল মহিষের হাতের আংটি। পরমুহূর্তেই দুর্গার বামহাত থেকে উড়ে এল বিশালাকার এক খড়্গ, আঘাত হানল মহিষাসুরের বাহনের কণ্ঠায়। শিরশ্ছিন্ন হয়ে বাহন এলিয়ে পড়ল মাটিতে। তার নীচে চাপা পড়ল শ্রান্ত মহিষাসুর। ঝাপসা চোখে মহিষ দেখল, তেজপ্রভায় দশদিক উদ্ভাসিত করে ওর দিকে ধেয়ে আসছে অতিকায় সিংহে আরোহিণী রক্তবস্ত্র পরিধান এক অসামান্যা তেজস্বিনী নারী। হাতে তাঁর ত্রিশূল। সে নারী অবিকল মাতামহী দনুর মতো দেখতে। মেরুদণ্ড বরাবর হিমশীতল এক স্রোত বয়ে গেল। মৃত্যুভয় জাগল মহিষাসুরের মনে।

''অভ্যুত্থানমধর্মস্য,'' তীব্রস্বরে বলে উঠল দুর্গা, ''তদা প্রকৃতি সম্ভব!''

''মা! রক্ষা করো মা!'' আর্তনাদ করে কেঁদে উঠল মহিষাসুর।

''শত্রুকে হীনবল ভাবার মতো ভুল আর দুটি হয় না,'' ঠাট্টার স্বরে বলল দুর্গা, ''আমাকে মধুকৈটভের কথা মনে করিয়ে দিয়ে তুই নিজের বিনাশ ডেকে আনলি। বিষ্ণু মধুকৈটভের বিনাশ করেছিল জলকীটের স্বভাবশত্রু জীবের সাহায্যে। আমিও সেই পথই নিলাম। তোর মহিষ-রূপ সূক্ষ্মশরীরের বিরুদ্ধে আমার বাহনের বাঘ-সিংহরূপী সূক্ষ্ম শরীর!''

ত্রিশূল হাতে দুর্গা কানফাটানো রণহুংকার দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল মহিষাসুরের ওপর। একই সঙ্গে ঝাঁপ দিল চিঙ্কা। শরীর অবশ, আত্মরক্ষার্থে শিথিল হাত উঠেও উঠল না। চিঙ্কা মহিষের গলা টিপে ধরল, দুর্গার ত্রিশূল বিদ্ধ করল মহিষের বক্ষ। চোখের সামনে দিয়ে জীবনের প্রতিটি ঘটনা দ্রুত ছায়াচিত্রের মতো বয়ে গেল মহিষাসুরের। ছোটবেলার ছোট ছোট ঘটনা, যেগুলো ও ভুলেই গিয়েছিল, সবই এসে ভিড় করল একসঙ্গে। ঠাকুমা দনুর স্নেহ। বরুণ উপজাতিদের সঙ্গে বেড়ে ওঠা। তাদের স্নেহ, ভালবাসা। তাদের বন্ধুত্ব। অগ্নিদেবের করুণা। তার প্রতিদান আমি কীভাবে দিয়েছি? আমি অকৃতজ্ঞ। আমি নরাধম।

ঝাপসা হয়ে এল মহিষের চোখ। সময় হয়ে এল। ওপারে কি সত্যিই অসু নামের কেউ প্রতীক্ষা করে আছে? আমি স্বর্গদ্বারে পৌঁছলেই যে আমাকে দিব্যাঙ্গনা বারবণিতাদের উপহারে পুরস্কৃত করবে? সত্যিই কি? আজ আর আর সেসব বিশ্বাস হচ্ছে না। সবচেয়ে বড়ো কথাটা হলো, দিব্যাঙ্গনাদের আজ আর তেমন আকর্ষণীয় লাগছে না। জগতের কোনো ভোগই আর আকর্ষণীয় লাগছে না। অলীক এক অসুবাদ, তার গাঁজাখুরি গালগল্প ও তার অলীক স্বর্গের মিথ্যে প্রতিশ্রুতিতে ভুলে আমার পরমাত্মীয়দের আমি হত্যা করেছি। ধ্বংস করেছি আমার নিজেরই সমাজ ও সভ্যতাকে। চরম স্বার্থপর আমি! পরকালের স্বর্গের লোভে ইহকালটাকে করে তুলেছি নরকসদৃশ। শুধু আমার নয়, সমস্ত দেশবাসীর ইহকাল।

হাত থেকে খড়্গ ও ঢাল খসে পড়ল। জীবনের অন্তিম মুহূর্তে পরাজ্ঞানের অন্তিম উপলব্ধি হলো মহিষের। তার দানবসত্তার হলো মৃত্যু। শরীরের শেষ শক্তি একজোট করে মহিষাসুর হাতদুটোকে মাথায় ঠেকাল, দুর্গার উদ্দেশে অন্তিম প্রণাম রেখে গেল।

''মা! তোমাকে আমি চিনতে পারিনি। আমি মহাপাপী। স্বর্গ নয়, পরকালের সুখ নয়, যন্ত্রণাময় মৃত্যুই আমার উপযুক্ত

পাওনা। মা, জগজ্জননী মা আমার, তোমার এই অধমতম সন্তানকে পারলে ক্ষমা করো মা!”

অন্ধকার দ্রুত ঘনিয়ে এল দু’চোখে। অন্তহীন অন্ধকার...

সময়ের কুজ্ঝটিকা মিলিয়ে গেল বাতাসে। কালী দেখল, ঘূর্ণির অন্তরাল থেকে ভেসে উঠছে বেলেপাথরের বেদীর ওপর অধিষ্ঠান হীরকখণ্ডের তৈরি এক লিঙ্গ, তাকে সাক্ষী রেখে সিংহবাহিনী দুর্গার রক্তস্নাত অবয়বের পদতলে মর্দিত হচ্ছে সবাহন মহিষাসুর।

দূরে কোথা থেকে কে জানে, ভেসে আসছে ঢাকের বাদ্য।

চারিদিক থেকে দৌড়ে এল দেবাতারা। শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল মহীশূর নগরী। ঠিক সেই সময়েই দমকা এক ঝড়ের হাওয়ায় রাশি রাশি ফুলের পাপড়ি উড়ে এল দুর্গার দিকে। মনে হলো, আকাশ যেন পুষ্পবৃষ্টি করছে।

মহীশূর থেকে অনেকটা দক্ষিণে, তিনটি সাগর যেখানে মিলিত হয়েছে, ভারতভূমির সেই শেষ বিন্দুতে অনন্ত জলধির মাঝে মাথা উঁচিয়ে জেগে থাকা প্রস্তরখণ্ডের ওপর বসে ছিল হরি ও রুদ্র। শান্ত সমাহিত চিত্তে দেখছিল জ্ঞানে রত এক সভ্যতার নবজাগরণের স্বপ্ন।

“প্রলয় পূর্ববর্তী প্রযুক্তির দান ছিল তিনটে লিঙ্গ,” বলল হরি, “তাদের জোরেই এত কাণ্ড করল মহিষ। এর মধ্যে একটা লিঙ্গ ধ্বংস হয়েছে, অন্যটা সাগরের অতলে হারিয়ে গেছে। শেষেরটা রয়ে গেছে মহাবলাচল পর্বতে। সেটা নিয়ে কী করা যায় এখন?”

“তোমার সম্মতি পেলে ওটা আমি কৈলাসে নিয়ে যাব,” বলল রুদ্র, “লোকচক্ষুর অন্তরালেই থাকবে সেটা। যাতে মহিষের মতো অযোগ্য কারোর হাতে না পড়ে সে লিঙ্গ, তার ব্যবস্থা করব।”

“আমার কোনো আপত্তি নেই তাতে,” বলল হরি, “শুধু একটা কথা বলো, শুনেছি নাকি কৈলাশ পর্বত বস্তুত কোনো পর্বত নয়, আদিযোগী নির্মিত এক অতিকায় মন্দির? তুষারাবৃত ওই পর্বতের গর্ভে নাকি এক নগরী রয়েছে? যেখানে শিবপন্থী বিনা কারোর প্রবেশাধিকার নেই? সেখানে গেলে নাকি সাধারণ অনধিকারী মানুষ পাগল হয়ে যায়, তার বয়স বেড়ে যায় আচমকা? সময় কি সেখানে অন্যগতিতে এগোয়?”

“একদিন চলে এসো সেখানে,” হেসে বলল মহাদেব, “সবকিছু ঘুরে দেখাব তোমাকে!”

সূর্য অস্ত যাচ্ছে। গেরুয়া রঙে আলো হয়ে আছে ব্রহ্মসাগর, সিন্ধুসাগর ও ভারত মহাসাগরের আকাশ, তাদের অনন্ত জলধি। পলাশ ফুলের মতো রাঙা টুকটুকে হয়ে আছে ভারতভূমির তটরেখা।

“অতঃ কিম্?” বলল রুদ্র।

“অসুর রাজশক্তি ধ্বংস হলো,” বলল হরি, “কিন্তু অসুর সমাজ তো আজও বলবান। দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল আজ অচেনা বিদেশ হয়ে রয়ে গেছে। দেশটাকে উদ্ধার করতে হবে। দানব পরিচয়, দানব স্বাতন্ত্র্যকে দেশ থেকে দূর করতে হবে।”

“দানবরা সফল,” বলল রুদ্র, “সেটাই দেখিয়ে ওরা প্রমাণ করত, দানবদের পথটা বিধিনির্দিষ্ট পথ। এই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই এত লোক জড়ো করেছিল দানবরা। দানব-পন্থার বৈধতার একমাত্র প্রমাণ ছিল দানবদের সাফল্য। আজ থেকে দানবদের অসাফল্যের পালা শুরু হলো। দেখবে, এবার দলে দলে দানব দলত্যাগ করবে।”

“ন হি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ,” হেসে বলল হরি, “পাথরে আঘাত না করলে পাথর নিজে থেকে ফেটে চৌচির হয় না। সবকিছু আপনা আপনি হয়ে যাবে, এমনটা আশা করো না।”

“তাহলে?” প্রশ্ন রুদ্রর, “কীভাবে করবে সেটা?”

“অসুরদের পাড়ায়-পাড়ায় গ্রামে-গ্রামে ছড়িয়ে পড়ব আমরা,” হেসে বলল হরি, “বিষ্ণুনামের মাহাত্ম প্রচার করব জোরগলায়।”

“অসুররা অসহিষ্ণু,” ভ্রূ কুঁচকে বলল রুদ্র, “তোমাদের প্রচারের উত্তর ওরা দেবে মারধর ও গুপ্তহত্যা দিয়ে।”

“তার প্রতিকারের জন্য তোমরা তো আছ,” রুদ্রর হাত ধরে বলল হরি, “প্রতিটি বিষ্ণুর হত্যার প্রতিশোধ নেবে শিবপ্রমথরা। নেবে না?”

“নিশ্চয়ই নেব,” একটু ভেবে স্মিত হেসে বলল রুদ্র, “সেটাই তো আমাদের বিধিনির্দিষ্ট কর্ম। প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ বিষ্ণুর কাজ। কিন্তু প্রতিশোধ, তার দায়িত্ব শিবের!”

সাবধান নকল তালমিছরি কিনে ঠকবেন না

স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও
বাংলার ঘরে ঘরে ছিল
বিশ্বস্ত একটাই নাম

চির পরিচিত

দুলালের ®

তালমিছরি

আজও তার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ বাংলার প্রতিটি ঘরেই।
সাধারণ অল্প সর্দি - কাশিতে দুলালের তালমিছরি চুষে খাওয়াই যথেষ্ট। আর সর্দি - কাশি বেশী হলে একটা লবঙ্গ ও একটু আদা সহ দুলালের তালমিছরি এক সঙ্গে ফুটিয়ে চায়ের মতন দু' বার খান — দারুণ কাজ দেবে।

ভারত সরকারের R ® চিহ্ন দেখে তবেই কিনুন

দুলালের তালমিছরি — সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী

দুলালের তালমিছরি ৪, দত্তপাড়া লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬, ফোন - ২২১৮ ৫৬৭৩, ২২১৮ ০৫৪৩

লড়াই

জয়ন্ত পাল

হ্যালো মা, হ্যালো, আমি বিবেক বলছি। এই সবে আমার ইন্টারভিউ শেষ হলো। প্রায় ১ ঘণ্টা ২৫ মিনিট ধরে ৫ জন মিলে বিভিন্ন ধারায় প্রশ্ন করছিলেন। শেষে সবাইকে বসতে বলেছিল। আমরা সবাই বসেছিলাম। প্রায় সন্ধ্যা ৬টার সময় আমাদের তিনজনকে সিলেক্ট করে ১ তারিখ থেকে জয়েন করতে বলল। প্রটোকল অনুযায়ী নিয়োগপত্র চলে যাবে বাড়িতে। না, বাবাকে এখনও জানাইনি। আগে তোমাকে জানালাম। তবে বাবাকে ফোন করছি। তুমি কিন্তু আগে বলে

দিও না। তাঁকে প্রথম নিউজটা আমিই দেবো। এতক্ষণে মনে হয় টেনশনে সুগারটা আরও বেড়ে গেছে। আচ্ছা, ছাড়ছি বাড়ি গিয়ে বাকি কথা হবে।

হ্যালো বাবা, তুমি এখনও অফিসে কেন? শরীর ঠিক আছে তো? হ্যাঁ ইন্টারভিউ হয়ে গেছে। খবর কী বলব, শুনে তোমার ভালো লাগবে না। কেন? কারণ তোমার শাশ্বত, পরমব্রত কেউ সিলেক্ট হয়নি। ওরাই তো তোমার কাছে বুদ্ধিমান ছেলে। এখন ওদের কথা শুনতে চাইছ না। আমার খবরের জন্য হাঁ করে আছো। বলছি, বলছি। যারা ইন্টারভিউ বোর্ডে ছিলেন তারা ততটা বুদ্ধিমান ছিলেন না। তাই তোমার ছাত্রদের সিলেক্ট না করে আমার মতো হাবুকেই সিলেক্ট করেছে। আরে অতো চিৎকার করো না। সুগারের সঙ্গে সঙ্গে প্রেশারটাও বেড়ে যাবে। আচ্ছা বাড়ি গিয়ে সব কথা বলব। তুমি সাবধানে বাড়ি এসো।

হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন ডাকছে, বিবেক বিবেক...। ঘাড় ঘুড়িয়ে দেখলাম অভিনব আসছে। ও এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে বলল, কনগ্রাচুলেশন। ওর হয়তো ইন্টারভিউ ছিল দ্বিতীয় ব্যাচে। আমি ধন্যবাদ বলে জিজ্ঞাসা করলাম। উত্তরে ও বলল না রে এবারে হলো না। যেহেতু এটা একটা লিডিং পেপার। তাই কমপিটিশানটা খুবই টাফ ছিল। যাই হোক, আমাদের ব্যাচের জানিস তো ফার্স্ট সেকেন্ড বয়ের হয়নি রে। আমি বললাম জানি। অভিনব গড়গড় করে বলে চলেছে, একদিন না একদিন এই পত্রিকায় কাজ করবই। দেখে রাখিস। যাইহোক তোর কথা বল। শুনলাম তোকে দেড়ঘণ্টা দুরমুশ করেছে। যাই হোক চান্সটা যখন পেয়েছিস ভালো করে কাজে লাগা। প্যান ইন্ডিয়াতে ওয়ান অব দ্য লিডিং পেপার। এখন তো বর্ডার পেরিয়ে বাংলাদেশে সার্কুলেশন হচ্ছে। এখানে ৫টা বছর কাটালে তোকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হবে না। যাই হোক আংকলকে জানিয়ে দিস্। এতক্ষণে আমি বলার সুযোগ পেলাম। বললাম হ্যাঁ বাবাকে ফোনে জানিয়েছি। কারণ তিনিই আমার চলার পথে সার্চলাইট। জানি না তাঁর আদর্শে শেষ পর্যন্ত চলতে পারব কিনা। না পারলে সেটা আমার অক্ষমতা তাঁর কিছু নয়।

অভিনবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হলাম। পথে এসডি-র সঙ্গে দেখা। এসডি মানে আমাদের ইকোনোমিক্সের স্যার, শৈবাল দাস। দেখা হতেই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম। তিনি বললেন তুই এখনো সেইরকম আছিস। বর্তমান যুগের আধুনিকতার পরশ লাগেনি। একটা আনহাইজিনিক কাজ করে ফেললি। আমি বললাম, যুগযুগ ধরে আমাদের দেশে ছোটোরা বড়োদের পায়ে হাত দিয়েই প্রণাম করে এসেছে, আমি তো শুনিনি তার জন্য স্বাস্থ্য গড়বড় হয়েছে । আমাদের বাড়িতে এখনো ছোটোরা বড়োদের এইভাবেই সম্মান করে আর আপনি তো জানেন স্যার আমাদের বাড়িতে ডাক্তারের পদধূলি পড়েনি। সবাই মোটের উপর সুস্থ।

— ওঃ, তোর সঙ্গে তর্কে পারব না। যাকগে বল্ তোর কী খবর? কিছু করছিস।

— স্যার এইমাত্র আমি একটা চাকরি পেলাম।

— এক্ষুনি মানে?

— একটা ইন্টারভিউ দিলাম বিবর্তনে। আমাকে সিলেক্ট করেছে তারা।

শৈবালবাবু লাফিয়ে উঠলেন। বলিস কীরে! গুড নিউজ। এটাতো লটারি পাওয়ার মতো। এরকম একটা প্রথম শ্রেণীর কাগজে সুযোগ পাওয়া। যাক্‌গে ভালো করে কাজ করিস। একদিন বড়ো সাংবাদিক হবি। দেখিস্ যেন বিক্রি হয়ে যাস না। তোর জন্য আমরা যেন গর্ব করতে পারি। উত্তরে আমার কিছু বলার ছিল না। শুধু বললাম চেষ্টা করব স্যার।

পায়ে পায়ে বাড়িতে এসে ঢুকলাম। বাড়িতো নয় এক চিলতে পায়রার খোপ। তাও আমাদের আত্মীয়রা বলেন তোরা ফ্ল্যাটে থাকিস মানে খুব বড়োলোক। বাবাকে দেখলাম ড্রইংরুমে বসে টিভি দেখছেন। ঢোকামাত্র টিভিটা বন্ধ হয়ে গেল। চেঁচিয়ে বললেন শুনছো বিলে ফিরেছে। বাবা আমাকে বিলে বলেই ডাকে। মা ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল। আমার কপালে মায়ের মুখটা পৌঁছল না তাই বুকেই একটা চুমু খেলো। একটু আদর করে দিল। বাবার দিকে তাকালাম। একটু আলগাভাবে মায়ের কাণ্ড দেখছিলো। বাবাকে যখন প্রণাম করলাম আমাকে বললেন ডাইনিং টেবিলে একটা জিনিস রাখা আছে। হাতমুখ ধুয়ে ওটা খেয়ে নে। মা বলল দেখ না তোর বাবা এসে থেকে চা পর্যন্ত খায়নি। তোর জন্যে অপেক্ষা করছে। আগে কী খাবি। আমি তাড়াতাড়ি কলে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে ভাঁড়ের ঢাকাটা খুললাম। খুলতেই মনটা ভরে গেল। প্রায় ৩০০ গ্রামের মতো হবে, রাবড়ি। আমার খুব প্রিয়। আমি বললাম তোমরা চা খাও, আমি এখন তারিয়ে তারিয়ে এটা খাবো। মা বলল এতটা রাবড়ি তুই একলা খাবি? বাবা সঙ্গে সঙ্গে বললেন না না, আজ ও ওটা একলাই খাক। এতটা কোথায়, এর চার গুণ দিলেও আমি একলাই খেতাম। মা বলল আমাকে একটু আর তোর বাবাকে একটু দে। আমি বললাম তোমাদের খুবজোর একটা করে পাপড়ি দিতে পারি। মা বলল তাই দে। হাতটা তো খুলুক। বাবা ধমকের সুরে বললেন সবকিছু না খেলে বোধ হয় তোমার মন ভরে না,তাই না?

আমি বুঝলাম, মায়ের মনের যে খুশি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে আসছে। আসলে দুজনের খুশির বহিঃপ্রকাশ হয় দুরকম। দুটোই আমি বুঝতে পারি। মায়ের খুশির বহিঃপ্রকাশ একটু উচ্ছলতার মধ্য দিয়ে। কিন্তু বাবা, আমার বাবার খুশি তার চোখে

থাকে, কখনো কখনো অশ্রু হয়ে গাল বেয়ে নেমে আসে। আমি জানি যদি বাবার চশমটা একটু খুলে দিই তবে বাবার খুশি বন্যা হয়ে আমাকে ভাসিয়ে দেবে।

রাত্রে একসঙ্গে তিনজন খেতে বসলাম। সেখানেই বাবার প্রথম প্রশ্ন। কী প্রশ্ন করেছিল? বোর্ডে কজন ছিল? আমি বললাম বোর্ডে পাঁচজন ছিল। প্রথমেই আমাকে প্রশ্ন করেছিল হোয়াট ইজ নিউজ? আমি বলব বলে মনে করলাম যে মিনিং অব অ্যালফাবেট। জিজ্ঞাসা করছে তাই বললাম North East West South. ie. means to know everywhere. একজন তো বাংলায় বললেন আরে বাবা When it become News? আমার সঙ্গে সঙ্গে ক্লাসের একটা উদাহরণ মনে পড়ে গেল। আমি একনিঃশ্বাসে বলে দিলাম, When a Dog bites a Man not a news but when a Man bites a Dog, is a News। পাঁচজনই হেসে উঠে বললেন, গুড ভেরি গুড। তারপর দেশের প্রশ্ন, সমাজের, পড়াশোনার প্রশ্ন। সেগুলি সবাই পারে, তাই অসুবিধা হয়নি।

একটা উত্তরেই তুই বাজিমাত করে দিয়েছিস। ফার্স্ট আগস্ট জয়েন করতে বলেছে তার মানে হাতে মাত্র তিন সপ্তাহ। তার মধ্যে মেডিক্যাল সার্টিফিকেট জোগাড় করতে হবে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার এর মধ্যেই এসে যাবে।

আজ সোমবার ফার্স্ট আগস্ট। গতকাল রাত্রিতে বাবা বলেছিল দেখ রাস্তা চলার সময় পথের মধ্যে যেমন একটা ক্রসিংপড়ে সেইরকম সব মানুষের জীবনেই একপ্রকার মোড় আসে। স্কুলের গন্ডি পেরিয়ে কলেজ প্রবেশ প্রথম মোড়। কলেজ গন্ডি পেরিয়ে কর্মক্ষেত্র দ্বিতীয় মোড়। কর্মস্থলে স্থায়ী হওয়ার পর এবং সংসারে প্রবেশ তৃতীয় মোড়। তারপর ছেলেমেয়ে মানুষ করে ঠিক পথে চালনা করা চতুর্থ মোড়। চলার সময় রাস্তায় পথিক গন্তব্যস্থল হিসাবে তার পথ নির্ধারণ করে, তা না হলে সে রাস্তা হারিয়ে যেখানে পৌঁছানোর কথা ছিল তার থেকে অনেক দুরে চলে যায়। জীবনে যদি আদর্শকে ধ্রুবতারা করে এগোতে না পারে মানুষও একটা মোড়ে এসে হারিয়ে যায়। জীবনে কোনো কিছুতেই সাফল্য আসে না।

আজ আমি শ্রী বিবেক বসু, বাবা শ্রী আদিনাথ বসু ১৩বি গোবিন্দ ঘোষ লেন থেকে জার্নালিজম পাশ করে বাবার বহুদিনের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে একটি নামি বাংলা দৈনিক বিবর্তনের অফিসে ঢুকে পড়লাম যোগ্যতা যাচাইয়ের মাধ্যমে। গেটের সামনে একজন দাড়িয়ে ছিল। আমাকে দেখে বললেন,আপনি কি বিবেক স্যার? আমি মাথা নাড়তেই উনি বললেন ওই সোজাসুজি ঘরটাতে আপনাদের বসার ব্যবস্থা হয়েছে।

আমি পায়ে পায়ে নির্দিষ্ট ঘরটার সামনে এসে আস্তে করে দরজাটা খুললাম। দেখলাম আগের দিনের দুজন বসে আছে। আমিও ওদের কাছে গিয়ে বসলাম। বাবা একবার বলেছিল যে আমার সঙ্গে আসবে কিন্তু আমি বললাম যে এইটুকু সময়ের জন্য তুমি অফিস কামাই করবে কেন? তার থেকে তুমি তোমার অফিসে যাও আমি আমার অফিসে যাই। কী ভ্যাগিস কথাটা শুনল। তবে বাসস্ট্যান্ড অবধি এসে বাসে তুলে দিয়ে গেছে। তাতেই শান্তি। আস্তে আস্তে ঘরে আমাদের সংখ্যা পাঁচে দাঁড়ালো। পাঁচ সংখ্যাটা ভালো। কারণ পাঁচে পঞ্চবান, পাঁচে পঞ্চপাণ্ডব, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চসায়র। সবকটিই সুন্দর। প্রায় একঘণ্টা অপেক্ষার পর একজন সৌম্যদর্শন পুরুষ এলেন। বললেন যে একটা কাজে ব্যস্ত ছিলাম। তাই দেরি হলো। যাই হোক আমার ঘরে এসো। বলে উনি চলে গেলেন। একজন স্টাফ এসে ওনার ঘরে নিয়ে গেলেন।

শুনলাম উনি ম্যানেজার বাবু। ওনার ঘরে আমাদের ডকুমেন্ট পরীক্ষা হলো। তারপর এক একটা ডিপার্টমেন্টে পাঠালেন। অফিস দেখছিলাম। বিরাট অফিস। বিরাট যজ্ঞ চলছে। তাতে বোধ হয় ঘি দেওয়ার জন্যই আমাদের ডাকা হয়েছে। একটা কাগজের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট আছে। আমরা যখন একটা কাগজ পড়ি তখন বুঝতে পারি না যে কত বিভাগের কত জনের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল সকালে আমাদের ঘুম ভাঙার আগেই ঘরে পৌছে যায়।

আমাদের পাঁচজনের মধ্যে তিনজনকে রিপোর্ট ডিপার্টমেন্টে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে একজন স্টাফ এডিটর ছিলেন তিনি আমাদের খবর সংগ্রহের পদ্ধতি, খবর রিপোটিং কেমন করে করতে হয় সমস্ত বিস্তৃত আকারে বাখ্যা করলেন। শেষে উনি বললেন যে একটা ঘটনার বিবরণ দিচ্ছি। ধরুন, একটা ঘটনা আজ ঘটেছে। আপনারা তার ওপর রিপোর্ট তৈরি করুন। যে যতটা পারেন খবরের গভীরে প্রবেশ করবেন। একটা কথা মনে রাখবেন যে খবরটা যেন মানুষ নেয়। পড়তে তাদের ভালো লাগে, তবেই তারা পয়সা খরচা করে আমাদের কাগজ কিনবে। আপনাদের খবর পরিবেশনের ওপরে নির্ভর করছে আমাদের কাগজের বাড় বাড়ন্ত।

আমি ওনার কথা শুনছি, সঙ্গে ক্লাসের দিনগুলোকে মনে পড়ছে। ক্লাসে ফ্যাকাল্টিরা পড়াবার সময় বলতেন, যে ঘটনা দেখবে বা শুনবে তাকে চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে হবে। এই সময় মনে রাখতে হবে কেউ আমার আপন নয়, কেউ শত্রু নয়। নিরপেক্ষ মন নিয়ে যদি সংবাদ পরিবেশন করি তবেই সত্য উদ্ঘাটন হবে। কিন্তু এতো দেখছি পুরোপুরি ব্যবসায়িক। যাইহোক ওই

ঘটনাকে কেন্দ্র করে যতটা সম্ভব খেটেখুটে একটা সত্যকে সামনে নিয়ে এলাম। পরে সবকটি রিপোর্ট দেখে আমাকে বললেন যে, আপনার বিশ্লেষণটা ভালো হয়েছে কিন্তু শুধু অ্যানালিস ভালো হলে চলবে না, এটাকে বাজারজাত করতে হবে। তবে প্রথম প্রথম আপনারা রিপোর্ট লিখুন পরে আমরা কাগজের মতো সাজিয়ে নেবো।

আস্তে আস্তে আমার চাকরির বয়স বাড়ছে। দেখতে দেখতে একমাস হয়ে গেল। এই এক মাসে অনেকগুলো রিপোর্ট তৈরি করেছি। আমার লেখা রিপোর্ট কাগজে ছাপা হতে দেখেছি। আনন্দ লেগেছে, তবে একটা স্কুলের বাস এক্সিডেন্টের সংবাদ এমনভাবে পরিবেশন করেছিলাম যার মধ্যে অনেক অনুসন্ধানের বিষয় ছিল। সেই সংবাদ নিয়ে বেশ হইচই পড়ে গেল। শুধু আমাদের অফিসে নয়, রাজ্যে ও লালবাজার থেকে আমাদের সম্পাদককে ফোন করে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছে। সম্পাদক সাহেব তো আমার ডিপার্টমেন্টে এসে পিঠ চাপড়ে দিলেন।

বেশ চলছিল কর্মজীবন। আরও উৎসাহ নিয়ে খবর সংগ্রহ করতে যেতাম। প্রেস কার্ডটা যখন বুকে লাগিয়ে কভার করতে যেতাম, যখন দেখতাম ভিড়ের মধ্যে আমাকে সসম্মানে জায়গা করে দিচ্ছে, তখন নিজেকে একটা কেউকেটা মনে হতো। এভাবে টক ঝাল মিষ্টি অভিজ্ঞতায় ছ'মাস কেটে গেল। প্রতিমাসে বেতন ব্যাংকে জমা হচ্ছে। তবে প্রথম মাসে খুব আনন্দ হয়েছিল টাকাটা দেখে। পুরো টাকাটা ব্যাংক থেকে নগদে তুলে বাবার হাতে গর্বভরে তুলে দিয়েছিলাম। কিন্তু বাবা বললেন ওটা ব্যাংকেই রেখে দে। পরে কাজে লাগবে। বাবা তেমন গুরুত্ব দিলেন না আমার কাজে। কিন্তু মা খুব আনন্দ পেল। একটা বড়ো লিস্ট করতে বসে গেল যে মামা মাসি ভাইপো ভাইঝিদের কী কী দিতে হবে।

এরকম ভাবেই কাটছিলো। একদিন সকালে অফিস যাবো বলে তাড়াহুড়ো করছি। ডিপার্টমেন্ট ইনচার্জের ফোন এলো। তোমাকে অফিসে আসতে হবে না। তুমি সোজা ধর্মতলায় স্যামুয়ো জনস্ স্কুলে চলে যাও। ওখানে ঝামেলা হচ্ছে। কভার করে অফিসে এস। এই রকম চ্যালেঞ্জিং কাজ করতে আমার ভালো লাগত। আমি স্কুলে গেলাম। শুনলাম একটা শিশু ছাত্রীর উপর যৌন হেনস্থা হয়েছে। সেই নিয়ে রাতারাতি গার্জেন ফোরাম তৈরি হয়েছে। তারাই গেট বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। আমাদের দেখে সবাই বিবৃতি দিল ক্যামেরার সামনে। ওদের অনুরোধ করে কয়েকটি কাগজের সাংবাদিকরা স্কুলের ভেতরে ঢুকলাম। টিচার্স রুমে কথা বললাম। প্রিন্সিপাল ম্যাডামের সঙ্গে কথা বললাম। বুঝলাম। পাঁচ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কভার করার পর অফিসে এলাম। প্রায় রাত্রি দশটা অবধি অফিসে থেকে রিপোর্ট তৈরি করলাম। জমা দিয়ে বাড়ি এলাম। কাল সকালে কাগজে বেরোবে। এর মধ্যে তিনবার সিনিয়র বাসুর অর্থাৎ বাবার ফোন এসে গেছে। প্রায় ১১টায় যখন বাড়ি এলাম দেখলাম যথারীতি বাবা রাস্তায় দাঁড়িয়ে। যতই বারণ করি না কেন ভবি ভুলবার নয়। যদি জিজ্ঞাসা করি দাড়িয়ে আছো কেন? একটাই উত্তর পাড়ার কুকুরগুলো চিৎকার করবে তাই দাঁড়িয়ে আছি।

পরের দিন সকালে উঠে আমাদের কাগজটা নিয়ে বসে পড়লাম। খবরটা পড়ে তাজ্জব হয়ে গেলাম। আমার কভারের সঙ্গে কোনো মিল নাই। আমার উপরের বস সংবাদের উপর রং রস গন্ধ যোগ করে একটা রিপোর্ট প্লেস করেছে। রিপোর্টটা পড়ে আমার বমি পাচ্ছে। একটা শিশুকে নিয়ে এরা মার্কেট করতে চাইছে। অথচ যাকে অপরাধী বলে শনাক্ত করা হয়েছিল আমার সংবাদে তাকে সন্তর্পণে আড়াল করা হয়েছে। কেন কেন কেন? কার স্বার্থে, যেখানে অধিকাংশ অভিভাবক ওই বাসের খালাসি মহম্মদ সেলিমের দিকে আঙ্গুল তুলছে, যেখানে অভিযুক্ত আনসারি নিখোঁজ, তার দিকে না গিয়ে অন্যভাবে স্কুলকে দোষী সাব্যস্ত না করে সমস্ত দোষ অভিভাবকদের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছে। যাহোক যেতে ইচ্ছা না করলেও অফিসে পৌছালাম। অফিসে পৌঁছে আরও অবাক হয়ে গেলাম। সবাই শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। সংবাদ পরিবেশনের জন্য। কলকাতায় যত কাগজ বেরোয় সবথেকে ভালো সংবাদ পরিবেশন আমাদের হয়েছে। মনটা খারাপ হয়ে গেল। কোথায় ঝগড়া করব বলে এলাম কিন্তু করতে পারলাম না। বুঝলাম এটাও একটা ষড়যন্ত্র।

হঠাৎ খবর পেলাম গুজরাটে একটা বড়ো অনুষ্ঠান হবে যেখানে আমেরিকার একজন লেখককে পুরস্কার দেওয়া হবে। সেই নিয়ে নেট ঘেঁটে একটা আর্টিকেল লিখে ফেললাম। কিন্তু জানি না কোনো এক অজ্ঞাত কারণে ওটা ছাপা হলো না। হঠাৎ ১৪ আগস্ট কলকাতায় বনধ ডাকা হলো। আগেরদিন রাত্রে প্রায় দুটোর সময় ফোন এল যে আমাকে মানিকতলা থেকে পার্কসার্কাস কভার করতে হবে। ফোন পেয়ে থেকে আর ঘুম এলো না। কখন বেরোবো? কেমন ভাবে কভার করব? খালি ভেবেই চলেছি। আমি বুঝতে পারছি না যে গুজরাটে একজনকে পুরস্কার দেবে তার জন্য কলকাতায় কেন হরতাল। অফিস থেকে বলেছিল সকালে গাড়ি আর ক্যামেরা পৌঁছে যাবে। গাড়ি আসতে দুজনে বেরোলাম। মাঝে মাঝে গাড়ি থেকে নেমে রিপোর্ট লিখছি, ছবিও উঠছে। শিয়ালদহ-এন্টালি-নোনাপুকুর হয়ে মল্লিক বাজারে এসে গাড়ি থেকে নেমে দেখলাম একটা বাস জ্বলছে। পুলিশের দিকে ইট ছোড়া হচ্ছে। আমি

ক্যামেরাম্যানকে বললাম ছবি তুলতে। ভয়ে সে গাড়ি থেকে নামল না। তখন বাধ্য হয়ে আমি ক্যামেরা নিয়ে ছুটলাম। ছবি তুলছি, এক পুলিশ অফিসারকে বললাম, আপনারা কিছু করছেন না কেন? বললেন ওপর থেকে গুলি কাঁদানে গ্যাস চালাতে বারণ করা হয়েছে। কী আর করবো, ছবি তুলছি। একটু সামনেই চলে গেছিলাম। হঠাৎ আমার মাথায় কেউ আঘাত করল। কিছু বোঝার আগেই পড়ে গেলাম। হাত থেকে ক্যামেরা দুটো গেল। দেখলাম একজন ক্যামেরা তুলছে আমি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। পেটের ভেতর ক্যামেরাটা নিয়ে আমি শুয়ে পড়লাম। তখন আমার ওপর এলোপাথাড়ি লাঠি পড়ছে। তার পরে আর মনে নাই।

পরের দিন যখন জ্ঞান ফিরল দেখি বাবা আমার বেডের পাশে দাড়িয়ে আছেন। এছাড়া আমার কয়েকজন অফিস কলিগ আমার জ্ঞান ফিরতেই ডাক্তার ডাকতে গেল। আমি বাবাকে দেখে একটু উঠতে গেলাম। কিন্তু কার সাধ্য যে শরীরটা নাড়াতে পারি। জমে পাথর হয়ে গেছে। বাবা তাড়াতাড়ি ধরে ফেললেন। অনুভব করলাম মাথাটা ছিঁড়ে যাচ্ছে যন্ত্রণায়। পায়ে ব্যান্ডেজ, কলিগরা ফিরে এল ডাক্তার নিয়ে। সঙ্গে দেখি আমার ডিপার্টমেন্ট ইনচার্জ ডাক্তারকে বলছে যদি মনে করেন আইসিইউ-তে সিফট করতে পারেন। টাকার জন্য চিন্তা করবেন না। কিন্তু তাড়াতাড়ি সুস্থ করতে হবে। এ আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্টাফ। আমার শুনতে ভালো লাগছিল। তার ওপর কলিগরা বলছিল আরে বস্ কাল তুমি হিরো হয়ে গেছো। আমি ইশারা করলাম কেন? বলল সমস্ত ইলেকট্রনিক্স মিডিয়াতে তোমার মারের দৃশ্য দেখিয়েছে। আজ সমস্ত প্রিন্ট মিডিয়াতে তোমার রক্তমাখা ছবি, একদিনেই মাত। মোট ২৬টা কেস হয়েছে। নিজেকে বীর মনে হচ্ছিল। বাবা চুপ করে দাড়িয়ে

ছিলেন। একটাও কথা বলেননি। তারপর আমাকে ওটিতে সিফট করাবার জন্য নিয়ে যাওয়া হলো। বাবা ও অফিসের সবাই আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে গেল, আমি আবার জ্ঞান হারালাম।

প্রায় তিনমাস বাদে অফিস জয়েন করলাম। আমাকে বলা হলো যে তুমি আজ কোনো কাজ করবে না। কিছুক্ষণ বসো। শরীর খারাপ লাগলে বাড়ি চলে যাও। নীচে গাড়ি রেডি আছে। সমস্ত কলিগ এসে শুভেচ্ছা জানালো। এমনকী এডিটর, সাব এডিটর সবাই। আমি একজন সাবর্ডিনেট স্টাফকে বললাম, ভাই ১৬ই আগস্টের কাগজটা নিয়ে এসো তো। সে এনে দিল। দেখি প্রথম পাতায় আমার রক্তেভেজা মুখমণ্ডলের ছবি। কিন্তু খবর পড়ে চোখে জল এসে গেল। সবজায়গায় দুষ্কৃতী বলে আসল তথ্য চাপা দেওয়া। এমনকী পুলিশ মার খেয়েছে সেই তথ্যটা কোথাও নাই। আমার শরীরে আঘাতে যতটা কষ্ট পেয়েছি তার থেকেও বেশি কষ্ট পেলাম। এটা কি সাংবাদিকতা না এখানেও তুষ্টিকরণ?

প্রায় তিনমাস পার হয়ে গেছে। এখন আমি পুরো সুস্থ। এই তিনমাসে আমাকে বাইরের কোনো ডিউটি দেয়নি। অফিসে গেছি, একটু আধটু কাজ করেছি। বাড়ি চলে এসেছি। একদিন রাত্রে ডিনার করে ঘরে ঢুকেছি, হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠল। শোন, আন্দুলে একটা দাঙ্গা লেগেছে। অফিসের গাড়ি যাচ্ছে, গাড়িতে ক্যামেরা আছে, কভার করে দুটোর মধ্যে ফ্যাক্স করবে। সবার আগে আমাদের কাগজে ছাপা হওয়া চাই। রিস্ক নেবে না। ফোন কেটে গেল।

জামা প্যান্ট পরে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াতেই দেখি বাবা দাড়িয়ে আছেন। একটাই প্রশ্ন, এখন ডিউটি না কি? এই হয়েছে, আমার ফোন এলেই ওমনি বাইরে চলে আসবে। সবসময় টেনশন সেইজন্যই বোধ হয় সুগার কমছে না।

বললাম হ্যা। মা কোথায়?

— ঘুমিয়ে পড়েছে,

—তুমি ঘুমাওনি কেন?

— ফোনের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। কোথায় যেতে হবে?

— আন্দুলে, গাড়ি আসছে।

বুঝলাম আমার জন্য সবসময় দুঃশ্চিন্তা করেন। বিশেষ করে মার খাওয়ার পর থেকে। আমার কাজটাই এরকম। ওই সফট্ওয়ার ইঞ্জিনিয়ারদের মতো তো হবে না। নির্দিষ্ট কাজের সময়, এসি ঘর ইত্যাদি। তবে এইরকম চ্যালেঞ্জিং কাজই আমার ভালো লাগে। স্পট পেলাম, ছবিও তুললাম, দেখলাম এমএলএ আমানুল্লা সাহেব দাঁড়িয়ে থেকে দোকান লুঠ করাচ্ছে। একজন বলে উঠলো ওটা হিন্দুর দোকান ,ভাঙো। সঙ্গে সঙ্গে লুঙ্গিপরা একদল কাটারি কাস্তে নিয়ে দৌড়াল, ভাঙা হলো। লুঠের মাল নিমেষে ভ্যানিশ। কয়েকটা বাড়িতে আগুন লাগানো হলো। একটা লরি এলো। ফ্রিজ, টিভি, আলমারি সব তোলা হলো। সবাই চিৎকার করছে, কান্নাকাটি করছে, পুলিশও দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু কিছু বলছে না, বাধা দিচ্ছে না। আর একটা কাগজের সাংবাদিক পুলিশকে বলল, অফিসার কিছু করুন। তখন পুলিশ বললো এটা রমজান মাস, তাই ওদের গায়ে হাত দেওয়া যাবে না। আমি লরিতে বসে একটা রিপোর্ট তৈরি করলাম। ছবি-সহ পাঠিয়ে দিলাম। পরেরদিন সকালে কাগজে রিপোর্ট ছাপা হয়েছে কিন্তু কোথাও এমএলএ সাহেবের নাম নেই। মুসলমানদের নামের জায়গায় দুস্কৃতী বলে উল্লেখ হয়েছে। মনটা বিষিয়ে গেল। মনে হলো শ্রেণীকক্ষে যা যা পড়ানো হয় বাস্তবে তার সঙ্গে কোনো মিল থাকে না। সেদিন অফিসে গিয়ে আমার ইমিডিয়েট বস্‌কে বললাম। উত্তরে তিনি বললেন এটা হবে এবং আমাদের মেনে নিতে হবে। কারণ আমরা সেকুলার তো। সংখ্যালঘুদের নিয়ে কিছু বলা যাবে না। তাদের বিরুদ্ধে কিছু লেখা যাবে না। সত্য ছাপাতে গেলে খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। বসকে দেখে কেমন আমার করুণা হলো। নিজের পেট চালানোর জন্য এত আপোশ? যারা ভিক্ষা করে পেট চালায় তারা এর থেকে অনেক স্বাধীন।

যাই হোক সন্ধ্যায় সিই-র ঘরে ডাক পড়ল। দেখি ওনার হাতে আমার রিপোর্টের ফ্যাক্স পেপার। তোমার রিপোর্টটা ভালোই ছিল। ওটাকে বেস করে একটা রিপোর্ট প্রিন্ট হয়েছে, পড়েছ? আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে এলো একটা কথা, বললাম ওটাতো রিপোর্ট নয়, ওটা গল্প। ওটা লেখার জন্য স্পট ভিজিটের প্রয়োজন ছিল না। অফিসে বসেই লেখা যেত। উনি চুপ করে থাকলেন। কিছুক্ষণ বাদে একটা সিগারেট ধরালেন। বললেন তোমার সেদিনকার কাজের জন্য রাজ্য সরকার তোমাকে সাহসিকতার পুরস্কার দেবে। দিনটা বলে দেবো। রবীন্দ্রসদনে হবে। তুমি মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে পুরস্কার নেবে। আমি চুপ করে থাকলাম। ঠিক আছে আজ বাড়ি যাও পরে কথা হবে।

দুদিন বাদে আমাকে ধর্মতলায় একটা মিটিং কভার করতে বলল। আমি টিফিন করে বেরোলাম। গাড়ি থেকে নেমে মেট্রোর কাছে দাঁড়ালাম। ওদিক থেকে একটা বড়ো মিছিল আসছে। সেই মিছিল থেকে কিছুলোক বেরিয়ে বড়ো বড়ো দোকানের কাচগুলোতে পাথর ছুড়ছে। পথচারীরা যে যেদিকে পারছে ছুটছে। পার্কিং করা গাড়িগুলো ভেঙে দিচ্ছে। আমার গাড়িটা আক্রমণ করতেই ড্রাইভার কোথায় যেন পালিয়ে গেল। আমি দেখলাম যত লোক ছুটছে তাদের তুলনায় এদের সংখ্যা নগণ্য। সবাই যদি একজোট হয়ে প্রতিবাদ করত ওরা উড়ে যেত। কিন্তু কে বাঁধবে বিড়ালের গলায় ঘণ্টা? কারণ সবাই ভাবছে আমি একা। আমার মনে পড়ল যারা একদিন বলেছিল

যে সজ্জনশক্তি সংখ্যায় বেশি কিন্তু তাঁরা সঙ্ঘবদ্ধ নন। কিন্তু দুর্জনশক্তি কম হলেও তারা জোটবদ্ধ। তাই তারা যখন দলবেঁধে অন্যায় করে তখন সরকারপক্ষ হোক বা বুদ্ধিজীবী , ভয়ে চুপ করে থাকে।

অনেক পরে মিটিং আরম্ভ হলো। পুরো মিটিংটাই ছিল ভারত বিরোধী। ভারতকে ভেঙে টুকরো করার শপথ নেওয়া হলো। তার মধ্যে শুধু মুসলমান নেতা আছে তা নয়, অনেক হিন্দু নেতাও আছে। যেখানে ভারত সরকার আসমুদ্রহিমাচল সবাইকে নিয়ে ভারত গড়ার কথা বলছে, সেখানে এরা প্রকাশ্য দিবালোকে মাইক্রোফোন চালিয়ে জোর গলায় ভারতকে ভাঙার কথা বলছে। শুধু তাই নয়, ভারত বিরোধী স্লোগান দিচ্ছে। কারণ ওরা বুঝে গেছে কেউ বাধা দেবার নেই। কেউ তাদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানাবে না। আমি ভাষণগুলো রেকর্ড করলাম। ছবি তুললাম, রিপোর্ট লিখে পাঠিয়ে দিলাম। কিন্তু সেই রিপোর্টটাও বিফলে গেল। আমার রিপোর্ট সরিয়ে রেখে অন্য গল্প ছাপা হলো। সেখানে দোকান ভাঙা, পথচারীদের লাঠির আঘাত করা, এমনকী সংবাদমাধ্যমের গাড়ি ভাঙা সমস্তই খবরের বাইরে।

পরেরদিন আমি ফ্লোরে চিৎকার করে বললাম, এখানে সাংবাদিকতার কবর দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্য কেউ কিছু বলল না সবাই শুনলো। আসলে সবাই ব্যাপারটা মেনে নিয়েছে। আমি অবাক হলাম আমি কেন মানতে পারছি না।

সন্ধ্যায় আবার যথারীতি আমার ডাক পড়ল। আমাকে বড়োসাহেব বললেন, কি রাগ পড়েছে? আমি উত্তর দিলাম

কেন জানি না কিছুতেই রাগ কমছে না। এই রিপোর্টগুলো প্রতিবার আমি সততার সঙ্গে স্পটে নিজের চোখে দেখে তৈরি করি, যার মধ্যে এতটুকু রং থাকে না, ভেজাল থাকে না। পরে যখন দেখি আমার পরিশ্রম, আমার সততাকে খুন করা হয়েছে, তখম আমার স্বাভিমানটাই জাগ্রত হচ্ছে, আমি রেগে যাচ্ছি।

বড়ো সাহেব বলতে শুরু করলেন— দেখ, এই কাগজ চলে জারদার সাহেবের টাকায়। তোমার কি মনে হয় আমাদের এত স্যালারি, অনেকের গাড়ি, দামি ফ্ল্যাট সব কাগজ বিক্রির টাকায় হয়? হয় না। সমস্ত কিছু ওনার টাকায় চলে। তোমার পরিশ্রম, তোমার সততা, যোগ্যতা নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই কিন্তু এইসব ছাপা হলে এই কাগজ বন্ধ করে দেবে। আমরা সবাই বেকার হয়ে যাবো। তোমার মতো বুদ্ধিমান ছেলের এটা বোঝা দরকার।

বড়ো সাহেবের ঘর থেকে যখন বেরোলাম তখন নিজেকে বিধ্বস্ত, অসহায় লাগছিল। শুধু দুবেলা দুমুঠো খাবার জন্য নিজের আদর্শ, নিজের যোগ্যতা, নিজের স্বাভিমানকে মালিকের পায়ে সমর্পণ করে দেবো? রাত্রি এগারোটা অবধি চুপকরে বসে রইলাম। যত রাত বাড়ছে অফিসে ব্যস্ততা বাড়ছে। চিফ এডিটর চলে গেছেন। আমি দুটোর সময় ডেস্কটপটার কাছে বসে কি-বোর্ডে হাত দিলাম। তারপর পদত্যাগপত্রটা চিফ এডিটরের ঘরে রেখে আস্তে আস্তে বাড়ির দিকে রওনা দিলাম।

দুর থেকে দেখতে পাচ্ছি বাবা চাবি খুলে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। এই হয়েছে বাবা। বললেও কথা শুনবেন না। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকলে কি আমি তাড়াতাড়ি ফিরব? অন্যদিন বলতাম, আজ বলার অবস্থায় নেই। চুপচাপ বাড়িতে ঢুকলাম। আমার এই নীরবতা বাবা বোধহয় কিছুটা অনুধাবন করেতে পেরেছেন। কিছুক্ষণ আমার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে পায়ে পায়ে ঘরে ঢুকলেন। চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, কিছু গণ্ডগোল হয়েছে অফিসে? ওই এক ধাক্কায় আমার নীরবতার বাঁধ ভেঙে চৌচির হয়ে গেল। বাবা কোনো কথা বললেন না, শুধু আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন। অনেকক্ষণ কাঁদার পর কিছুটা ধাতস্থ হলাম। কথা বললাম, বাবা আমি হেরে গেলাম। পারলাম না। আদর্শবাদের সঙ্গে স্বার্থবাদের সংঘর্ষে আমি হেরে গিয়ে পদত্যাগ পত্র জমা করে এসেছি। আমার বস্ থেকে আরম্ভ করে কলিগদের সবাই নিজের স্বার্থকেই গুরুত্ব দিচ্ছে। তাদের সঙ্গে কাজ করতে ঘৃণা হচ্ছে।

এতক্ষণে বাবার দিকে তাকালাম। দেখলাম তার অশ্রু বুকে নেমে সাদা গেঞ্জিটা ভিজিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ নিঃশব্দে কেঁদেছেন। নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি বললেন, আমি তোকে হারতে দেবো না। এখনো এরাজ্যে অনেক জাতীয়তাবাদী পত্রিকা আছে। কোথাও না কোথাও জায়গা হবে। বাকি নাম পরিচয়টা করিয়ে নিবি। আমি বললাম তুমি নিশ্চিন্ত থাকো বাবা। এখন আমাকে অনেকেই চেনে। আমি ঠিক জায়গা করে নেবো। কারণ আমার লিডিং নিউজ পেপারের মোহটা কেটে গেছে।

পরের দিন অফিস থেকে সিই-র ফোন এল। অফিসের গাড়ি যাচ্ছে তুমি একবার অফিসে এসো। প্রয়োজনীয় কথা আছে। ফোন রেখে দিলেন। বাবা অফিসে বেরোচ্ছিলেন। বললেন, ডাকছে যখন একবার দেখা কর, তাঁর সম্মানের জন্য। যথারীতি গাড়ি এলো। তৈরি হয়ে অফিসে পৌঁছলাম। সাব এডিটার শ্যামলদা আমার দিকে এগিয়ে এসে ফিসফিস করে বললেন একবারে সিই-র ঘরে চলে যা। আমি সোজা তার ঘরে গেলাম। দরজা খুলতেই তিনি সাদরে ডাকলেন। চেয়ারে বসতে বললেন। কফির অর্ডার দিলেন। আমি চুপ করে বসে রইলাম। ঘরের মধ্যে নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। একটা সিগারেট ধরিয়ে আরম্ভ করলেন।

— দেখলাম তুমি রেজিগনেশন দিয়েছ। কিন্তু কেন? তোমার রিপোর্টগুলি তোমার মতো ছাপানো হচ্ছে না বলে?

— না স্যার, আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের সংঘাত হচ্ছে বলে।

— আদর্শ? তুমি কি মনে করো তুমি একলাই আদর্শবাদী? অনেক আছে। কিন্তু তারা বাস্তবকে বোঝে তাই মানিয়ে চলে। আজ পাকিস্তান থেকে কোটি কোটি টাকা বলিউডে ঢুকছে। সিনেমা তৈরি হচ্ছে। তাদের শর্ত থাকছে কে হিরো হবে ,কে হিরোইন হবে। তারা দেশের রাজনৈতিক দলকে টাকা দিচ্ছে, বুদ্ধিজীবীরা তাদের টাকায় জীবিকা নির্বাহ করছে, তাই তারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কথা বলে। তাদের কি তুমি বোকা মনে কর? তুমি তোমার আদর্শ নিয়ে বাঁচতে পারবে না। কোথায় যাবে? এখন দেখো দেশে রাজনৈতিক নেতাদের মুখে অন্য দেশের প্রধানমন্ত্রীদের কথা শোনা যায়, তারা কি বোকা? একমাত্র তুমিই চালাক? এখন বয়স কম বুঝতে পারছো না। দুদিন বাদে যখন অভাব ঢুকবে তখন সমস্ত আদর্শবাদ বেরিয়ে যাবে। এখন তুমি চিন্তা কর।

কিছুক্ষণ আবার নীরবতা। শেষে আস্তে আস্তে বললাম, স্যার সেইরকম দিন এলে আমি আপনার কাছেই আসব। এখন আপাতত আদর্শকে বুকে নিয়ে বাঁচতে দিন।

পরাধীন ভারতবর্ষে জাতীয়তাবোধ ও চরমপন্থী রাজনীতির উত্থান এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

উনবিংশ শতক বাঙ্গালিজীবনে এক খুবই গুরুত্বপূর্ণ সময়। আমরা বাঙ্গালি মহাপুরুষ বলতে মূলত যাঁদের বুঝি তাঁদের প্রায় সকলেরই জন্ম এই শতকে। কিন্তু এই শতকেই কিছু ইংরেজি শিক্ষিত বাঙ্গালি পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে ব্রতী হয়েছিলেন। এর বিরুদ্ধে যারা পাশ্চাত্যের দর্শন-ইতিহাস থেকে শেখার পাশাপাশি ভারতীয় সংস্কৃতি-ঐতিহ্য-ধর্ম থেকেই ভারতীয়দের আত্মশক্তি অর্জন করে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করা উচিত বলে মনে করতেন তাঁদের পুরোধা ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ অমলেশ ত্রিপাঠী তাঁর The Extremist Challenge গ্রন্থে (যার বাংলা অনুবাদ হলো ভারতের মুক্তিসংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব) ভারতীয় রাজনীতিতে চরমপন্থী মতবাদের ভাবগত পটভূমি তৈরির পিছনে তিনজন ব্যক্তিত্বের ভূমিকার কথা বলেছেন—বঙ্কিমচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ ও দয়ানন্দ সরস্বতী। Charles Himesath তাঁর The Indian Nationalism and Hindu Social Reform গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যকৃতির মধ্যেই

চরমপন্থী রাজনৈতিক আদর্শের উৎস আবিষ্কার করেছেন। বহু ইউরোপীয় ও ভারতীয় পণ্ডিতও একই মনোভাব পোষণ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বাস করতেন যে, বিদেশ থেকে আমদানি করা কোনো তত্ত্ব নয়, এ দেশের আবহাওয়া, মানুষের শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্যই তার ভিত্তি হতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন লেখালেখি কীভাবে জাতীয়তাবাদ ও চরমপন্থার আদর্শগত উৎস হিসাবে কাজ করেছিল—এবার সেগুলোই একটু দেখা যাক।

কৃষ্ণচরিত্র ঃ বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র প্রকাশিত হবার পর অবিশ্বাস্য দ্রুততায় শ্রীকৃষ্ণই হয়ে ওঠেন চরমপন্থী মাত্রেরই আদর্শ পুরুষ। বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণ হলেন গীতার শ্রীকৃষ্ণ। যিনি বলেন—

''যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে। ।।''

এই শ্রীকৃষ্ণ অতি দূরে সরে থাকা, নির্লিপ্ত ঈশ্বর নন। তিনি ধর্ম সংস্থাপনের জন্য দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের কাজে সদা তৎপর। শ্রীকৃষ্ণের গুণাবলীর মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন তাঁর অতুলনীয় নেতৃত্ব-প্রতিভার ওপর, তাঁর সামরিক জ্ঞান ও সাম্রাজ্য সংগঠনী কুশলতার ওপর। শ্রীকৃষ্ণ স্বপ্ন দেখেছিলেন এক ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষের, আর এই স্বপ্নকে পূরণ করার জন্যই কুরুক্ষেত্রে অগণিত ক্ষুদ্র সামন্ত রাজাকে বিনাশ করে এক সুবিশাল, সংহত ধর্মরাজ্য সৃষ্টি করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, বঙ্কিমচন্দ্রের এই ধর্মরাজ্যের সঙ্গে প্রতীচ্যের পররাজ্যলিপ্সু উগ্র জাতীয়তাবোদের কোনো সাদৃশ্য ছিল না।

বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র প্রকাশিত হবার পর তিলক রচনা করলেন গীতার মারাঠি ভাষ্য, অরবিন্দ লিখলেন গীতার দীর্ঘ ভূমিকা, লাজপৎ রায় উর্দুভাষায় শ্রীকৃষ্ণের জীবনী প্রণয়ন করলেন, ভক্তিযোগের ব্যাখ্যা লিখলেন অশ্বিনী কুমার দত্ত, ব্রাহ্ম বিপিনচন্দ্র পাল শ্রীকৃষ্ণকে 'ভারত-আত্মা' হিসাবে অভিহিত করেন, এমনকী ক্যাথলিক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় লিখে ফেললেন—শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব। এতটাই ছিল বঙ্কিমের কৃষ্ণ চরিত্রের প্রভাব।

ধর্মতত্ত্ব (অনুশীলন) ঃ বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্ব (অনুশীলন গ্রন্থের আদর্শে এবং এর নাম অনুসারে বঙ্গপ্রদেশের সবথেকে খ্যাতনামা বিপ্লবী সমিতি 'অনুশীলন সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০২-এ। অনুশীলন সমিতির বিশিষ্ট বিপ্লবী জীবনতারা হালদার তাঁর অনুশীলন সমিতির ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন, ''ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন তত্ত্বে শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সমন্বিত আদর্শ মানব গঠনের যে নির্দেশ আছে—তাহাই হইল অনুশীলন সমিতির ভিত্তি।''

আনন্দমঠ ও বন্দে মাতরম্ ঃ আনন্দমঠ ও বন্দে মাতরম্ হলো ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিকাশে বঙ্কিমচন্দ্রের সবচেয়ে বড়ো অবদান। আনন্দমঠ উপন্যাসে ভবানন্দ সর্বপ্রথম মহেন্দ্রকে 'বন্দে মাতরম্' গেয়ে শোনান। সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পটভূমিকায় আনন্দমঠ লেখা হয়েছিল। দেশকে দেশমাতৃকা রূপে দেখানো এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের সবথেকে বড়ো কৃতিত্ব।

এই উপন্যাসে আমরা দেখি ব্রহ্মচারী সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে বিভিন্ন সময়ে দেশমাতৃকার নানা রূপ দেখাচ্ছেন। প্রথমে ব্রহ্মচারী মহেন্দ্রকে দেখাচ্ছেন, এক অপরূপ সর্বাঙ্গসম্পন্না, সর্বাঙ্গাভরণভূষিতা জগদ্ধাত্রী মূর্তি। মহেন্দ্র তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে ব্রহ্মচারী সর্বানন্দ বললেন, 'মা যা ছিলেন'। তারপর ব্রহ্মচারী কক্ষান্তরে মহেন্দ্রকে নিয়ে গিয়ে দেখালেন মা কালীর মূর্তি। বললেন, ''দেখ, মা যা হইয়াছেন। ..... কালী-অন্ধকারসমাচ্ছন্না, কালিমাময়ী। হৃতসর্বস্বা, এই জন্য নগ্নিকা। আজি দেশের সর্বত্রই শ্মশান—তাই মা কঙ্কালমালিনী।'' তারপর ব্রহ্মচারী সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে দেখালেন মর্মরপ্রস্তর নির্মিত একটি মন্দিরের মধ্যে সোনার তৈরি দশভুজা দুর্গাপ্রতিমা। ব্রহ্মচারী মহেন্দ্রকে বললেন, ''এই মা যা হইবেন। দশভুজ দশ দিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দিত, পদাশ্রিত বীরকেশরী শত্রু নিপীড়নে নিযুক্ত, দিগ্‌ভুজা, নানা প্রহরণধারিণী, শত্রুবিমর্দিনী– বীরেন্দ্র পৃষ্ঠবিহারিণী, দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিনী, বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানদায়িনী, সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়, কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ।'' মহেন্দ্র ব্রহ্মচারীকে জিজ্ঞাসা করল যে, মায়ের এই মূর্তি কবে দেখতে পাব? উত্তরে ব্রহ্মচারী সত্যানন্দ বললেন—''যবে মার সকল সন্তান মাকে মা বলিয়া ডাকিবে, সেইদিন উনি প্রসন্ন হইবেন।''

এখানে বিভিন্ন দেবীমূর্তির কথা বলে বঙ্কিমচন্দ্র বিভিন্ন সময়ে ভারতবর্ষের অবস্থা বোঝাতে চেয়েছেন। প্রথমে স্বর্ণালংকারভূষিতা জগদ্ধাত্রী হচ্ছেন প্রাচীন সমৃদ্ধিশালী ভারতবর্ষের প্রতীক। তারপর নগ্নিকা, হৃতসর্বস্বা, শ্মশানচারিণী মা কালী ইসলাম ও ব্রিটিশ আমলে অত্যাচারিতা, লুণ্ঠিতা, পরাধীনা দেশমাতৃকার প্রতীক। এরপর লক্ষ্মী-সরস্বতী-গণেশ-কার্তিক সহ স্বর্ণনির্মিত দশভুজা দুর্গামূর্তির মাধ্যমে ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতবর্ষের এক প্রতিচ্ছবি অঙ্কনের চেষ্টা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র।

ঋষি অরবিন্দের ভাষায় ঃ বন্দে মাতরম্ ধ্বনি এক নতুন ধর্মের জন্ম দিল যা হলো দেশপ্রেমের ধর্ম। বঙ্কিমচন্দ্র ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন—একদিন দেখিবে এই গানে বঙ্গদেশ মাতিয়া উঠিবে। বাস্তবে হয়েছিলও তাই। ১৯০৫ থেকেই বঙ্গদেশ সমেত সারা ভারতবর্ষে বন্দে মাতরম্ দেশপ্রেমের মন্ত্র। স্বাদেশিকতার প্রতীক হয়ে দাঁড়াল। অনুশীলন সমিতির আদর্শের অন্যতম উৎসও হয়ে দাঁড়ায় আনন্দমঠ ও বন্দেমাতরম্।

বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস চেতনা ঃ বঙ্কিমচন্দ্র 'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রবন্ধে আক্ষেপ করে বলেছিলেন, ''সাহেবরা যদি পাখি মারিতে যান, তাহারও ইতিহাস লিখিত হয়, কিন্তু বাঙ্গালার ইতিহাস নাই।'' বঙ্কিমচন্দ্র বুঝেছিলেন সঠিক ইতিহাস-জ্ঞান একটি জাতির উত্থানের

জন্য আবশ্যিক। আর মিথ্যা, বিকৃত ইতিহাস যে একটি জাতিকে ভিতর থেকে ফাঁপা করে দিতে পারে তাও তিনি বুঝেছিলেন। বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'ঐতিহাসিক গবেষণায় বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে ইউরোপে যখন বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসচর্চার শৈশাবস্থা এবং বঙ্গে যখন ইতিহাসচর্চা প্রায় শুরুই হয়নি বলা যায় সেই সময় বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস-চেতনা ও ইতিহাস-লেখনীর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র মিনহাজ উস সিরাজের *তবাকত-ই-নারিরী*-তে প্রাপ্ত বখতিয়ার খলজীর সপ্তদশ অশ্বারোহী নিয়ে বঙ্গবিজয়ের কাহিনিতে কোনোদিনই বিশ্বাস করেননি। তিনি বলেছিলেন—''সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখতিয়ার খিলজি বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল, একথা যে বাঙ্গালি বিশ্বাস করে, সে কুলাঙ্গার।'' তিনি এই ঘটনাকে অসম্ভব বলে মনে করেন এবং বখতিয়ার বঙ্গের খুব কম অংশকেই দখল করতে পেরেছিলেন, তাও উল্লেখ করেন। বর্তমানে আমরা জানি যে বঙ্কিমচন্দ্রের দাবি ঐতিহাসিকভাবে সত্য। বখতিয়ার শুধু কয়েক বছরের জন্য বর্তমান মধ্যবঙ্গের কিছু অংশ দখলে রাখতে পেরেছিল। বাকি উভয় বঙ্গের অধিকাংশ অঞ্চলই লক্ষ্মণ সেনের পুত্র বিশ্বরূপ সেন, কেশব সেন-সহ তাঁর উত্তরাধিকারীরা বহু বছর যাবৎ শাসন করেন। *মৃণালিনী* উপন্যাসেও বঙ্কিমচন্দ্র বখতিয়ার সংক্রান্ত কিংবদন্তিটির বিরোধিতা করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র কি মুসলমান-বিরোধী ছিলেন? ঃ কিছু গবেষক বঙ্কিমচন্দ্রকে মুসলমান-বিরোধী, সাম্প্রদায়িক হিসাবে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই 'বঙ্গদর্শন'-এ ১২৮০ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় লিখেছেন যে--''বাঙ্গালা হিন্দু-মুসলমানদের দেশ—একা হিন্দুর দেশ নহে।'' ১৯৩৮-এ বঙ্কিম জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় রেজাউল করিমের প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি সংকলন আকারে ১৯৪৪ সালে *বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ* নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। মুসলিম লিগের প্ররোচনায় কলকাতার রাস্তায় শত শত কপি *আনন্দমঠ* পোড়ানোর প্রতিবাদ করে রেজাউল করিম লেখেন, ''আনন্দমঠকে অগ্নিদগ্ধ করিয়া ইহারা যে মনোবৃত্তির পরিচয় দিলেন তাহা অতীব জঘন্য। স্বাধীন চিন্তার পথ রুদ্ধ করিবার জন্য এই যে প্রচেষ্টা, ইহা ইসলামকে উদ্ধার করিবে না। ইহা লইয়া যাইবে মুসলমানকে অধঃপতনের দিকে.... ভূলুণ্ঠিত হইল মুসলমানের স্বাধীন চিন্তার শক্তি....।'' তিনি আরও লিখেছেন— ''আজ আনন্দমঠের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, তাহা মুসলমানদের অভাব-অভিযোগ দূর করিবার উদ্দেশ্যে নহে। তাহার মূল কারণ—মুসলমান যাহাতে মুক্তি আন্দোলনে যোগ দিতে না পারে তাহার জন্য কতকগুলি ছল বাহির করিবার দুরভিসন্ধি।'' বন্দেমাতরম্ প্রসঙ্গে তিনি লেখেন—''অন্যান্য দেশের মুসলমানরা এরূপ গান ব্যবহার করিবার মতো পরিস্থিতি পাইলে ধন্য হইয়া যাইতেন। তাই তাঁর মতে বঙ্কিমের নিকট যদি বাঙ্গালি ঋণী হয়, বাংলাভাষা ঋণী হয়, তবে বাঙ্গালি মুসলমানও সমভাবে তাঁহার নিকট ঋণী—সর্বাংশে ঋণী।''

রেজাউল করিম দেখাচ্ছেন যে, বঙ্গজননীর সপ্তকোটি সন্তানকেই বঙ্কিমচন্দ্র স্বাধীনতার সংগ্রামে আহ্বান করছেন। তিনি বলেছেন, বন্দেমাতরম্ কোনো হিন্দু দেব-দেবীর পূজার গান নয়। এখানে দেশকে বন্দনা করা হয়েছে। তাকে কোথাও এবাদত বা সেজদা করতে বলা হয়নি। এই *বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ* গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ যদুনাথ সরকার। সেখানে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র ও বন্দেমাতরম্-কে ইসলাম-বিরোধী সাজানোর মুসলিম লিগের চক্রান্তের বিরোধিতা করেছেন।

ইতিহাসবিদ অমলেশ ত্রিপাঠী লিখেছেন, ''বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী কখনোই সৎ মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেনি। তাঁর রচনায় নিন্দিত হয়েছিলেন কেবলমাত্র অত্যাচারী বা অপদার্থ মুসলমান শাসকবর্গ। তাঁর বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনা চলত যদি তিনি আকবর বা হুসেন শাহের মতো কোনো সুশাসকের কুৎসা করতেন।'' পশুপতি, ভবানন্দ, গঙ্গারাম, সীতারাম প্রভৃতি হিন্দু চরিত্রের খারাপ দিকও তিনি তুলে ধরেছেন।

বঙ্গদেশের কৃষক ঃ বঙ্কিমচন্দ্র নিজ দেশীয় ঐতিহ্য, ধর্ম, জাতীয়তাবাদ প্রভৃতির ওপর জোর দিলেও কিছু বামপন্থী বা অতি-বামপন্থী যেভাবে তাঁকে ব্রাহ্মণ্যবাদী, মনুবাদী বা এলটিস্ট হিসাবে দাগানোর অপচেষ্টা করেন, তা কখনই ঠিক নয়। কারণ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর ও বর্ণের কথা আমরা তাঁর লেখায় পাই।

এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ তাঁর লেখা প্রবন্ধ 'বঙ্গদেশের কৃষক'। এই প্রবন্ধে তিনি বঙ্গের কৃষকদের দুরবস্থার কথা লিখেছেন। তৎকালীন সমাজের অধিকাংশ বিশিষ্ট ব্যক্তিই যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রশংসায় পঞ্চমুখ—তখন তিনি এই ব্যবস্থার ফলে কৃষকদের দুর্দশা নিয়ে কলম ধরেছিলেন।

মনে রাখতে হবে যে, বঙ্গদেশের কৃষকদের অধিকাংশই ছিল মুসলমান এবং বাকিরা তথাকথিত নিম্নবর্ণের হিন্দু। কিন্তু এদের জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র কলম ধরেছিলেন।

চরমপন্থার উদ্ভবে বঙ্কিমচন্দ্র ঃ কংগ্রেসের নরমপন্থীদের নীতি ও কর্মপন্থার তীক্ষ্ণ সমালোচনা করে বঙ্কিমচন্দ্রই চরমপন্থার উত্থানের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন। কমলাকান্তের দপ্তরে 'পলিটিকস' রচনায় তিনি কমলাকান্তের মুখ দিয়ে নরমপন্থীদের সমালোচনা করে বলিয়েছিলেন—"জয় রাধে কৃষ্ণ। ভিক্ষা দাও গো! ইহাই আমাদের পলিটিকস্।" তিনি এই প্রবন্ধে কলুর পুত্র সংক্রান্ত একটি গল্পে নরমপন্থীদের রাজনীতিকে 'কুক্কুর জাতীয় রাজনীতির' সঙ্গে তুলনা করেন এবং এর পরিবর্তে 'বৃষ জাতীয় রাজনীতি' গ্রহণ করার কথা বলেন।

এহেন বঙ্কিমচন্দ্র—যিনি শুধু সাহিত্যসম্রাট এবং বাংলা সাহিত্যের ভগীরথই নন—তাঁর রচনার সামাজিক, রাজনৈতিক ও দার্শনিক গুরুত্বও ছিল অপরিসীম। বঙ্গপ্রদেশ তথা ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদের উত্থানের পিছনে তাঁর রচনাগুলি অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু তিনি কি তাঁর যথার্থ স্বীকৃতি পেয়েছেন? তাঁর এই অবদানগুলোকে নিয়ে কি যথেষ্ট চর্চা হয়েছে? ভারতবর্ষে জাতীয়তাবোধের উদ্গাতা ঋষি বঙ্কিমকে শুধুমাত্র নৈহাটির বঙ্কিম করে রাখার প্রয়াস ইচ্ছাকৃত না অনিচ্ছাকৃত? পাঠকদের ওপরই তা বিচারের ভার থাকল। □

With Best Compliments from -

hotel Ajanta

8647, Arakashan Road, Ram Nagar, New Delhi- 110055
91-11-42003316, 42003317, Mob. : 9910694505

ROOM RESERVATION

9818544466, 9810668881

info@hotelajanta.com, Website : www.hotelajanta.com

সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাকের
অত্যাধুনিক গয়নার
ডিজাইনের ক্যাটালগ
সুপার
যে কোন স্বর্ণকারকে দেখাতে বলুন
ক্যাটালগের জন্য যোগাযোগ করুন
9830950831

ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana (NR) ®
SAREES • SUITS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidary Sarees
Contact No. : 033-22188744 / 1386

নাগরিক

দেবদাস কুণ্ডু

'যতো নষ্টের গোড়া তুমি।' আমার গলায় রাগ।

বেলারানি অবাক। 'কী কস তুই? আমি আবার কী করলাম তোর?'

'কী করলে তুমি? আবার জিজ্ঞেস করছো?' আমার চোখ দুটো বড়ো হয়ে উঠলো। গলায় রাগ ঝরে পড়ল। বড়ো ক্ষোভ নিয়ে বললাম, 'আটটা সন্তানের তো জন্ম দিয়েছে। তাদের বার্থ সার্টিফিকেট যত্ন করে রাখোনি কেন?

'কাগজ তোর ঠাকুরমা রাখতো। আমি লেখাপড়া জানি না। আমি কাগজের কী বুঝি? তোর বাবা উদ্বাস্তু হয়ে এদেশে এসে সারা জীবন লড়াই করে গেল। কাগজপত্র নিয়ে কখন মাথা ঘামাবে বল?'

এই কথায় আমার রাগ এতটুকু কমলো না। বরং বেড়ে গেল। বললাম, 'ঠাকুমা কোথায়

রাখলো তা জেনে রাখবে না?

'ক্যান তুই আমারে দোষ দিচ্ছিস। ঘর ঝাঁট দিচ্ছিলেন, এবার সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। 'তোর বাবার এগুলো ঠিক করে রাখা উচিত ছিল। কিন্তু মানুষটা ভিটেমাটি হারিয়ে এদেশে এসে দুটো ভাতের জন্য রাতদিন খাটতো।

'তুমি এখন ঠাকুমা, বাবার দোষ দিয়ে পার পেতে চাইছো। আমার এখন খাওয়া নেই, ঘুম নেই, টেনশন হচ্ছে। কিছু হয়ে গেলে কে দায় নেবে। আমারও তো বয়স ষাটের কাছাকাছি হয়ে এলো।'

'ক্যান তোর আবার টেনশনের কী হলো। একটা মাত্র ম্যাইয়া। তার বিয়ে হয়ে গেছে। নাতি হয়েছে। বউমা এখনও চাকরি করে। তুই এলআইসি করিস। তোর টেনশন ক্যান? টেনশন তো হবে আমার। ফ্ল্যাটে একা থাকি। কখন কী হয়ে যাবে কে বলতে পারে?' বেলারানি চেয়ারে বসলেন। হাঁফাচ্ছেন। হার্টের অসুখ ধরা পড়েছে।

'দেখ, তুমি আশি পার করেছো। তোমার অসুখ বিসুখ থাকবে। তা নিয়ে টেনশন করে তুমি কিছু করতে পারবে না। আমার টেনশন কীসের জানো?'

টিভি চলছিল। মা এই ফ্ল্যাটে একা থাকেন। তার স্বামী বলে গেছেন, এটা সরকারি ফ্ল্যাট। ফ্ল্যাট ছেড়ে কোনো ছেলের কাছে গিয়ে থাকবে না। তিনিও স্বামীর কথা মেনে চলেছেন। তাকে অনেকবার বলা হয়েছে তোমার পাঁচ ছেলে থাকতে তুমি এখানে একা পড়ে থাকবে কেন? লোকে কী বলে? তারা ভাবে আমরা মানুষ নই। তা তো নয়। তুমি পালা করে ছেলেদের কাছে থাকলে। ভালো না লাগলো আবার তোমার ফ্ল্যাটে চলে এলে। তিনি তা করবেন না। এখান থেকে নড়বেন না। স্বামী এখানে মারা গেছেন তিনিও এখানে মরবেন। তাই একা থাকেন। যখনই এসেছি দেখেছি মা রান্নাঘরে কাজ করছেন বড়ো ঘরে টিভি ফুল ভলুয়েমে চলছে। নিঃসঙ্গতা কাটানোর জন্যই বুঝি এটা করেন। যেন ঘরে আরও কতো মানুষ আছে। তিনি একা নন।

টিভি বন্ধ করলাম। এতোক্ষণ মার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম। এবার চৌকিতে বসলাম। বললাম 'এনআরসি হবে দেশে শুনেছো?'

'এন আর ছি? সেটা আবার কী?'

'এনআরছি নয়, এনআরসি।'

'সে যাই হোক তাতে তর কী?'

'আমার কী? আমি আর এ দেশে থাকতে পারবো না।'

বেলারানির হলদে চোখে বিস্ময় আর আতঙ্ক, কে কইছে তোরে এইসব কথা?

'কেন তুমি খবর দেখ না? লোকের মুখে কিছু শোনোনি?'

'খবর শুনতো তর বাবা। আমি দেখি রাসমণি, চৈতন্যদেব, লোকনাথ সিরিয়াল।'

'তুমি তো সিরিয়াল দেখো। তোমার আর কী? জীবন তোমার শেষ হয়ে এসেছে। আমার কী অবস্থা ভাবো একবার। পঞ্চান্ন বছর ধরে জানলাম এটা আমার দেশ। এখন সরকার বলছে তুমি অনুপ্রবেশকারী, তুমি বাংলাদেশি।'

'কী কস তুই? তুই বাংলাদেশি?' বেলারানি রাগের সঙ্গে বলেন। তারপর চুপ করে বসে থাকেন কিছু সময়।

কী হলো এখন কথা বলছো না কেন?

কী কমু তোরে? তোর তো মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। আমি তোরে জন্ম দিলাম মেডিকেল কলেজে আর তুই হয়ে গেলি বাংলাদেশি? এ কি জাদুকরের খেলা পাইছোস নাকি কৃষ্ণ?

হ্যাঁ। জাদুরই খেলা। এটা খেলার বল। ভারত মারবো লাথি আমি যামু বাংলাদেশে। বাংলাদেশ মারবো লাথি আমি নো ম্যানস ল্যান্ডের মানুষ হয়ে যাবো।

সেটা আবার কী? এমন কথা তো কখনো শুনি নাই।

নো ম্যানস ল্যান্ড মানে তুমি কোনো দেশের নাগরিক নও।

তা আবার হয় নাকি? কী সব কস তুই। সত্যি তোর মাথাটা খারাপ হইছে। শোন সেদিন ছিল ঝড়জলের রাত। আমার ব্যথা উঠছে। তোর ঠাকুমা আমাকে রিস্কা করে নিয়া গেল হাসপাতাল। সারারাত ব্যথায় ছটপট করছি। ভোরবেলা তুই হলি। ঝড়জলের রাতে হইছিস বলে তর নাম রাখলো তোর ঠাকুমা কৃষ্ণ।

— নাম তো রেখেছো খুব ভালো জন্মের কাগজ রাখো নাই।

— বার বার একথা কস ক্যান? তা এখন ঐ কাগজ দিয়া কী হইবো তোর? বেলারানি হাঁফাচ্ছেন। রোগ তাকে ধরেছে। সুগার, প্রেশার, অর্শ, হার্ট, মাথা, ঘাড় যন্ত্রণা। এই সিআইটি ফ্লাটে তিনি একা থাকেন। কাছেই বস্তিতে তার একটা বাড়ি আছে। সে বাড়িতে দুই ছেলে থাকে। বাকি ঘরগুলোয় ভাড়াটে আছে। তিন ছেলে ফ্ল্যাট কিনে আলাদা আলাদা জায়গায় থাকে। যেমন আমি থাকি দাশপাড়া। তিন মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। ছেলেরা খাবার দেয়। চিকিৎসা করে। টাকা দেয়। খোঁজখবর রাখে। আমি একটা ছোটো মোবাইল কিনে দিয়েছি। ফোন রিসিভ করা দেখিয়ে দিয়েছি। একটা ডাইরিতে পাঁচ ছেলের নাম লেখা আছে। পাশের ঘরের রতনকে দিয়ে ফোন করেন। একটা ঘণ্টা কিনে দিয়েছে দাদা। বিপদ কিছু হলে জোরে জোরে বাজাবে। তখন আশপাশের লোকজন ছুটে আসবে। খবর দেবে। আমরা চলে আসবো। তবু ওনার একটা ভয় কখন রাতবিরেতে মরে পড়ে থাকবো। একটু জল পর্যন্ত পাবেন না।

— ১৯৭১ সালের পর যারা এসেছে তাদের তাড়িয়ে দিচ্ছে।

— তাড়াবে না তো কী করবে? বেলারানি জোরের সঙ্গে বলেন, গলা জড়িয়ে ধরবে? বলবে এসো বসো। এটা

কি খোলা বাজার নাকি? যে কেউ যখন তখন এলো আর বসবাস করতে শুরু করলো। তুই ক্যান ভয় পাস। তোর বাবা পঞ্চাশ সনে রায়টের সময় এসেছিল। আমি যখন ওই দ্যাশ ছেড়ে এদেশে আসি তখন আমি ফ্রক পড়ি। আমার বয়স ছিল তেরো বছর। বাবা মা মারা গেছেন। পিসি নিয়ে এসেছিল। তেরো বছর বয়সে বিয়ে হয়ে গেল।

— তা দেশ ছেড়ে এলে কেন? কামড়ে থাকতে পারলে না?

— শোন তোর এক পিসি ছিল। তার ইজ্জদ গেলে সে আত্মহত্যা করেছিল। মেয়ে বউদের নিরাপত্তা নেই। কোন ভরসায় সেখানে থাকি?

— ছাড়ো তোমার ইতিহাসে আমার কী হইবো?

— আমি বলছি তোর কিছু হবে না। যারা পরে এসেছে, এখনও আসছে রোজ, তাদের বের করে দিতে পারে। সেটা তো অন্যায় নয়।

— তুমি সব জেনে বসে আছো না? দেশ জুড়ে আন্দোলন হচ্ছে।

-– হোক আন্দোলন। তোর কোনো ভয় নেই। তোর কিছু হবে না। আমি বলছি। মিলিয়ে নিস আমার কথা। ওই দেশে আমাগো ওপর অনেক অত্যাচার হইছে। সে যে কী জ্বালা কী কমু তোরে।

বেলারানি একটা কৌটো বের করলেন। দুটো ট্যাবলেট খেলেন, আমাগো তাড়াই বো না। তুই চিন্তা করিস না।

— তুমি বললেই তো আমার চিন্তা দূর হয়ে যাবে না।

— তা আমারও জন্ম কাগজ নাই। আমারে কি তাড়াই দেবে? ঐ দেশে তো সব ফ্যাইলা আইসি।

— আরে বাবা তুমি আইসো পঞ্চাশ সালে। আমাগো কাগজ না থাকলে বের করে দিতে পারে।

— অত সোজা নাই। তোর মতো কতো মানুষের কাগজ নাই। কতজনরে তাড়াইবো হ্যাঁ।

— বাবার লকারে কোনো কাগজপত্র নাই?

— কী আছে না আছে আমি কী জানি। আরে বাবা তোর তো ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, স্কুলের কাগজ সবই আছে।

— এসব দিয়ে প্রমাণ হবে না তুমি এ দেশের নাগরিক?

— তাহলে দেখ একবার লকার খুইল্যা কোনো কাগজ পাস কিনা।

অনেক কসরত করেও লকার খোলে

না। শেষ পর্যন্ত শিলনোড়া দিয়ে লকার খুলল।

ভিতরে কত কাগজ। বাড়ির দলিল। ফ্ল্যাটের কাগজ। বাড়ি ভাড়ার রসিদ। কিন্তু আসল কাগজ নাই।

— তুই যে এতো ভয় পাইতাছোস কেন? তোরে কি জেলে দেবে নাকি? কতো লেতা কতো লোকের টাকা খাইলো তাদের কিছু হইছে নাকি? এসব লোকরে ভয় দেখানো।

— আচ্ছা বাবা যখন এদেশে আসে তখন সরকার থেকে কোনো কাগজ দেয় নাই?

— সে আমি কইতে পারুম না। তবে জাহাজে কাজ করবো বইল্যা খিদিরপুর গেছিল। তখন অনেক ছোটাছুটি করছে কী সব কাগজের জন্য। আমি ঠিক জানি না।

— তুমি কিছু জানো না তো মা হইছো ক্যান?

— এই দেখ তোর বাবা কি আমারে সব কইতো?

— এই দুশ্চিন্তা নিয়ে কতদিন কাটবে? আসামের কথা কাগজে পড়ি। বিশ্বাস হয় না। তবে এটাও তো ঠিক তুমি এদেশে জন্ম নিয়েছো, তোমার কেন জন্ম কাগজ থাকবে না? হারিয়ে গেলে নকল বের করবে না কেন? শুধু বছর বছর বাচ্চা বিয়াইলে হইবো? আর কোন দায় নাই?

কাকে সে এসব কথা বলবে? হতাশ হয়ে বের হয়ে আসছে বেলারানি, বললেন,

— ওই লকারের ভিতর কিন্তু আরও একটা খোপ আছে। সেটা দেখছোস?

— না তো। আমার তো চোখে পড়ল না। দাও দেখি চাবি আবার।

লকারের ডান দিকে অ্যান্টি লকার। চাবি ঘোরাতে চাবি শুদ্ধ আটকে গেল। এতো হমা বিপদ। আবার শিলনোড়া। হ্যাঁ এবার খুলেছে। একটা ভয় কাজ করছে বুকে। পাবো তো? যদি না পাই সেই দুঃচিন্তা। এভাবে বাঁচা যায় না। আচ্ছা সে কি এই ব্যাপারটা নিয়ে বেশি ভাবছে?

এখানে হিজিবিজি কাগজের জঙ্গল। সে সব সরিয়ে চোখে পড়ে একটা মলিন প্লাসটিকের প্যাকেট। সেটা নিয়ে বারান্দায় আসি। বেলারানি জিজ্ঞেস করেন,

— কি রে পাইলি কামের কাগজ?

— দাঁড়াও। আগে দেখতে দাও।

— ভালো কইরা দেখ।

জীর্ণ হলুদ ছেঁড়া ফাটা সেলোটেপ লাগানো। চোখের সামনে তুলতে চোখে পড়ে একটা লম্বা কাগজে মোটা হরফে ছাপা FROM OF CERTIFICATE। তার নীচে অনেক লেখা। শেষে লেখা হরিদাস পাল IS AN INDIAN CITIZEN । আর একটি কাগজ হাতে তুলে নিলাম। সেটারও জীর্ণদশা। তাতে মোটা হরফে লেখা— CERTIFICATE OF REFUGEE। নীচে ফাস্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেটের সই, তারিখ, সিলমহর।

এতোদিন বাবার ওপর রাগ হতো। কিন্তু না, মানুষটা বুঝেছিল শরণার্থী মানুষের যন্ত্রণা। তাই কাগজ দুটো এতো যত্ন করে রেখেছিলেন। বেলারানি বললেন,

— পাইছোস?

— পাইছি মা।

হঠাৎ মাকে জড়িয়ে ধরি, 'বাবা যদি এদেশের নাগরিক হয় আমিও এদেশের নাগরিক।

মার শরীর থেকে মাটির গন্ধ পাচ্ছিলাম আমি। □

উত্তম কুমার অভিনীত চিড়িয়াখানা-র একটি দৃশ্য

ব্যোমকেশের অন্তরালে

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

অতি সম্প্রতি কাগজে এক লন্ডনবাসী অপরাধমূলক গল্প উপন্যাসের লেখিকা অ্যানি পেরির মৃত্যুর খবর বেশ নজর কাড়াভাবে পরিবেশিত হয়েছে। লেখাটির ভেতর প্রবেশ করে জানলাম লেখিকা কৈশোরে অপর এক বান্ধবীর সাহচর্যে এক ব্যক্তিকে খুন করে ৫ বছর কারাবাসের অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করেছিলেন।

এই রহস্যগল্পের প্রতি টান খুনের মতো অপরাধে অপরাধী লেখিকাকেও যে মাফ করে দিতে পারে ৮৪ বছরের লেখিকার খ্যাতির শীর্ষে ওঠা তা নিশ্চিত প্রমাণ করে। আমাদের বাঙ্গলায় বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের উত্তরাধিকার বহনকারী লেখকদের মধ্যে রহস্য উপন্যাস, গল্প লেখার চেষ্টা শুরু হয় পাঁচকড়ি দে'র কলমের মাধ্যমে। অনেকেই ছেলেবেলায় পাঁচকড়িবাবুর লেখা আগ্রহ সহকারে পড়েছেন। তিনি মূলত বিলিতি লেখক এবং ফরাসি ডিটেকটিভদের লেখাতেই অনুপ্রাণিত হয়ে সেই ছাঁচ বাংলায় এনেছিলেন, একথা প্রবীণরা সকলেই জানেন। এই পাঁচকড়িবাবু এখন super duper hit বা 'আঃ সুপার গেয়েছে' প্রভৃতি যে কোনো অতি প্রশংসাসূচক বাক্যের অনুষঙ্গ আমরা দেখতে পাই সেই কথাটি আমদানি করেছিলেন, সেটি হলো super sleuth যা 'নীলবসনা সুন্দরী'র মতো প্রাচীন বাঙ্গালি রহস্য রোমাঞ্চ উপন্যাসে পাঁচকড়িবাবু প্রকাশ করেন। এর অর্থ গল্পের মধ্যেই ডিটেকটিভকে টপকে গিয়ে আর এক ডিটেকটিভের আবির্ভাব এবং সাফল্য। কিন্তু পাঁচকড়িবাবুর এই চমক চমকের চরিত্র বজায় রেখেই দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। পাঁচকড়িবাবু রহস্য রোমাঞ্চের যে ইঙ্গিত দিয়ে গেলেন সেই নামেই বাঙ্গালি গেল তার সর্বকালের সেরা অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগত তদন্তকারী 'ব্যোমকেশ বক্সী'কে। হ্যারিসন রোড আর আমহার্স্ট স্ট্রিটের সংযোগস্থলের একটি মেসবাড়িতে সম্ভবত এই ছদ্মনামা গোয়েন্দা লেখক থাকতেন। ব্যোমকেশের স্রষ্টা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম উত্তর প্রদেশের জৌনপুর অঞ্চলে। তৎকালীন পরাধীন ভারতে যা ছিল ইউনাইটেড প্রভিন্স। এসব অঞ্চলে বহু পরিশীলিত ও শিক্ষিত বাঙ্গালির বাস ছিল তখন। শরদিন্দুর বাবা তারাভূষণ কর্মসূত্রে দীর্ঘদিন জৌনপুরেই নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁদের আদি নিবাস ছিল বরানগরের কুঠিঘাট অঞ্চল।

শৈশবে হিন্দিভাষীদের সঙ্গে একনাগাড়ে মেলামেশা করায় তাঁর গল্পের বহু চরিত্র ছিল হিন্দিভাষী। স্কুলের পড়া মুঙ্গেরে হওয়ায় হিন্দিতে ছিলেন দুরস্ত।

তবে, শরদিন্দুর জীবন প্রচলিত অর্থে একস্থানকেন্দ্রিক হয়নি। ১৮৯৯ সালে জন্মান শরদিন্দু। ১৯১৫ সালে বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করে কলকাতায় এসে বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্তি হন। প্রবাদ প্রতিম ইংরেজির অধ্যাপক নাট্যবিশারদ শিশির ভাদুড়ী এখানে তাঁর শিক্ষক ছিলেন। স্নাতক স্তর পার করার পরই তিনি পুনরায় জৌনপুরে ফিরে গিয়ে পাটনায় আইন পড়া শুরু করেন। পাশের পরই শুরু হয় আইন পেশায় যোগদান। এই পেশায় চর্চা তাঁকে উত্তরকালে অপরাধী চরিত্র, অপরাধের গতি প্রকৃতি ও খুনির মানসিকতা বিশ্লেষণে পর্যাপ্ত সাহায্য করেছিল। কিন্তু সাহিত্য ও ইতিহাসের গভীর আকর্ষণ মাত্র ত্রিশ বছর বয়সেই ওকালতি পরিত্যাগ করতে কোনো বাধা হয়নি। আমরা সকলেই শার্লক হোমসের কথা প্রায়শই উত্থাপন করে থাকি। ইনি ইংরেজ ডাক্তার স্যার আর্থার কোনান ডয়ালের সৃষ্টি। এই কোনান ডয়েল ডাক্তার হয়েও এক লাইনও Prescription লেখেননি। লিখে গেছেন অবিশ্রান্ত রহস্য কাহিনি যার নায়ক শার্লক হোমস। এক-আধবার হোমসের দাদার ভূমিকাও তিনি এনেছিলেন তবে তা ক্ষণস্থায়ী। এই কোনান ডয়েলের নামে ব্রিটেনের অন্যতম প্রধান রাস্তায় রয়েছে মিউজিয়াম। নানা ধরনের তদন্তে প্রয়োজনীয় বস্তু বা লিখিত গ্রন্থগুলিতে উল্লেখিত বহুবিধ সরঞ্জামের আকর্ষণীয় প্রতিলিপি। টিকিট কেটে এখানে ঢুকতে হয়। লেখালিখি ছাড়াও এভাবেই শার্লক হোমসের স্মৃতি এখন সুরক্ষিত। আমাদের শরদিন্দু পেশায় প্রতিষ্ঠিত উকিল হয়েও এক লহমায় পেশা ছেড়ে দেন। আজও তিনি প্রবল চর্চিত। বিগত ৫০ বছর ধরে তাঁর অজস্র রহস্যগল্প বা লেখা নিয়ে সারা ভারতের নানা ভাষায় চলচ্চিত্র নির্মাণ চলছে। রজত কাপুরকে নিয়ে দীর্ঘ টিভি সিরিয়াল হয়ে গেছে। কিন্তু দীর্ঘস্থায়ীভাবে তাঁর স্মৃতিরক্ষার কোনো নিদর্শন আছে বলে দেখিনি।

এখন রহস্য-রোমাঞ্চ উপন্যাস বা গল্প যাই বলা হোক না কেন উপনিবেশিক ভারতে এর পাঠক ও জনপ্রিয়তা সৃষ্টির মূলে বিদেশি প্রভাব নিশ্চিত আছে। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে আগাথা ক্রিস্টি, কোনন ডয়ালরা এবং আরও বহু ডিটেকটিভ লেখক-লেখিকা এক ডাকে চেনা নাম ও বহু মূলধারার লেখকের তুলনায় বহুগুণ বেশি জনপ্রিয়। আগাথা ক্রিস্টির রহস্য গল্পগুলি বিশ্বের কোন ভাষায় না অনুদিত হয়েছে। তাঁর সৃষ্ট মহিলা গোয়েন্দা মিস মারপল হয়তো

ডি ডি ন্যাশনালের একটি টিভি সিরিয়ালে ব্যোমকেশ বক্সীর চরিত্রে রাজিত কাপুর।

দেবিকা রাণি অভিনীত 'দুর্গা' ছায়াছবির একটি দৃশ্য।

লেখিকা আগাথা কৃষ্টির থেকেও বেশি জনপ্রিয়। হারকুল পওয়ারো নামে একজন গোঁফে চাড়া দেওয়া পুরুষ গোয়েন্দাও ছিলেন। শরদিন্দু কিন্তু কোনো দ্বিতীয় গোয়েন্দাকে আনেননি।

দৈনন্দিন জীবনের চলমান যাত্রায় বহু মানুষেরই একটু ভিন্ন ধারার অনেক সময়ই প্রয়োজন হয়। শুধু তাই নয়, আমাদের সৎ সাহিত্যের যে শান্তসমাহিতভাব বহুক্ষেত্রে গভীর অন্তর্দৃষ্টিমূলক বিষয় ও গম্ভীর রীতিতে লিখিত হয় তার গভীরতা থেকে বেরিয়ে এসে পাঠক সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়ের সঙ্গী হতে চায়। যা তুলনামূলকভাবে হালকা কিন্তু আকর্ষক।

দেশে রহস্য কাহিনির উদ্ভাস এই ভাবেই এক সময় হয়েছিল। বাঙ্গলার কিশোররা নীহাররঞ্জন গুপ্তের রক্তমুখী ড্রাগন, অশরীরী বিভীষিকা প্রভৃতি নিয়ে মশগুল হয়ে পড়ত। টিভিও ছিল না। এরই সমসাময়িক হয়ে উঠেছিলেন দীনেন্দ্র কুমার রায়। তিনিও তাৎক্ষণিক বললে ভুল হবে কয়েক দশক তরুণদের মধ্যে তুমুল জনপ্রিয় ছিলেন। কিন্তু তিনি বিদেশি পত্র বা পত্রিকা থেকে প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ এনেছিলেন। বাল্যবয়সে তাঁর রবার্ট ব্লেক সিরিজের লেখাগুলির মাধ্যমে সেই কৈশোরলগ্নে সুদূর লন্ডনের এবং পাশ্ববর্তী অঞ্চলের ভূগোল তীব্র উত্তেজনার মধ্য দিয়ে কিছু কিছু শেখা হয়ে যেত। সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশ, চরিত্রদের সম্পূর্ণ অশ্রুত নাম-ধাম, খাদ্যাভ্যাস জেনে যাওয়ার কিছুটা সুযোগও থাকত। সেই প্রথম টেমস নদীর বাঁধ, পিকাডেলি অঞ্চল আলাদা চমক নিয়ে আসত। তাঁর বিপুল জনপ্রিয় গোয়েন্দা কাহিনির পর সিরিয়াস পল্লীচিত্র, পল্লীবৈচিত্র্য গ্রন্থগুলিকে কেউ বিশেষ স্পর্শসুখ দেয়নি। এ প্রসঙ্গটি উত্থাপনের কারণ এই যে আমরা আজও শরদিন্দুর যে বিপুল আকর্ষণ নিয়ে মুগ্ধ তারা তাঁর সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়ের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি রহস্য গল্পগুলির মতে না হলেও অত্যন্ত সাগ্রহে পাঠ করে থাকি। এর জন্য অবশ্য বিষয়-চরিত্রও কিছুটা দায়ী।

শরদিন্দু কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট বয়সের মধ্যে তাঁর কাহিনিপ্রবাহ আটকে রাখেননি। বাস্তবে তাঁর বহু রহস্যগল্পই কিশোরপাঠ্য নয়। কিন্তু তাঁর সামগ্রিক ভাষা ও গল্পের পরিবেশ বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ অদৃষ্টপূর্ব। পরাধীন ভারতে ১৯৩২ সালে শরদিন্দু যখন 'সত্যান্বেষী' লেখাটি নিয়ে আবির্ভূত হলেন সেই মুহূর্তেই একটি আগাগোড়া নতুন জগতের দরজা খুলে গেল। ''আমাদের বাসার উপরতলায় সর্বসুদ্ধ পাঁচটি ঘর ছিল, প্রত্যেকটিতে একজন করিয়া ভদ্রলোক থাকিতেন। তাঁহারা সকলেই চাকরিজীবী এবং বয়স্ক। শনিবারে শনিবারে বাড়ি যাইতেন, আবার সোমবারে ফিরিয়া অফিস যাতায়াত আরম্ভ করিতেন। ....সম্প্রতি একজন কাজ হইতে অবসর লইয়া বাড়ি চলিয়া যাওয়াতে তাঁহারই শূন্য ঘরটা আমি দখল করিয়াছিলাম। সন্ধ্যার পর তাসের বা পাশার আড্ডা বসিত। সেই সময় মেসের অধিবাসীদের কণ্ঠস্বর ও উত্তেজনা কিছু উগ্রভাব ধারণ করিত। ..... ঠিক নয়টার সময় বামুন ঠাকুর আসিয়া জানাইত যে আহার প্রস্তুত, ... এই রূপ নিরুদ্ঘাত শান্তিতে বৈচিত্র্যহীন দিনগুলি কাটিতেছিল, আমিও আসিয়া নির্বিবাদে এই প্রশান্ত জীবনযাত্রা বরণ করিয়া লইয়াছিলাম।''

সত্যিই কি প্রশান্ত গার্হস্থ্যজীবনের সঙ্গে সাযুজ্যময় এক ধীরগতি বাঙ্গলার ডিটেকটিভের কলম একেবারে উদ্বোধন লগ্নেই ভবিষ্যতের ঈঙ্গিত দিল? এমন ভাষায় কোনো রহস্য গল্প ইতিপূর্বে বাংলায় লিখিত বিশেষ হয়নি। প্রেমেন্দ্র মিত্র ঘরনার বনমালী নস্কর লেনের মেসের আবহ অনেক এসেছে কিন্তু তা একমুখী এবং সে গল্পের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ আলাদা এবং তা অনেক পরে।

অশোক কুমার, লীলা চিটনিস অভিনীত 'কঙ্কন' সিনেমার পোস্টার

আরও একটি বিষয় রয়েছে শরদিন্দুবাবুর অন্ত্যন্ত বুদ্ধিগ্রাহ্য রহস্য গল্পগুলির মধ্যে তিনি সবসময় তৎকালীন কলকাতা বা গ্রামের পটভূমি হলে একটি যথার্থ সমাজচিত্র ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করতেন। জীবনের প্রথম লেখাটিতেই দেখুন 'বামুন ঠাকুর' খেতে ডাকল। পরিচয় চিত্রটি ১০০ শতাংশ সত্যি। তিনি নিজে চোখে দেখেছেন। তখনকার একটু সম্পন্ন বাড়িতেই বিশেষ করে মেসবাড়িতে ওড়িয়া বামুন রান্নার কাজ করত। এদের রন্ধনও ছিল অতি উত্তম। বামুন ঠাকুরের উল্লেখ তাঁর গল্পটিকে সামাজিক প্রামাণ্যতা দিল। এর পর খুনখারাপির বিষয় প্রকাশ করতে তিনি তো তলোয়ারের ডগার মতো ক্ষুরধার ভাষ্য দিয়েছেন।

যেহেতু তিনি রহস্যমোচক ব্যোমকেশের স্রষ্টা তিনি আজও রূপালি পর্দায় সদা আমাদের মগ্ন করে রাখেন। এই শতসহস্র উন্নত টেকনিক্যাল যন্ত্রপাতির দাপটের যুগেও তরুণ পরিচালকেরা ব্যোমকেশ কাহিনির অন্বেষণ করেন। তাঁরও কিন্তু সিনেমার সঙ্গে ছিল দৃঢ় সংযোগ।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির সেই দু'দশক আগে থেকেই ভারতে সিনেমার নির্মাণ ও প্রদর্শন বিপুল উদ্যমে শুরু হয়েছে। শরদিন্দু প্রধানত সাহিত্যিক হলেও এই মাধ্যমটির আকর্ষণ মোটেই এড়াতে পারেননি। এ ছাড়া সে সময়কার 'মায়ানগরী' বোম্বের টানে বাঙ্গলার একগুচ্ছ প্রতিভা ঋত্বিক ঘটক, সলিল চৌধুরী, হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির মতো শরদিন্দুর বোম্বাই যাত্রাও হয়ে ওঠে অনিবার্য। তৎকালীন প্রবাদপ্রতিম পরিচালক হিমাংশু রায়ের ডাকে ১৯২৮ সালে ওকালতি বিসর্জন দিয়ে চিত্রনাট্য ও চলচ্চিত্রীয় কাহিনি রচনার চুক্তিতে তিনি 'মায়ানগরীতে' যে অবতরণ করলেন সেখান থেকে পূর্বদিকের জন্মাঞ্চলে পাকাপাকিভাবে আর ফিরতে পারেননি।

কিন্তু প্রতিভা চট করে মার খায় না। তখনকার বম্বে টকিজ ছিল স্বনামধন্য প্রযোজনা সংস্থা আর সময়টা ভারতীয় চলচ্চিত্রের উষালগ্ন। ১৯৩৮ থেকে ৪০ এর মধ্যে বিখ্যাত বম্বে টকিজের ব্যানারে তিনি দুটি সফল হিন্দি ছবির চিত্রনাট্য ও সংলাপ দুই-ই লিখলেন। ভাবী, নবজীবন, কঙ্কন, দুর্গা, পুনর্মিলন ও আজাদ। এর মধ্যে কোনোটিই এলেবেলে ছিল না। প্রথম চারটির পরিচালক ছিলেন জার্মান Franz sten। আর শরদিন্দুর বোম্বাই পর্বের পুরোধা পুরুষ হিমাংশু রায় তো দাদাসহেব ফালকে পুরস্কারে ভূষিতা দেবীকা রানির স্বামী। শরদিন্দুর 'দুর্গা' ছবির নায়িকা ছিলেন তিনি। একজন বাঙ্গালি রহস্য-রোমাঞ্চ গল্প লেখকের মানসভূমিতে তখন সর্বভারতীয় হিন্দি সামাজিক পটভূমিতে চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় চিত্রনাট্য নির্মাণ এক বিস্ময় হিসেবেই গণ্য হয়েছিল। তিনি প্রথমে ইংরেজিতে লিখে দিতেন হিন্দিভাষীরা তা পরিবর্তন করে নিত। কঙ্গন ছবিটিতে দর্শকপ্রিয় অশোক কুমার তখন নিতান্তই শিক্ষানবীশ, তিনি নায়ক হয়েছিলেন। নায়িকা লীলা চিটনিস। ইনিও পরবর্তীকালে দাগ রেখে যান। এ থেকে সহজেই বোঝা যায় চলচ্চিত্রের বিস্তৃতির লগ্নে শরদিন্দুর ভূমিকা অস্বীকার করার নয়। তাঁর নিজের বাংলা গল্প 'বিষের ধোঁয়া' নিয়ে তিনি 'ভাবী' ছবির খসড়া তৈরি করে দেন। তৎকালীন তরুণ-তরুণীর প্রেম পরিবার ও সামগ্রিকভাবে সমাজের ওপর কী ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করত এই ছবিটি তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিল। তাই প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে ওঠার বছরগুলিতে ভারতীয় চলচ্চিত্রের ভিতকে মজবুত ও আকর্ষক করে তুলতে অত্যন্ত বিখ্যাত সব মানুষদের নিয়ে শরদিন্দুর অবদানও কম ছিল না।

শরদিন্দু ছিলেন শব্দার্থেই বহুমুখী প্রতিভা। যৌবনের মধ্যগগনেই মুম্বাই যাত্রা হলেও আদি বরানগর কুঠিঘাট অঞ্চলের

অশোক কুমার অভিনীত 'কঙ্কন' সিনেমার একটি দৃশ্য।

বংশধারার অদৃশ্য আবেগ তাঁর রক্তে প্রবাহিত। ব্যোমকেশের অধিকাংশ সমাদৃত গল্পের কেন্দ্রভূমি কলকাতা। একেবারে প্রথম দিককার 'পথের কাঁটা'র (১৯৩২) প্রারম্ভিক পঙ্‌ক্তিগুলিতে তাঁকে সামাজিক রহস্যগল্প লেখকের বিরল তকমা অর্পণ করা যায়। এবং তা যে কলকাতাকেন্দ্রিক সেটা দেখা যেতে পারে। ''বাহিরে কুয়াশাবর্জিত ফাল্গুনের আকাশে সকালবেলার আলো ঝলমল করিতেছিল।

.....গবাক্ষপথে শহরের ও আকাশের একাংশ বেশ দেখা যায়। নীচে নবোদ্‌বুদ্ধ নগরীর কর্ম কোলাহল আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, হ্যারিসন রোডের (মহাত্মা গান্ধী রোড) উপর গাড়ি- মোটর-ট্রামের ছোটাছুটি ও ব্যস্ততার অন্ত নাই। আকাশেও এই চাঞ্চল্য কিয়ৎপরিমাণে প্রতিফলিত হইয়াছে। চড়াইপাখিগুলি অনাবশ্যক কিচিমিচি করিতে করিতে আকাশে উড়িয়া বেড়াইতেছে, তাহাদের অনেক ঊর্ধ্বে এক ঝাঁক পায়রা কলিকাতা শহরটাকে নীচে ফেলিয়া যেন সূর্যলোক পরিক্রমণ করিবার আশায় ঊর্ধ্ব হইতে আরও ঊর্ধ্বে উঠিতেছে। ..... প্রভাতি চা ও জলখাবার শেষ করিয়া আমরা দু'জন অসলভাবে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা হইতে বহির্জগতের বার্তা গ্রহণ করিতেছিলাম।'' দ্বিতীয় জনটি বন্ধু তথা সহকারী বুদ্ধিমান অজিত।

কোনো ঘনায়মান রহস্যের ইঙ্গিত অন্তত ১৯৩২ সনে মুদ্রিত তাঁর এই 'পথের কাঁটা' গল্পের প্রারম্ভিক পঙ্‌ক্তিগুলিতে নেই। কিন্তু এটিই ছিল ইংরেজি, সংস্কৃতে পণ্ডিত এই লেখকের অননুকরণীয় পরিচয়চিহ্ন। পরে যতই গুলি-গোলা চলুক শরদিন্দুর গল্পে ছত্রে ছত্রে থাকত এই স্নিগ্ধতা। সিনেমা যতই দেখা থাক না কেন শরদিন্দুকে জানতে হলে তাঁর এই অনাবিল ভাষার লিখনকে পড়তেই হবে। শরদিন্দুর ডিটেকটিভ সত্তাকে সম্পূর্ণ অপসারিত করে (কোনো রহস্য রোমাঞ্চ লেখকের গল্পের বিষয়বস্তু করে ও পরিসমাপ্তিতে উত্তেজনা ও চমকের ঘনঘটাই ছিল প্রধান বিচার্য)। বিশিষ্ট ভাষাবিদ পণ্ডিত সুকুমার সেন লিখছেন, 'শরদিন্দুবাবুর গল্পের গুণ বহুগুণিত করেছে তাঁর ভাষা। কাহিনিকে ভাসিয়ে তাঁর ভাষা যেন তরতর করে বয়ে গেছে সমাপ্তির সাগরসঙ্গমে। সে ভাষা সাধু না চলিত বলা মুশকিল। বলতে পারি— সাধু-চলিত কিংবা চলিত-সাধু। শরদিন্দুবাবুর স্টাইল তাঁর নিজেরই স্বচ্ছ, পরিমিত, অনায়াসসুন্দর।' এই অনায়াসসুন্দর স্টাইল কথাটি যথার্থ

ব্যবহৃত হয়েছে। ইংরেজি স্টাইলে ১৯৬০-এর পর থেকে আমূল বদল হয়েছে। ক্রিস্টি, কোনান ডয়াল, এডগার এলান তো কিছুটা বিস্মৃত হওয়ার অবকাশ পেয়েছেন।

ইংরেজ লেখক ফ্রেডরিক ফোরসাইথ তাঁর 'Days of the Jackal' বা নাজি অত্যাচারের পটভূমিতে অসামান্য thriller 'odessa file' লিখে সারা বিশ্বের বাজার মাত করে দেন। সম্পূর্ণ অন্য স্টাইলে টানটান উত্তেজনাকর এনার লেখা ৮০টি ভাষায় অনূদিত। এর সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন আমেরিকান লেখক John Grisam . তিনি পেশায় উকিল হলেও অসাধারণ বই the client, run away jury, pelican brief প্রভৃতি লিখেছেন। তাঁর উপজীব্য কিন্তু আইন আদালতেও যে কী পরিমাণ চক্রান্ত ও হিংস্র ঘটনা সংঘটিত হয় তার সত্য উন্মোচন। এই লেখকরা রহস্য লেখক হিসেবে সারা বিশ্বে সম্মানিত। আমাদের শরদিন্দুর ধারেকাছে আজও ভারতের কোনো অপরাধ কাহিনি-লেখকই সেভাবে আসতে পারেননি। তবে শরদিন্দু ছিলেন এক বর্ণময় লেখক প্রতিভা। শুরু থেকেই তাঁর মধ্যে বিরাজ করত এক ভারতীয়ত্ব, হিন্দুত্ব, সর্বোপরি বাঙ্গালি হিসেবে স্বকীয়তার গর্ব।

তাঁর 'আদিম রিপু' গল্পটির মধ্যে বহুতর স্বর রয়ে গেছে। সেখানে ৪৬-এর দাঙ্গা আছে এবং সে বিষয়ে লেখকের দ্বিধাহীন পর্যবেক্ষণে হিন্দু সমাজ যে অত্যাচারিত হয়েছিল তা উঠে এসেছে। তাঁর গল্পের পটভূমি ছিল সবচেয়ে হিংসাপ্রবণ অঞ্চল যেমন বৌবাজার স্ট্রিট, পূর্বদিকে আপার সার্কুলার রোড, উত্তরে বিবেকানন্দ রোড, এদিকে গঙ্গার দিকে স্ট্যান্ড রোড। গল্পে তাঁর টান যে নিজ সম্প্রদায়ের প্রতিই রয়েছে তার প্রতিষ্ঠাও তিনি দিয়ে গেছেন— ''থানায় কেউ ছিল না। একটা জমাদার টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে ঘুমোচ্ছিল। আমার কথা শুনে রেগে উঠল, বললে যাও যাও, একটা হিন্দু মরেছে তার আবার এত হইচই কীসের? লাশ রাস্তায় ফেলে দাও গে।'' গভীর জাতীয়তাবাদী শরদিন্দু স্বাধীনতার প্রাক্‌সময়ে লিখে গেছেন ''সারা ভারতবর্ষের জীবনে এক মহাসন্ধিক্ষণ।'' প্রত্যেক ভারতবাসীর মধ্যে তিনি একটি জাতীয়তাবাদী কর্তব্যবোধ জাগাতে চেয়ে লিখছেন ''স্বাধীনতা যখন আসবে হয়তো মুমূর্ষু রক্তহীন দেহে আসিয়া উপস্থিত হইবে। তাহাকে বাঁচাইয়া তুলিতে প্রত্যেক ভারতবাসীকে হৃদয়রক্ত নিঙড়াইয়া দিতে হইবে।''

এই শরদিন্দুর পরিচয় বিশেষ সামনে আনা হয়নি। এ এক অন্য ভারতপ্রেমী শরদিন্দু। অবশ্য তিনি যে একান্তভাবে বাংলা প্রেমিকও সেটিও জানা যাবে।

তবে 'আদিম রিপুতে' যে বহু স্বর থাকার কথা বলেছিলাম তাতে শরদিন্দুর একেবারে নির্দিষ্ট করে জাতিবৈশিষ্ট্যের কথাও কিন্তু বর্ণিত হয়েছে। বাস্তবে তা প্রায় সম্প্রদায়গত বিশিষ্টতাকে ছুঁয়ে ফেলেছে।

তাঁর অন্যতম টানটান রহস্য উপন্যাস 'আদিম রিপু' অঞ্জন দত্তের পরিচালনায় চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হওয়ার পর তুমুল দর্শক কৌতূহল নজরে পড়ে। কিন্তু শরদিন্দু লেখায় কামুক ও ঘিনঘিনে চরিত্রের অনাদি হালদারের বিশৃঙ্খল সংসার পরিচালিকা ননীবালা রায়ের সন্দিগ্ধ চরিত্রের বর্ণনায় শরদিন্দু এক বিচিত্র বাক্যগুচ্ছ উপস্থিত করেছেন, ''বেশবাস দেখিয়া তাঁহাকে স্ত্রীলোকই বলিতে হয়। কিন্তু সে কি স্ত্রী লোক! পাঁচ হাত লম্বা, তদনুপাতে চওড়া, শালপ্রাংশু আকৃতির; পালিস করা আবলুস কাঠের মতো গায়ের রং, ঘটোধী, নিবিড়নিতম্বিনী, স্পষ্ট একজোড়া গোঁফ আছে; বয়স পঞ্চাশের ওপর''। এই বর্ণনায় একটা বিষয় নিশ্চিত যে শরদিন্দু ননীবালাকে নারীসুলভ নম্রতা প্রায় কিছুই দেননি। এক্ষেত্রে এই মহিলার জীবিকা ও শারীরিক বর্ণনা থেকে তিনি এক ধরনের সামাজিক স্তরের কিছুটা পতিত সম্প্রদায়কে বোঝাতে বা তাদের অস্তিত্বকে নির্দেশ করেছেন। উপন্যাসের মধ্যেও চরিত্রের চলনকে তিনি তেমন গ্রহণযোগ্যও করেননি। যে কথা শুরুতেই বলা হয়েছিল যে রহস্য গল্পের মধ্যে শরদিন্দু একটি বিশ্বাসযোগ্য সামাজিক আবহাওয়াকে প্রদর্শিত করেছিলেন ১৯৩০—৬০-এর সময়কালে। এই সূত্রে বাঙ্গলির আরও একজন সর্বকালের উল্লেখযোগ্য রহস্য রোমাঞ্চ উপন্যাসিক জটায়ুকে বাদ দিয়ে প্রদোষ মিত্র অর্থাৎ সত্যজিতের ফেলুদাও ছিলেন। সেটি অনেক পরে ১৯৭০-৯০। ব্যোমকেশের যেমন তন্ত্রধারক হিসেবে অজিত ছিল ফেলুদার ভাইপো তপেশ ছাড়া বিদূষক লালমোহন গাঙ্গুলীও আনন্দ কম দেননি। এগুলি সবই বিবেচনায় নিয়ে বিংশ শতাব্দীর মাঝ পর্বের থেকে আজ অবধি টিকে থাকা বাঙ্গালির কাছে ধুতি-শার্ট পরা ব্যোমকেশ আজও একটি হারানো মোহময় সমাজ জীবনের প্রতিভূ। যে মাটির সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে শুধুমাত্র 'মগজাস্ত্র' ব্যবহার করে জটিল সমস্যার তুখোড় সমাধান করছে, ন্যূনতম শারীরিক ক্ষমতার প্রয়োগে। এই রহস্য উন্মোচকের মূল উদ্দেশ্য তো সত্যান্বেষীর সত্য উন্মোচন। তিনি নিশ্চিত সফল।

কিন্তু এই সাফল্য শরদিন্দুর কাছে যথেষ্ট মনে হয়নি। তাঁর জাতীয় কর্তব্যের কথা তিনি বিস্মৃত হননি। ভারত ইতিহাস তাঁকে সর্বদা আকর্ষিত করত। এরই ফলশ্রুতিতে মগধেশ্বর স্কন্দগুপ্তের সময়কাল নিয়ে তিনি দেশের বিস্তৃত ইতিহাসের পাতাগুলি আবার উপস্থাপন শুরু করলেন। গুপ্ত সাম্রাজ্য ও হুনদের মধ্যে অসংখ্যবার হানাহানি হয়েছিল লেখক সেই লিখন ১৯৩৮-এ মুঙ্গেরে থাকাকালীন শুরু করেন। তাঁর সিনেমা পর্বের চাপে সেটি আটকে পড়ে। আশ্চর্য লেখক শরদিন্দু , দীর্ঘ ১০ বছর পরে ১৯৪৮-এ পুনর্বার শুরু করে এই উপন্যাস 'কালের মন্দিরা' তিনি ১৯৫০ সালে অনুরাগীদের হাতে তুলে দেন। শুরুতেই এক বৃদ্ধ হুন গল্প বলিতেছে ''... একদিন যাযাবর জাতির স্বভাবজাত অস্থিরতা কেমন করিয়া তাহাদের গান্ধারের সীমান্তে আনিয়া উপনীত করিল তারপর পঞ্চনদ ধৌত শ্যামল উপত্যকার লোভে তাহারা কীভাবে পঙ্গপালের মতো চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল স্কন্দের সহিত হুনেদের

যুদ্ধ। হুনগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল" ভারতে বিদেশি লুণ্ঠন পর্বের সামগ্রিক ইঙ্গিত রেখে গেলেন। লক্ষ্য করার বিষয় জীবনের প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস শুরু হলো মাতৃভূমির বিগত গৌরব বা দৈন্যের গভীর গবেষণালব্ধ ফল নিয়ে। তিনি নিজে বলে গেছেন যে তিনি 'fictionised history নয় Historical fiction লেখেন। অর্থাৎ গল্পের মাধ্যমে ইতিহাস তৈরি করতে চান না, তাঁর লক্ষ্য প্রামাণ্য ইতিহাসের ওপর কিছু কল্পিত চরিত্র, সংলাপ, পারিপার্শ্ব তৈরি করে ইতিহাসকে শুধু ঐতিহাসিক নয়, সাধারণের মনে জায়গা করে দেওয়া। ৬টি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছিলেন, সব কটিই মানুষ সাগ্রহে পাঠ করেছে। অভিভূত হয়ে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর বিদগ্ধ পর্যবেক্ষণ দিয়ে গেছেন ১৯৬৭-র রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' উপন্যাসকে। ''আপনি বিজয়নগরের অতীত ঐশ্বর্যের স্মৃতি একটি মনোরম কাহিনির মধ্য দিয়ে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এজন্য আমরা অর্থাৎ ঐতিহাসিকেরা খুবই কৃতজ্ঞ। কারণ লোকে ইতিহাস পড়ে না—কিন্তু আপনার বই পড়িবে।"

আর এক বাংলা সাহিত্যের মহীরূহসম বিশ্লেষক প্রমথনাথ বিশী বলছেন ''আপনার গল্প পড়িতে পড়িতে বঙ্কিমবাবুকে মনে এনে দেয়। তিনি ছাড়া আপনার জুড়ি নেই।"

এমন দু'টি বিজয়মাল্য কিন্তু তাঁর গোড়ায় বলা জাতীয়তাবোধ প্রসূত চিন্তাধারার মুদ্রিত রূপেরই অর্জন। এর মধ্যে রাজা শশাঙ্ক যাঁর মুর্তি প্রতিষ্ঠা এখন একটি আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে—সেই শশাঙ্কদেবের পতনের ''অব্যবহিত পরে বঙ্গদেশে যে শতাব্দীব্যাপী মাৎস্যান্যায় আরম্ভ হয়েছিল তাহারই সূচনা আমার গল্পে আছে। বাঙ্গালির জীবনে ইহা এক মহাক্রান্তিকাল। আধুনিক বাঙ্গালির জন্ম এই সময়"। কর্ণসুবর্ণ রাজধানীর গৌড়রাজ শশাঙ্কের সময়কাল ছিল ৭ম শতাব্দী। শরদিন্দু তাঁর বাঙ্গালি তথা ভারতের গৌরবময় ইতিহাস অন্বেষণ নীহাররঞ্জন গুপ্ত, পণ্ডিত প্রবর হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের সঙ্গে গভীর উৎসাহে চর্চা করে সত্য উদ্ধার করেছেন।

বোম্বে যাত্রার পর ১৯৩৬ থেকে ১৯৫০ অবধি তাঁর কলম ততটা সক্রিয় ছিল না। এই সময়টা তিনি সিনেমার অন্তরালের কাজ ও গভীর ইতিহাস সমীক্ষায় মগ্ন থেকেছেন। এর সঙ্গে যোগ হয়েছিল নিবিড় মনোনিবেশে জ্যোতিষচর্চা

শরদিন্দু আলোচনায় ইতি টানার আগে তাঁর বাদ পড়ে যাওয়া একটি অসাধারণ দিকের কয়েকটি উদাহরণ যা না দিলে অন্যায় হবে। সীমান্তহীরায় ''...বড় লোকের ফুস্কুড়ি হলে ডাক্তার আসে কিন্তু গরিবের নাভিশ্বাস না উঠলে ডাক্তারের কথা মনেই পড়ে না...।"

আর একটি অসাধারণ পরিশীলিত ব্যঙ্গ 'অগ্নিবাণ' থেকে ''পরিচ্ছন্নতার আতিশয্যে ঘরের আসবাবপত্র যেন আড়ষ্ট হইয়া আছে। এমনকী দেয়ালে লম্বিত মা কালীর ছবিখানিও যেন ঘরের শুচিতা-ভঙ্গের ভয়ে সন্ত্রস্তভাবে জিভ বাহির করিয়া আছেন।" লেখার মধ্যে কোন এক জায়গায় ভাষাবিদ সুকুমার সেন কৌতুক করেছিলেন শরদিন্দুর ভাষা সাধু-চলিত না চলিত-সাধু। দেখুন অজস্র থেকে কয়েকটি স্বাদ গ্রহণ করার নমুনা পঙ্‌ক্তি 'তুমি সন্ধ্যার মেঘ' থেকে, '' রাজারা আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন, রেবার তীরে মেঘপুঞ্জবৎ পট্টাবাসগুলি পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। পরিজন যাহারা আসিয়াছে তাহাদের মনোভাব বরযাত্রীর মতো। দেহে নবীন বস্ত্র, নূতন মণ্ডন। তাহারা গুম্ফ শানিত করিয়া নগরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, মণ্ডা মিঠাই খাইতেছে, তালকী মাধুক ইক্ষুরস পান করিতেছে, মদবিহ্বলা নগর কামিনীদের সঙ্গে শ্লেষযুক্ত রসিকতা করিতেছে। গীত বাদ্য হট্টগোল...।" জীবনকে আঠারোআনা সফল রসে উপভোগ করার দৃশ্যটিতে সাধু-চলিতের এক রমণীয় সংমিশ্রণ ঘটালেন তিনি। শরদিন্দু গত হয়েছেন ১৯৭০ সালে তাঁর নিজের পুনার বাড়িতে। বোম্বে যাত্রার পর তিনি মায়াবী জীবনকেও দেখেছেন। বাচ্চাদের নিয়ে সদাশিব নামের কেন্দ্রীয় চরিত্র তৈরি করেন যা খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। লিখেছেন অজস্র মননশীল গল্প।

দীর্ঘদিন স্মৃতিতে ভেসে থাকার যোগ্য রহস্য উপন্যাস, গল্প গভীর বিশ্লেষণ উদ্ভূত তথ্য সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাস সর্বভারতীয় হিন্দি চলচ্চিত্রের কাহিনি, চিত্রনাট্য, সংলাপ, ছোটদের গল্প তাঁর অর্জন। সংস্কৃতিক্ষেত্রে তাঁর অবদান অপরিমেয়। কিন্তু মৃত্যুর ৫০ বছর পরেও তিনি আজও তুমুল আলোড়ন সৃষ্টিকারী ব্যক্তিত্ব। ১৯৪৭ সালে প্রথম বাঙ্গালি মহিলা পরিচালক হিসেবে মঞ্জু দে তাঁর 'সজারুর কাঁটা' চিত্রায়িত করেন। বিপুল হিট ছবি হয়। ১৯৬৬-তে সত্যজিৎ রায় পরিচালিত সর্বভারতীয় পুরস্কার জেতা অবিস্মরণীয় উত্তম কুমারের 'চিড়িয়াখানার' ব্যোমকেশ। তপন সিংহের 'ঝিন্দের বন্দী', তরুণ মজুমদারের 'দাদার কীর্তি'। তিনি আজও বহু মানুষের জীবিকার উৎস। ২০০৯ থেকে প্রতিষ্ঠিত চলচ্চিত্রকাররা তাঁর গল্পের চলচ্চিত্র নির্মাণ করে চলেছেন। শ্রী অঞ্জন দত্ত একটি কথপোকথনে একবার বলেছিলেন অনেকেই আমাকে এখন 'ব্যোমকেশ' বলে আনন্দ পায়। আমার ৭ খানা ছবি হয়ে গেল। অরিন্দম শীলও পিছিয়ে নেই।

এর অর্থ শরদিন্দু কালজয়ী সম্ভার রেখে গেছেন। তবে তাঁর অপরূপ মিশ্রিত ভাষার আস্বাদ না নিলে শরদিন্দু অনাস্বাদিত থেকে যাবেন।

এত কথা বলতে গিয়ে মনে হলো তার নামটির ব্যাপ্তি একটু ভিন্নভাবে সাজিয়ে নিলে তাঁকে যথার্থ সম্মান দেওয়া হবে। শরতের ইন্দু অর্থে চাঁদই হলো শরদিন্দু। বাঙ্গালির মননে শুধু শরতের নয় ষষ্ঠ ঋতুরই স্নেহময় চন্দ্রকিরণ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু শরতের নয়, তিনি চিরকালীন ইন্দু।

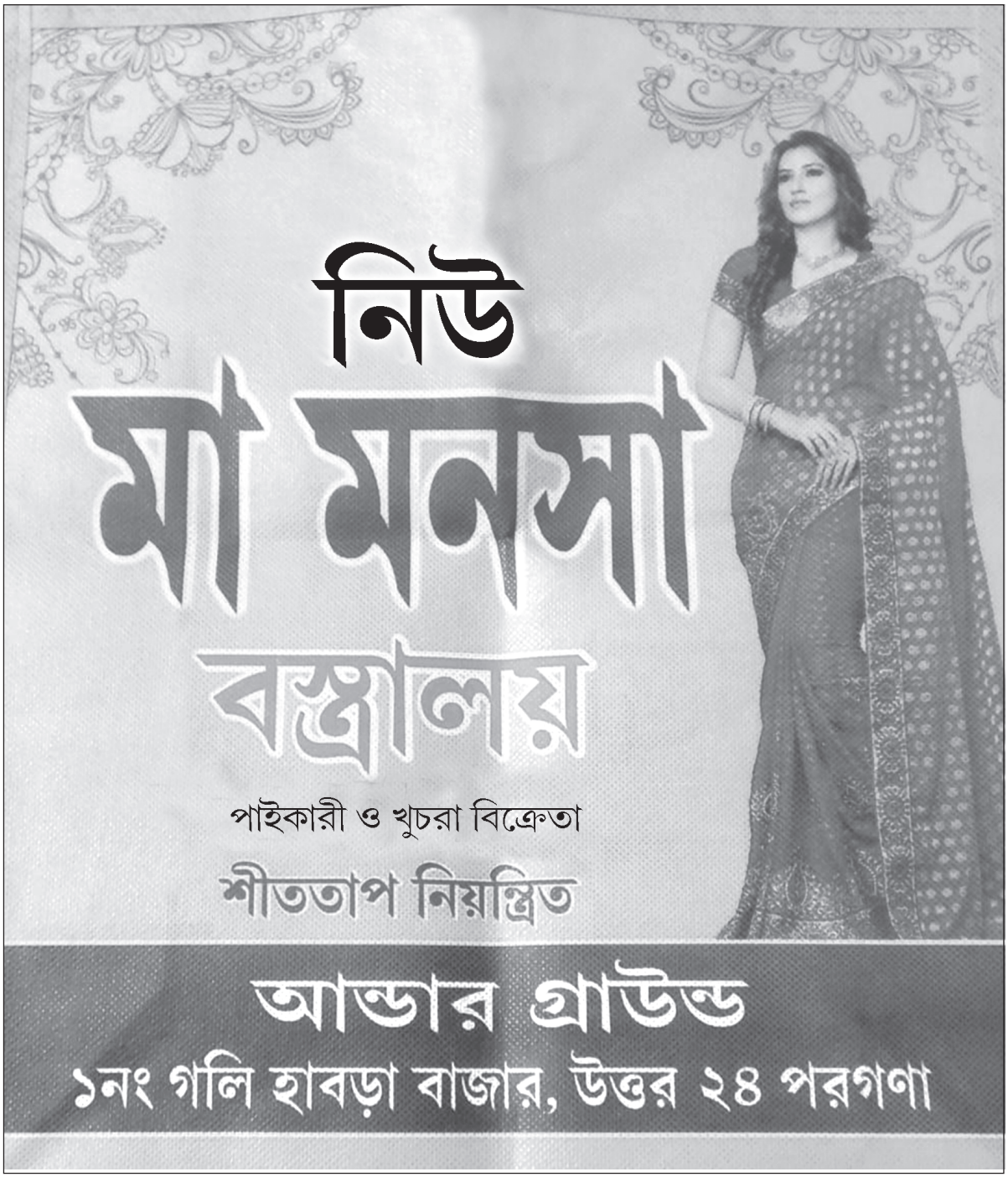
নিউ
মা মনসা
বস্ত্রালয়
পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
শীততাপ নিয়ন্ত্রিত
আন্ডার গ্রাউন্ড
১নং গলি হাবড়া বাজার, উত্তর ২৪ পরগণা

শিব, শিবলিঙ্গ ও শ্রীরুদ্র একটি পর্যালোচনা

সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্

ড. পঙ্কজ কুমার রায়

শিব ও শিবলিঙ্গ নিয়ে কদর্যভাষার প্রয়োগ যে কোনো সনাতনী ধারণার মানুষের ভাবাবেগকে আঘাত করবে। ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন ভারতীয় গণতন্ত্রে কালো দিনের সূচনা হয় এবং জরুরি অবস্থা বজায় থাকে ১৯৭৭ সালের ২১শে মার্চ পর্যন্ত। এই সময়কালের মধ্যে ১৯৭৬ সালে সংবিধানের ৪২তম সংশোধনী আনা হয় এবং ভারতীয় গণতন্ত্রকে ধর্মনিরপেক্ষ আখ্যায়িত করা হয়। ১৯৯৪ সালে এস আর বোম্বাই বনাম ভারত সরকারের মামলার রায়দান প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের মহামান্য বিচারপতি মনে করিয়ে দেন ভারত প্রথমাবধিই ধর্মনিরপেক্ষ দেশ ছিল। সুলতানি আমল, মুঘল আমল এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন ও ব্রিট্রিশ শাসনের জাঁতাকলে আমাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির অবক্ষয় ও অবনমন লক্ষ্য করা যায়। ধর্মনিরপেক্ষতার মোড়কে আমাদের চিন্তা ও চেতনাকে মূল থেকে উৎপাটিত করে অভারতীয় ভাবনা মনোজগৎকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। সেই কারণে এ প্রবন্ধের অবতারণা।

সংস্কৃতে শিব শব্দের অর্থ শুভ, দয়ালু ও মহৎ। লিঙ্গ একটি সংস্কৃত শব্দ যার অর্থ প্রতীক বা চিহ্ন। শিবলিঙ্গ হলো শুভচিহ্ন বা মহৎ চিহ্ন। হিন্দু ধর্মমতে শিব অর্থাৎ মহাদেব হলেন আদি দেব/আদি শক্তির প্রতীক। সকল দেবতার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। সর্বত্যাগী, বিলাস বসনহীন, জটাধারী, ভস্মমাখা-শ্মশানবাসী দেবতা তিনি। তিনি অল্পে তুষ্ট। কথায় বলে, তিনি একটি বেলপাতাতেই তুষ্ট হন। মহাদেব নানা নামে পুজিত। কখনও শতনাম আবার কখনও শ্রীশিবসহস্রনামাবলীতে সমাদৃত। শিব কখনও শঙ্কর,

কখনও- বা শম্ভু, ভোলে, ভাণ্ডারী, ঈশ্বর, মহেশ্বর, রামেশ্বর, সোমেশ্বর, ত্রিনেত্রধারী, শূলপাণি, উমাপতি, নীলকণ্ঠ, রুদ্র, মৃত্যুঞ্জয়, সর্বেশ্বর, গৌরীশঙ্কর, লিঙ্গেশ্বর, ভৈরব, অমৃত্যু, অজমা অর্ধনারীশ্বর, ভাদ্রপ্রিয়, ওঙ্কারেশ্বর, দক্ষিণামতি, চন্দ্রশেখর, পিনাকী, বিরুপাক্ষ, শশীশেখর, কদপী, কামদেব, বিষ্ণুবল্লভ, অম্বিকানাথ, সর্ব, শিবাপ্রিয়, কপালী, গঙ্গাধর, ভীম, পরশুহস্ত, শ্রীকণ্ঠ, ভব, শিতিকণ্ঠ, সর্বজ্ঞ, বীরভদ্র, সোম, ভর্গ, ব্যোমকেশ, গিরীশ আরও কত না নামে তিনি ভূষিত।

শিবোহম্ শব্দে দু'টি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। শিব ও অহম্। যার তরজমা করলে দাঁড়ায় I am Shiva,যেখানে 'Shiva' হলো God Shiva এবং Aham -এর অর্থ I। আদি শঙ্করাচার্য থেকে স্বামী বিবেকানন্দ একই কথার অনুরণন করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ বিরচিত 'শ্রীশিবস্তোত্রম্' হলো ঃ

''নিখিল ভুবন জন্মস্থসভঙ্গ প্ররোহার
অকলিতমহিমানর কল্পিতা যত্র তস্মিন।
সুবিমলগগনাভে ঈশ্বরসংস্থে হল্যনীতে
মম ভবতু ভবহেস্মিন্ ভাসুরো ভাববন্ধঃ।।"

শিবলিঙ্গের অর্থ অসীম, যা আমাদের চিন্তা চেতনার অতীত। শিব নিরাকার। শিবলিঙ্গ শাশ্বতের প্রতীক। শিবলিঙ্গের তিনটি সমান ভাগ বিদ্যমান। শিবলিঙ্গে ত্রিদেব অর্থাৎ তিন দেবতা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের অবস্থান। শিবলিঙ্গের ভূমিদেশ ব্রহ্মাকে অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তাকে চিহ্নিত করে, যা চতুর্ভুজাকৃতি। পাদদেশ বিষ্ণু অর্থাৎ রক্ষাকর্তাকে ভূষিত করে, যা অষ্টভুজাকৃতি। শীর্ষদেশ মহেশ্বরকে অর্থাৎ বিনাশকর্তাকে চিত্রায়িত করে, যা গোলাকৃতি। অন্যভাবে বললে, ব্রহ্মা অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা ইলেকট্রন। বিষ্ণু অর্থাৎ রক্ষাকর্তা প্রোটন এবং মহেশ্বর অর্থাৎ ধ্বংসকর্তা নিউটনের প্রতিস্থাপক। শিবলিঙ্গকে যারা লিঙ্গ অর্থাৎ প্রজননকারী অঙ্গ হিসেবে দেখেন তারা এর অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ ঘটান। কথিত আছে, মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র ১০৮ বার উচ্চারণে জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পায়।

''ওঁ ত্র্যম্বকম্ যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনম্।
উর্বারুকমিব বন্ধনান্ মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ।।

ঋকবেদ ৭ মণ্ডল, ৫৯ যুক্ত, ১২ মন্ত্র

'হে ত্রিভুবনের পালনকর্তা, হে ত্রিনেত্র শিব, আমি তোমার ভজনা করছি। তুমি আমাকে জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন হতে মুক্ত কর এবং মোক্ষ প্রদান কর। যেমন ফুটিফল পেকে গেলে আপনা থেকে বৃন্ত হতে চ্যুত হয়, সেরকম সাংসারিক জীবন হতে আমাকে মুক্তি প্রদান করে মোক্ষ প্রদান কর।'

সীতা উদ্ধারে রাম-রাবণের যুদ্ধের পূর্বে রাম ও রাবণ ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় শিবের আরাধনায় রত ছিলেন। রক্তকরবী সম্পর্কিত আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ রাম-রাবণ শব্দের এক অসাধারণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ''রাম ও রাবণ দুই নামের দুই বিপরীত অর্থ। রাম হলো আরাম, শান্তি। রাবণ হলো চিৎকার, অশান্তি। একটিতে নবাঙ্কুরের মাধুর্য, পল্লবের মর্মর, আর একটিতে শান বাঁধানো রাস্তার উপর দিয়ে দৈত্যরথের বীভৎস শৃঙ্গধ্বনি।" (সূত্র ঃ রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৩তম খণ্ড, ১৩৬০, পৃঃ, ৫৪৮, বিশ্বভারতী প্রকাশনা সংস্থা)।

লঙ্কা অভিযানের পূর্বে রামেশ্বরমে শ্রীরামচন্দ্র বালি দিয়ে শিবলিঙ্গ তৈরি করে শিবের আরাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন। রামচরিত মানসে গোস্বামী তুলসীদাস বর্ণনা দিয়েছেন শ্রীরুদ্রাষ্টকম্ রূপে, যা শান্ত ও সমাহিত ধ্যানের প্রতীক।

''নমামি শমীশান নির্বারণরূপং
বিভুং ব্যাপকং ব্রহ্মবেদ স্বরূপম্।
নিজং নিগুণং নির্বিকল্পং নিরীহং
চিদাকাশমাকাশবাসং ভজেহহম্।।

অপরদিকে রাবণ শিবকে তুষ্ট করতে শিবতাণ্ডবস্তোত্রম্ পাঠ শুরু করেন, যা ভীষণ ও তাণ্ডবের শামিল।

''জটাটবী গলজ্জল প্রবাহপাবিত স্থলে
গলেহবলম্ব্য লম্বিতাং ভুজঙ্গতুঙ্গং মালিকাম্
ডমড্ডম ড্ডম ড্ডম নিনাদবড্ডমর্বয়ং
চকার চণ্ড তাণ্ডবং তনোতু নঃ শিবঃ শিবম্" (১)

রুদ্র শিবের অপর নাম হিসেবে বিবেচ্য। ঋকবেদের সূক্ত ২.৩৩ অনুসারে শিবকে বর্ণনা করা হয়েছে 'Father of Rudras' অর্থাৎ একঝাক ঝঞ্ঝাযুক্ত ঈশ্বররূপে। স্তব (১০.৩২) অনুসারে, রুদ্রের দু'টি রূপ একটি বন্য ও নিষ্ঠুর এবং অন্যটি দয়ালু ও শান্ত। নমকম্ হলো রুদ্রের অভিবাদন যাতে রুদ্র হিংস ও ভাস্কর রূপ থেকে শান্ত ও সমাহিত রূপ পরিগ্রহ করতে পারেন এবং আমাদের মঙ্গল করেন। অন্যদিকে চমকম্ হলো রুদ্রের কাছে প্রার্থনা যাতে সমস্ত ক্রোধ নিবৃত্তির মধ্যে দিয়ে আশীর্বাদ বর্ষণ করেন। যজুর্বেদ অনুসারে, নমকম্ (অভিবাদন) ও চমকম্ (প্রার্থনা)-এর সমন্বয়ে শ্রীরুদ্র সংঘটিত হয়।

নমকম্ (অভিবাদন) যোগ চমকম্ (প্রার্থনা) হলো শ্রীরুদ্র
১১ বার ১ বার হলো একাদশ রুদ্র
$(১১)^{২}$ = ১২১ বার ১১ বার হলো লঘুরুদ্র
$(১১)^{৩}$ = ১৩৩১ বার $(১১)^{২}$ = ১২১ বার হলো মহারুদ্র
$(১১)^{৪}$ = ১৪৬৪১ বার $(১১)^{৩}$ = ১৩৩১ বার হলো অতিরুদ্র

বাবা বিশ্বনাথ মন্দিরে পূজারিগণ এভাবেই রুদ্রের অভিষেক করে থাকেন। মহাদেব যার আদি নেই, অন্ত নেই, যিনি অন্তহীন তাঁর আরাধনার মধ্যে গণিতের ঝংকার বারবার অনুরণিত হয়। শূন্য থেকে অসীমের এই যাত্রায় রুদ্রাভিষেক উচ্চারিত হয়। 'পিনাক পানির ডমরু ত্রিশূল ধর্মরাজের দণ্ড' এই মহাবিশ্বে মহাকালে মহারবে চিরভাস্কর হয়ে থাকুক। সুভাষচন্দ্র বসুর মতো সত্য শিব ও সুন্দরের আরাধনায় ব্রতী হয়ে বলতে হয়, ''তোমার কথা হেথা কেহ তো বলে না। করে শুধু মিছে কোলাহল। সুধাসাগরের তীরেতে বসিয়া পান করে শুধু হলাহল।।" *(পূজা পর্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)*

চোর

অনির্বাণ দে

"কে র‍্যাঃ?"

আবার ভাঁড়ার ঘরে আওয়াজ হলো, খুট!

"কে ওকানে? বেরিয়ে আয় বলচি!"

ঢন ঢনা ঢন ঢন! টিনের ড্রামটা উলটে এক মূর্তিমান আস্তে আস্তে অন্ধকার থেকে ঘরের মৃদু আলোয় এসে দাঁড়াল। আফিমের ঘোরে কানাইবাবুর একটু তন্দ্রামতো এসেছিল ঠিকই

কিন্তু প্রথম শব্দটা শুনেই তিনি সজাগ হয়ে গেছেন। এমনিতে তাঁর কান খুব খাড়া। মাথার কাছে হাতড়ে বড়ো চার সেলের টর্চলাইটটা জ্বালালেন, তারপর তড়াক করে উঠে বসে লোকটার মুখের দিকে তাক করলেন তিনি। গম্ভীর গলায় বললেন, ''কী চুরি করতে এয়েছিস? অ্যাঃ?''

কানাইবাবু যেখানটায় বিছানায় শুয়ে, সেটা কোনো শোবার ঘর নয়। একটা বিরাট হলঘর। বাইরে থেকে ঢুকতে গেলে এই হলঘর পেরিয়েই ঢুকতে হয়। আর বাড়ির সব ঘরে ঢোকারও একটাই কমন রাস্তা। হলের শেষপ্রান্তে একদিকে ওপরে ওঠার সিঁড়ি। আরেকদিকে কানাইবাবুর শোওয়ার খাট পাতা। সুতরাং বাড়ির যেইখানেই যেতে চাও না কেন, তাঁকে এড়িয়ে যাবার যো নেই। লোকে যতই তাঁকে এই এতবড়ো বাড়ির মালিক মনে করুক, কানাইবাবু নিজেকে বলেন, বাড়ির পাহারাদার।

খাটের পাশে একটা ছোটো টেবিলে ওষুধপত্র টুকিটাকি জিনিস। একটা হাতির দাঁত-বাঁধানো লাঠি তাঁর বহুকালের সাথী। সেটা আগে তাঁর ঘরের কোণায় থাকত। গিন্নি চলে যাওয়ার পর থেকে এই হলঘরেই শোন তিনি। আর সেইসময় থেকে ওই লাঠিটাই তাঁর শয্যাসঙ্গী। কানাইবাবু সে লাঠিখানা দিয়ে দেয়ালের সুইচ টিপে বড়ো আলো জ্বাললেন। তাড়াতাড়ি পাশের টেবিলের থেকে চশমাটা নিয়ে পরলেন। তারপর আপাদমস্তক দেখতে লাগলেন লোকটাকে।

লোক নয়, ছোকরা! বয়েস বড়োজোর বছর সতেরো আঠেরো হবে। মাথাভর্তি ঝাঁকড়া চুল। ছিপছিপে, শ্যামবর্ণ। খালি গা, খালি পা। কোমরে গামছাবাঁধা খাটো ধুতি। সেখান থেকে উঁকি দিচ্ছে একটুকরো ছোট্টো লাঠি, মনে হয় সিঁদকাঠি।

তবে তার মুখখানা ভারী মিষ্টি। কানাইবাবুর মনে হলো যেন এই মুখ তিনি আগে কোথাও দেখেছেন। ছেলের চেহারায় তো ভয়ডরের ছাপ বলে কিছু নেই! কানাইবাবু চোখ নাচিয়ে কড়া স্বরে বললেন, ''কী রে? খুব সাহস, না? ভেবেচিস, বাড়ি ফাঁকা, লোকজন নেই! এই বুড়োটার পা দুটো অকেজো... কিচ্ছু করতে পারবে না, তাই না?''

''কই আমি তো সেকথা বলেছি নাকি?'' মিহি গলায় জবাব এল।

হু! ভুলেও ভাবিস নি ওইরকম কতা! আর শোন, একদম পালানোর চেষ্টা করবি নি! তাহলে এই দেকছিস, এই সুইচটা, এইটে টিপে দেব! তখন বুজবি ঠেলা!

আচ্ছা, পালাচ্ছি না।

হ্যাঃ হ্যা! কি? ভয় পেয়েচিস, তো? তা, জানিস এই সুইচ টিপলে কী হবে?

কী হবে?

এমন জোর অ্যালার্ম বাজবে না, সারা পাড়া থেকে লোক ছুটে আসবে! হু হু বাবা! ঘুঘু দেকেছ, ফাঁদ দেকনি! ভেবেচ কী? এই বাড়ির পাহারায় আচে খোদ কানাইচরণ দাস!

হ্যাঁ, তা ঠিক

''মুখে মুখে কতা এত বলছিস যে বড়ো? তা এবাড়ি ঢুকলি কী করে র‍্যা? সদর থেকে সিঁড়ির ঘর অবধি সব তো সব তালা দেওয়া? সিঁদ কেটেছিস নাকি?'' বলে তিনি বালিশের নীচ থেকে একটা ইয়াব্বড়ো চাবির গাছাটা একবার ছুঁয়ে দেখে নিলেন। নিন্দুকেরা বলে ওই চাবিগাছার জন্যই কানাইবাবু রাত্তিরে ভালো ঘুমোতে পারেন না। মাথার বালিশ যা উঁচু হয়ে থাকে! বুড়ো একবারে যক্ষের মতো। সম্পত্তি আগলে বসে আছে সারাক্ষণ।

''আমি তো ভিতরেই ছিলাম!'' ছেলেটা একটু কাচুমাচু মুখে বলল।

অ! তাই ভাবি! এই হতচ্ছাড়া ট্যাঁপাকে কতবার বলিচি সন্ধ্যার আগে ছাতের দরজা ভালো করে বন্ধ হয়েচে কিনা দেকে নিতে। কখন এসে ঘরের মধ্যে সেঁদিয়ে আচে...

ও কী করে দেখবে দাদু!

কী? ব্যাটা এয়েছিস চুরি করতে, আর আমি কিনা তোর দা আ আ দু উ? অ্যা? সাহস তো কম নয়?

না, মানে আর কী বলে ডাকব?

ডাকবি? তুই কী ডাকবি রে ব্যাটাচ্চেলে? একন আমি ডাকব, পুলিশ!

পুলিশ? আবার পুলিশ কেন?

চুরি করলে পুলিশে ধরে জান নে বুজি? কোনোদিন পুলিশে ধরেনি বুজি? এবারে জানবে। তারপর যকন জেলে যাবে তকন টের পাবে, এই কানাই দাসের বাড়ি চুরি করতে ঢোকার পরিণাম।

জেল? ওরে বাবা! সে তো বিচ্ছিরি জায়গা। আমার বাড়ির লোকেদের একবার বিনা দোষে জেলে ধরে রেখেছিল। সে কী কষ্ট।

অ! তাই বল! তার মানে তোরা বংশপরম্পরায় চোর? অ্যা?

না না দাদু, মোটেই না। আমরা মোটেই তা নই যা তুমি ভাবছ। আমাদের মেলা জমি-জায়গা ছিল, চাষবাস ছিল, গোরু ছিল.....

তাই নাকি? তা তোদের ঘর কোতায়, শুনি?

উত্তর প্রদেশে।

ও বাবা! বুজেছি। এবার বেশ ভালোই বুজতে পেরেচি। গোটা বিহার ইউপি ভরতি তোমার মতো সাধুপুপুরুষ তো কিলবিল করচে। তা এত ভালো বাংলা শিকলি কোত্তেকে র‍্যা?

এখানে অনেককাল আছি তো গো!

হুম! তা এখানে কোথায় থাকা হয়?

থাকা? কোনো ঠিক নেই। বেশ

কিছুকাল এই মন্দিরে ছিলাম, দুবেলা খেতে-শুতে পেতাম তো!

ওই নইচোরো মন্দির! তাই বলি তোকে কোতায় যেন দেকিচি! ওঃ, ওদেরও বলিহারি! অত বড়ো মন্দিরখানা যত রাজ্যের চোর-ভিকিরি-পাগল-ভবঘুরেদের আড্ডা হয়ে উটেচে! কী সুন্দর চিল, আমাদের কম বয়সে। এখন চারিদিকে নোংরা-দুগ্গন্দ! ব্যাটারা আবার পরশু এয়েছিল চাঁদা চাইতে! ব্যাটাদের নাকি ভোগ দেওয়ার পয়সা জুটচে না। দুদ্দুর করে তাড়িয়েচি! যাক সেসব কথা। এখন বলো দেখি বাবা কী কী সরিয়েচ! সত্যি কথা বলবি কিন্তু নইলে এই লাটি দেকেচিস তো? চামড়া একেবারে.....

বিশ্বাস কর দাদু কিচ্ছু নিই নি! আজ কদিন ভালো করে খাইনি... বড্ডো খিদে পেয়েছিল তো, তাই...

শোন ওসব আষাঢ়ে গপ্পো অন্য জায়গায় বলিস গে!

''সত্যি গো! এই দেখো'', বলে সে ডানহাতটা খুলে দেখালো! তাতে এক টুকরো কালাকাঁদ। কানাইবাবু সেদিকে একটুক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপর আনমনা হয়ে গেলেন! শেষে একটু গলা খাঁকারি দিয়ে দিয়ে শান্ত গম্ভীর গলায় বললেন, ''ইয়ে, শোন, এক কাজ কর দেকি। ওই পিছনদিকটায় কলতলা আচে। হাত-পা গে ধো ভালো করে। তারপর ওই রান্নাঘরের তে কটা সরা, কলাপাতা আর এক ঘটি জল নে আয় গা। সব ভালো করে ধোয়া আছে। পিঁড়ে আর জলচৌকিও রাকা আচে, একেনে নিয়ে আয়। আর দেকিস, কিছু এদিক-ওদিক না হয়! ওকেনে আঁশ ঢোকে না কিন্তু!''

ছেলেটা তাই করল। কলাপাতা নিয়ে এসে দাঁড়াতে কানাইবাবু বললেন, ''ভাঁড়ার ঘরে দই-মিষ্টি আচে, কটা ফলও আছে। তোর খুশিমতো নিয়ে আয়।'' সে নীরবে আদেশ পালন করল। কানাইবাবু নিজের খাটের কাছের জায়গাটা দেখিয়ে বললেন, এইখানে বোস, পাখার বাতাস পাবি। নেঃ, এবারে খা!''

সে ছেলে মহানন্দে খেতে বসে গেল। কানাইবাবু এবারে মোলায়েম স্বরে বললেন, ''নিজেই জোগাড় করে নিতে হলো, নারে? কী আর করব বল বাবা, এখন যে পোড়ো হয়ে গেচি। মোটে চলতেই পারি নে। তার ওপরে এত রোগভোগ! ওই ট্যাঁপা মাজে মাজে হুইলচেয়ারে করে বেড়াতে নিয়ে যায়। তা, হ্যাঁ রে! তোর নাম কী রে?''

মুকুন্দ

বাঃ! বেশ নাম!

দাদু, তুমি কিছু খাবে না?

আমার তো একাদশীর উপোস! আজ ঝুলনযাত্রা না? তা, ও মিষ্টি পছন্দ হয়েছে তোর?

হ্যাঁ দাদু

আরে আগে ফলটুকু খা দেকি। নইলে পরে আর মিষ্টি লাগবে নি। ওই পেয়ারা, ওই কালোজাম, সব কিন্তু আমার বাগানের।

জানি তো।

হ্যাঁ, তা জানবেই! জানবেই তো! রাতবিরেতে এসব এলাকা আগে থেকে জরিপ করে বেরোতে হয়েচে কিনা! চুরি করা কি কম পরিশ্রমের কাজ?

এই তো মুশকিল! দাদু তুমি আমার কথা বিশ্বাস করলে না তো?

আহা চটছিস কেন? এবার বল দেখি ওই ট্যাঁপা হতভাগাটাকে নে কি বলচিলি?

ও? ও কিছু না! বলছিলাম আপনি ওকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন, ও কী করে করবে?

কেন?

ওর কি হুঁশ থাকে? ও তো সন্ধে হলেই তোমার অফিম চুরি করে খায়।

হ্যাঁ? ও-ও-ওরে হতভাগা! আজ ব্যাটাকে একবার হাতের কাছে পাই! আমার ছোটোচেলে ঠিক বলেচিল দেখছি। এও আরেক চোর!

এই দেখো দাদু, তুমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই আবার আমায়...

আচ্চা, আচ্চা হয়েচে! নে বল দেকি আর কী জানিস? ওকে চিনলি কী করে?

ওকে? কেন মন্দিরে। ও তো প্রায়ই মন্দিরে যায়। তোমাদের নামে পুজো দেয়। আমরা কতবার একসাথে বসে ভোগ খেয়েছি।

হু, আর?

তোমাকে খুব ভালোবাসে। নিজের বাবার মতো।

হু, ওর নিজের তো কেউ নেই! সেই ছোট্টো বয়সে ওই মন্দিরের তেকে নে এয়েচিলাম। সেই তেকেই এবাড়ি আচে। আমার নাতিটা তো ট্যাঁপাকাকা বলতে অজ্ঞান। যকন ও ছোটো ছিল, এখানেই থাকত তো ওরা। ট্যাঁপাই ওকে কোলে-পিটে করে বড় করেচে।

দাদু একটা কথা বলব? রাগ করবে না তো?

বল।

ও চোর না! অমন লোক চোর হতে পারে কখনও?

সে কী রে? এই যে বললি আপিম চুরি করে?

আহা, তা না! আমি বলছি আসল চুরি।

অ! ট্যাঁপা তোকে সব বলেচে তাহলে? অবশ্যি আমার মনও তাই বলে, জানিস? কিন্তু আমার ছোটোচেলে কদিন হলো দোকানে বসচে। ওর চুরি নাকি হাতেনাতে ধরেচে। বাড়ির সবাই তো পুলিশে দিতে গেচিল। আমি দোকানের কাজ ছাড়িয়ে এবাড়িতে নিয়ে এয়েচি। ফাইফরমাস খাটবে। চোকে চোকেও তাকবে।

হ্যাঁ তা ভালোই তো! অমন লোক

নিজের কাছে থাকাই তো ভাল। কত আপদে তোমায় দেখে।

বাড়ির লোকে মোটেও তা ভালো চোকে দেকে না, বুজলি? বলে চোরকে একেবারে বাড়ির মদ্দে ঢোকানো কি ঠিক?

যাদের মনে চুরি তারা তো একথা বলবেই?

অ্যাই! মুক সামলে। আমার ছোটোছেলে ওকে নিজের চোকে দেকেচে চুরি করতে।

আচ্ছা সে নাহয় হলো, তুমি নিজে কখনও দেখেছ, দাদু?

নাহ! কিন্তু আমার ছেলে তো দেকেচে। ও তো যে সে লোক না। মস্ত বড়ো ইঞ্জিনিয়ার। এই কদিন আগেই তো বিদেশ যাওয়ার কতা ছিল। গেল না। বলল বাড়ির ব্যবসা দেখবে। চাকরিবাকরি ছেড়ে, কলকাতার বাস ছেড়ে এই মফস্‌সলের পুরোনো বাড়িতে এসে উটেচে বউমা নিয়ে। সে তো দোকানে বসতে গিয়ে গোড়াতেই হাতেনাতে ধরে ফেললে ট্যাঁপাকে!

ওই তো দাদু। পরের চোখ দিয়ে দেখলে এই হয়। কলকাতার বাস, না ছাই! ও তো শ্বশুরের বাড়ি। আর চাকরি? সেও তো আর নেই গো। যে বাপের ব্যবসার নামে এতদিন নাক সিঁটকাতো সেটাই এখন তার ভরসা। এদিকে দোকানের পয়সা সরিয়ে নিজেদের খচর চালাতে গেলে তো ধরা পড়ে যাবে। তাই পথের কাঁটা ট্যাঁপাকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু পুরোপুরি পারেনি। তোমার জন্য!

এসব কথা তোকে ট্যাঁপা বলেচে, না?

মোটেই না! ওর অত বুদ্ধিও নেই, এসব খবরও রাখে না।

তাহলে কী করে জানলি?

কী করে আবার। আজ কতক্ষণ তোমাদের ঠাকুরঘরে এসে লুকিয়েছিলাম। জানো তো ওখান থেকে সব টের পাওয়া যায়, কোন ঘরে কে কী বলছে, মতলব ভাজছে, সব! আমি নিজের কানেই সব শুনেছি দাদু।

হুম! তা আজকে যে এরা কেউ বাড়ি থাকবে না, সব দল বেঁধে নেমন্তন্নে যাবে একতা তোকে কে বললে?

সেটা ওই ট্যাঁপাই বলছিল। বলল আজকে বাড়িতে বিকেলে কাজকর্ম তেমন নেই, তাই একটু ঝুলনের মেলা দেখতে যাবে।

কানাইবাবু এবার গুম হয়ে রইলেন। তাঁর মাথায় তো আকাশ ভেঙে পড়ছে। এই মুকুন্দ ছোকরা যা বলছে তা কি আদৌ বিশ্বাসযোগ্য? এ তো সব্বোনেশে কথা। শূন্যদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন ওপরের কড়িকাঠের দিকে।

যেখান থেকে হলঘরের বড়ো বাতিটা ঝুলছে সেখানে আলো পৌঁছয় না। ঘুপসি অন্ধকার। ঠিক যেমন অন্ধকার বাসা বেঁধে আছে তাঁর মনে। চেয়ে থাকতে কেমন যেন দম আটকে আসতে লাগল। নাহ! আর তোর পারা যায় না। এই যন্ত্রণা অসহ্য! তার চেয়ে এই মুকুন্দর সঙ্গে দুটো কথা বললে মনটা একটু হালকা লাগে বুঝি।

জানিস মুকুন্দ! ওই যে কালাকাঁদ খাচ্চিস ওই জিনিসটাই একদিন আমায় এই নবদ্বীপে টেনে এনেচিল। আমার বয়েস তখন তোরই মতো। চাল নেই চুলো নেই, একেনে সেকেনে ঘুরচি। ঘুরতে ঘুরতে একদিন দেকি রাসযাত্রায় এক কেত্তনের আসরে সারারাত গান হচ্চে। শীতের রাত। হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডা। মাতা গোঁজার ছাত নেই। পেটে একটা দানা পড়েনি সারাটা দিন। আমি ভিড়ে গেলাম সব লোকের সাতে।

হাঃ হাঃ! খুব ভালো!

হ্যাঁ, তারপরে শোন না! ওসব কেত্তন তো আমি মোটে শুনচি না, শুদু মাতার ওপরে শামিয়ানাখান আচে, তাই বসে আচি। আর কেত্তনগানের শেষে সবাইকে দুটো প্রসাদ দেবে, সেই লোভে। সেকেনেই এই মিষ্টি একটু ভেঙে দিয়েচিল একটুকরো। আহা কী সোয়াদ। আমি আবার মিষ্টির খুব ভক্ত। এক ময়রার দোকানে কাজে লাগলাম। সেই শুরু। তারপর একটু একটু করে কাজ শিখলাম। তারপর সারা মাসের মাইনেটুকু জমিয়ে জমিয়ে অনেক কষ্ট করে শেষে এই দোকান দাঁড় করিচি। এই জমি-বাড়ি-বাগান-পুকর সবকিছু।

হ্যাঁ গো, দাদু! তুমি অনেক কিছু করলে সারাটা জীবন ধরে। এই গোটা নদীয়ায় এই অ্যাত্তবড়ো মিষ্টির দোকান আর কটা আছে? ওই দোকানের কল্যাণেই তো তোমার এত বড়ো সম্পত্তি তাই না দাদু?

সবই শ্রীশ্রীরাধামাধবের কৃপা! অবশ্যি দোকানটার জন্য খাটতেও হয়েছে বিস্তর। সাধে কি আমাদের ওই রাবড়ি, ওই ক্ষীরদইয়ের এত নাম? কত দূরদূর আমাদের মিষ্টি যেত এককালে!

তুমি দোকানে বসতে পারো তো, দাদু! বসো না কেন?

এখন তো পোড়ো হয়ে গেছি কিনা। নিজের পায়ে দাঁড়াতেই পারি না। যে দোকানে এককালে দৌড়ে দৌড়ে কাজ করিচি, একেকদিনে লাকটাকার ওপরেও মিষ্টি বিক্কিরি করিচি, সেকেনে হুইলচেয়ার নিয়ে যেতে আর মন চায় না। কী আর করব বল? সবই অদৃষ্ট!

অদৃষ্ট নয় গো! তোমার পায়ে পক্ষাঘাত হয়েছে তো? তা কেন হয়েছে জান, দাদু?

হয়েচে বোধহয় আমার কোনো পাপে!

না গো! এখানেও সেই সর্ষের মধ্যেই ভূত!

তার মানে? আমার বড়ো ছেলে মস্ত

বড়ো ডাক্তার! সে নিজে আমার চিকিচ্ছে করচে আজ এত বছর!

চিকিৎসা না হাতি! সেই তো তোমাকে এইরকম অসুস্থ করেছে, গো!

তোর কি মাতাটাতা খারাপ হয়ে গেল? নাকি তুইও ওর ট্যাঁপার সাতে ভাগ করে আপিম খেইচিস? অ্যা? কার সম্মন্দে কী বলচিস জানিস?

বিশ্বার করো দাদু! আমি একদম ঠিক বলছি। ওই বড়োছেলেই দিদিমার মৃত্যুর পর তোমায় ওষুধ খাইয়ে খাইয়ে পঙ্গু করে দিয়েছে। আমি একথা নিজের কানে শুনেছি।

চুপ কর! একদম চুপ! কে রে তুই হতভাগা! তকন থেকে আবোলতাবোল বকচিস? তোর কোনো কতা আবি বিশ্বাস করি নে!

করো না?

না!

বেশ! চলো, নিজের চোখে দেখবে চলো।

কোতায় যাব? আমি কি চলতে পারি?

এসোই না।

ওকি? খাবারটুকু শেষ কর! গেরস্তের অমঙ্গল হবে যে!

মুকুন্দ খাবার ফেলেই উঠে দাঁড়াল। তারপর হাতটা কোমরের গামছায় মুছে কানাইবাবুর কাছে চলে এল। তারপর পাঁজাকোলা করে তুলে সোজা নিয়ে চলল রন্নাঘরে। কানাইবাবুর শত আপত্তি সে হেলায় উড়িয়ে দিল। তবে ছোকরার গায়ে জোর আছে।

রান্নাঘরে একটা পিতলের ঘটি ঢাকা দেওয়া। সেটা দেখিয়ে বলল, ''এটা কী দাদু?''

দুধ। কেন? কী হয়েচে?

এই দুধ তোমার খাওয়ার কথা তো

হ্যাঁ।

দেখো, এতে বিষ মেশানো আছে। ওই দেখ ওই পাত্রে দুধটুকু ঘটিতে ঢালতে গিয়ে মাটিতে পড়েছিল। তা খেয়ে ওই দেখ টিকটিকিটা মরে গেছে।

হে ভগবান!

তুমি ভেবেছ দাদু, তোমার বড়োছেলে পরিবার নিয়ে নিজের অমন বিরাট পসার ফেলে শুধু ঝুলনযাত্রা, জন্মাষ্টমীর পুজো এই সবের জন্য এবাড়ি এসেছে? মোটেই না! এটা একটা ছক। আজকে রাতে তোমার দুই ছেলে মিলে তোমাকে পুরোপুরি সরিয়ে দেওয়ার তাল করেছিল। এই দুধ তোমাকে ট্যাঁপা হাতে করে দিত, না জেনে। তোমার মৃত্যু হতো হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে। তোমার গুণধর ছেলে লিখে দিত তার বাবার মৃত্যু হয়েছে বুকের ব্যামোতে। আর কিছু উনিশ-বিশ হলে ফাঁসতো ওই ট্যাঁপা। কারণ আর কেউ তো বাড়ি নেই। ব্যাস! আর আজকের ফন্দি সফল না হলে ওরা আবার চেষ্টা করত।

কিন্তু আমার পরে এই সব তো ওদেরই! তাহলে ওরা আমায় মারতে চাইবে কেন?

অতদিন তর সইলে তো! তোমার দোকান, সম্পত্তি সব বেচে দিয়ে ওরা সবাই মিলে বিদেশে চলে যাওয়ার তাল করেছিল, তা জানো? কারা কারা কিনবে তা পর্যন্ত ঠিক হয়ে গেছে। তুমি বেঁচে থাকতে তো কিছুতেই রাজি হতে না। তারপর তুমি এত কৃপণ। বিলাসিতা মোটে পছন্দ করো না।

''নাহ্ রে মুকুন্দ! মরে গেলেই ভালো হতো রে'', কানাইবাবুর চোখে জলের ধারা'' এই দৃশ্য দেখার চেয়ে মরা ঢের ভালো, ঠাকুর এবারে তুলে নাও গো!'' কানাইবাবু একটুক্ষণ জোড়হাতে ওপরের দিকে মাথা তুলে দুচোখ বুজে রইলেন। মুকুন্দ তখনও তাঁকে ধরে দাঁড়িয়ে। শেষে একটু ধাতস্থ হলে চোখের জল মুছে বললেন ''চ, চ, এখান থেকে চ দেখি! হ্যাঁ রে, ট্যাঁপা কই, জানিস কিছু? ওর তো এতক্ষণে ফিরে আসার কথা।''

ও আজ আর এসেছে। দেখো গিয়ে যাত্রার আসরে গিয়ে মজে আছে। আর ভোরের আগে এখানে পা মাড়াবে না।

মরুগ্গে যাক! আপদ কোতাকার! আমি একেনে মরে থাকতুম, চোকে দেকতেও পেতনি!

উহু! ও না ফিরে এলে তোমায় ওই দুধ দিত কে? ভালোই হয়েছে, কী বল দাদু?

আর ভালো! এত কষ্ট করে ছেলেদুটোকে বড়ো করলাম, লেকাপড়া শেকালাম এত ঘটা করে বিয়ে দিলাম... সব বিফলে গেল। আমার নিজের সন্তান আমার বউমারা আমার মৃত্যুকামনা করে?

ছাড় ওদের কথা! যে যার কর্মফল ভোগ করবেখন। আর তুমি তো এতবড় ব্যবসায়ী মানুষ। সত্যি করে বল তো, এসব কিছুই কি টের পাওনি?

থাক, থাক! ওকতায় আর কাজ নেই! কিন্তু জানিস, আমার নাতি, ওই পাষণ্ড ডাক্তারের ছেলেটা কিন্তু মোটেও ওর বাপের মতো হয়নি। আমার দাদুভাইটা বড্ডো ভালো! তবে যেমন বুদ্দি তেমন চঞ্চল। আর মাজে মাজে যা এক একটা প্রশ্ন করে না, আমি হাঁ করে থাকি।

তাই?

হ্যাঁ রে! জানিস একদিন আমায় বলচে আচ্চা দাদুভাই, বিষ্ণুর অবতার মৎস্য, কূর্ম, বরাহ এগুলো তো ডারউনের বিবর্তনবাদের মত! মানে প্রথমে পৃথিবীতে এসেছিল জলচর প্রাণী, তারপর হলো উভচর, তারপর হলো স্থলচর। আবার একদিন বলে কী, বাংলায় যাকে বলে ব্যবহার ইংরেজিতে তাকেই বলে বিহেভিয়ার। ও নাকি ভেবে দেকেছে দুটো একই জায়গা থেকে এসেছে। ভেবে দেক, ওইটুকু ছেলের কত বুদ্দি?

হ্যাঁ গো দাদু! ওকে আসল শিক্ষাটুকু দিও, ও অনেক বড়ো হবে গো!

কানাইবাবু হলঘরে ফিরে এসে বেশ কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন খাটের ওপর। কিছু চিন্তা করছেন যেন গভীরভাবে। তারপর বললেন, ''বাবা মুকুন্দ, আমায় একটু সাহায্য করতে পারিস?''

সে হাসিমুখে বলল, ''নিশ্চয়ই দাদু। কী করতে হবে বল না।''

(দুই)

কানাইবাবুদের বাড়ির কাছেই নবদ্বীপ কোর্টের জজসাহেবের বাড়ি। আজ একটা অনুষ্ঠান ছিল। শহরের অনেক নামিদামি লোকের আসার কথা।

যথারীতি কানাইবাবুরও নিমন্ত্রণ ছিল বটে। তবে প্যারালিসিস হওয়ার পর থেকে সকলে তাঁকে খরচের খাতায় ফেলে রেখেছে।

জজসাহেবের বাংলোর গেটে চব্বিশ ঘণ্টা পুলিশ সিকিউরিটি থাকে। তারা খবর দিল গেটে বৃদ্ধ কানাইচরণ দাস একলা হুইলচেয়ারে অপেক্ষা করছেন, জজসাহেব অবাক হয়ে গেলেন! আজ সেই সকাল থেকেই বাইরে টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। জজসাহেব নিজেই একটা বড়ো ছাতা নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। তারপর নিজেহাতে হুইলচেয়ার ঠেলে কানাইবাবুকে নিয়ে চললেন ভিতরে। পিছনে একজন পুলিশ কনস্টেবল চলল ছাতা ধরে। কিন্তু কেউ লক্ষ্য করল না বাংলোর বিশাল বাগানে গাছের ঘন পাতার আড়ালে উঁকি মেরে সব দেখতে দেখতে মিটিমিটি হাসছে সেই মুকুন্দ।

কানাইবাবু যখন ফিরলেন রাত গভীর হয়েছে। আজ অনেকদিন পর বাড়ির বাইরে বেরোলেন, তা সে হুইলচেয়ারেই সই। মুকুন্দ প্রায় সারাটা সন্ধ্যে সঙ্গে সঙ্গে ছিল। একটা সম্পূর্ণ অজানা লোক, এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তাঁর পরম মিত্র হয়ে উঠেছে। যেন কতদিনের সম্পর্ক।

''বুজলি মুকুন্দ, আজ একটা খুব জরুরি কাজ সারা হয়ে গেল। ভাগ্যিস তুই এয়েচিলি! বেশ হালকা লাগচে। তবে এখন আবার শরীরটা কেমন যেন ছেড়ে দিচ্চে। একটু বিশ্রাম দরকার।''

বলে কানাইবাবু দেয়ালঘড়ির দিকে তাকালেন, বললেন, ''হুম, একাদশী ছেড়ে গেচে। আমাকে ওই জলচৌকির কাচে একটু নিয়ে চল তো বাবা'' মুকুন্দ চুপচাপ নির্দেশ পালন করল। কানাইবাবু সেই কলাপাতা থেকে অবশিষ্ট মিষ্টিটুকু তুলে মুখে নিলেন।

ওকি গো করছ দাদু, ও তো আমার এঁটো খাবার গো!

''খাবার জিনিস নষ্ট করতে নেই! আর এতে দোষের কী হলো? এও তো নরনারায়ণের প্রসাদ।'' বলে আর ঘটি থেকে জলটুকু গলায় ঢাললেন। তারপর হাতদুটো জড়ো করে মাথায় ঠেকালেন। মুকুন্দ তাকে ঘাটে এনে শুইয়ে দিল।

হ্যাঁ রে মুকুন্দ, তোর ট্যাঁকে ওটা কী রে?

এটা? এটা বাঁশী গো দাদু!

ও, তাই নাকি! তুই বাজাতে পারিস?

হ্যাঁ গো!

বাঃ! খুব ভালো। তা বাজা না একটু। মনটা একটু ভালো হবে! আমায় একটু খাটে শুইয়ে দে না বাবা।

কানাইবাবু শুয়ে শুয়ে হলঘরের বড়ো আলোটা নিভিয়ে দিলেন। আজ যেন চোখের জল কিছুতেই বাঁধ মানছে না। মুকুন্দকে নিজের শিয়রে বসালেন তিনি। সে বাঁশীতে একটা সুর ধরল। ভারী আশ্চর্য সুর। মন-প্রাণ সব জুড়িয়ে যায়। সব দুঃখকষ্ট যেন ভুলিয়ে দেয়। কানাইবাবুর চোখদুটো বুজে এল।

তন্দ্রার ঘোরে তিনি দেখলেন যেন পালাগানের আসার বসেছে। পালার নাম ননীচোরা। তিনি নিজেও অভিনয় করছেন তাতে। তাঁকে জজসাহেব জিজ্ঞেস করেছেন 'সংসার কী?' তিনি বলছেন 'সং সার যাহার!' ট্যাঁপা বাঁশি বাজাচ্ছে। আর পদকর্তার আসন আলো করে বসে তাঁর একমাত্র নাতি অনঙ্গমোহন।

গান বেশ জমে উঠেছে। এমন সময়ে যে টিকিধারী ব্রহ্মচারী তাঁর বাড়ি চাঁদা চাইতে এসেছিল, সে তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল, ''যিনি জন্ম ও মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি অর্থাৎ মোক্ষ প্রদান করবেন তিনিই তো মুকুন্দ!'' বলামাত্র সেই মুকুন্দ এসে দাঁড়াল তাঁর সামনে। মুখখানা ঠিক যেন নইচোরো মন্দিরের বিগ্রহের মতো। এসে তাঁর হাতদুটো ধরে ভুবনমোহন হাসি হেসে বলল, 'এসো!' আর শঙ্খ-বাদ্য-কাঁসর-উলুধ্বনিতে চারদিক মুখরিত হয়ে উঠল, আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। আর কোথাও যেন একটুকুল দুঃখ নেই, যন্ত্রণা নেই। শুধু আলো আর আলো! ওই ভোর হলো বুঝি!

(তিন)

পূর্ণিমার রাত। আজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা সমাপন হলো। কিন্তু ট্যাঁপার চোখে ঘুম নেই। আফিম তো দূরস্থান, আজ তিনদিন হয়ে গেল সে আহারনিদ্রা প্রায় ত্যাগ করেছে। তার প্রাণাধিক প্রিয় কত্তাবাবু গত শুক্লা দ্বাদশী তিথি ভোরে তাঁর নিজ বাসগৃহে সম্পূর্ণ সজ্ঞানে বৈকুণ্ঠধামে আরোহণ করেছেন। শেষ মুহূর্তে তাঁর মুখের ওই স্বর্গীয় হাসি, ওই অপূর্ব দ্যুতি সকলে অবাক হয়ে দেখেছিল। ট্যাঁপাও। সেই থেকে ওই দৃশ্য সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না। শেষযাত্রায় কত্তাবাবুকে সেই সাজিয়েছিল কিনা!

আজ সে অনাথ। কত্তাবাবুর ছবিখানার দিকে চেয়ে সেই কথা সারাক্ষণ ভেবে আর কেঁদে কেঁদে সে দুচোখ লাল করে ফেলেছে। কোন দুর্বিপাকে মাথার ওপরে ছাদটা যেন এক নিমেষে সরে গেছে। উলটে তার ওপরে এসে পড়েছে সাংঘাতিক এক দায়িত্ব। যার কল্পনা সে স্বপ্নেও করেনি।

গত পরশু পুলিশ এসে বাড়ির সকলকে ধরে নিয়ে চলে গেল। ওরা নাকি অনেকদিন ধরে কত্তাবাবুকে মারার চেষ্টা করছিল। যদিও পুলিশ বলেছে তাঁর বাবুর স্বাভাবিক মৃত্যুই হয়েছে। পরিবারের একমাত্র বংশধর বাড়ির নাতিটা এখন তার জিম্মায়। সেই

অনঙ্গমোহনের ভালোমন্দ, শিক্ষাদীক্ষা সব এখন থেকে তাকেই দেখতে হবে। বাঁচোয়া এই যে, জজসাহেবের মেয়েকে নাকি কত্তাবাবু বলে গেছেন ট্যাঁপাকে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতে।

এতদিন পরে একটা সন্ধ্যায় সে বাইরে গেছিল। তার মধ্যেই এতকিছু ঘটে গেল। সেইদিনই কত্তাবাবু তাঁর উইল করে গেছেন। জজসাহেবের বাড়ি গিয়ে। বড়ো বড়ো উকিল, মোক্তার নাকি সেদিন ওবাড়ি ছিল। তাঁদের দিয়ে লেখাপড়া করিয়েছেন। এমন উইল যার মাথামুণ্ডু সে বুঝে উঠতে পারছে না।

কত্তাবাবু তাঁর বহু কোটি টাকার স্থাবর-অস্থাবর সব সম্পত্তি দান করে গেছেন ননীচোরা মন্দিরে। ওরা বলে নইচোরা মন্দির। তবে ওই সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত অর্থ শুধুমাত্র দরিদ্রকল্যাণ ও শিক্ষার কাজে ব্যয় হবে। অবশ্য জীবদ্দশায় ধর্মীয় বিষয় নিয়ে কোনোকালেই বাড়াবাড়ি করেননি কানাইচরণ। আর দোকানখানা দেখবে ট্যাঁপা। সেখানে যা আয় হবে তার থেকে সব কর্মচারীদের আর চাকরবাকর মাসোহারা পাবে। বাকিটা মন্দিরে যাবে।

মন্দিরে যে সংস্কৃত টোল আছে অনঙ্গমোহন সেখানেও পড়াশোনা করবে। সঙ্গে ইস্কুলের পড়াও চলবে। মন্দির কর্তৃপক্ষ অনঙ্গমোহনের সব ভার বহন করবে শিক্ষা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত। তারপরে যদি সে মন্দিরস্থ শিক্ষালয়ে শিক্ষকতা করতে রাজি হয়, তবে সেও একটা মোটা মাসোহারা পাবে। তবে মন্দিরের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি ও আধুনিকীকরণের ওপরে তাকে জোর দিতে হবে।

কী উদ্ভট কাণ্ড! কত্তাবাবুকে ভালোমানুষ পেয়ে নির্ঘাত কেউ বুদ্ধি দিয়ে এইসব করিয়েছে। সেটা যে কে, ট্যাঁপা কিছুতেই ঠাহর করতে পারছে না। কিন্তু একটা বিষয়ে তার কোনো সন্দেহ নেই। সে রাতে নির্ঘাত বাড়িতে চোর ঢুকেছিল। কে জানে বাবুর এমন হুট করে চলে যাওয়ার সঙ্গে তার কোনো যোগ আছে কিনা? কত্তাবাবুর মৃত্যুর পর নানান ডামাডোলে কথাটা চাপা পড়ে গেল। কোনো জিনিস চুরি যায়নি বটে, কিন্তু সেই রাতে দোকানের জন্য ভাঁড়ার ঘরে রাখা কিছু ফল আর দই-মিষ্টি খোয়া গেছে। আর চুরি গেছে পুরো এক ভাঁড় মাখন, এক সরা মিছরি!

M/S. BELA ELECTRICAL WORKS

11/18, Anandapuri Co-operative Housing Society Ltd.
Durgapur - 13, (W. B.)

Electrical Engineers and Contractors

E-mail : belaarunkumar2000@gmail.com

PROP. ARUN KR PAUL

M. - 9434034087

রূপান্তর নয়, সংযোজনের আর এক নাম দুর্গাপুজো

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

থিম পুজো নাকি বনেদি বাড়ি?
প্যান্ডেল হপিং নাকি পাড়ার ছোটো পুজো?
স্ট্রিট ফুড নাকি খিচুরি?
আচ্ছা বালুচরি নাকি হালফিল ফ্যাশন?
আরও এটা না ওটা হাজার প্রশ্ন হাজির। সববারের মতো এবারও হাজির। পুজো এলেই এমন অসংখ্য অপশন আসে। এটাই পুজো। দুর্গাপুজো হলো ফিউশনের অন্য

নাম।

এটা বাঙ্গালির পুজোতো, তাই বাপারটাই একটু ক্লাসিক। সবার সব পুজো প্ল্যান এতক্ষণে নিশ্চয়ই হয়ে গেছে। অষ্টমীর শাড়ি বাছা হয়ে গেছে। নবমীতে কার বাড়িতে আড্ডা হবে সেটাও কথা চলছে। পুজোটা এখন একটা ফেস্টিভ্যাল! তাই না? এটাইতো রূপান্তর। টুকটুক করে বছরের পর বছর এগোতে এগোতে কখন কীভাবে যে পুজোটা আর ঠিক ভক্তির আসনে না থেকে উৎসব এবং তারপর ক্রমশ তা বানিজ্যের দিকে পা বাড়াল তা আমরা টেরই পেলাম না। আমরা সবাই গুটি গুটি পায়ে সেই বাজারকাড়া দুর্গাপুজোর অংশীদার হয়ে গেলাম। বনেদি বাড়ির পুজোতো এখন বাড়ির জন্যই। পুজো মানে এখন বিজ্ঞাপন হুল্লোর বিনিয়োগের ক্ষেত্র। একটু আজকের পুজোর রূপটা আগে পরিক্রমা করি। তারপর আমরা রেট্রোতে যাব। ঘুরে যাওয়ার চেষ্টা করব কেমন ছিল দুর্গাপুজোর ইতিহাস, তার শুরু। কেইই-বা করলেন শুরু। শ্রীরাম চন্দ্র? উনিতো অকালবোধন করেছেন। কিন্তু দুর্গাপুজো কি আর রামেরই ডাকে শুরু! মনেতো হয় না। যাই হোক। সে সব গল্প পুজো আড্ডায় করব। তার আগে একটু দেখিতো আমাদের আশপাশের সব পুজোর হিড়িক। কেমন যেন ফিকে হচ্ছে সাজপোশাকে বাঙ্গালিয়ানা, নিজস্বতা। কারণ, ওই যে বললাম এটা এখন বেশি বাণিজ্য, তারপর উৎসব, যদি কিছুটা বাঁচে তবে সেটুকু পুজো।

হ্যাঁ, আমরা বাঙ্গালি এবং তাই বাঙ্গালির দৃষ্টি দিয়ে পুজোর নবপত্রিকা স্নান থেকে ভাসান সবটুকু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার চেষ্টা করব। সাধারণত মানুষের হুজুগ পিছনের দিকে যে তাকাতে জানে না। সে বদলায়। বদলাতে বদলাতে সে ভুলে যায় ঠিক কেমন হওয়া ঠিক ছিল অষ্টমীর শাড়িটা অথবা কেমন খাওয়াদাওয়া করলে নিজেকে একটু বাঙ্গালি পেটুক মনে হবে। না! এসব মায়া আবেগ থেকে যে আমরা অনেকটাই ছিটকে যাচ্ছি।

পুজো যে তৃতীয় সারিতে অবস্থান করছে। বাঙ্গালির পুজোর বাঙ্গালিয়ানা দেখতে হলে একমাত্র গন্তব্য এখন বাড়ির পুজোগুলোই। বাড়ির পুজোতেই মন ভরে চোখ জুড়িয়ে দেখা যাবে আচারে প্রকৃতিতে সাজে গোজে ব্যবহারে একঘর বাঙ্গালিয়ানা। গরদের শাড়ি, নাকে নথ, পিতলের বাসনের টুংটাং নিজস্ব শব্দ — সব মিলিয়ে জানান দেয় একটা পুজো চলছে, উৎসব নয়। পুজোর পরে সময় থাকলে তবেই উৎসব। তারপাশে বারোয়ারি এইয়া সব পুজো। তাকে ঘিরে যে জমকালো সব আয়োজন, ভিড়, ভিড়ের মাঝে নানান রকম সাজ পোশাক সব যখন দেখছি মনে হচ্ছে একি দুর্গা পুজো নাকি কোনো অবাঙ্গালির এমনকী অভারতীয় উৎসব! হ্যাঁ সত্যিই যে এমনটাই মনে হচ্ছে আরও বেশি করে। বারোয়ারি পুজোগুলো উন্মুখ হচ্ছে আরও আরও আরও বেশি বিজ্ঞাপন পাওয়ার জন্য। পাচ্ছেও দিব্যি। লাভের মধ্যে এটাই হচ্ছে— সবটাই যে আউটসোর্সিং। কিছুকাল আগেও পাড়ার ক্লাবে যখন সরকারি অনুদানের কোনো গল্প ছিল না, তখনতো উদ্যোক্তা এবং তাদের বাড়ির মহিলারা পাড়ার মেয়ে- বউ-কাকিমা-জেঠিমা, দাদা, বন্ধু সবাই হাতে হাত দিয়ে পুজোর চারটে দিন মণ্ডপে থাকত। দল করে পালা বেঁধে কাজ চলত। রাত জেগে সন্ধিপুজো, আচার বিধি পালন। ধুনার গন্ধে সারা শরীরে এক অদৃশ্য মাদকতা পবিত্রতা প্রতিটা কোষে কোষে জানান দিত— এটা পুজোর বাহার। আজকে দেখান তো এমন একখানা বারোয়ারি পুজো। আছে কারও জানা? তবেতো সেটা নিয়েই একটা ছবি করা যায়, আসল ছবি তোলার মঞ্চ তবে সেই পুজোগুলোই হবে, যেখানে বাঙ্গালিয়ানা ষোলোআনা খাঁটি। যে মণ্ডপে সাজ পোশাকটাই বলে দেবে এটা বাঙ্গালির সেরা আয়োজন।

আড়ম্বরমুখর বারোয়ারি পুজো আয়োজনে যেমন কোনো ত্রুটি নেই তেমনই নেই বিন্দুমাত্র আন্তরিকতা, হাতে হাতে কাজ করার নেশা। সবটাই ফেলো কড়ি মাখো তেল। ধরুন, দক্ষিণ কলকাতার এক নামকরা বারোয়ারি পুজোর সামনে হাজির হলাম। গুঁতোগুতি হজম করে খুঁজে চলেছি কে বাঙ্গালির সাজে এসেছেন। খুঁজেই চলেছি। চারদিকে কেউ অমুক ধারাবাহিকের নকল সাজে তো তমুক ছবির স্টাইলের মাঞ্জা দিয়ে হাজির। চললাম অন্যখানে। অন্য পাড়ায়। বাঙ্গালিয়ানা খুঁজতে একটুও ক্লান্ত নই। দুর্গাপুজো তবুও নানাবিধ পশ্চিমি পোশাকে, ফিউশান ড্রেস, কনটেমপোরারি সাজে দলে দলে মেয়েরা হাজির। একবারও বলব না যে দেখতে অসুন্দর লাগছে, যেটা ঘটছে তা নামধারী দিনের সঙ্গে সাজসজ্জায় বেমানান। এখনতো সারা বছরে নানান উৎসব, অনুষ্ঠান লেগেই আছে। অঢেল সুযোগ মন খুলে সবরকম সাজগোজ করার। এই যে বছরের চারটে মাত্র দিন, এই চারটে দিনকে যদি দুর্গোৎসব ছেড়ে দুর্গাপুজো বলে অধিক গুরুত্ব দিত তবে বারোয়ারি মণ্ডপজুড়ে পুজোর সময়ও এমন ঝালমুড়ি মাখা পশ্চিমি পোশাকের ঢল দেখতে হতো না। সাজসজ্জা বহিরঙ্গের বিষয়। কিন্তু সেই সাজসজ্জাই জানান দেয় একটা বিশেষ দিনের প্রতি কতটা সম্মান, শ্রদ্ধা, ভক্তি, আন্তরিকতা রক্ষা করছি আমরা। সবটাই যদি ফোটোগ্রাফি নির্ভর হয়ে ওঠে তবে যে বাঙ্গালির নিজস্বতা

লেন্সের অনেক দূরে ছিটকে যাবে। এবার নির্ঘাত বলবেন—শান্তিপুরী, ধনেখালি, বেগমপুরী এসব পরে আবার ফ্যাশন হয় নাকি? তাহলে বিতর্কিত টেলিভিশন নায়িকা যখন এইগুলোর মধ্যেই একখানা শাড়ি পরে পরিপাটি বাঙ্গালি সাজে আসেন তখন তা কেমন করে বিজ্ঞাপনে চমক আনে? কেমন করে নেটিজেনদের খুশি করে! সিল্কের ওপর রান সেলাই দেওয়া কাঁথাস্টিচ, ওড়িশার বোমকাই, সম্বলপুরী, বিচিত্রপুরী, মহারাষ্ট্রের পৈঠানি, গুজরাটের বাঁধনি, অসমের মুগা, বিহারের ভাগলপুরী, মধ্যপ্রদেশের চান্দেরী, তেলেঙ্গানার পচমপল্লী এমন অসংখ্য অন্য প্রদেশের শাড়ি সাজকে বাঙ্গালিরা কবেই নিজের করে নিয়েছে। বিষয়টা হয়ে গেছে কলকাতার চাউমিনের মতো। চাইনিজ ফুড কিন্তু বাঙ্গালি স্টাইলে, ওই সব অন্য প্রদেশের শাড়িগুলোও ঠিক তেমনটাই। কিন্তু পুজোর সাজে উঠতি বয়সি থেকে মধ্য বয়সি পর্যন্ত সেই বাঙ্গালির সাজের হিড়িক পুজোর ক'টা দিন নিতান্তই ঠাঁই নেয় বাড়িতে, অর্থাৎ বাড়ির পুজোতে। তাই রাস্তা জুড়ে যেসব সাজসজ্জা দেখছি তাতে চোখ জুড়ালেও মন জুড়াচ্ছে কোথায়? সাজগোজ কি এতোটাই সহজ কথা! নারীর গাম্ভীর্য, আভিজাত্য, মর্যাদা দখল করে সাজসজ্জা। স্থান-কাল- পাত্র ভেদে তার পরিবর্তন হতেই পারে। কিন্তু হালফ্যাশন ধরতে গিয়ে যদি বাঙ্গালি সাজটাই ফুরুত হয়ে যায় তবে কি তা সইতে পারা যায়? ফ্যাশন কি আর কেবল সাজগোজকেই বোঝায়? না তো। এও এক গ্রহণযোগ্যতার সমষ্টি। মানুষের রুচিবোধ সমন্বিত ডিজাইন যখন সবার মাঝে প্রচলিত হয় তখন তাকে ফ্যাশন বলে। এটা একটা ঋতু, পুজো এবং উৎসবের কথা। তাই সেই সময়ের জন্য ফ্যাশনটাও হোক ততটাই জমকালো এবং তার চিকন সাজে থাকুক বাঙ্গালি ট্রাডিশন। কে বলে বাঙ্গালি সাজে নিজেকে আকর্ষণীয় করা যায় না! বহুবার দেখা গেছে ফ্যাশনচক্র রমরমা হয়েছে এবং তা সাধারণত পুজোর সময়ই হয়ে থাকে। বেলবটস্ থেকে ঘটিহাতা ব্লাউজ, গঙ্গাযমুনা পাড়ের শাড়ি থেকে খাটো চুড়িদার সবই গেছে ,আবার এসেছে। দুঃখের বিষয় এই যে, সাজে পোশাকে বারোয়ারি পুজোর ভিড়ে খাঁটি বাঙ্গালিয়ানা ম্রিয়মাণ। অলংকার থেকে শাড়ি

তাতেও উঠতি সাজের ছোঁয়ার অধিক দখলদারি। ব্যক্তিরুচির অন্তরালের মনস্তাত্ত্বিক রসায়ন তাদের যুগধর্মী হতে বলছে। স্টাইল হচ্ছে একজন ব্যক্তির নিজস্ব ধারা। সেটা কোথায়? সেটা অধরা যে। ফ্যাশনটারই রমরমা অনেক বেশি। নিজস্ব চিন্তা, সৃষ্টিশীলতা, চেতনা, আচরণ, ব্যক্তিত্বর যে বহিঃপ্রকাশ এই ফ্যাশনে ধরা দিচ্ছে, বলতে দ্বিধা নেই তা আকর্ষণীয় হলেও আভিজাত্যহীন অস্থিতিশীল। বাঙ্গালি সাজ পোশাকে নানান গঠনমূলক এবং সজ্জামূলক ডিজাইন এনেছে। তাতে রুচির কলস পূর্ণ থাকত। কিন্তু এখন মণ্ডপের ভিড় সাজ দেখে যা মনে হচ্ছে সবটাই কোনো না কোনো সিনেমা সিরিয়াল বা অভিনেত্রীকে অনুকরণ যা রুচি পরিপাটির ধারপাশ দিয়েও যাচ্ছে না।

আরও এক পরিবর্তিত বাঙ্গালিয়ানা পুজোতে চোখে পড়ছে। তা হলো খাওয়াদাওয়া। নিউ জেনারেশন যে বাড়িতে খেতেই চাইছে না। আরও আশ্চর্য এই যে বাঙ্গালির আয়োজনে বাঙ্গালি খাবার খেতে চায় না। কীজ্বালাতন বলুন তো। এমন দাবি করছি না যে আজকের পুজো মাতোয়ারা বাঙ্গালিদের 'ওগ্গারা ভত্তা গাইক ঘিত্তা'-তেই অর্থাৎ গাওয়া ঘি আর ফেনাভাতে তৃপ্ত থাকতে হবে। কিন্তু কেরামতিবাজ ব্যঞ্জনী বাঙ্গালিরা যদি মোমো, রোল, চাউমিন, সিজলার, সিজুইয়ান খেয়েই পুজোটা কাটায় তবে যে যন্ত্রণায় ছটফট করবে 'দুগ্ধতুম্বী, দুগ্ধ কুষ্মাণ্ড , বেশারী নাফরা/ মোচা ঘণ্ট, মোচা ভাজা, বিবিধ শাকেরা।' ভবানন্দ মজুমদারের স্ত্রী পদ্মমুখী রান্না করতেন 'রুই কাতলার তৈলে রান্ধে তৈল শাক / মাছের ডিমের বড়া মৃতে দেয় ডাক।' না না, আর ব্যঞ্জনবাহার আনব না, জিভে জল এলে যদি লেখাটাই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তবে? তবে কেমন করে পুজোর সময়টুকু পাতেও বাঙ্গালিয়ানা হারাচ্ছি আমরা। অষ্টমীতেও দেখেছেন বিরিয়ানির স্টলে ভিড় খানা? দৃশ্য ও দৃষ্টি দুইই বদলে গেছে। এও কোনো অপটিক্যাল ইলিউশন নয়। যেদিন কিনা খিচুড়ি খাওয়ার দিন সেদিন এমন যে জগাখিচুড়ি সব রদবদল ঘটবে তা পীড়া দেয় বই কী। বাঙ্গালিরা সবচেয়ে বেশি ফ্লেক্সিবল। তাই বর্মি ঘুঘনি আজ বর্মিদের চেয়ে বাঙ্গালিরাই বেশি খায়। মাংসের ঘুঘনি কলকাতার ট্রেড মার্ক। সবকিছু মিলিয়ে মিশিয়ে নিতে এবং তাকে বহন করতে আমরা ভালোবাসি। তা বলে পুজোর চারটে দিনও যদি ভিড়ের মাঝে খাঁটি বাঙ্গালিয়ানা পথ ছেড়ে একমাত্র বাড়ির পুজোতেই অবসর নেয় তবে তা আমাদের ট্রাডিশন রক্ষার অপারগতা। খাঁটি বাঙ্গালিয়ানা খুঁজতে ফোটোগ্রাফারকে দৌড়াতে হচ্ছে উত্তর কলকাতায় অথবা মফস্সলের কোনো আদি বাড়িতে। কিংবা ওই পুজোটা। যে পুজোটা এক অনামি স্কুলের মাঠে হচ্ছে, হচ্ছে এবারেও, চাঁদা তুলে তহবিল বানিয়ে। ওগুলোতে ভিড় হয় না। ঝাঁ ঝাঁ করে চারচাকা ওসব পুজোর দিকে না তাকিয়ে হাজির হয় বড় মন্ডপে, যেখান আতিশয্য আছে কিন্তু আভিজাত্য কম। বেনেডিক্ট অ্যান্ডারসন বহুকাল আগেই বলেছিলেন, জাতিসত্তার ব্যাপারটাই বড্ড গোলমেলে। তাই পুজোর সময় গুনে গুনে ষোলোআনা বাঙ্গালি হতেও একটা চর্চা ও রুচির পারাপারের ব্যাপার থাকে তো বটেই। একদিন যেন পুজো দেখতে গিয়ে শরদিন্দুর কথাই সত্যি না হয়ে যায়। শরদিন্দু একবার বাঙ্গালিয়ানা নিয়ে বলেছিলেন 'ধোকার টাটি'। বস্তুটা আসলে নেই কিন্তু আছে বলে বারবার ভ্রম হয়। অন্তত পুজোর কটা দিন শরদিন্দু যেন ফেল করেন। ঘনিয়ে উঠুক জামদানিতে বাঙ্গালির সাজ। শিকড়ের সন্ধান আবার তখনই আসে যখন শূন্যতার অনুভূতি হয়। মেয়েলি কলম, তাই চটপট সাজগোজ আর রান্নার কথাটা সেরে ফেললাম। না! অনেকক্ষণ হলো পুজোর অবাঙ্গালিয়ানার নিন্দা করলাম। সেই ফাঁকে দেরি হয়ে যাচ্ছে আসল পুজোর গল্পে পুজোর ইতিহাস। কে করল এই পুজোর শুরু? কবেই-বা হলো? তারপর শারদীয়া পুজোর চলই-বা কবে থেকে। এবং বাড়ি ছেড়ে মণ্ডপে কবে থেকে এল মা দুগ্গা? সে অনেক গল্প। কিছু ইতিহাস, কিছু বিতর্ক, কিছু কিছু প্রচলিত গল্পও আছে। কত পুজোতো লোকচক্ষুর আড়ালেই যেতে বসেছে। ঘন গভীর জঙ্গলে লুকিয়ে আছে চুপটি করে নিঃঝুমে লুকিয়ে গড় চণ্ডীধামের মা দুর্গা। কথিত, যে এটাই প্রথম দুর্গাপুজো। এখানেই বৈশ্যরাজা সুরথ বিশ্বের প্রথম দুর্গাপুজো সারেন। ভৌগোলিকভাবে যা বর্তমানে দুর্গাপুরের কাঁকসার গড় অরণ্যে অবস্থিত। মেধামুনির আশ্রমের পাশেই এই প্রাচীন দুর্গামন্দির অগুনতি অজানা ইতিহাস বন্ধ করে রেখেছে। আঞ্চলিক লোককথানুসারে সপ্তম শতকে মেধামুনির আদেশে নিবিড় অরণ্যে বসন্তকালে রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য দুর্গাপুজোর সূচনা করেন। বীরভূমের অন্তর্গত বোলপুরে বিশাল রাজ্য ছিল রাজা সুরথের। বহিরাগতদের আক্রমণে তিনি রাজ্য ছাড়া হলে এই অরণ্যেই তপস্যারত হন এবং মা দুর্গার উপাসনা শুরু করেন।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে উল্লেখ রয়েছে—

''ততঃ স্বপুরমায়াতো নিজেদেশাধিপোহভবৎ।
আক্রান্তঃ স মহাভাগস্তৈস্তদা প্রবলারিভিঃ।।
অমাতৈঃ বলিভিঃ দুষ্টৈ সুর্বলস্য দুরাত্মভিঃ।
কোষ বলঞ্চাপহৃতং তাত্রাপি স্বপুরে ততঃ।।"

আজ সংস্কারের অভাব এবং অনুমেয় বারবার বহিশত্রুর আক্রমণে মন্দির বারবার আক্রান্ত হয়েছিল। তা আজ জীর্ণ কিন্তু ইতিহাস জীবিত। হয়তো তা তেমন একটা প্রচলিত নয়। মন্দিরে শ্যাওলা, অশ্বত্থবিদীর্ণ কিন্তু ঐতিহ্য যে শাশ্বত।

শরতের এই দুর্গাপুজোতে আসলে মায়ের অকালবোধন। যদিও দেবী আরাধনার কোনো সময় হয় কি? তাঁকে বিশুদ্ধ চিত্তে যখনই আরাধনা করা হয় তখনই তিনি সাড়া দেন। কালিকাপুরাণ এবং বৃহদ্ধর্ম পুরাণ অনুসারে রাম ও রাবণের যুদ্ধকালে শরতে দুর্গাপুজো হয়েছিল। এতো অকালের পুজো। এই দুই পুরাণ অনুসারে শ্রীরাম চন্দ্রকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যেই ব্রহ্মা দুর্গার বোধন ও পুজো করেন। কৃত্তিবাস ওঝার রামায়ণেই সম্ভবত প্রথমবার এই অকালবোধনের সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। রাম যেখানে দুর্গার উপাসনা করছেন। এমনকী বাল্মীকির রামায়ণেও এমন কিছুর উল্লেখ নেই। অন্যান্য অনুবাদিত রামায়ণেও এমন কিছুর উল্লেখ পাওয়া যায় না। হংস নারায়ণ ভট্টাচার্যের মতে, ''অকালবোধন শরতের বৈদিক যজ্ঞের আধুনিক রূপায়ণ ছাড়া আর কিছুই না।''

মায়ের এই রূপ মহামায়া। তিনি ভগবতী দুর্গা। তিনি ঐশ্বর্যশালিনী। ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ,শ্রীজ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই ছয়টি মহাগুণের নাম 'ভগ'। এই ছয়টি গুণেই দুর্গা এক পূর্ণ রূপবতী। মহিমোজ্জ্বল। অকালবোধন ব্যতিরেকেও যদি দেখি, তবে দেখা যাবে নব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে দুর্গাপুজোর উল্লেখ রয়েছে। দুর্গাপুজোর প্রথম প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণ। দ্বিতীয়বার করেন ব্রহ্মা এবং তৃতীয়বার তা করেন মহাদেব। আবার ভগবত পুরাণ অনুসারে জানতে পারি, ব্রহ্মার মানসপুত্র মনু ক্ষীরোদ সাগরের তীরে দেবী আরাধনা করেন। আমাদের যে অকালবোধন তার উল্লেখ কালিকাপুরাণে রয়েছে। তবে দুর্গাপুজোর সবচেয়ে বেশি উল্লেখ পাওয়া যায় মার্কণ্ডেয় পুরাণে। এই পুরাণের তেরোটি অধ্যায় দেবী মাহত্ম্য নামে পরিচিত। শ্রীশ্রী চণ্ডী নামে প্রায় সাতশো শ্লোকবিশিষ্ট দেবী মাহাত্ম্যে যা ভরপুর। যা দুর্গাপুজোর অবিচ্ছেদ্য এবং স্থায়ী উপকরণ।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের মতভেদানুসারে চেদী রাজবংশের রাজা সুরাথ খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দে কলিঙ্গে দশেরা দুর্গাপুজোর প্রচলন করেন। পরিব্রাজক হিউ-এন-সাঙের পাণ্ডুলিপিতেও দুর্গার উল্লেখ রয়েছে। মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে দুর্গাপুজোর উল্লেখ রয়েছে। যদি ঢাকেশ্বরী মন্দিরের কথাই ধরি, এখানে দু' ধরনের স্থাপত্যরীতি উপস্থিত। এখানে দুর্গাপুজোর সঙ্গে সঙ্গে যে কালীপুজোরও চল ছিল তা স্থাপত্যরীতি থেকে অনুমেয়।

মহিষাসুরমর্দিনী ভাস্কর্য যে কবেকার তা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। সেগুলো সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর মাঝামাঝির আগে হবে না। এগুলি যদিও বঙ্গদেশে পাওয়া যায়নি। পাওয়া গেছে প্রয়াগের কাছে ভিটাগ্রামে ও মথুরায়। তবে এসকল ভাস্কর্যে দেবী বিনা অস্ত্রেই মহিষাসুরকে বধ করছেন। কুষাণযুগে প্রথম দেবীর হাতে ত্রিশূল এল। গুপ্তযুগেও দেবী শূলবিদ্ধ করছেন। বাদামি গুহা ও ইলোরাতে এবং উদয়গিরিতে অস্ত্রধারিণী মহিষঘাতিনী দেবীমূর্তি পাওয়া গেছে। উল্লেখ্য, প্রাচীন ও মধ্যযুগের এইসকল মূর্তিতে সিংহ অনুপস্থিত এবং মনুষ্যদেহধারী অসুর নেই। অসুরের ধারণা এনেছে বাঙ্গালিরাই। পালযুগে দেবীর সিংহবাহন রূপটিতে বহির্দেশের প্রভাব থাকলেও থাকতে পারে। বহির্ভারতীয় মেসোপটেমিয়ার ইশতার বা গ্রিসের রিয়া—এরা প্রত্যেকেই সিংহবাহনে অধিষ্ঠিতা এবং রণনিপুণা। আশ্চর্য এই যে, গ্রিক রণদেবী অ্যাথিনার সংগ্রাম এবং সিংহ সহচর আর আমাদের দুর্গার অনেক সাদৃশ্য। পুরাতত্ত্ব বিশেষজ্ঞ ব্রতীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের মতে দেবীমূর্তিতে সিংহ এবং অসুরের সংযোজনে মধ্য এশিয়ার প্রভাব উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

তবে একটা বিষয়ে খটকা থেকেই যাচ্ছে এত কথার মাঝে। শরতের অকালবোধন রামচন্দ্র করলেও শরতের মাতৃ উপাসনার রীতি কিন্তু প্রাচীন হরপ্পা সভ্যতাতেও পাওয়া গেছে। তা তো কৃত্তিবাসের থেকেও তারমানে প্রাচীন! সুকুমার সেনের মতে ঊষার উপাসনা শরতেই হতো এবং তামাল দাশগুপ্তের গবেষণাভিত্তিক লেখাতেও চোখে পড়েছে পাল সম্রাট গোপালের কথা। যিনি চুন্দার উপাসনা করতেন শরতেই। এই চুন্দাই কি তবে চণ্ডী বা সম্পর্কিত দেবী? আজকের দুর্গার বিবর্তনে যে পাল-সেন যুগের চণ্ডী এক মাইলফলক ছিলেন তার সঙ্গে সহমত নীহাররঞ্জন সেন। তারপর পাল সম্রাট মহীপালের সময় এক নবজোয়ার ঘটেছিল। এই সময়েই নারোপা নিগুমা সহজ আন্দোলন সংগঠিত হয় এবং প্রচুর দুর্গামূর্তি দেখা যায় এইযুগে। পালযুগে নবম শতকের শেষের দিকের মূর্তিগুলি দাক্ষিণাত্যের মতো অষ্টভুজা। দশম শতকে তা রূপ পরিবর্তিত করে হলো দশপ্রহরণধারিণী।

আরও এক বিস্ময়কর সাহসের ছবি রেখে গেছেন ১৪১৫-১৪১৯-এর মধ্যে দনুজমর্দনদেব ও মহেন্দ্রদেব। যাঁরা নিজেদের চণ্ডীচরণপরায়ণ বলে উল্লেখ করছেন। এরাও সিংহবাহিনী মাতৃকার উপাসক ছিলেন। ওই সময়কালে কান্দাহার থেকে কামরূপ অবধি কোনো ভারতীয় শাসক

নিজের মুদ্রা সচল রাখার সাহস করেননি। ব্যতিক্রম কেবল চণ্ডীচরণপরায়ণ দেবসম্রাট। যাঁরা মধ্যযুগের এই বর্বরতার মধ্যেও নিজেদের মুদ্র সচল রেখেছিলেন। দেবী ছিলেন বেশ কিছু মুদ্রায়। যদিও মহিষাসুরমর্দিনী মুদ্রা পাওয়া যায়নি। কিন্তু সিংহবাহিনী দেবী ছিলেন বেশ কিছু মুদ্রায়। তাহেরপুরের কংসনারায়ণ এর প্রায় ষাটবছর পর দুর্গাপুজোর প্রচলন করলেন। বহুল প্রচলিত যে কলকাতায় দুর্গাপুজোর চল আনেন রাজা নবকৃষ্ণ দেব। কিন্তু ইতিহাসে চাপা রয়ে গেছে চিত্তেশ্বরী খ্যাত ডাকাত চিতের কথা। সে ঘটা করে দুর্গাপুজো করত। যদিও চিত্তেশ্বরী দুর্গামন্দির প্রতাপাদিত্যের কালে প্রতিষ্ঠিত কিন্তু দুর্গাপুজোর চল কলকাতায় আনে চিতে ডাকু। বর্তমান বাংলাদেশের রাজশাহীর তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণ বারনই নদের পূর্বতীরে রামরামা গ্রামে বাদশা আকবরের রাজত্বকালে (১৫৫৬-১৬০৫) প্রায় লক্ষাধিক (আট লক্ষ) অর্থ ব্যয়ে দুর্গাপুজো করেন। তবে দুর্গাপুজোর রীতি রেওয়াজ নিয়ে নানান চর্চা করেছেন পণ্ডিতমহল। রঘুনন্দনের (১৫৪০–১৫৭৫) 'দুর্গাপুজা তত্ত্ব' গ্রন্থে রামকৃষ্ণের 'দুর্গার্চনকৌমুদী' নিবন্ধে, মিথিলার স্মার্তপণ্ডিত বাচস্পতি মিশ্রের (১৪২৫-১৪৮০) 'ক্রিয়াচিন্তামণি' এবং 'বাসন্তীপূজাপ্রকরণ' গ্রন্থে এবং অষ্টম শতাব্দীর ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে এই শারদীয়া দুর্গাপুজোর উল্লেখ ও বিবরণ রয়েছে। রঘুনন্দনের গ্রন্থে পুজোর আচার উল্লেখ রয়েছে। এর থেকেই অনুমান করা যায় পুজো তার অনেক আগেই রমরমিয়ে ঘটা করে হয়েছে। রঘুনন্দনের আগেও কৃত্তিবাস ওঝার বিবরণ রয়েছে। এখন প্রশ্ন এটাই, কৃত্তিবাস কি তবে কালিকাপুরাণ থেকেই অকালবোধনের ধারণা পেয়েছিলেন! সে যাই হোক। শরতকাল এলেই মনের মধ্যে আমাদের ঢাক কুড় কুড় করে। এ বিষয়ে যে কৃত্তিবাস হিরো হয়েছেন তা নিয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তবুও ঢাকের আওয়াজের ফাঁকে ফাঁকে একটু ঘেঁটে দেখি না! কেমন করে কৃত্তিবাস এমন একটা কনসেপ্টের আয়োজন করলেন। কৃত্তিবাসের আগে চতুর্দশ শতাব্দীতে পণ্ডিত শূলপাণি (১৩৭৫– ১৪৬০) রচনা করেছিলেন 'দুর্গোৎসব বিবেক', 'বাসন্তী বিবেক' এবং 'দুর্গোৎসব প্রয়োগ' নামের তিন তিনটি স্মৃতিশাস্ত্র প্রবন্ধ। যেখানে মায়ের অকালবোধন এবং চিন্ময়ী মৃন্ময়ী রূপের উল্লেখ রয়েছে। একই সময়ে কবি বিদ্যাপতিও (১৩৭৫–১৪৫০) লিখছেন একই বিষয়ের ওপর 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী' (১৪৭৯)। শূলপাণিরও পূর্বে পণ্ডিত জীমূতবাহন (আনুমানিক ১০৫০–১১৫০) রচনা করলেন 'দুর্গোৎসব নির্ণয়' নামক স্মৃতিগ্রন্থ। এছাড়াও 'কালীবিলাসতন্ত্র' অগ্নিপুরাণের ৯৮ অধ্যায়, ৩২৬ অধ্যায়, গরুড় পুরাণের ১৩৫ এবং ১৩৬ অধ্যায় এমন বেশ কিছুখানে গৌরীপুজোর বা দুর্গাপুজোর বিধি উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং দ্বাদশ শতাব্দীর থেকেও আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে। ঢাকের কাঠি ঢ্যাক কুড় কুড় করে সেই কোন প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে বেজেই চলেছে। আচার্য শশীভূষণ দাশগুপ্ত 'ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য' গ্রন্থের 'দেবীর বিচিত্র ইতিহাস' অংশে সে কথাই জানিয়েছেন। তাই বাঙ্গালির দুর্গাপুজোর সবটা ক্রেডিট একা কৃত্তিবাসকে দেওয়া চলবে না। বাঙ্গালির ইতিহাসে কৃত্তিবাস অতি উজ্জ্বল কারণ সেবার দেবীর পুজো করলেন শ্রীরামচন্দ্র। তাই তা ভিন্ন মাহাত্ম্য পেল। কিন্তু ইতিহাস প্রিয় বাঙ্গালিকে স্বজাতির দলিল যে খুঁজতেই হবে।

পুজোর ব্যাপ্তির ক্ষেত্রে যতই কংসনারায়ণের নাম আসুক না কেন তার আগেই সেই কাজে ফিতে কাটেন বিষ্ণুপুরের মল্লরাজারা। কুলদেবী মৃন্ময়ীর পুজো ৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে জগৎ মল্ল শুরু করেছিলেন। তবে এই প্রতিমা ঠিক আজকের প্রতিমার মতো ছিল না। এমনভাবে ভরা সংসারে দুর্গার আগমন ঘটেনি তখনও। পটের দুর্গাপুজোও ওরাই করেন। তারপর কংসনারায়ণ। কংসনারায়ণের পর নদীয়ার ভবানন্দ মজুমদার, বড়িশার সাবর্ণ রায়চৌধুরী, কোচবিহারের রাজা এক এক করে সবাই সপ্তদশ শতাব্দীর শুরুতেই দুর্গাপুজোর সূচনা করলেন। কলকাতার কংসনারায়ণের পুজোর পরেই ঘটা করে অর্থব্যয়ের পুজোর হিড়িক শুরু হলো। অথচ লক্ষ্য করতে হবে, রাঢ়বঙ্গের দুর্গাপুজো তখনও একটু ভিন্ন চালে চলছে। পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতায় ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে তৈরি দেবী সর্বমঙ্গলার মন্দির, হুগলীর বালি দেওয়ানগঞ্জ দুর্গামন্দির বিশেষত্বের দাবিদার। কিন্তু তখনও তো বারোয়ারি পুজোর চলটাই ছিল না। তবে কবে এল এই বারোয়ারি পুজো? ১৭৯০ গুপ্তিপাড়ার বারোজন ইয়ারি অর্থাৎ বন্ধু মিলে এক পুজোর আয়োজন করলে তারই নাম হলো বারোয়ারি। তাহলে কী দাঁড়াল, দেবীর পুজোর জন্য সবাই মিলে একজোট হয়েও করা যায় তো বেশ। ব্যাস, বাঙ্গালি স্বাদ পেল একসঙ্গে হাতে হাত রেখে আয়োজনের। এই গুপ্তিপাড়ার পুজো দেখেই ১৮৩২ সালে কাশিমবাজারের মহারাজা হরিনাথ শুরু করলেন বারোয়ারি দুর্গাপুজো। তার আগে পর্যন্ত কলকাতার পুজো বলতে বিখ্যাত ছিল ১৭৮২-র খিদিরপুরের ভূকৈলাশ রাজবাটীর জমিদার জয়নারায়ণ বাহাদুর (১৭৫২–১৮২১) বাড়ির পতিতপাবনী দুর্গামন্দির, ১৭৬০-এ দর্জিপাড়ার দাঁ বাড়ির পুজো। হয়তো বাদ পড়ে

যাচ্ছে আরও কিছু নাম। তবে পোস্তার রাজা সুখময় রায় দুর্গাপুজোয় প্রথম নাচ গান আর সুরার ফোয়ারা ছোটান। হয়তো পুজোটাকে উৎসবে শুরুর প্রথম ঈঙ্গিত উনিই দিয়েছিলেন। তারপর কলকাতার জমিদারেরা সুখময়কেই নকল করতে শুরু করল। পুজোতে বাইজি নাচের আসার জমত। রাজা নবকৃষ্ণ তো সুরার ফোয়ারা ছুটিয়েছিলেন। ইংরেজরা আমন্ত্রিত হতো কিনা! তাই এই বাড়তি আয়োজন। সেই বাবু কালচারের পুজোতে সেজে উঠত শোভাবাজার রাজবাড়ি থেকে বহুবাজার, কাঁসারিপাড়া, জোড়াসাঁকো, পাথুরিয়াঘাটা, ভবানীপুর থেকে গোপীমোহন ঠাকুরের পুজো। বাবু নিমাই চরণ মল্লিক তো সংবাদ শিরোনাম পর্যন্ত দখল করলেন—এমন পুজোর হুল্লোড় হলো একবার। ১৮৪০ সালে শিবকৃষ্ণ দাঁ-র পুজোতে যাত্রা বসত। এই পরিবারের পুজোতে মণিমালায় দেবী সজ্জিত হতেন। সেটাও হয়ে উঠল একটা প্রতিযোগিতা। কার প্রতিমা কত প্রাচুর্য ধরে। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সময় থেকে ঠাকুরবাড়িতেও ঝলমলে পুজোর পর্ব শুরু হয়। ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমলে এমন জমকালো পুজো হতো যে দেবীর অঙ্গ শোভাতেই নিরঞ্জন সম্পন্ন হতো। দেবীর অলংকার মাঝিরাই রেখে দিত। এই ভাবেই পুজো গেল বদলে। কোথায় যেন ম্লান হয়ে গেল। অম্বিকা কালনার প্রতাপেশ্বর মন্দির (১৮৪৯), বর্ধমানের শ্রীবাটির বীশ্বেশ্বর মন্দির, বালির দেওয়ানগঞ্জ কিংবা হুগলী আটপুরের রাধাগোবিন্দ মন্দির (১৭৮৭), কোতলপুর রাজরাজেশ্বর মন্দির (১৬৯৪), গিরিগোবর্ধন মন্দির থেকে বাঁকুড়ার শ্রীধর মন্দির প্রতিটা কারুকার্যে মহিষাসুরমর্দিনী। কিন্তু আজকের দুর্গা মানেই তা হয়ে উঠেছে প্রাচুর্যের গল্প, বিনিয়োগের প্রতিযোগিতা, অর্থের ছড়াছড়ি। হুতোমপ্যাঁচার নকশাতে যেমন বিলাসী দুর্গাপুজোর উল্লেখ ছিল, যেখানে পুজো আছে কিন্তু অধিক রয়েছে দেখানদারি। আজকেও সে ট্রাডিশন চলছে। রমরমিয়ে ছুটছে।

তবে দুর্গাপুজো এবং জাঁকজমক যে এই বাবুকালচারের আমলেই শুরু এমনটাও বলা সম্পূর্ণ ঠিক হবে না। ১৭৫৭-র ২৩ জুন, পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদদৌলার পরাজয়ের বছরই তো শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণদেব পলাশীর যুদ্ধ স্মরণীয় করে রাখতে মহা ধুমধামে পুজো করলেন। যা আগেও উল্লেখ রয়েছে। সেই পুজোতে ক্লাইভ এবং ইস্ট ইন্ডিয়া

ঁপূর্ণচন্দ্র দাস

পূর্ণচন্দ্র দাস মেমোরিয়াল এডুকেশনাল ট্রাস্ট-এর পক্ষ থেকে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে সকলকে জানাই প্রীতি, শুভেচ্ছা ও হার্দিক অভিনন্দন।

আগামী দিনগুলো হয়ে উঠুক উৎসবমুখর ও আনন্দময়।

অধ্যাপক ডঃ কালোবরণ দাস

প্রতিষ্ঠাতা, পূর্ণচন্দ্র দাস মেমোরিয়াল এডুকেশনাল ট্রাস্ট
ইলশোবা-মণ্ডলাই, পাণ্ডুয়া, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ
মোঃ ৯৯৩২৬৮১৫৪০

কোম্পানির রথী মহারথীরা উপস্থিত ছিলেন। তারপর একে একে পুজোর চল যা আলোচিত। কিন্তু এরই মাঝে ঘটে গেল এক বিপ্লব, পুজো হয়ে উঠল বিপ্লবের মঞ্চ। যে দেবী দুর্গতিনাশিনী তিনি সত্যিই হয়ে উঠলেন ইংরেজনাশিনী। যে ইংরেজদের তোষামোদ করতে ঘটা করে পুজো শুরু হয়েছিল সেই ইংরেজদেরই ঘায়েল করতে পুজো শুরু হয় ১৯১৯ নাগাদ। কলকাতা, খুলনা, রাজশাহী সর্বত্র তখন স্বদেশির জোয়ার। এক নতুন উত্তেজনা উদ্দীপনা। ঘরে ঘরে তরতাজা তরুণরা তখন এক একজন অসুরবিনাশীর ভূমিকায়। এখানে ওখানে ছোটো ছোটো অসংখ্য বিপ্লবী দল। তাদের এক ছাতার নীচে আনতে হবে তো। তাই ঠিক করা হলো দুর্গাপুজোই হোক যথার্থ সময়। যখন মা দুর্গাকে উপলক্ষ করে স্বদেশি চেতনায় উদ্বুদ্ধ যুবকদের একত্রিত করলেন সুভাষ চন্দ্র বসু। তিনিও শুরু করলেন বারোয়ারি দুর্গাপুজো। ১৯২৭-এ বার্মার জেল থেকে ছাড়া পেয়ে যখন সেবামূলক কাজে নিমগ্ন ঠিক তখনই দক্ষিণ কলকাতার আদি লেক পল্লীর পুজো, মধ্য কলকাতার ৪৭ পল্লীর পুজো, উত্তর কলকাতার বাগবাজার, কুমারটুলি, সিমলা ব্যায়াম সমিতি এই প্রত্যেকটি পুজো তাঁরই হাতে শুরু। অধিবাসীদের মধ্যে একতা, জাতীয়তাবোধ গড়ে তুলতে মাধ্যম হলো মায়ের পুজো। প্রত্যেকটা পুজোর উদ্দেশ্য সেদিন স্বদেশে চেতনার জাগরণ ঘটানো। পুজো চত্তরে বাইজি আসর বসত না, হতো স্বদেশি আড্ডা, আলোচনা, গান, নাটক। মণ্ডপগুলো ছিল প্রকৃতই মায়ের সেবাতীর্থ। মা দুর্গা এবং ভারতমাতা সেদিন একরূপে উপাসিত। স্বাধীনতা সংগ্রামী চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও এই সকল পুজোর সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। ঋষি অরবিন্দ ও বাঘা যতীন ঘনিষ্ঠ সহযোগী যুগান্তর দলের নেতা বিপ্লবী অতীন্দ্রনাথ বসু সিমলা ব্যায়াম সমিতি প্রতিষ্ঠা করলে সেখানে গড়ে উঠল কুস্তি লাঠি খেলার আখরা। ১৯২৬-এ অতীন্দ্রনাথ এখানেই প্রথম পুজোর প্রস্তাব আনেন। মহাষ্টমীর দিনটা ছিল বীরাষ্টমী। সাহসিকতা এবং শারীরচর্চার বাৎসরিক পরীক্ষার দিন ছিল এটি। সুভাষচন্দ্র বসু বেশ কয়েকবার বীরাষ্টমীর উদ্বোধন করেন। ১৯২৮-এ সে কী জাঁকজমক বীরাষ্টমীর। সিমলা ব্যায়াম সমিতির তৃতীয় বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় সেবার শরৎ চন্দ্র বসু, সুভাষচন্দ্র বসু, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণ মুখোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত কে হাজির ছিলেন না। ১৯৩০-এ সুভাষচন্দ্র বসু কলকাতার মেয়র নির্বাচিত হলে তিনি সিমলা ব্যায়াম সমিতির সার্বজনীন দুর্গাপুজোর সভাপতি নিযুক্ত হন। না, লোকদেখানি অলংকারের বৈভবে না, সেবার মায়ের বসন ছিল দেশীয় খাদি। দেবীর পরনের সব অলংকার ছিল মাটির। অস্ত্র ছিল দেশীয় লোহার, তামার। এমন অমূল্য প্রতিমা সুভাষচন্দ্র বসু হাতেই তো গড়ে ওঠে। তাতো আর ইংরেজ তোষামোদি জমিদার গড়তে পারে না। পুতুলনাচ, যাত্রাপালা, কবিয়াল সবকিছুতেই স্বদেশ ভাবনা। যেন উপচে পড়ছিল দেবীর শোভা। ইংরেজদের পত্রিকা 'অ্যাডভানস' সিমলার দেবী আরাধনাকে 'স্বদেশী ঠাকুর' বলে উল্লেখ করেছিল। সুভাষচন্দ্র বসুই মোচ্ছবের দুর্গোৎসবকে দুর্গাপুজোয় ফিরিয়ে আনলেন। এতটাই জোরালো হলো স্বদেশি পুজো যে ভীত ইংরেজরা ১৯৩২-এ নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হলোএ । পর পর তিনবছর বন্ধ রইল পুজো। বন্ধ বললেই বন্ধ। আবার ১৯৩৯-এ মহেন্দ্র দত্তের তৎপরতায় শুরু হলো পুজো। ১৯৩৬-এর বাগবাজার পুজো বেশ উল্লেখযোগ্য। সেবার সরলা দেবীর পরিচালনায় বীরাষ্টমী উৎসব সূচনা হয়। সেবার উদ্বোধনে সরলা দেবী বলেন, ''কাপুরুষতা, ভীরুতা সব মায়ের চরণে অর্পণ করে দেশ মাতৃকার পুজোর জন্য তৈরি হতে হবে। সে পুজোর জন্য প্রয়োজন শুধু ত্যাগ।" এমন অর্ঘ্য কোনো বনেদি বাড়ির সোনার প্রতিমা পেয়েছে বলে তো মনে হয় না। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, নলিনীরঞ্জন সরকার যুক্ত হন এই পুজোর সঙ্গে। ১৯৩২- এ শুরু হলো হরিমোহন পালের সভাপতিত্বে এবং সম্পাদক দ্বারিকানাথ দাসের নেতৃত্বে কুমারটুলি পুজো। ১৯৩৮-এ এক আজব কাণ্ড ঘটালেন সুভাষচন্দ্র বসু। সবাই তো একেবারে হতভম্ব! এমনটাও মাথায় আসে কেমন করে। সুভাষচন্দ্র বসু উমার সংসার ভেঙেই ফেললেন। ঘটনাটা ভারী অন্যরকম। ওই বছর তিনি যখন পুজো কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হলেন সেই বছরই পঞ্চমীর দিন পুজামণ্ডপটি ভস্মীভূত হয়। এবার উপায়? পুজো তো হবেই হবে। তখন এক রাতের মধ্যে ভাস্করশিল্পী গোপেশ্বর পালকে তিনি বুদ্ধি দেন একচালার প্রতিমা নয়, ছেলেপুলে আর পার্বতী সব পৃথক পৃথক ভাবে নির্মাণ হোক। তাতে একই সময়ে অনেকগুলি মূর্তির কাজ সম্পন্ন করা যাবে। ব্যাস শুরু হলো নতুন স্টাইল। বাঙ্গালি নতুনত্ব পেলে ছাড়ার পাত্র নয়। যে কথা দিয়ে পুজোর প্রবন্ধ আড্ডার শুরু ছিল। তাই ছেলে-মেয়ে আর উমার একচালার থেকে বেরিয়ে

আসার সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা পেতেও বেশি সময় লাগল না। সুভাষচন্দ্র বসু সংস্কার এবং স্টাইল দুটোই দিয়ে গেলেন বাঙ্গালিকে। বাঙ্গালির উৎসবকে অনেকটা পুজোয় ফিরিয়ে আনলেন তিনি।

একে আধুনিক দুর্গাপুজোর অলংকার বলব না বাঙ্গালির অহংকার তা সত্যিই ঠিক বুঝতে পারছি না। দুর্গাপুজোর হাজার কথা হয়। তা এই পুজোতে শেষ হবে না। দুর্গামূর্তির বহু বিবর্তন হয়েছে। আদি বাঙ্গলার প্রতিমার মুখ ত্রিকোণাকার, দুই কপাল চাপা। পাতলা ওষ্ঠ, উন্নত নাসিকা। ঘন বঙ্কিম ভ্রূ। তারপর কেমন করে বদলাতে বদলাতে তা ব্রিটিশ যুগে ডাকের সাজ হয়ে গেল তা আমরা টেরই পেলাম না। রাজা কংসনারায়ণের আমল থেকেই পটের প্রচলন কমতে শুরু করল। বাড়ল মাটির প্রতিমার কদর। আর অদ্ভুতভাবে লক্ষ্মী-সরস্বতী-কার্তিক-গণেশ সবাই মিলে ঘর আলো করে দেবীর পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু কবে থেকেই-বা এর সূচনা তা বলা খুব কঠিন। মেধসমুনি মহিষাসুরমর্দিনীর সঙ্গে দেবী লক্ষ্মী-সরস্বতী, মতভেদে জয়া-বিজয়ার উপাসনা করতেন। ত্রিদেবীর আরাধনা তখনই ছিল। লক্ষণীয় নবদ্বীপের রাস উৎসব। সেখানে এখনও ত্রিদেবীর পুজোই করা হয়। গণেশ-কার্তিক সেখানে কোথায়? অনুমেয়, পরবর্তীতে যখন গিরিনন্দিনী রূপের পুজো উত্তরভারতে শুরু হলো সেখানে হাজির হলেন গণেশ ঠাকুর। আর কেউই কাউকে তারপর ছাড়ল না। দেবীর সঙ্গে ধীরে ধীরে এক কাঠামোয় চলে এল সবাই। আমরা বাঙ্গালিরা দুর্গামূর্তিকেও ঠিক যেন বর্মী ঘুঘনির মতো গ্রহণ করেছি। একা দেবী নয়, পুরো সংসারের পুজো এক ছাদের তলে— এই আমরাই করি। এখনও বাঙ্গালি বনেদিয়ানায় একটা বিষয় অটুট রয়েছে। তা হলো প্রতিমার চালি। এখনও অনেক বনেদি বাড়ির পুজোতে প্রাচীন ধ্রুপদী চালই ব্যবহার করা হয়। হাজার বছরের শাক্ত শিল্পের পীঠস্থান এই বঙ্গভূমি। এত থিম পুজো। যার অনেকসময় না আছে মাথা আর না মুণ্ড। কিন্তু অবিচল এখনও সেই ধ্রুপদী রীতি। যা স্বয়ং ইতিহাস। যা স্বয়ং প্রমাণসিদ্ধ। যা হাজার বছরের শৈল্পিক ঘরানার কথা ফিসফিস করে বলে। বলে বৈষ্ণব প্রভাবে অনেকটাই চরা ধরেছে শাক্তরীতিতে কিন্তু কেউ কাউকে আটকাতে পারেনি। শেষমেশ তাই মেলবন্ধনের কথা বলে বাঙ্গালির দুর্গাপুজো।

এ এক এমন পুজো যা কোনো স্টাইল, রীতি, কায়দাকে বর্জন করেনি। এই পুজো বাঙ্গালিকে একাত্মবোধের পাঠ দিল। চৌধুরি চালি হোক কিংবা মার্কিনি চালি পুজো কিন্তু রমরমিয়ে হয়েছে। ঠাকুরের বাংলা চালি আর মঠমৌরি চালিতেই কত পার্থক্য। প্রথমটি যেখানে সম্পূর্ণ মৃত্তিকার একচালার, সেখানে দ্বিতীয়টি সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ — এই তিন গুণের সাপেক্ষে তিনটি অর্ধচন্দ্রাকার চালিতে অবস্থিত। যা শক্ত দর্শনে পূর্ণ। এত পার্থক্য তবু তো বিরোধ নেই। দুর্গাপুজো দুর্গামূর্তির যতবার রূপান্তর ঘটেছে ততবারই যেন স্থিতিস্থাপক বাঙ্গালির আরও একবার জন্ম হয়েছে। যে বাঙ্গালির মাটি প্রত্যেকে মতাদর্শের পুজোকেই গ্রহণ করেছে। মৌর্যযুগ থেকে আজকের দিন পর্যন্ত ক' হাজার বার যে পুজো ও প্রতিমার রূপান্তর হয়েছে তা হয়তো আমরা কেউই জানি না। আমরা শুধু জানি এটা সবার পুজো। সব ভাবনার মিলনের-গ্রহণের নাম দুর্গাপুজো। দেবী সিংহে কী ঘোটকে (কংসনারায়ণের মূর্তিটি ঘোটকে ছিল) তা গৌণ। দেবী দুর্গতিনাশিনী অভয়দাত্রী, তাই কালে কালে তিনি বোধনে এবং অকালবোধনে হাজির। দুর্গাপুজো তাই প্রাণের পুজো।

তথ্যসূত্র ঃ

১। হুতোম প্যাঁচার নকশা—কালীপ্রসন্ন সিংহ

২। বাঙ্গালার ইতিহাস—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

৩। বাংলা দেশের ইতিহাস, প্রাচীন যুগ—রমেশ চন্দ্র মজুমদার

৪। সুভাষ স্মৃতি

৫। মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গার যুগান্তরে রূপান্তর—তরুণ কুমার বিশ্বাস, দেশ, ১৩-৯-১৯৮০

সুজাতার পায়েস

সমাজ বসু

সাবধানে যাস মা সুজু। চারদিকে যা থমথমে পরিবেশ। আমার তো রীতিমত ভয় হয়। রুমালটা মেয়ের নাকের ওপর বাঁধতে বাঁধতে সুজাতাকে বললেন বিজয় মণ্ডল।

—বাবা তুমি একদম চিন্তা করো না, আমি ঠিক চলে যাবো। সুজাতা, বিজয় মণ্ডলের সুজু-মা বাবাকে আশ্বস্ত করল।

—তোকে তিরিশ টাকা দিলাম মাস্ক কেনার জন্য, তুই সেটা দিয়ে পাউরুটি বিস্কুট কিনে রাস্তার কুকুরগুলোর পেছনে খরচ করলি। বিজয় মণ্ডল কাতর স্বরে বললেন।

—বাবা, ওরা যে বড়ো অসহায়। এই সময় ওরা খিদের জ্বালায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটু খাবার যে ওদের খুব দরকার।

—কিন্তু মা নিজেকেও তো বাঁচতে হবে। এই যা মারণ রোগ

শুরু হয়েছে, যতদূর সম্ভব শরীরে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

—আর কথা বাড়িও না, অনেক বেলা হলো। এরপর রোদের তেজ আরও বাড়বে। খুব অসুবিধায় পড়বি। সুজু , তুই এখন এগো মা— বাবা মেয়ের উদ্দেশে কথাগুলো বললেন বিজয় মণ্ডলের স্ত্রী অনুপমা দেবী।

ইলেকট্রিক মিস্ত্রি বিজয় মণ্ডলের স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে ছোট্ট সংসার। অভাবের সংসারেও মেয়েটা লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে। মেধাবী না হলেও পড়াশুনোয় মন আছে। আর ভীষণ পরোপকারী স্বভাবের। কারও কষ্ট দেখতে পারে না। দিন-আনা দিন-খাওয়া সংসারেও যতটুকু পারে বাঁচিয়ে রাখে পরের জন্য। সেবাধর্ম এমনই, কোনো অভাব কিংবা বাধাই ছুঁতে পারে না। প্রবল এক মানসিক শক্তি আর পরম শান্তিই তাদের চালিত করে। বাবা-মেয়ের এইরকম উদার ও একনিষ্ঠ মনোভাবে মাঝে মাঝে বিরক্ত হন অনুপমা দেবী। কিন্তু দুজনকে আটকানোর সাধ্যি তার নেই। তাই মুখ বুজেই থাকেন।

জনমানবহীন খাঁ খাঁ রাস্তাঘাট। অন্যদিনে ফুটপাতেও লোকের সমাগম থাকে। দিন পনেরো হলো, লকডাউনের জেরে ছবিটা একেবারে পালটে গেছে। খুব প্রয়োজন ছাড়া কেউ রাস্তায় পা রাখছে না। দু'চারজন মানুষ আর কয়েকটা হাতে গোনা গাড়ি বাইক চলছে। ব্যাস, এই পর্যন্ত। দেরি হয়ে যাচ্ছে ভেবে সুজাতা একটু তাড়াতাড়ি পা চালায়।

—কোথায় যাচ্ছেন এই ভরদুপুরে? জানেন না, খুব দরকার ছাড়া এখন বাইরে বেরনো নিষেধ? একজন পুলিশ সার্জেন্ট সুজাতার মুখোমুখি।

—খুব দরকারেই বেরিয়েছি। সুজাতা জবাব দেয়।

—আপনার নাম কী? সার্জেন্ট জানতে চাইলেন।

—সুজাতা ভৌমিক।

—কোথায় থাকেন?

—তেরো নম্বর মিলন পার্ক।

—আইডেন্টিটি কার্ড কি সঙ্গে আছে?

—না, তাড়াহুড়োয় সেটা আর নেওয়া হয়নি। আসলে আমাকে এখনই সেখানে যেতে হবে। ওরা আমার অপেক্ষায় পথ চেয়ে বসে আছে, অফিসার। সুজাতার সপ্রতিভ উত্তরে সার্জেন্টের উৎসাহ আর কৌতূহল বাড়ে।

—চলুন, আমি আপনার সঙ্গে গিয়ে দেখতে চাই, কারা আপনার পথ চেয়ে বসে আছে।

—সুজাতা চুপ করে থাকে। সার্জেন্টের আদেশে জিপে উঠে পড়ে।

—ব্যাস, এখানেই থামান। কবি নজরুল মেট্রোর সামনে জিপ থামে।

সুজাতার সঙ্গে সার্জেন্টও নেমে পড়েন। চাকরিজীবনে প্রথমবার এইরকম একটা দৃশ্য দেখে তিনি বিস্মিত হয়ে পড়লেন। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। জনমানবহীন মেট্রোর সিঁড়িটার নীচে দু'ফুটের মতো ব্যবধানে দু-দুটো সাদা বৃত্তের ভেতর বসে আছে দুজন অসহায় মানুষ। মেয়েটাকে দেখামাত্রই ওদের মুখে হাসি ফুটে উঠল। তারপর কাঁধের ব্যাগটা নামিয়ে পরম যত্নে মেয়েটা ওদের থালায় ভাত ডাল আর তরকারি পরিবেশন করা মাত্রই

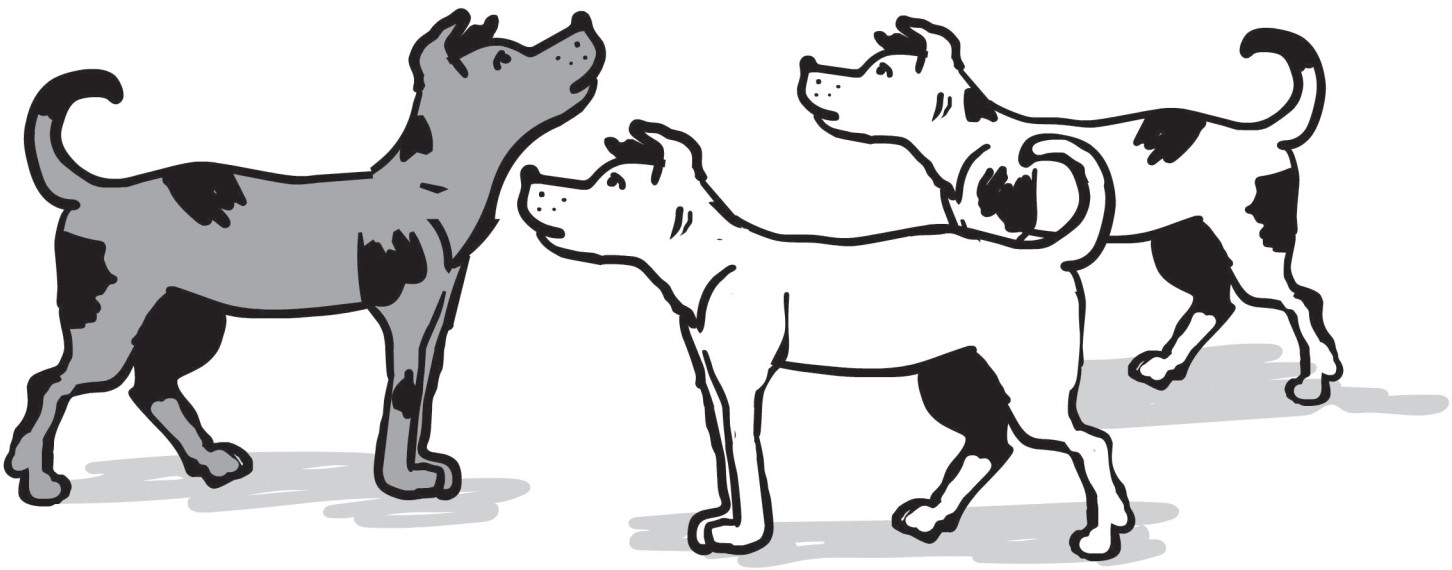

অভুক্ত মানুষ দুটো গোগ্রাসে গিলতে শুরু করল। তারপর নিজের সঙ্গে বয়ে আনা জলটুকু ওদের তোবড়ানো গ্লাসে ঢেলে দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো মেয়েটা।

—আমার কাজ হয়ে গেছে, এবার বাড়ি ফিরবো। দেখলেন তো আমার প্রয়োজনটা। সুজাতা বেশ প্রত্যয়ের সুরে বললো।

—চলুন, আমি আপনাকে বাড়িতে পৌঁছে দিচ্ছি। আজ আমি আপনার কাছে অনেক কিছু শিখলাম। সিনেমার মতো এইরকম একটা অবিশ্বাস্য দৃশ্যের মুখোমুখি হতে হবে, আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। আপনাকে কুর্নিশ জানাতেই হচ্ছে। সার্জেন্টের স্বীকারোক্তিতে সুজাতা একটু হাসলো।

পুলিশের জিপ থেকে নেমে সার্জেন্টের সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে মেয়েকে আসতে দেখে, সুজাতার মা বাবা দুজনেই উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়লেন। দুজনেরই মুখে ভয়ের ছায়া নেমে এলো।

—আপনারা অহেতুক ভয় পাবেন না। শুধু আপনাদের এক হিরের টুকরো মেয়েকেই নয়, আমি আজ দেবী দর্শন করলাম। আপনারা সার্থক মা-বাবা। মেয়েকে আরও যত্নে রাখুন। কোনো প্রয়োজন হলে আমাকে অবশ্যই জানাবেন। শেষ কথাগুলো সুজাতাকে বলে সার্জেন্ট জিপের দিকে পা বাড়াতেই অনুপমা দেবী অনুরোধের সুরে সার্জেন্টকে বললেন,

—যদি কিছু মনে না করেন, একটা কথা বলি।

—হ্যাঁ বলুন।

—আজ মেয়েটার জন্মদিন। একটু পায়েস মুখে দিয়ে, ওকে একটু আশীর্বাদ করে যাবেন না?

অভিভাবিকার এইরকম একটা সরল আর আন্তরিক প্রস্তাবকে মন থেকে প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না সার্জেন্ট। সুজাতার উদ্দেশে বললেন, Happy birthday. Wish you all the best and good luck.

Oh, thank you Sir, সুজাতা একটু হাসল। দুজনের কথার ফাঁকে, অনুপমা দেবী একসময় পায়েসের একটা ছোট বাটি তুলে ধরলেন সার্জেন্টের দিকে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর সার্জেন্ট বললেন, আমি হয়তো অনাহারের ধ্যানে ছিলাম না, কিন্তু আজ আমার দীর্ঘ দিনের লোভ, স্বার্থ আর অজ্ঞানতার ধ্যান ভাঙল। আর ধ্যান ভাঙতেই আপনার মুখোমুখি। আপনি সুজাতা। আমার একান্ত ইচ্ছা, পায়েসের বাটিটা আপনি আমার হাতে তুলে দিন।

With Best Compliments from -

A

Well Wisher

আপামর পশ্চিমবঙ্গবাসীকে দুর্গাপূজার প্রীতি, শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানাই—

বেচু নায়েক

বিশিষ্ট সমাজসেবী

সভাপতি বলাগড়

বিধানসভা মণ্ডল -৪

বিজেপি

বিশ্বকাপ ফুটবলের সঙ্গে আমরা

নিলয় সামন্ত

মিন্টু বাড়ুইয়ের বাড়ি বাগনানের সেলুনে। ও রংমিস্ত্রির কাজ করে। বহুদিনের চেনা। তবে বেশ কয়েক বছর যোগাযোগ ছিল না। তা প্রায় বছর ৩০ তো হবেই। হঠাৎ ধর্মতলায় দেখা জিসি লাহার দোকানের সামনে। এ কথা সে কথার পর জনতে পারলাম ওর একমাত্র ছেলে অভিজিৎ ফুটবল খেলতে খুব ভালোবাসে। গ্রামে, জেলায় দাপিয়ে ফুটবল খেলছে। তারপরের আবদার, আপনার তো অনেক চেনা জানা আছে। একটু দেখুন না যদি কোথাও ব্যবস্থা করে দেওয়া যায়। কলকাতায় যদিও খেলতে পারে।

প্রায় মাস ছয়েক পরে যখন কলকাতা ক্লাবগুলো লিগ খেলার আগে খেলোয়ারদের ট্রায়লের ডাকে, তখন আমি ওকে কলকাতায় ডেকেছিলাম। ও এসেছিল। সুপার ডিভিশন থেকে শুরু করে ফিফথ ডিভিশন পর্যন্ত বহু ক্লাবেই ট্রায়াল দিয়েছিল। কোথাও সুযোগ মেলেনি। সল্টলেকের সাইতে ফুটবল খেলার জন্য ভর্তি করাতে গেলে নানান নিয়মের বেড়াজালে সেটা করা যায়নি। তারপর এসে গেল নোবেল করোনা ভাইরাস কোবিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব। সবকিছু বন্ধ। স্বাভাবিক কারণে অভিজিৎ বা মিন্টু কারও সঙ্গেই আর যোগাযোগ থাকেনি।

আবার একদিন মিন্টুর সঙ্গে দেখা। ওই ধর্মতলার মোড়েই। বলে, ছেলে নাকি ফুটবল বিশ্বকাপে গিয়েছে, কাতারে। শুনে চমকে উঠলাম। এ আবার কেমন কথা! ভারত তো বিশ্বকাপ ফুটবল খেলছে না। অভিজিৎ কি তাহলে একা একাই বিশ্বকাপ ফুটবল খেলবে নাকি?

মুচকি হাসি দিয়ে মিন্টু বলল, আমার ছেলে সেই করোনার আগেই কাতার চলে গিয়েছিল। ওখানে আছে। ওখানে কাজ করছে। এখন রঙের কাজই করছে। এর আগে মিস্ত্রির কাজও করেছে। ও আবার একটু লেখাপড়া জানে কিনা, তাই প্রথমদিকে জেসিবিও চালিয়েছে। অনেকদিন হয়ে গেল চোখে দেখিনি। তবে ভালোই আছে। তিন মাস পরপর বাড়িতে টাকা পাঠায়। আমরা সবাই ভালোই আছি। ও নিজেও খুব খুশি ফুটবলের জন্য কাজ করতে পেরে। বাগনান থেকে একটা ১৮ জনের দল গিয়েছে। খুব মজায় আছে, কাজ করছে।

সেই মজাই যে এক সময় দুঃখের কারণ হয়ে উঠবে, কে ভেবেছিল? প্রথমে ফোন আসা অনিয়মিত হয়ে গেল। ফোনের ওপাশ থেকে ভেসে আসতো কান্নার আওয়াজ। টানা বারো ঘণ্টা, কখনো বা ১৮ ঘণ্টা কাজ করতে হচ্ছে। শরীর আর চলছে না অবশ হয়ে আসছে। একদিন ফোন করে বলল, গত তিনদিনে একবারও ঘুমোতে পারিনি। ৭২ ঘণ্টা সমানে কাজ করতে হয়েছে। এইভাবে কমতে থাকে ফোন আসা। তারপর একদিন চিরতরে বন্ধ হয়ে যায় অভিজিতের গলার আওয়াজ। একে তাকে ধরা করা করে দেহটা ফেরত এসেছিল বাগনানের সেলুনে।

বিশ্বকাপ ফুটবলে মেতে উঠলো সারা বিশ্ব। আর মিন্টুর পরিবারে নেমে এলো কালো শোকের ছায়া। নেটফ্লিক্সে একটা ডকুফিল্ম দেখাচ্ছিল। নাম ফিফা আনকভার্ড। চার এপিসোডের ওই ফিল্মে সাফ বলে দেওয়া আছে, কাতার কী করে বিশ্বকাপ ফুটবল সংগঠনের দায়িত্ব পেয়েছিল। অনেক অসুবিধে ছিল। ইউরোপের ফুটবলকর্তারা অনেকেই চাননি। কিন্তু অসম্ভবকে সম্ভব করে ছিলেন ফিফার প্রেসিডেন্ট সেপ ব্লাটার। আফ্রিকা, এশিয়া আর কনকাকাফ দেশগুলির ভোট জোগাড় করে। সেই ভোট নাকি আদায় করতে হয়েছিল ঘুষের বিনিময়ে। ফিফা কর্তাদের অনেকেই গ্রেপ্তার হন তখন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই প্রমাণ করতে পারেনি এফবিআই।

অনেকদিন পর সেপ ব্লাটারের চৈতন্য উদয় হয়েছিল, কাজটা তিনি ঠিক করেননি। কাতার খুব ছোট্টো দেশ। বিশ্বকাপের মতো এত বড়ো একটা টুর্নামেন্ট ঠিকঠাক করতে পারবে কিনা এমন সংশয় অনেকের মনে দেখা দিয়েছিল। কাতার দেশটার জনসংখ্যা মাত্র চৌত্রিশ লাখ। যা হোটেল ছিল তাতে ত্রিশ হাজারের বেশি ট্যুরিস্টকে জায়গা দেওয়া সম্ভব নয়। এদিকে বিশ্বকাপ ম্যাচ দেখতে আসার কথা ছিল প্রায় বারো লাখ লোকের। প্রথমিকভাবে সংশয় দেখা দিয়েছিল, কোথায় থাকবেন তারা? সংগঠকরা বলছিলেন বটে, ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কিন্তু দোহার মতো ছোটো একটা শহর অত লোকের বোঝা টানতে পারবে তো? সন্দেহ ছিল।

এবার প্রথমবারের জন্য বর্ষ শেষে আয়োজিত হয়েছিল কাতার বিশ্বকাপ। আর

বত্রিশ দলের শেষ বিশ্বকাপ। পয়সার জোরে উদ্বোধনে চমক ছিল। কিন্তু আয়োজক দেশ এই প্রথম বিশ্বকাপের মূল পর্বে হেরে গেল। খেলল একেবারে সাধারণ মানের খেলা। মাত্র তিন মিনিটের মাথাতেই তারা পিছিয়ে যেত। কিন্তু অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে দেখা গেল ইকুইডরের খেলোয়াড় গোলের আগে অফসাইডে ছিল। তবে এটা প্রমাণিত হয়ে গেল কাতার যদি কোনও ম্যাচ জেতে তাহলে সেটা হবে অঘটন। অর্থাৎ আয়োজক না হলে তাদের বিশ্বকাপ খেলার কোনও যোগ্যতাই নেই।

অন্য বিশ্বকাপে ছয় সাতটা শহরে ছড়িয়ে খেলা হয়েছে। দোহার আশপাশে আটটা স্টেডিয়াম, খুব কাছাকাছি। কাতার কর্তারা দর্শক নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন তো? যে দেশের সেনার সংখ্যা মাত্র বারো হাজার, পুলিশ আরও কম, তাঁরা হুলিগানদের আটকাবেন কী করে? অগত্যা বিদেশ থেকে সাতান্ন হাজার নিরাপত্তা কর্মী ভাড়া করে

আনে কাতার। ইংল্যান্ড, আমেরিকা, তুরস্ক, এমনকী পাকিস্তান থেকেও পুলিশদের আনা হয়েছিল পাহারা দিতে। মুশকিল হচ্ছে কিছু দর্শক আছেন এমন উগ্র যে তাঁদের সঙ্গে পেরে ওঠা কঠিন। কয়েকটা দেশ এবার কাতারে এসেছিল, যাদের সমর্থকদের খুব বদনাম আছে। যেমন ইংল্যান্ড, জার্মানি, হল্যান্ড, আর্জেন্টিনা, ইরান, আমেরিকা। দোহার মাঠে কিন্তু কোনো গোলমাল হয়নি। খুব ভালোভাবেই সব কিছু সামলে ছিলেন কাতার প্রশাসন।

এবারের ফুটবল বিশ্বকাপ কাতারে অনুষ্ঠিত হওয়া নিয়ে অনেক আলোচনা-সমালোচনা হলেও একদিক থেকে আগের সব আয়োজককে ছাড়িয়ে গেছে স্বাগতিক দেশটি। আর সেটি হলো, আয়োজন বাবদ খরচ।

এই বিশ্বকাপ আয়োজনের প্রস্তুতি বাবদ কাতার ৩০ হাজার কোটি ডলার খরচ করে ফেলেছে। প্রতিযোগিতা চলাকালীন খরচ আরও কয়েক হাজার কোটি। অথচ ২০১৪ সালে ব্রাজিল বিশ্বকাপ আয়োজন করতে খরচ করেছিল ১ হাজার ৫০০ কোটি ডলার, ২০১৮ সালে রাশিয়া ১ হাজার ২০০ থেকে ১ হাজার ৫০০ কোটি ডলার খরচ করেছিল। এই খবর প্রকাশিত হয়েছে ব্রিটিশ দৈনিক দ্য ইকোনমিস্টে।

দ্য ইকোনমিস্টের তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বকাপ ফুটবল আয়োজনের দৌলতে কাতারের অর্থনীতিতে ১ হাজার ৭০০ কোটি ডলারের মতো যুক্ত হবে। দেশটি এই আয়োজনে যে খরচ করেছে, তা মূলত ব্যয় হয়েছে পরিকাঠামো নির্মাণে। যার বড়ো অংশই খরচ হয়েছে মেট্রো নেটওয়ার্ক তৈরিতে। বিশ্বকাপের খেলা দেখতে ১৫ লাখ মানুষ এক শহর থেকে আরেক শহরে আসা যাওয়া। তাঁদের যাতায়াত সহজ করতে এই মেট্রোব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়। তবে আয়োজকেরা বলছেন, এসব পরিকাঠামো শুধু বিশ্বকাপের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, এগুলো বিশ্বকাপ শেষেও কাজে লাগবে। সুইজারল্যান্ডের লুসান বিশ্ববিদালয়ের এক গবেষণায় দেখা গেছে, ১৯৬৪ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত বিশ্বকাপ ও অলিম্পিকের মতো ৩৬টি বড়ো আয়োজনের মধ্যে ৩১ টি আয়োজন লাভজনক হয়নি। গবেষণায় যে ১৪টি বিশ্বকাপের তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তার মধ্যে কেবল একটির আয়োজন লাভজনক ছিল। আর সেটি ছিল ২০১৮ সালে রাশিয়ার ফুটবল বিশ্বকাপ। ওই বিশ্বকাপ থেকে রাশিয়া ২৩ কোটি ৫০ লাখ ডলার মুনাফা করেছিল। মূলত বিশ্বকাপের প্রচারস্বত্ব বিক্রি করে এই মুনাফা করে দেশটি। তবে বিনিয়োগের দিক থেকে দেখলে সেটা আবার খুব বেশি লাভজনক হয়নি। বিনিয়োগের খরচখরচা ধরলে রাশিয়া ওই আয়োজন থেকে মুনুফা করেছিল মাত্র ৪.৬ শতাংশ।

বিশ্বকাপ ফুটবল আয়োজনের সব খরচ আয়োজক দেশের ঘাড়ে বর্তায়। ফেডারেশন অব ইন্টারন্যাশনাল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন বা ফিফা কেবল প্রতিযোগিতার পরিচালন ব্যয় নির্বাহ করে। অথচ রাজস্ব আয়ের বড়ো অংশই ফিফার ঘরে যায়। টিকিট বিক্রি, পৃষ্ঠপোষকতা, সম্প্রচার স্বত্ব—সবকিছুই থাকে ফিফার হাতে। গত বিশ্বকাপ থেকে ফিফা ৫৪০ কোটি ডলার আয় করে। এ আয়ের একটি অংশ বিভিন্ন দেশকে দেওয়া হয়েছে।

সম্প্রচার স্বত্ব আয়োজক দেশ বিক্রি করলেও তার বড়ো অংশই যায় ফিফার খাতে। একই কথা টিকিট বিক্রি এবং মার্কেটিং অধিকারের ব্যাপারেও। এই সব খাতের সিংহভাগই যায় ফিফার অ্যাকাউন্টে। প্রতিযোগিতা চলার জন্য খরচের একটা বড়ো অংশ এখান থেকে আয়োজকদের দেয় ফিফা। পুরস্কার অর্থের পাশাপাশি ১.৭ বিলিয়ন ডলার কাতারকে দিয়েছে ফিফা। কিন্তু স্টেডিয়াম, রেল যোগাযোগ, পরিকাঠামো নির্মাণে প্রায় ২০০ বিলিয়ন ডলার খরচ হয়ে গিয়েছে

কাতারের।

লুসান বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় শুধু স্টেডিয়াম নির্মাণ, উপকরণ ও মানবসম্পদ বাবাদ খরচকে হিসাবে ধরা হয়। কিন্তু একটি ফুটবল বিশ্বকাপ আয়োজনের সঙ্গে আরও অনেক পরোক্ষ ব্যয় থেকে যায়, যেমন কাতারের মেট্রো কাঠামো, নতুন নতুন হোটেল তৈরি ইত্যাদি। কিছু কিছু কাঠামো আবার দীর্ঘমেয়াদি অর্থনীতির জন্য উপকারী। কিন্তু ব্যয়বহুল স্টেডিয়াম অনেক ক্ষেত্রেই পরবর্তীকালে অব্যবহৃত থেকে যায়। ফলে এ বিনিয়োগ অর্থনীতিকে খুব বেশি চাঙা করতে পারে না।

এই যখন বাস্তবতা, তখন এ ধরনের বড়ো ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের বিষয়ে দেশগুলোর অনাগ্রহ তৈরি হবে, এটাই স্বাভাবিক। সেজন্য দেখা গেল, ২০১৬ সালের অলিম্পিক আয়োজনের জন্য মাত্র সাতটি শহর নিলামে অংশ নেয়। আর ২০২৪ সালের অলিম্পিক আয়োজনের নিলামে অংশ নিয়েছে মাত্র দুটি শহর।

তবে এরকম ব্যয়বহুল আয়োজনের ইতিহাস খুবই নতুন। ১৯৬৬ সালের বিশ্বকাপে মাত্র ১৬টি দল অংশ নেয়। ২০১৮ সালে করা হিসাব অনুযায়ী, ১৯৬৬ সালের আয়োজনে ফুটবলার প্রতি মাথাপিছু ব্যয় হয়েছিল ২ লাখ ডলার। আর ২০১৮ সালের বিশ্বকাপ আয়োজনে খরচের সেই অঙ্ক একলাফে উঠে গেল ৭০ লাখ ডলারে। প্রতিটি প্রতিযোগিতার জন্য নতুন স্টেডিয়াম নির্মাণ করার যে রীতি চালু হয়েছে, সে কারণেই ব্যয় এতটা বেড়েছে। এবার কাতারে সাত-আটটি নতুন স্টেডিয়ামও তৈরি করতে হয়নি।

এতো গেল অর্থনীতির বিষয়। মর্যাদার দিক থেকেও কাতার আগের বিশ্বকাপ আয়োজকদের সমপর্যায়ে যেতে পারেনি। এ কারণে এই বিশ্বকাপের আগে ব্রিটিশ মিডিয়ার যত আলোচনা হয়েছে, তার দুই-তৃতীয়াংশ আলোচনায় ছিল নেতিবাচক বা সমালোচনামূলক। এমনকী এই বিশ্বকাপে স্টেডিয়াম নির্মাণ করতে গিয়ে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ও নেপালের প্রায় সাত হাজার শ্রমিক মারা গেছেন। এ কারণেও কাতারের বদনাম হয়েছে। তা ছাড়া অ্যালকোহল ব্যবহার নিয়ে আয়োজকদের দ্বিচারিতাও সমালোচনার মুখে পড়েছে। তবে বিশ্বকাপ আয়োজনের মধ্য দিয়ে কাতার যে বড়ো আয়োজক হিসেবে নিজের নাম প্রতিষ্ঠা করল, সেটা তাকে প্রতিবেশীদের থেকে এগিয়ে রাখবে।

অলিম্পিককে এই বিশ্বের সবথেকে বড়ো ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হিসাবে গণ্য করা হয়। অলিম্পিক বাদ দিলে এই বিশ্বের সবথেকে বড়ো প্রতিযোগিতা নিঃসন্দেহে ফুটবল বিশ্বকাপ। আশা করা হচ্ছে প্রায় ৫০০ কোটির চোখ থাকবে এই প্রতিযোগিতায়। ১০ লক্ষেরও বেশি লোক কাতারে উপস্থিত থেকে ম্যাচ দেখবেন। ম্যাচের টিকিট, সম্প্রচার স্বত্ব, পুরস্কর মূল্য, বিদেশি দর্শকদের আগমন ঘিরে পর্যটন, স্পনসর— সবমিলিয়ে আয়োজক দেশের রোজগার রয়েছে এই বিশ্বকাপ ঘিরে। কিন্তু এর পাশাপাশি বিশ্বকাপের পরিকাঠামো তৈরিতে যে খরচ হয় না নেহাতই কম নয়। কয়েক শত কোটি টাকা খরচ হয়ে যায়, তা করতে।

উৎসাহী কাতার এবার চাইছে ২০৩৬ সালের অলিম্পিক্স আয়োজন করতে। সরকারিভাবে এখন আবেদন করা হয়নি। তবে আগামীদিনে অলিম্পিক্সের জন্য তাদের বিড করতে দেখা গেলে অবাক হওয়ার কিছু নেই!

কবে ২০৩৬-এর আয়োজক দেশের নাম জানানো হবে, তা নিয়ে এখনও কোনও কথা বলেনি আন্তর্জাতিক অলিম্পিক্স কমিটি (আই ও সি)। তবে কাতার যে সেই লড়াইয়ে অংশ নেবে, তা অনেকটাই পাকা। যদি সফল হয়, তবে প্রথম প্রথম মুসলিম দেশ হিসাবে অলিম্পিক্স আয়োজন করবে তারা। ফুটবল বিশ্বকাপের মতো অলিম্পিক্সকেও বছরের শেষে আয়োজন করার দাবি জানানো হবে। তবে তা মানা হবে কিনা কেউই জানে না।

কাতারের দাবি, ফুটবল বিশ্বকাপের জন্য যে পরিকাঠামো তৈরি করেছে তারা, আগামীদিনে তার রক্ষণাবেক্ষণ এবং সেই সঙ্গে উন্নতিও করা হবে। অর্থাৎ বাতানুকূল ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট, বিমানবন্দর, মেট্রো সবই তাদের কাছে তৈরি রয়েছে। তাই ১৪ বছর পর অলিম্পিক্স আয়োজন করতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। বরং পরিকাঠামোর আরও উন্নতি হবে। কাতার সরকারের এক সূত্র সংবাদ সংস্থা রয়টার্সকে বলেছে, ''বিশ্বকাপের এই সাফল্য কাতারকে বাকিদের থেকে অনেক উপরের দিকে রাখবে। আমরা সফল, প্রমাণ করে দিয়েছি। ২০০৬ সালে এখানে এশিয়া গেমস হয়েছিল। আবার ২০৩০-এ আমরা আয়োজক। সব পরিকাঠামো রয়েছে এখানে। তাই আমাদের দায়িত্ব দিতে কোনো অসুবিধা নেই।'' ২০২৪-এ পরের অলিম্পিক্স হবে প্যারিসে। তার পরের দু'টি অলিম্পিক্স হওয়ার কথা লস অ্যাঞ্জেলেস এবং ব্রিসবেনে। ২০৩০-এর আয়োজক এখনও ঠিক হয়নি। কিন্তু এখন থেকেই আশার প্রহর গুণছে কাতার। তবে বিশ্বকাপে যে কড়াকড়ি করা হয়েছে তা অলিম্পিক্সেও থাকবে কিনা, সে ব্যাপারে এখনও কিছু জানানো হয়নি।

এদের মধ্যে রয়েছে হুলিগানদের হিংস্রতা। হার-জিৎ শত্রুতার পর্যায়ে চলে যায়। ফ্রান্সের এতিন শহরে আর্জেন্টিনা আর ইংল্যান্ড ম্যাচের আগে পরে খণ্ডযুদ্ধ সাক্ষী ছিলেন কলকাতার সাংবাদিক। তাঁর মুখে শোনা, কবে ফকল্যান্ড যুদ্ধ হয়ে গেছে দু'দেশের মধ্যে। এখনও তার রেশ কাটেনি। এতিন স্টেডিয়ামের বাইরে একটা পার্ক। তার দুপাশে সকাল থেকে জড়ো হয়েছেন ইংরেজ আর আর্জেন্টিনার সমর্থকরা। মাঝে পুলিশ। দু-দলের মধ্যে স্লোগান- পালটা স্লোগান চলছে। বিয়ার বোতল ছোড়া ছুড়িও। আঁচ পড়েছিল ম্যাচটাতেও। মারামারি করে লাল কার্ড দেখলেন ডেভিড বেকহ্যাম। দশজনে খেলে ম্যাচ হেরে গেল

ইংল্যান্ড। গ্যালারিতেও সংঘর্ষ দেখে ভয় পাচ্ছিলাম পারিসে ফিরতে পারব কি না। ফরাসি পুলিশ আমাদের সে রাতে স্টেশন পৌঁছে দিয়েছিল। রাস্তায় আহতদের কাতরানোর দৃশ্য এখনও ভুলতে পারিনি। ইতালি বিশ্বকাপে জার্মানি- হল্যান্ড ম্যাচ, পরের বার ইরান-আমেরিকা খেলায় মারপিট দেখেছি। ইংরেজ সমর্থকরা মারাত্মক মাথাগরম। ডাচরাও কম যান না। কাতারে এঁদের ম্যাচে গণ্ডগোল হলে কি কাতার পুলিশ সামলাতে পারবে?

বিশ্বকাপ সুষ্ঠুভাবে করার জন্য কাতারিরা অবশ্য প্রচুর খরচ করেছেন। স্টেডিয়ামে যাতে প্লেয়ারদের গরম না লাগে তার জন্য এসি মেশিন রয়েছে। প্রায় চারগুণ বেশি বাজেট। তেল বিক্রির টাকা, ওঁরা পারেন বিলিয়ে দিতে। আমার ভয় অন্য জায়গায়। লাতিন আমেরিকার দলগুলোর প্রচুর বায়নাক্কা। সেটা মেটাতে পারবেন তো কাতারিরা? তা ছাড়া অবৈধ বেটিং-এর স্বর্গভূমি হচ্ছে আরব দেশগুলি। ভয় হচ্ছে বিশ্বকাপ কলুষিত হবে না তো?

৩৪ লক্ষর অধিবাসীর কাতারে নিজেদের অধিবাসী মাত্র ৪ লক্ষ। ভারতীয় আর বাংলাদেশি প্রচুর মানুষ গিজ গিজ করছেন। কিন্তু পুরে দেশ জুড়েই নারীর সংখ্যা এতটাই কম যে চমকে উঠতে হয়। সাত লাখেরও কম!

কাতার রক্ষণশীল দেশ হলেও, তেল আর গ্যাসের বিশাল মজুতের জন্য কাতারের মানুষের মাথাপিছু আয় পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি। মাথাপিছু আয় প্রায় এক লাখ তিরিশ হাজার ডলার। দ্বিতীয় স্থানে থাকা লুক্সেমবার্গের থেকে যা প্রায় ২০ হাজার ডলার বেশি। কিন্তু তবুও বিশ্বকাপ আয়োজনকে কেন্দ্র করে যে হারে অভিবাসী শ্রমিকদের নিয়ে কর্মযজ্ঞ চলেছে, তাতেই বিক্ষোভের মাত্রাটা বেড়েছে মারাত্মক হারে। যা থামাতে ফিফা প্রেসিডেন্ট ইনফানতিনোকে পর্যন্ত বিবৃতি দিতে হচ্ছে। আর হবে নাই-বা কেন? কিছুদিন আগেই ইংল্যান্ডের কোচ গ্যারেথ সাউথ গেট জানিয়েছেন, ফিফা সভাপতি থামতে বললেই তাঁরা থেমে থাকতে পারেন না। যেখানে মানবাধিকারের প্রশ্ন জড়িত, সেখানে তাঁরা প্রশ্ন তুলবেনই।

যে গরমের কথা ভেবে প্রথা ভেঙে পুরো বিশ্বকাপটাকে নিয়ে আসা হয়েছে শীতকালে, তাতেও তো সমস্যা মিটছে না। ওয়েলস দল ঠিক করেছিল, প্র্যাকটিস করবে দুপুর দেড়টায়। দেখা গেল, তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস! অথচ ওয়েলসের সর্বোচ্চ তাপমাত্রাই হচ্ছে ১২ ডিগ্রি। অতএব প্র্যাকটিস শিডিউলটাই বাতিল করে দিলেন ওয়েলস কোচ।

কিন্তু শেষ বেলায় 'বিয়ার' বিক্রি নিয়ে ফিফার সঙ্গে বিশ্বকাপের সংগঠক কাতারের যে সমস্যা তৈরি হলো, তাতে জল কোনদিকে গড়াবে কেউ বলতে পারছেন না।

নির্দিষ্ট লাইসেন্স থাকা একটি মাত্র দোকান থেকেই পারমিট থাকলে একমাত্র পানীয় কিনে আপনি রুমে ফিরে পান করতে পারবেন। কাতারের এই নিয়ম ভাঙলেই শাস্তি। কিন্তু বিশ্বকাপ আয়োজনের অনুমতি পাওয়ার সময় কাতারের সঙ্গে ফিফার যা চুক্তি হয়েছিল, তাতে ফিফার সঙ্গে যে সংস্থাগুলির কমার্শিয়াল চুক্তি রয়েছে, তা কাতার মানতে বাধ্য। কিন্তু এদিন কাতার রয়্যাল পরিবারের পক্ষ থেকে যে নির্দেশিকা জারি হয়েছে, তাতে চুক্তিভঙ্গ, আর তাতেই ঝামেলা।

কাতার বিশ্বকাপে ফিফার বড়ো স্পনসরগুলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বাডওয়েজার। ফিফার সঙ্গে চুক্তিমতো বিশ্বকাপের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই সংস্থাই একমাত্র বিয়ার বিক্রি করতে পারে। অথচ কাতারে তা সম্ভব নয়। দু'পক্ষের

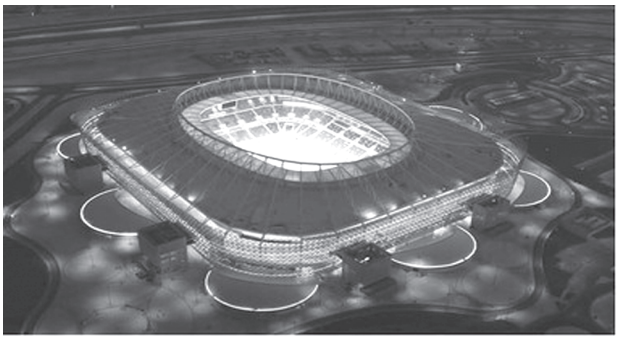

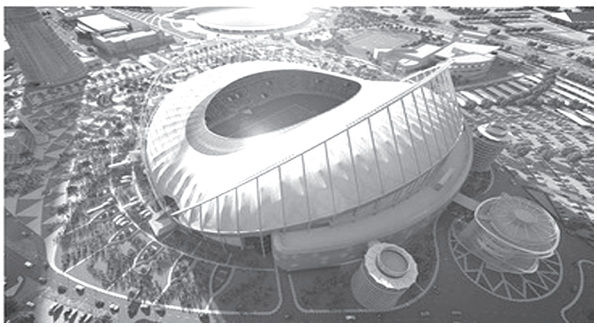

অনেক আলোচনার পর ঠিক হয়েছিল, এবার স্টেডিয়ামের ভিতর বিয়ার পান করা যাবে না। ম্যাচের তিন ঘণ্টা আগে এবং ম্যাচ শেষের এক ঘণ্টা সাধারণ দর্শকদের জন্য বিয়ার বিক্রি হবে। আর তারজন্য যা দাম নির্ধারিত হয়েছে, আজ পর্যন্ত বিশ্বকাপে এক দাম দিয়ে কখনও বিয়ার কিনতে হয়নি। আধ লিটারের এক গ্লাস বিয়ারের দাম ১৪ ডলার! সব কিছু ঠিক হয়ে যাওয়ার পরেও, বিশ্বকাপ শুরুর দু'দিন আগে সংগঠকদের পক্ষ থেকে জানানো হচ্ছে, বিয়ার বিক্রি করা যাবে না। ফলে ব্যবসার এই যুদ্ধ কোথায় থামবে কেউ জানে না।

এবার বিশ্বকাপের ফাইনাল নিয়ে আলোচনা করে শেষ করা যাক। দিদিয়ের দেশঁ অধিনায়ক হিসেবে দেশকে প্রথমবার বিশ্বকাপে জয়ের স্বাদ এনে দেন ১৯৯৮ সালে। বিশ বছর পর ১৯৯৮ সালে কোচ হিসেবেও তিনি দেশকে বিশ্বকাপ এনে দেন। এবারও তিনিই কোচ ছিলেন। কিন্তু হয়তো-বা তাঁরই ভুলে এবার বিশ্বকাপ হাতছাড়া হয়ে গেল ফ্রান্সের।

কাতারে বিশ্বকাপ ফাইনালে দেশঁ তাঁর প্রধান অস্ত্র কিলিয়ান এমবাপেকে শুরুতে হয়তো ঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারেননি। তাঁকে বোতলবন্দি করে রেখেছিল আর্জেন্টিনা। এমবাপের প্রধান অস্ত্র প্রান্ত ধরে দৌড়। যে গতিতে তিনি দৌড়ন তার সঙ্গে একমাত্র উসেইন বোল্টের দৌড়ের তুলনা হয়। সেই দৌড় বন্ধ করার জন্য মোলিনা ও ম্যাক অ্যালিস্টারকে রেখেছিলেন আর্জেন্টিনার কোচ লিয়োনেল স্কালোনি। ফলে বারবার আটকে যাচ্ছিলেন তিনি। ফরাসি কোচ দিদিয়ের দেশঁ অলিভিয়ের জিহুকে তুলে নেওয়ায় প্রধান স্ট্রাইকারের ভূমিকায় চলে যান এমবাপে। ফলে আরও বেশি নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছিলেন তিনি। পথমার্ধে মাত্র একবার আর্জেন্টিনার বক্সে ঢুকতে পেরেছিলেন এমবাপে।

কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে এমবাপে নিজের পছন্দের জায়গায় খেলা শুরু করতেই ভয়ংকর হয়ে উঠলেন। বক্সের মধ্যে ওটামেন্ডি ফাউল করায় পেনাল্টি পায় ফ্রান্স। জোরালো শটে গোল করেন এমবাপে। দু'মিনিট পরেই বক্সের মধ্যে থেকে ডান পায়ের দুরন্ত শটে ফ্রান্সের হয়ে দ্বিতীয় গোল করেন এমবাপে। চলন্ত বলে তিনি যে শট মারলেন তা এবারের বিশ্বকাপে অন্যতম সেরা গোল। নির্ধারিত সময়ের শেষ ১০ মিনিটে এগিয়েও যেতে পারত ফ্রান্স। এমবাপের জোরালো শট একটুর জন্য বাইরে বেরিয়ে যায়।

অতিরিক্ত সময়ে মেসির গোলে আর্জেন্টিনা আবার এগিয়ে গেলে মনে হচ্ছিল ফ্রান্সের হার নিশ্চিত। কিন্তু তখনও মাঠে ছিলেন এমবাপে। বক্সের বাইরে থেকে গোল লক্ষ্য করে শট মারেন তিনি। বক্সের মধ্যে সেই বল পারেদেসের হাতে লাগায় পেনাল্টি পায় ফ্রান্স। আরও একবার পেনাল্টি থেকে গোল করেন এমবাপে। টাইব্রেকার থেকে এমবাপে আবার গোল করলেও তাঁর দলের দুই সতীর্থের শট বাঁচিয়ে দেন এমিলিয়ানো মার্তিনেস। শেষ পর্যন্ত চোখের জলের বিশ্বকাপ ছাড়তে হল তাঁকে।

২৩ মিনিটে পেনাল্টি থেকে মেসির গোল। দেম্বেলে পেনাল্টি বক্সের মধ্যে ফাউল করে দি মারিয়াকে। রেফারির সিদ্ধান্তে কোনো ভুল ছিল না। তার চেয়েও বড়ো ব্যাপার ছিল, শট নিতে যাওয়ার আগে মেসির এক মুহূর্তের জন্য চোখটা বন্ধ করা। নিজে ফুটবল খেলেছি বলেই জানি, ওই সময় জীবনের সমস্ত নেতিবাচক ঘটনাগুলো মাথায় এসে ভিড় করে। প্রথম গোল পায় আর্জেন্টিনা। লরিসকে বিভ্রান্ত করে বল জালে জড়িয়ে দিল, গোল। ৩ মিনিটে গোলটাও এল সেই মেসির হাত ধরেই। একটা বাঁ পা কতটা ধারালো হতে পারে, ১৯৮৬ বিশ্বকাপে তা দেখিয়েছিলেন দিয়েগো মারাদোনা। আমি নিশ্চিত, এই রাত তিনিও উপভোগ করছেন। দুই

ডিফেন্ডারের মাঝখান থেকে মেসির বাঁ পা ঝলসে উঠল। বল গেল দে পলের কাছে। সেখান থেকে দি মারিয়াকে লক্ষ্য করে থ্রু আলভারেসের। ২—০ করেন দি মারিয়া। অতিরিক্ত সময়ের ১০৮ মিনিটে ঠান্ডা মাথায় ফের গোল। নির্ধারিত সময়ে ফল ২—২। অতিরিক্ত সময়ে ফল ৩—৩! তারপরে টাইব্রেকার। এমিলিয়ানো মার্তিনেসের দুটো হাতই দুলে দিল কাঙ্ক্ষিত বিশ্বকাপ।

তবে মেসির স্বপ্নপূরণের রাতে অবশ্যই বলব কিলিয়ান এমবাপের কথা। বিশ্বকাপের ফাইনালে হ্যাটট্রিক করে ম্যাচ থেকে হারিয়ে যাওয়া ফ্রান্সকে ও-ই তো ফিরিয়ে এনেছিল। ২০১৮ সালের বিশ্বকাপে প্রথমবার খেলতে নেমে চারটি গোল করেছিলেন এমবাপে। এবার তিনি করেছেন ৮টি গোল। বিশ্বকাপে গোলদাতাদের তালিকায় পেলের সঙ্গে যুগ্মভাবে পঞ্চম স্থানে রয়েছেন তিনি। তাঁর ঠিক উপরেই রয়েছেন লিয়োনেল মেসি ও ফ্রান্সেরই জাঁ ফঁতে। তাঁদের গোল সংখ্যা ১৩। জার্মানির গার্ড মুলারের রয়েছে ১৪টি গোল। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন ব্রাজিলের রোনাল্ডো নাজারিয়ো। তিনি ১৫টি গোল করেছেন। শীর্ষে জার্মানির মিরোস্লাভ ক্লোজে। তাঁর গোলের সংখ্যা ১৬টি।

মাঠে এবং বিশ্ব জুড়ে মাঠের বাইরে মেসি যে সহায়তা পেয়েছেন এমবাপে তা পেল না। এমবাপের বিশ্বকাপ জয়ে বাধা দিল তাঁর দুই সতীর্থ নাকি এমিলিয়ানো মার্তিনেস। এই নিয়ে গবেষণা চলবে যুগ যুগ ধরে। কিন্তু এখন সবাই খুশি মেসির হাতে বিশ্বকাপ ওঠায়। বিশ্বের সমস্ত বড়ো বড়ো পুরস্কার, বড়ো বড়ো ট্রফি মেসির দখলে। অধরা ছিল বিশ্বকাপ। এবার সেটাও পূরণ হলো। একটাই আফসোস ফুটবলের রাজপুত্র দিয়াগো মারাদোনা সেটা প্রত্যক্ষ করতে পারলেন না। অবশ্য ফুটবলের সম্রাট পেলে দেখতে পেলেন হাসপাতালের শয্যায় শুয়ে শুয়ে। তাঁর স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। তাহলে কাতারের ফাইনালের নায়ক কে? মেসি! এমবাপে! নাকি একেবারে পিছনের সারিতে থেকে নিঃশব্দে দেশকে ট্রফি এনে দেওয়া এমিলিয়ানো মার্তিনেস! না কি, তিনজনেই?

এবার আর্জেন্টিনা ট্রফি নিয়ে গেছে। কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করার কিছু নেই তাঁদের। উলটে, মেসি ও তাঁর সতীর্থদের উপর অনেকে খাপ্পা হয়ে রয়েছেন। ফরাসি ফুটবল সংস্থা ফিফার কাছে এমনও নালিশ করেছে, মেসিদের আচরণ শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে গেছিল ফাইনালের দিন। কিলিয়ান এমবাপের সম্পর্কে ওঁরা খুব খারাপ কথা বলেছেন। গোলকিপার এমি মার্টিনেজ গোল্ডেন গ্লাভস ট্রোফি হাতে পাওয়ার পর কুৎসিত ভঙ্গিতে ছবি দেন। সেই ছবি সারা বিশ্বকে হতবাক করেছে। অথচ সেই এমিলিয়ানো মার্তিনেসকেই জামাই আদর করে কলকাতায় ঘুরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। তবে সে যাই হোক বরাবরই আর্জেন্টিনার টিম মারকুটে বলে কুখ্যাত ছিল।

১৯৬৬ সালে ইংল্যান্ড বিশ্বকাপের সময়ে কী রাফ ফুটবল খেলেছিল আর্জেন্টিনা। ক্যাপ্টেন রাটিনকে মাঠ থেকে বের করে দিয়েছিলেন জার্মান রেফারি রুডন ক্রেটলেন, ইংল্যান্ডের সঙ্গে কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে। ইংল্যান্ড কোচ আলফ রামসে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, জন্তুরা খেলছে। সেই সময়ে আর্জেন্টিনার প্লেয়াররা থুতু ছেটাতেন, চোখে আঙুলের খোঁচা দিতেন, চুল ধরে টানতেন। রেফারির অজান্তে চোরাগোপ্তা লাথি মারতেন। ইংল্যান্ডে হেরে যাওয়ার পর আর্জেন্টিনার প্লেয়াররা যেখানে ইউরোপের টিম পেতেন,

পেটাতেন। এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছিল, ১৯৭৮ সালের বিশ্বকাপে বুয়েনস এয়ারেসে ফাইনালে উঠেও জোহান ক্রুয়েফ খেলতে চাননি, আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে। স্রেফ চোট আঘাতে ভয়ে। ওই ম্যাচে পঞ্চাশের বেশি ফাউল হয়েছিল।

মারাদোনার উত্থান কিছুটা বদলে দিয়েছিল আর্জেন্টিনা ফুটবলকে। বেশ কয়েক বছর শিল্পের ছোঁয়া এনেছিল। সেই ঐতিহ্য মেসি ধরে রাখতে পারলেন না। জেতার উদগ্র কামনায় ফের রাফ ফুটবলের দিকে ঝুঁকলেন কোচ স্কালোনি। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, মেসির অবস্থাও মারাদোনার মতো হবে। ১৯৯০ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ইতালিকে হারিয়ে খুব অপ্রিয় হয়ে গেছিলেন মারাদোনা। তখন তিনি নাপোলি ক্লাবে খেলেন। বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার পর ওই দেশে খেলতে গিয়ে তিনি নানা অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছিলেন। মেসিও বোধহয় ভুলে গেছিলেন, তিনি প্যারিসের ক্লাবে খেলেন।

ফরাসিদের তিনি এমন চটিয়েছেন যে তার ফল তাঁকে ভুগতে হবে মরসুমের বাকি ম্যাচগুলোতে। প্যারিস সঁ জঁমার সঙ্গে মেসির চুক্তি সম্ভবত আগামী মার্চ পর্যন্ত। বোঝাই যাচ্ছে, আগামী চার মাস অনেক ঝড় ঝাপটার মুখোমুখি হতে হবে তাঁকে।

খুব দ্রুত পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে বিশ্ব ফুটবল। ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগে একটা পরিষ্কার বিভাজন ছিল। লাতিন আমেরিকার স্টাইল আর ইউরোপিয়ান স্টাইল। বিশ্বকাপ খেলার সময়ে যে যার চমৎকারিত্ব দেখাত। দুই মহাদেশের কোচেরা খাতা-কলম নিয়ে বসে থাকতেন। কারা কী বিবর্তন আনলেন তা জানার জন্য এখন মনে হচ্ছে, লাতিন স্টাইল বিপন্ন। লাতিন আমেরিকার দক্ষ ফুটবলাররা রোজগারের আশায় খেলেন ইউরোপের নানা ক্লাবে। উইরোপের কোচেরা তাঁদের যে স্টাইলে খেলতে বলেন, তাঁরা খেলতে বাধ্য হন। না খেললে ক্লাব টিমে জায়গা পাকা করতে পারেন না। জাতীয় দলের হয়ে খেলার সময়ে এই ধরনের প্লেয়াররাই সবথেকে মুশকিলে পড়েন। যেমন কোচ তিতের দলের প্লেয়াররা কাতারে বিপন্নতার মধ্যে পড়েছিলেন। ব্রাজিল দল কুড়ি বছর ট্রফি জেতেনি। সমস্যাটা সিবিএফ কর্তারা বুঝতে পেরেছেন। তাই ভাবতে শুরু করছেন, ইউরোপের কোনও কোচের হাতে দায়িত্ব তুলে দেবেন কি না।

শুনছি, তিন কোচের নাম আপাতত ঘোরাফেরা করছে। গুয়ারদিওয়ালা, লুই ফান গাল আর কার্লোস আনসেলত্তি। ম্যাঞ্চেস্টার সিটির কোচ গুয়ারদিওয়ালা সাফ না করে দিয়েছেন। বলেছেন, ব্রাজিলের উচিত কোনো ব্রাজিলীয় কোচের উপর ভরসা রাখা। কেননা তিনি জানেন, ইউরোপের যে কোচ চাকরিটা নেবেন, তিনি স্বস্তিতে থাকতে পারবেন না।

সাম্বাপন্থীরা তাঁকে টিকতে দেবেন না। লুই ফান গাল তো কিছুতেই রাজি হবেন না। কেননা কাতারে নেদারল্যান্ডস ম্যাচের পর রিভালদোর মতো প্রাক্তন ফুটবলাররা তাঁকে বিশ্রীভাবে গালাগাল দিয়েছিলেন। বাকি রইলেন ইতালির আনসেলত্তি। তিনি এখন রিয়েল মাদ্রিদের কোচ। তাঁর সেই চাকরি রয়েছে আরও দু বছর। রিয়েল মাদ্রিদ ছেড়ে না দিলে তিনি ব্রাজিলে যেতে পারবেন না। ব্রাজিলের নামি ক্লাবে যাঁরা কোচিং করান, তাঁদের মধ্যে এমন কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না, যিনি এই গুরুদায়িত্ব পালন করতে পারেন। এক অদ্ভুত সমস্যার মধ্যে পড়েছে ব্রাজিল।

কাতারের বিশ্বকাপের পর ফিফা ক্রমপর্যায় দেখে অবাক হলাম। ব্রাজিল এখনও শীর্ষে। চ্যাম্পিয়ন হয়েও আর্জেন্টিনা দ্বিতীয় স্থানে। ফিফার এই ক্রমপর্যায় নির্ধারণের পদ্ধতিটা জটিল। খোঁজ নিয়ে জানলাম, কাতারে ফাইনাল ম্যাচ টাইব্রেকার পর্যন্ত না গড়ালে, ফ্রান্স বা আর্জেন্টিনা যে দল সরাসরি জিতত, তারাই এক নম্বরে চলে যেতে পারত। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার, ভার (ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি) নিয়ে বিতর্ক। ভার এমন কয়েকটা সিদ্ধান্ত জোর করে চাপিয়ে দিয়েছে, যার ফলে অনেক দলকে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিতে হয়েছে। ফাইনালের দিন আর্জেন্টিনা গোলকিপার মার্টিনেজকে লালকার্ড দেখানো উচিত ছিল। ট্রাইব্রেকারের সময়ে এমন গেমসম্যানশিপ তিনি দেখিয়েছেন। টিভিতে সেসব দেখানো হয়নি। কিন্তু ফরাসি ফুটবল কর্তারা তার ভিডিয়ো ক্লিপিংস ফিফার কাছে পাঠাচ্ছেন।

কাতার থেকে আর্জেন্টিনা ট্রফি নিয়ে গেছে, অথচ লাফাচ্ছে আফ্রিকার দেশগুলো। না, শুধু মরক্কোর সাফল্যের জন্য নয়। আফ্রিকা ফুটবল কর্তাদের দাবি, ইউরোপের বহু দেশ এখন অফ্রিকাজাত ফুটবলার ছাড়া টিম গড়তে পারছে না। বড়ো নিদর্শন ফ্রান্স দল। প্রায় পুরো দলটাই অভিবাসীদের নিয়ে তৈরি। কেউ আলজেরিয়া, কেউ ক্যামেরুন বা মরক্কোর ছেলে। এঁরা যদি নিজেদের দেশের হয়ে খেলতেন তা হলে ইউরোপের অনেক দেশ গ্রুপের গন্ডি পেরতে পারত না। এতে প্রমাণিত হচ্ছে আফ্রিকার ফুটবল তার শক্তি বাড়িয়ে চলেছে। হয়তো এটাই সত্যি। লাতিন আমেরিকার মতো কৌলিন্য হারাচ্ছে না আফ্রিকা। ইউরোপকে ফুটবলার সরবরাহ করছে বটে, কিন্তু নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে। কোনো বিদেশি কোচের উপর তারা দায়িত্ব দেয়নি।

কলকাতা থেকে অনেক সাংবাদিকই বিশ্বকাপ ফুটবল কভার করতে যায়। তাদের কেমন প্রতিক্রিয়া হয় একবার দেখে নেওয়া যাক। কলকাতার এক দৈনিকের বিশ্বকাপ কভার করতে আসা সাংবাদিক বয়ানে—আল বায়েত স্টেডিয়ামে যাচ্ছি ফ্রান্স-মরক্কো ম্যাচ কভার করতে। যত সময় যাচ্ছে, মনটা খারাপ হয়ে আসছে। একদম নবমীর ফিলিংস।

ফুটবলাররা যেরকম ম্যাচ খেলার জন্য টিম হোটেল থেকে টিম বাসে রওনা দেন, আমরা সাংবাদিকরাও সেরকম কাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরির মূল মিডিয়া সেন্টার থেকে আমাদের টিমবাসে ম্যাচের দিকে রওনা দিই। আলাদাও যাওয়া যায়। কিন্তু

আল বায়েত স্টেডিয়ামটা দোহা থেকে অনেক অনেক দূর। মিডিয়াবাসে যাওয়ার একটাই সুবিধা, একদম মিডিয়া সেন্টারের সামনেই নামিয়ে দেয়। প্রথমদিন যখন একা গিয়েছিলাম, স্টেডিয়ামের মিডিয়া সেন্টারে পৌঁছতে হাঁটতে হয়েছিল প্রায় ৭ কিলোমিটার। ফলে আল বেইতে গেলে আর রিস্ক নিই না।

আজ সকালে যখন মূল মিডিয়া সেন্টারে এলাম, কেমন জানি ভাঙা হাটের মতো লাগছিল। যাঁরা বিশ্বকাপ খেলতে এসেছিল, তাদের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে দেশের বেশিরভাগ সাংবাদিকও বাড়ি চলে গিয়েছে। আজ আবার আর্জেন্টিনার প্র্যাকটিস ছুটি ছিল। তবে ওদের সাংবাদিকরা বেশিটা সময় কাটায় কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকেই। ফলে ওদেরও আজ এদিকে কম উপস্থিতি। কাল থেকে শুধুই দুটো দেশের সাংবাদিকদের পূর্ণ উপস্থিতি। সঙ্গে আমাদের মতো আরও কিছু দেশও থাকবে। ও হ্যাঁ, সাংবাদিকদের একটা প্রদর্শনী ম্যাচেরও আয়োজন করেছে ফিফা। খেলার খুব ইচ্ছে ছিল। কিন্তু কপি পাঠানোর চাপে টাইমটাই কাল বের করতে পারব না। শেষ বেলায় মনটা ক্রমশ ভারী হয়ে আসছে।

বিশ্বকাপের মঞ্চে এলেই এই কষ্টটা ভীষণভাবেই মোচড় দিয়ে ওঠে ভিতর থেকে। অভিজিৎ স্টেডিয়াম গড়েছেন। কিন্তু নিজেকে বাঁচাতে পারেননি। আবার কলকাতার সাংবাদিকেরও কাতারের মাঠে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। কিন্তু তার অন্য একটা সুপ্ত বাসনা শুনুন তাঁরই কথায়--বিশ্বাস করুন, সাংবাদিক হব, কস্মিনকালেও ভাবিনি। কত স্বপ্ন ছিল দেশের হয়ে খেলব। ম্যাচ শুরুর আগে মাঠে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াব। জাতীয় সংগীতে গলা মেলাব। যাঁরা মাঠের গ্যালারিতে আছেন তাঁরা। যাঁরা টিভিতে খেলা দেখবেন তাঁরাও আমার সঙ্গে গলা মেলাবেন জাতীয় সংগীতে। ছোটবেলায় কতবার মনে মনে ভেবেছি দৃশ্যটা। আর দশজন ফুটবলার যেভাবে বড় হতে চায় আমিও তো সেভাবেই স্বপ্ন দেখতাম।

ছোট থেকেই বিছানায় আমার পাশেও তো থাকত ফুটবল। মনে আছে তখন ক্লাস ফোরে পড়ি। বাড়ির অদূরে একটা বাঁশ বাগান ছিল। এদিকে বাড়ির আপত্তি স্কুলে বল নিয়ে যেতে দেবে না। সকালে ঘুম থেকে উঠেই সেই বাঁশবাগানে বলটা লুকিয়ে রেখে আসতাম। স্কুলে যাওয়ার সময় বলটা ব্যাগে নিয়ে নিতাম।

সকালে ৪' ১০" খেলতে শঙ্কর দা'র বাড়ি হয়ে লেবুতলা পার্কে খেলতে গেছি। রাতেই আবার ঢাকুরিয়ার রঞ্জুদার হয়ে যাদবপুরে ফাইনাল। চিফ গেস্ট চিমা। সকালে লেবুতলা পার্কে হেরে যাওয়ায় শাস্তি হিসেবে শঙ্করদা রাতে রঞ্জুদার খেলা দেখতে যেতে দেবে না। মন খারাপ করে সিরিটিতে শঙ্কর দা'র বাড়িতে বসে আছি। এদিকে রঞ্জু দা আমাকে আর দেবুকে রাতের খেলায় নিয়ে যাবে বলে শঙ্কর দা'র পা ধরাধরি করছে। অবশেষে গেলাম ফাইনাল খেলতে। সেই সামনে থেকে চিমাকে দেখা। আমি আর দেবু একটা করে গোল করলাম। আমারটা ব্যাকভলিতে। প্লেয়ার প্রাইজ প্যান্টের পিস, আর মাচের সেরা দেওয়াল ঘড়ি নিয়ে বেশি রাতে বাড়ি ফিরে বাবার কাছে ঝাড় খেলাম। তখন তো আর মোবাইল নেই। সারাদিন কোথায় গেছি পাগলের মতো খুঁজেছে। পড়াশোনাতেও খারাপ ছিলাম না। কিন্তু আমি ঠিক করেই নিয়েছিলাম, ফুটবলারই হবো। বেঙ্গল স্কুলের ট্রায়ালে গেলাম আব্দুর সাদিকদের সঙ্গে। রবীন্দ্র সরোবরে হয়েছিল ট্রায়াল। দু'জনেই সুযোগ পেলাম। সাদিক তখন আমাদের সঙ্গেই আন্ডারহাইট খেলত শেখ রাজু নামে। আমরা যখন প্রহ্লাদদার হয়ে ৪'১০" খেলি, দীপঙ্কর রায় তখন নাক মুছতে মুছতে আমাদের সঙ্গে প্র্যাকটিসে আসত। পরে ইস্টবেঙ্গল জুনিয়রের হয়ে খেলতে গেলাম কৃষ্ণনগর স্টেডিয়ামে। প্রতিপক্ষ সাই। আমি উইং-এ খেলছি। প্রতিপক্ষর ব্যাক সূর্যবিকাশ চক্রবর্তী। অমিয়দা'র কোচিঙে আমরা চ্যাম্পিয়ন।

পরে বেহালার লুনার মাঠে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে খেলতে গেলাম। আমরা চ্যাম্পিয়ন। আমি ম্যান অব দ্য ম্যাচ। আবার প্যান্টের পিস, পুজোর আগে। ঠিক ঠিকই চলছিল সব। কাউকে চিনতাম না। সোজা গিয়ে ট্রায়াল দিলাম টাউন ক্লাবে। কোচ মিহিরদা নিয়ে নিলেন। সেই বছর শেষ চারটে ম্যাচ খেললাম। পরের বছর নিয়মিত। আমরা চ্যাম্পিয়নশিপের দৌড়ে দলটা তুলতে চাইলেন না অশোক ঘোষ। লিগ টেবিলের এক নম্বর জায়গায় থেকে পর পর ম্যাচ ছেড়ে দিতে শুরু করলাম আমরা। চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেল কালীঘাট এমএস। যদিও সে বছর ফার্স্ট ডিভিশন বি গ্রুপে ৬ গোল করে আমি সর্বোচ্চ গোলদাতা। সেই বছরেই বিদ্যাসাগর ট্রফিতেও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে চার গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতা আমি। আমার স্ট্রাইকিং পার্টনার আলি রেজা পরের বছরই মোহনবাগানে চলে গেল।

সব কিছুই ঠিক ঠিকঠাক চলছিল। টাউন থেকে বেঙ্গল ট্রায়ালে গেলাম। এক প্রাক্তন ফুটবলার তখন বেঙ্গলের কোচ। সেই প্রথম শন্তিদা, দেবুদা'র নামগুলো ট্রায়ালে গিয়ে জানতে পারলাম। প্রথম ৩০এ ঢুকেও পড়লাম। ট্রায়ালে গোল করলেও সেই কোচ দেখতেন না। পরে যারা মূল দলে থাকলেন, অনেকেই ট্রায়ালে আসেনি। শুনলাম, অশোক ঘোষ তখন আই এফ এর বিরোধী গোষ্ঠী। আমি তখন এত ছোট এগুলি কী করে বুঝব। তাহলে বড়ো কোনও কর্তার দলেই খেলতাম।

অনেক পরে সাংবাদিক হয়ে দোহাজার বাড়িতে প্রথম গেলাম পাসপোর্ট করার জন্য। বলেছিলাম, ফুটবলার থাকার সময় আপনার বাড়ির ঠিকানাটা জানলে হয়তো সাংবাদিক নয়। ফুটবলারটাই হতাম।

বিশ্বকাপে এলে ঘটনাগুলি খুব খুব মনে পড়ে। কেন জন্মালাম না সার্বিয়া, পোল্যান্ড, পর্তুগাল, মেক্সিকো এরকম কোনো একটা ছোট্টো দেশে? এদের দেখি আর ভীষণ

আফশোস হয়। কী করলাম সারাটা জীবন। শুধু একে অপরের বিরুদ্ধে দোষারোপ করে গেলাম। ব্যর্থ জীবনে যখন বিশ্বকাপে এই ছোটো দেশগুলির ফুটবলারদের দেখি ভীষণ আফশোস হয়। এরা যখন মাঠের মাঝখানে দাঁড়ায় সারা দেশ এদের জন্য গলা ফাটায়। এরাই তো আসল ভগবান। আমাদের ছোটোবেলায় ফুটবল হওয়ার স্বপ্নটা কোথাও তো এদের থেকে কম ছিল না। তাহলে? এমবাপেও বল নিয়ে ঘুমোত আমরাও তো ভালবেসে তাই করতাম। ঘুরতে গেলেও সঙ্গে টেনিস বল রাখতাম। তাহলে কেন ব্যর্থ হলাম আমরা?

যেবার ব্রাজিল গিয়ে সারাটা দেশ চক্কর দেওয়ার সময়, খালি মনে হতো, যদি ব্রাজিলে জন্মাতাম, নিশ্চিতভাবেই ফুটবলার হতাম। হয়তো ছোটোবেলা থেকেই গ্রেমিও বা সাওপাওলো নাহলে ভাস্কো কোনো না কোনো অ্যাকাডেমিতে ছোটোবেলাটা কাটত।

আর আমাদের শুরুটাই হয়েছে ভুল ভাবে। ছোটোবেলায় যিনি প্র্যাকটিস করাতেন, শিখিয়েছিলেন, প্র্যাকটিসের মাঝে বা পরে যেন জল না খাই। তাতে নাকি শরীরের খারাপ হয়। বড়ো হয়ে দেখলাম, খেলার সময় জল খাওয়ার জন্য মাঠের পাশে জলের বোতল থাকে। এরকম অজস্র ভুলের মধ্যে আমাদের বড়ো হওয়া। সেদিন ৪'১০" খেলতে গিয়ে প্রথম পেট চেপে দাঁড়িয়েছিলাম হাইট কমানোর জন্য, সেদিনই ছোটোবেলায় ফুটবলের সঙ্গে অসৎ হওয়ার প্রথম শিক্ষাটা পেয়ে গিয়েছিলাম। জেনেছিলাম, অন্যায়ভাবে লুকিয়ে সব হয়। সেটাই দেখেছি বাংলার ট্রায়ালে গিয়ে।

ভগবান, পরজন্ম বলে যদি কিছু থাকে, আর ভারতে নয়। ইউরোপ বা লাতিন আমেরিকার কোনো ফুটবল খেলিয়ে দেশ জন্মটা দিও। ফুটবলটাকে অত্যন্ত কাছ থেকে দেখেই বলছি, আগামী পঞ্চাশ বছরেও ভারত বিশ্বকাপে খেলবে বলে মনে হয় না। আমরা দর্শক হিসেবেই ঠিক আছি। খেলবে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা। আর আমরা কোথাও কত দূরে নিজেদের মধ্যে মারপিট করে মরছি। আর একে অপরকে ট্রোল করে আনন্দ পাচ্ছি। আমরা দর্শক হিসেবেই ভালো।

বিশ্বকাপ এলে বড়ো আফশোস হয়। বড়ো কষ্ট হয়। শেষটায় শেষ করে একটা ছড়া দিয়ে—

স্টেডিয়াম গড়া থেকে
কাজ ছিল কাতারে।
শ্রমিকের মৃত্যুতে
শুধু কয় আহারে।

স্পনসর ভারতীয়
বিলবোর্ড ভর্তি।
দর্শকও ভারতীয়
মাঠে করে ফুর্তি।

বিনোদনে ছিল কিছু
ভারতীয় তারকা।
খাবারেও ছিল জেনো
রুটি আর তড়কা।

নেই শুধু ভারতীয়
ফুটবল মাঠেতে।
দল বেঁধে মাতে শুধু
সমালোচনাতে।

নবাঙ্কুর

মুংরু

গার্গী দেব

চৈত্র-বৈশাখ গিয়ে জ্যৈষ্ঠমাস এসে গেল। বৃষ্টির দেখা নাই। হায় ভগবান ,এ কী অনাসৃষ্টি! বৃষ্টি না হলে , জল না পেলে গাছগুলান বাঁচে কীভাবে? হায় হায়, এবার অদৃষ্টে অনাহার লেখা আছে। বাবুর বাগানের জঙ্গল সাফ করতে করতে মুংরু দীর্ঘশ্বাস ফেলে। দেশে না জানি জমিজমাগুলান ফুটিফাটা হয়ে গেছে। ডান হাতটা দিয়ে আড়াল করে, চোখদুটোকে কুঁচকে ছোটো করে আকাশের দিকে তাকায় সে, একখণ্ড মেঘের আশায়। হায় মা কালী, কোনো আশাই নাই। আকাশের গোল অগ্নিপিণ্ডটা যেন আগুন ঝরাচ্ছে। কী তেজ! মুংরুর শীর্ণ, আবলুস কাঠের মতো চেহারাটা সর্বাঙ্গে ঘামে ভেজা। ফোঁটা ফোঁটা ঘাম ঝরে পড়ছে শুকনো মাটিতে। মাঝে মাঝে মলিন ধুতির খুঁট দিয়ে কপালের, মুখের ঘাম মুছছে। মাথার ছেঁড়া গামছার পাগড়িটাকে ঠিকঠাক বেঁধে রাখছে। জ্যৈষ্ঠের উত্তাপ শরীরটা যেন আর সহ্য করতে পারছে না। মাঝে মাঝেই গামছা দিয়ে হাওয়া খেতে খেতে আমগাছটার ছায়ায় বসে হাঁপাচ্ছে। তবু, কাজ ছাড়ান দেওয়া চলবে না। বাবু বলেছে, জমিটুক সাফ করে দিলে পুরা পানসো রুপয়া মিলবে। মুংরু দুপুরের খরতাপে ভরপেট একথালা ডালভাতের স্বপ্ন দেখতে থাকে। শুধু মুংরুরাই জানে এ স্বপ্ন কত দামি! এ স্বপ্ন তাদের দেখতে নেই। কিন্তু মাঠভরা ধান, গোলাভরা ফসল, মাঠের সবুজ সবজি ওদের হাতেই তো পুষ্ট হয়, তবু তারা কেন বঞ্চিত? অর্ধের দিন অনাহারে, অর্ধাহারে থাকতে হয়। হায় ভগবান, তোমার কি চক্ষু নাই? দুনিয়ার সব ফসল, সব কিছু কি শুধু বাবুলোকেদের জন্য? জ্যৈষ্ঠের তাপদগ্ধ আকাশের দিকে তাকিয়ে হতাশায় মুংরুর চোখ জলে ভরে ওঠে। এ চোখের জলের কোনো সমব্যথী নেই, সমবেদনা নেই। মুংরুরা শুধু অক্লান্ত পরিশ্রম করতেই জানে। এ পরিশ্রমের কোনো বিরতি নেই।

সেই কোন ভোরে দুটো পান্তাভাত খেয়ে ঘর থেকে বেরিয়েছে মুংরু। তারা পুরনো একটা বাড়িতে পাঁচজনে মিলে থাকে। বিহার থেকে এসেছে রোজগারের আশায়। পুরনো ভাড়া বাড়ির ড্যাম্প লাগা দেওয়াল। মেঝেটাও জায়গায় জায়গায় ভাঙা। বিছে, ইঁদুর লুকিয়ে থাকে। বর্ষায় ফুটো ছাদ দিয়ে জল পড়তে থাকে। তবু ভাড়া সেই দেড়হাজার টাকা। সারাবার কথা মুখে আনলেই বাবুর সেই এক বুলি—'অন্য বাড়ি দেখে নে, এ বাড়ি আমি প্রোমোটারকে দিয়ে দেব। তারচেয়ে আগে থাকতেই ব্যবস্থা করে নে সব।' মুংরুরা কুঁকড়ে যায়। অন্য কোথাও উঠে যাবার অর্থ তো আরও বেশি ভাড়া। গরিব মানুষগুলো খাবেই-বা কী। দেশে বউ, পোলাপান সব টাকার মুখ চেয়ে বসে থাকে। সেখানেই-বা কী পাঠাবে? চিন্তায় ওদের কপালে ভাঁজ পড়ে যায়।

বাগানে যা জঙ্গল বাপ, সেই সকাল থেকে কোদাল কাটারি চালাচ্ছে, ঝুড়ি করে ঝোপঝাড় বাগানের বাইরে গাদা করে রাখছে, যন্ত্রের মতো। এখনোও অর্ধেক কাজ হয়নি। এর উপর আবার দুটো আমগাছের ডাল কাটতে হবে। বাবু বলেছে, পুরো কাজ না হলে একটা পয়সাও দেবে না। হায় ভগবান!

বেলা প্রায় বারোটা বেজে গেছে। খিদেয় মুংরুর পেট জ্বলছে। হাত আর

চলছে না। গরমের চোটে মাথা ঘুরছে। নাঃ, মুংরু আর পারে না। সামনের আমগাছটার তলায় বসে পড়ে সে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় চোখটা বুঁজে আসে। কিন্তু কাজ যে অনেক বাকি!

— কী রে মুংরু, কী ব্যাপার, কাজ তো দেখছি কিছুই এগোয়নি। বসে পড়লি যে বড়ো অ্যাঁ,

— বাবু, টিফিনের পয়সাটা যদি দ্যান, একটু খেয়ে আসি গে।

বাবু খেঁকিয়ে ওঠেন, কেবল চা টিফিন খেলেই চলবে? তোকে ডেকেছি কী কারণে? শুধু চা খাওয়ার জন্য? নে নে কাজ কর। হাত চালা। আমি একটু পরেই আসছি। তোদের ওই এক রোগ। নজর না রাখলেই কাজে ফাঁকি। হুঁঃ, যত্তোসব। রাগে গজগজ করতে করতে গেট পেরিয়ে তিনি বাড়ির দিকে পা বাড়ান।

কিন্তু পেটে খিদের জ্বলন যে আর সহ্য হয় না। গেটের পাশের কলটা থেকে আঁজলা ভরে জল খায় সে।। ময়লা গামছাটা ভিজিয়ে মুখ, ঘাড় মুছে নেয়।

নাঃ, কিছু খেতেই হবে। মুংরু বেপোয়ারা। ওই তো কিছুটা দূরে একটা চায়ের দোকান। ওখান থেকে যা কিছু হোক খেয়ে আসবে সে। দোকানের সামনে নড়বড়ে বেঞ্চে বসে কতকগুলো লোক রুটি-ঘুগনি খাচ্ছিল। গন্ধে মুংরুর জিভে জল আসে।

— দাদা, দুটো রুটি আর এক পেলেট ঘুগনি দ্যান তো। চা-ও দেবেন সাথে।

দোকানি মুংরুর হতশ্রী চেহারা দেখে বিরক্তির সঙ্গে বলে— হ্যাঁ, দুটো রুটি হলো গে চার টাকা, ঘুগনি দশ টাকা আর পাঁচ টাকার চা, সবসুদ্ধু উনিশ টাকা বের কর।

ইতস্তত করে মুংরু বলে, এখন তো টাকা দিতে পারবনি, উই উধারে বাবুর জমিতে কাজ করতেছি। পাঁচটায় ছুটি করে আপনার পয়সা দিয়ে যাব দাদা।

খেঁকিয়ে ওঠে দোকানি। ওসব ধারে ব্যবসা করি না বুঝলি? যা খাবি সব ন-গ-দে।

হায় ভগবান, এখন কী হবে। দু'একজন মুংরুর অসহায়তায় করুণা করে বলে, আহা , দিয়ে দে না হারু, ও তো বলছে দিয়ে যাবে। আহা, মানুষটার খিদে পেয়েছে। লোকটার কথা শেষ হয় না, দোকানি গর্জে ওঠে— ব্যবসা করতে বসেছি, দানসত্র খুলে তো বসিনি!

হতাশায় মুংরুর চোখে জল ভরে আসে। কোনোরকমে সে টলতে টলতে ফিরে এসে কোদালটা নেয় কাঁপা কাঁপা হাতে। সামনের বনতুলসীর ঝোপটার দিকে এগোতেই সরসর করে করে বেরিয়ে আসে এক গোখরা। উদ্ধত ফণা তুলে গজরাতে থাকে। আরে বাপ! ভয়ে মুংরু দু'পা পিছিয়ে আসে। দুবছর আগে ভগীরথ ঝোপঝাড় পরিষ্কার করতে গিয়ে এমনিভাবে গোখরার ছোবলে প্রাণ দিয়েছে।

আমগাছটার ঠাণ্ডা ছায়াটা মুংরুকে ডাকতে থাকে। মুংরু সে ডাক এড়াতে পারে না। বসে পড়ে সে হাঁপাতে থাকে। নিজেকে সান্ত্বনা দেয়— আর তো পাঁচিলের ওধারটুকু বাকি। কোনোরকমে সে কাজ শেষ করে দেবে। বাবুর কাছে কড়কড়ে পাঁচশো টাকা পাওয়া যাবে। বাড়িতে গিয়েই আলুসেদ্ধ ভাত বসিয়ে দেবে, পথে মুদির দোকান থেকে ডিমও নেবে। কাঁচা লঙ্কা দিয়ে পেট ভরে খাবে মুংরু।

গাটা কেমন যেন গুলিয়ে উঠল মুংরুর। আসলে খলি পেটে অনেকখানি জল খাওয়া হয়ে গেছে। বমি হয়ে গেল অনেকখানি। শুধু জল। গাছের তলায় এলিয়ে পড়ল সে। কেমন যেন ঘুম নেমে এল দুচোখে। এক অনন্ত ঘুমের মধ্যে মুংরু স্বপ্ন দেখতে থাকল— এক থালা গরম ভাত আর চকচকে পাঁচশো টাকার নোট।

সূর্য ঢলে পড়েছে। একি! হারামজাদাটা কাজ ফেলে শুয়ে আছে। দেখাচ্ছি মজা।

— মুংরু, এই মুংরু। বাবুর কণ্ঠস্বর উত্তপ্ত বাতাসে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে আম জাম আর কাঁঠালগাছের মধ্যে। ঝোড়ো গরম বাতাসের হাহাকার যেন। তাদের শাখা-প্রশাখার মধ্যের শীতল ছায়া এসে মুংরুর গায়ে যেন মমতার হাত বুলিয়ে দেয়।

পাড়ার ডাক্তার এসে মুংরুর নিথর শরীরটা পরীক্ষা করে বললেন, খালিপেট আর প্রচণ্ড গরমে অতিরিক্ত পরিশ্রমে হিটস্ট্রোক হয়ে মারা গেছে।

বাবু ভাবলেন, যাক, বিনি পয়সায় অন্তত অর্ধেকটা জমি তো পরিষ্কার করা গেল! □

With Best Compliments from -

A Well Wisher

নবাঙ্কুর

চিরসাথী

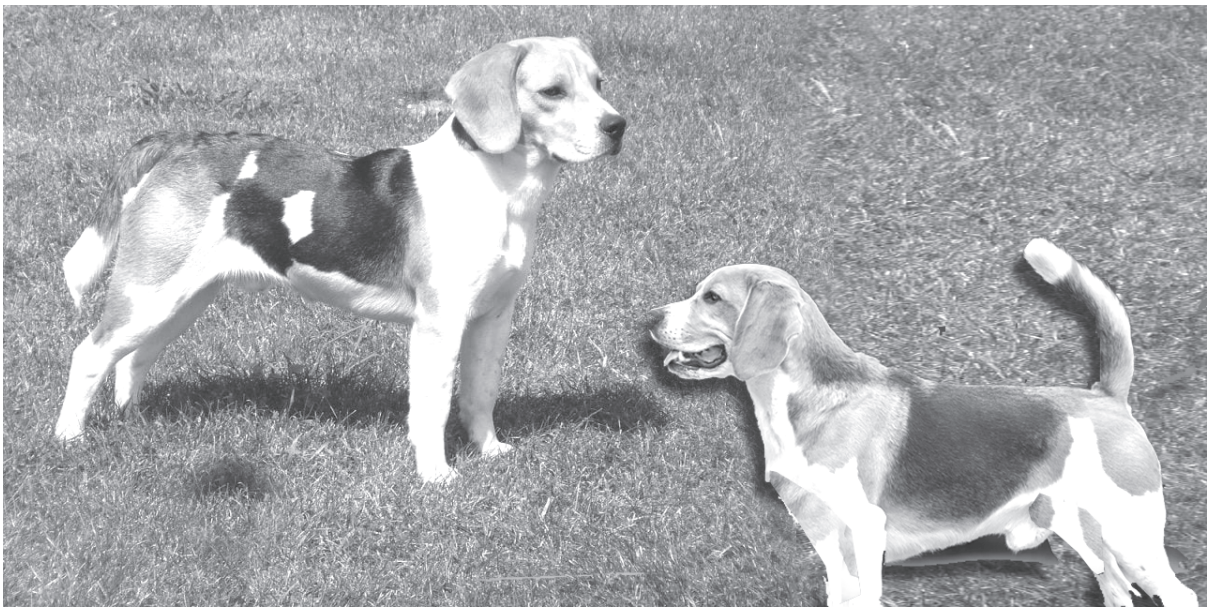

ডুকু আর টুকু খুব ভালো বন্ধু। কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতেই পারে না। একজন কিছু না খেলে অন্যজনও খায় না। এত মধুর সম্পর্ক দুজনের মধ্যে যা আজকের দিনে কোনো মানুষের মধ্যে দেখা যায় না।

এতক্ষণ যাদের কথা বললাম তারা কিন্তু মানুষ নয়। তারা দুটি কুকুরছানা। একটি ছেলে, অন্যটি মেয়ে। ছেলে ছানাটির গায়ের রং সাদা, তার ওপর বড়ো বড়ো বাদামি রঙের ছোপ। মেয়ে ছানাটিও সাদা রঙের আর বাদামি ছোপগুলো ছোটো ছোটো। এদের জন্ম হয়েছিল আমাদের বাড়ির পাশের নিমগাছটার তলায়। যেদিন বৃষ্টি হতো, সেদিন ওরা আমাদের বারন্দায় উঠে আসত।

বড়ো হলেও ডুকু আর টুকু অন্য কুকুরের থেকে আলাদা। দুজনেই শান্ত আর নিরিবিলি জায়গা পছন্দ করে। অন্য কুকুরের মতো অকারণ ঘেউ ঘেউ করে না।। দুজনে দৌড়াদৌড়ি করে খেলে বেড়ায়। যে যা দেয় তাই খেয়ে নেয়। এরা যেন মানুষের ভাষা বুঝতে পারে। পাশের বাড়ির দাদু যেদিন হার্টঅ্যাটাকে মারা গেল, বাড়ির সবাই যখন কাঁদছিল, তখন ওরা দুটিও ভিড়ের মধ্যে এসে করুণস্বরে কাঁদছিল। সেদিনই কাকা ওদের নাম রেখেছিল ডুকু আর টুকু।

ডুকু আর টুকুকে আমাদের পাড়ার সবাই খুব ভালোবাসে। পাড়ার কেউ যদি দোকানে কিছু কিনতে আসে, ওরা যেখানেই থাক ছুটে এসে তার পায়ে কাছে লেজ নাড়াতে থাকে। আর কেউ যদি ওদের বিস্কুট খেতে দেয় তাহলে

খুশি হয়ে দুবার ঘেউ ঘেউ করে আবার নিজের জায়গায় ফিরে যায়।

ওরা যখন মাত্র পাঁচমাসের, তখন ওদের মা মারা যায়। সেদিন রাতে খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। রাত্রিবেলা হঠাৎ ছানাদুটি কুঁইকুঁই করে চিৎকার করতে শুরু করে। চিৎকার শুনে আমরা সবাই, পাশের বাড়ির কাকুরা গিয়ে দেখি ওদের মা নিথর হয়ে পড়ে আছে। তাই দেখে আমার মা কাঁদতে শুরু করে। ইতিমধ্যে আরও অনেকে এসে জমা হয়েছে। ছানাদুটি সমানে কেঁদেই চলেছে। আমার বাবা একজনকে বলল, মরা কুকুর তো এভাবে ফেলে রাখা যায় না, পৌরসভায় ফোন করো যেন সকালে মরা কুকুরটিকে নিয়ে যায়।

আমার মা তো সেইভাবে পশুপ্রেমিক নয়, তাসত্ত্বেও সেদিন ছানাদুটিকে কোলে নিয়ে এমনভাবে আদর করতে লাগল যেন মা ওদের বলছে , আজ থেকে আমিই তোদের মা। এমন সময় আমার দাদু বললেন, সেই সকালে তো পৌরসভার গাড়ি আসেবে। তারচেয়ে বড়ো রাস্তার পাশে যে মাঠটা আছে সেখানেই ওটাকে পুঁতে রাখতে হবে। দাদুর কথা শুনে বেশ কয়েকজন রাতে বৃষ্টি মধ্যেই মরা কুকুরটিকে নিয়ে মাঠের দিকে চলল। আমার মা ছানাদুটি নিয়ে বাড়ি এসেছিল। ছানাদুটিকে সেদিন জোর করেও কিছু খাওয়ানো যায়নি। বাবা-কাকাদের মাঠ থেকে ফিরতে সেদিন অনেক রাত হয়েছিল। ছানাদুটেকে সেদিন দাদুর খাটের নীচে রাখা হয়েছিল।

ডুকু আর টুকুর বয়স এখন একবছর হয়ে গেছে। ওরা এখন সবার চোখের মণি। সেইসঙ্গে ওদের দুজনের ভাব আরও গাঢ় হয়েছে। ভুকু টুকুকে দাদার মতোই আগলে রাখে। যদিও ওরা একই বয়সের।

এভাবেই আনন্দে দিন কাটছিল। কিন্তু হঠাৎ সেই আনন্দ একনিমেষে শেষ হয়ে গেল। গত ১৫ জুলাই আমার জন্মদিন ছিল। আমি সেদিন সকালে ডুকু আর টুকুকে দু' টুকরো স্লাইস কেক দিয়ে বললাম, আমার জন্মদিন, তাই তোদের কেক খেতে দিয়েই দিনটি শুরু করলাম। ওরা আনন্দে দু'বার ঘেউ ঘেউ করে আমাকে উইশ করল। আমিও খুব খুশি।

সেদিন দুপুরে আমরা সবাই একসঙ্গে খেতে বসেছি। কিছুক্ষণ পরে বিকট শব্দে একটা বাইক যাবার শব্দ পেলাম। তার পরেই ডুকুর চিৎকার শুনতে পেয়েই রাস্তায় ছুটে এসে দেখি টুকু রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে আছে, ওর মুখ দিয়ে গল গল করে রক্ত বেরুচ্ছে। সারা পাড়ায় শোকের ছায়া নেমে এল। আমার চিন্তা হচ্ছিল এবার টুকুছাড়া ডুকু থাকবে কী করে। সবাই চোখের জলে টুকুকে তার মায়ের পাশেই পুঁতে রাখল।

এরপর ডুকুকে সবাই চোখে চোখে রাখতে শুরু করল। ডুকুর মধ্যে একটা অদ্ভুত আচরণ লক্ষ্য করা গেল। যখন কেউ ডুকুকে বিস্কুট দিত, ডুকু একটু খেয়ে বাকিটা মুখে করে নিয়ে গিয়ে টুকুর কবরের উপর রেখে দিত। সবাই অবাক যে, টুকুর কবরটা ডুকু চিনল কী করে? দাদু বলল, ওটা প্রাণের টান।

টুকু মারা যাবার পর ডুকু আমাদের বারন্দায় আর থাকত না। জোর করে ঘরে নিয়ে গেলে চিৎকার করত। ওর স্বভারের পরিবর্তন হতে শুরু করল। সবসময় চিৎকার করত। খাবার দিলেও খেত না। কারও বাড়ি গিয়ে নোংরা করে দিত। আগে আমি স্কুল থেকে বাড়ি ফিরলে ওরা দুজন আমার সঙ্গে খেলা করত। এখন ডুকু চুপচাপ শুয়ে থাকে আর রাতে নিমগাছের তলায় গিয়ে ঘেউ ঘেউ করে। আর মনে হয় যেন কারও সঙ্গে খেলা করছে। সবাই বলে, রাতে মনে হয় টুকু ওর কাছে আসে।

এভাবেই চলছিল। এগারো দিনের মাথায় আবার একটা দুর্ঘটনা ঘটল। দাদু রোজকার মতো সকালে হাঁটতে বেরিয়েছিল। দশ মিনিট পরেই দাদু প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে চিৎকার করে বলল, ডুকু আর নেই। বলেই দাদু কাঁদতে কাঁদতে ছুটল বড়ো রাস্তার দিকে। আমি, বাবা, মা আর পাড়ার কয়েকজন গিয়ে দেখি যেখানে টুকুর মা আর টুকুকে কবর দেওয়া হয়েছে সেখানেই ডুকুর প্রাণহীন দেহ পড়ে আছে। সবার চোখে জল। ডুকুকেও ওখানেই কবর দেওয়া হলো।

বাড়ি এসে মা কান্নায় ভেঙে পড়ল। দাদু আমাকে বলল, সোনা মা, একেই বলে চিরসাথী। এরা কেউ কাউকে ছেড়ে থাকত না। বাবা দাদুর কথা শুনে বলল, তোমরা আর কেঁদো না। ডুকু আমাদের কাছে থাকলে ভালো থাকত না। টুকু ছাড়া ও কিছুই বুঝত না। আমি তখন মায়ের দিকে তাকিয়ে দেখি, মায়ের মুখে হাসি। আমিও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

মৌমিতা দেবনাথ, নবম শ্রেণী, নিমতা, কলকাতা-৪৯।

শারদ শুভেচ্ছায়—

শ্রী সৌরভ ঘোষ
শ্রী অজিত জানা
শ্রী রমেশ সারাওগী
শ্রী অনিল সারাওগী
শ্রী শ্রীধর বাগলা
শ্রী নির্মল কুমার মাইতি

‘আমার এই তুচ্ছ প্রাণের অঞ্জলীতে
জানিয়ে যাব তোমায় প্রণাম’

— শীলভদ্র দত্ত

প্রাক্তন বিধায়ক, বারাকপুর